২

পূর্ব্বপ্রকাশিত প্রবন্ধাংশে বৈদিকযুগে শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ ও নিরুক্ত নামক বেদাঙ্গের অনুশীলনের উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার পর "ছন্দস্" শাস্ত্রের কথা। মধুচ্ছন্দাদি ঋষিদের সময়ে "ছন্দস্" শাস্ত্রের যে বিশিষ্ট অনুশীলন ছিল, তাহা সপ্রমাণ করিবার যত্ন না করিয়া, পাঠকবৃন্দকে ঋগ্বেদের "ছন্দ" গুলি দেখিতে অনুরোধ করি। ঋগ্বেদের প্রথম অবস্থায় প্রধান প্রধান ছন্দ সাত প্রকার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইত, কিন্তু ঋক্‌রচনকারী ঋষিরা সেই সাত হইতে ভাঙ্গিয়া অন্যান্য প্রকার বিবিধ নূতন ছন্দের গঠন করেন। ইহা যে ছন্দস্ শাস্ত্রের প্রকৃষ্ট অনুশীলনেরই ফল, তাহা বলা বাহুল্য।

"জ্যোতিষ" ষষ্ঠ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বেদাঙ্গ বলিয়া পরিগণিত। অন্যান্য কয়েকটি বিজ্ঞান বেদের ভাষা অবলম্বন করিয়া নির্ম্মিত; বেদাঙ্গের মধ্যে জ্যোতিষই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ছিল। ঋষিরা যজ্ঞকালনির্ণয়ের জন্য জ্যোতিষের ব্যবহার করিতেন; সেই কারণে ঋষিসমাজে জ্যোতিষের সবিশেষ অনুশীলন প্রচলিত

আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে খৃঃ পূঃ ১৫০০ বৎসরকে মধুচ্ছন্দার আনুমানিক সময় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। এই সময়ে জ্যোতিষের অনুশীলন এদেশে কিরূপ ছিল, তদ্বিষয়ে কুতূহলী পাঠক মোক্ষমূলর কর্ত্তৃক প্রকাশিত ঋগ্বেদের ভূমিকা পাঠ করিবেন। এখানে সে কথার সবিস্তার আলোচনা অসম্ভব এবং নিষ্প্রয়োজন। বেণ্টলীর গণনা অনুসারে জানা যায়, খৃষ্টপূর্ব্ব ১৪২৬ অব্দে এতদ্দেশীয় ঋষি জ্যোতিষীগণ কৃত্তিকা নক্ষত্রে ক্রান্তিপাতের পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, এবং এই সময়েই নক্ষত্রগণনায় কৃত্তিকা আদি বা প্রথম নক্ষত্র বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। অনুরাধার পূর্ব্ববর্ত্তী নক্ষত্র, এই সময়ে "রাধা" বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। ইহার মধ্য দিয়া বিষুব রেখা পতিত হওয়ায়,—এবং বিষুব রেখা দ্বারা ঐ নক্ষত্র দুই সমান ভাগে খণ্ডিত হওয়ায়, ঋষিরা উহার দ্বিশাখা বা "বিশাখা" এই নূতন নামকরণ করেন। আরও জানা যায়, ঠিক ঐ সময়ে ঋষি জ্যোতিষীরা একটি আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়াছিলেন, যাহা তৎপূর্ব্বে বা তৎপরে আর কেহ

কখনও দেখিতে পায় নাই। ন্যূনাধিক ষোড়শ মাসের মধ্যে (খৃঃ পূর্ব্ব ১৪২৫ অব্দের ১৯এ আগষ্ট হইতে খৃঃ পূর্ব্ব ১৪২৪ অব্দের ১৯এ এপ্রেলের মধ্যে) চন্দ্রের সহিত বুধগ্রহের রোহিণী নক্ষত্রে, শুক্রগ্রহের মঘা নক্ষত্রে, মঙ্গলগ্রহের পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে, এবং বৃহস্পতিগ্রহের পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে, সমসূত্রপাত ঘটিয়াছিল; কিন্তু শনিগ্রহ তৎকালে চন্দ্রের ভ্রমণপথের দূরবর্ত্তী থাকায়, তাহার সহিত তাদৃশ সমসূত্রপাত ঘটে নাই। এই অদৃষ্টপূর্ব্ব ঘটনার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জ্যোতিষীরা আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পর্য্যবেক্ষিত ঘটনা হইতে এক লৌকিক উপাখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে যে, সোম (চন্দ্র) দক্ষ প্রজাপতির ২৭ কন্যাকে (২৭ নক্ষত্রকে) বিবাহ করিলে; সোমের ঔরসে উল্লিখিত চারি নক্ষত্র হইতে উপরি-উক্ত চারিটি গ্রহের জন্ম হয়, তজ্জন্য বুধের নামান্তর "রৌহিণেয়", শুক্রের নামান্তর "মঘাভূ", মঙ্গলের নামান্তর "আষাঢ়াভব", এবং বৃহস্পতির নামান্তর "পূর্ব্বফল্গুনীভব"। ইহার কিছু পূর্ব্বেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়; এবং জ্যোতিষীরা তখন দেখিয়া রাখেন যে, সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে রহিয়াছে। ইহা দ্বারা স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, মধুচ্ছন্দার সময়ে জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিশিষ্ট আলোচনা চলিতেছিল। মধুচ্ছন্দার বহুপূর্ব্বে ঋষি জ্যোতিষীগণ ভ-চক্রকে ২৭ ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন, এবং এক এক ভাগে চন্দ্র এক এক দিন অবস্থিতি করেন, ইহা গণনা করিয়াছিলেন। সাধারণ লোকে অমাবস্যা হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত ৩০ দিন গত হয়, দেখিতে পায়। এই পর্য্যবেক্ষণ মাসগণনার মূল। কিন্তু অচল তারাগণের মধ্যে চন্দ্রের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিলে জানা যায়, ৩০ দিনে নয়, ২৭ দিনে চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, ইহাই ভ-চক্রকে ২৭ ভাগে বিভক্ত করিবার কারণ। ঋষিদের অনেক পূর্ব্বে দ্বাদশ চান্দ্র মাসে এক সম্বৎসর হয়, এবং সূর্য্যের অয়ন পরিবর্ত্তন হয় বলিয়া অবধারিত হইয়াছিল, কিন্তু মধুচ্ছন্দার সময়ে তাদৃশ দ্বাদশ মাসে যে সম্বৎসর হয় না, ইহা সূর্য্যের গতি-পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছিল; তজ্জন্য তৎকালের ঋষিরা এক ত্রয়োদশ "অধি" মাসের গণনা আরম্ভ করেন। যেখানে নিয়মের ব্যতিক্রম হইতেছে বলিয়া আপাততঃ দেখা যাইত, এইরূপে সেখানেও নিয়মের রাজত্ব বিস্তৃত হইল। এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মধুচ্ছন্দার সময়ে ঋষিরা রাত্রিকালে ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে নভোমণ্ডলে জ্যোতিষ্কগণের ভ্রমণবৃত্তান্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। জ্যোতিষ্কগণ যে অচল নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া বিচরণ করিতেছে, এই জ্ঞান তাঁহাদের হৃদয়ে তৎকালে বদ্ধমূল হইয়াছিল।

জ্যোতিষের আলোচনাতেই প্রধানতঃ তাঁহারা এই সত্যে উপনীত হয়েন যে, ব্রহ্মাণ্ডের সমুদায় কার্য্যই অটল নিয়মের অধীন।

পূর্ব্বকাল অপেক্ষা আমাদের সময়ে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিস্তর সমুন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু বিজ্ঞানের যে মূল তত্ত্ব, অর্থাৎ বিশ্বসংসার অচল ও অটল নিয়মের অধীন,—এই তত্ত্ব আমরাও যেমন জানি, মধুচ্ছন্দাও তেমনি জানিতেন। বেদপাঠীগণের নিকট এই কথাটি বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য। যাহাকে আমরা ইহ যুগে Scientific Spirit বলি, তাহা উল্লিখিত মূলতত্ত্বেরই অঙ্গীকার মাত্র, এবং সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে, মধুচ্ছন্দা প্রভৃতি ঋষিগণের হৃদয়ে সেই বৈজ্ঞানিক ভাবের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। জগদ্বিখ্যাত নিউটন বলিয়াছিলেন যে, তিনি যে সকল বৈজ্ঞানিক মহাসত্যের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা জ্ঞানার্ণবের বেলাভূমিতে উপলখণ্ড মাত্র;— জ্ঞানার্ণব-পার হওয়া দূরে থাকুক, তাহাতে তিনি প্রবেশ করিতেই পারেন নাই! যিনি যতই জ্ঞানী হউন না কেন, তাঁহাকে এই কথা স্বীকার করিতে হয়। এক জন বা দশটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অবগত আছে, আর এক জন বা এক শত; তাহাতে তাহাদের বৈজ্ঞানিক ভাবের বিশেষ ইতরবিশেষ ঘটে না। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অপেক্ষা মনের বৈজ্ঞানিক ভাবই শিক্ষার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। বৈজ্ঞানিক বিশেষ বিশেষ তত্ত্বের পরিগ্রহ সন্দিগ্ধ বা ভ্রান্ত হওয়া সম্ভব; কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভাব চিরকালই সমান। সংসার নিয়মের অধীন, তাহার ব্যতিক্রম নাই—এ কথা মধুচ্ছন্দার সময়েও যেমন সত্য, আজিও তেমন। ইহাকেই আমি বলি বৈজ্ঞানিক ভাব। মধুচ্ছন্দা যদি এই বৈজ্ঞানিক ভাব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তবে তাঁহাকে এক জন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

মধুচ্ছন্দা এই ভাব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন কি?

বিশ্বামিত্রের কৃত্রিমপুত্র দেবরাত,—যিনি সম্বন্ধে মধুচ্ছন্দার ভ্রাতা,—তিনি বলিতেছেন—

> অমী য ঋক্ষা নিহিতাস উচ্চা নক্তং দদৃশ্রে কুহচিদ্দিবেয়ুঃ।
> অদব্ধানি বরুণস্য "ব্রতানি" বিচাকশচ্চন্দ্রমা নক্তমেতি॥ ১।২৪।১০

ইহা স্পষ্টই জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনুশীলনপ্রসূত বৈজ্ঞানিক ভাব। নক্ষত্রগণ ও চন্দ্র দিবাভাগে অদৃশ্য থাকিয়া রাত্রিতে দৃষ্টিগোচর হয়। ইহারা যদৃচ্ছাক্রমে উদিত বা অস্তমিত হয় না—বরুণের অদব্ধ ব্রতের অনুসরণ করিয়াই আবির্ভূত

ও তিরোহিত হয়। ব্রত=Law বা নিয়ম। অদব্ধ=অপরিবর্ত্তনীয়, অচল অটল। দেবরাত বলিতেছেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অপরিবর্ত্তনীয় অচল অটল নিয়মের অধীন; বৈদিক ভাষায় অদব্ধব্রতের অধীন। তবে ইহাঁর সঙ্গে সঙ্গে তিনি আর একটা বড় গুরুতর কথা বলেন, তাহা এই যে, "বরুণ" নামক সেই অদব্ধব্রতের একজন ব্যবস্থাপক আছেন! তাহার পর মধুচ্ছন্দার শিক্ষা কি বলিতেছেন, শ্রবণ কর;

বিশ্বামিত্র বলিতেছেন:—

ন তা মিনংতি মায়িনো ন ধীরা ব্রতা দেবানাং প্রথমা ধ্রুবাণি।
ন রোদসী অদ্রুহা বেদ্যাভির্ন পর্ব্বতা নিনমে তস্থিবাংসঃ॥—৩।৫৬।১

দেবতাদের যে সকল "ব্রত",—যাহা সৃষ্টির প্রথম হইতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে,—(প্রথমা)—যাহা অচল অটল (ধ্রুবাণি)—যাহার বিপরীতাচরণ অসম্ভব (অদ্রুহা)—কুশল শিল্পীগণই হউক (মায়িনঃ)—অগাধ চিন্তাশীল পণ্ডিতগণই হউক (ধীরাঃ) কেহই "নতা মিনংতি" অর্থাৎ সে সকল ব্রতের হিংসা বা বিনাশ করিতে পারে না। দ্যাবা-পৃথিবীর মধ্যে এমন কেহই নাই যে, বিদ্যা দ্বারা (বেদ্যাভিঃ) তাহাদের অন্যথাসাধন করিতে পারে। সেই সকল চিরস্থায়ী নিয়ম (তস্থিবাংসঃ) "পর্ব্বতা ইব ন নিনমে" অর্থাৎ পর্ব্বতের ন্যায় অবনত হইবার নহে!!!

ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, মধুচ্ছন্দার গুরু এবং মধুচ্ছন্দার সহাধ্যায়ী বিশ্বসংসারকে অচল অটল নিয়মের সর্ব্বতোভাবে অধীন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। আমরা বিশেষ করিয়া এ স্থলে বিশ্বামিত্র ও দেবরাতের বেদ হইতে উদাহরণ দিলাম; কেন না, ঐ দুই ঋষির বিদ্যাবুদ্ধির সহিত মধুচ্ছন্দার বিদ্যাবুদ্ধির ঐক্যবিষয়ে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না। ফলতঃ, প্রণিধানপূর্ব্বক ঋগ্বেদ পাঠ করিলে জানা যায় যে, অনেক ঋষিই ঐরূপ বৈজ্ঞানিক ভাব অতি উজ্জ্বল ভাষায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

একজন ঋষি বলিতেছেন,—

সত্যেনোত্তভিতা ভূমিঃ সূর্য্যেণোত্তভিতা দ্যৌঃ।
ঋতেনাদিত্যাস্তিষ্ঠংতি দিবি সোমো অধিশ্রিতঃ॥ ১০।৮৫।১

অবিচলিত নিয়মের (সত্য) দ্বারাই পৃথিবী আকাশের মধ্যে "উত্তভিত" হইয়া রহিয়াছেন, অবিচলিত নিয়মের (ঋত) দ্বারাই আদিত্যগণ ঊর্দ্ধদেশে স্থায়ী রহিয়াছেন। *

* এই ঋকের সমগ্র তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে জানা আবশ্যক, তৎকালীন জ্যোতিষশাস্ত্রের

আর একজন ঋষি বলিতেছেন,—

ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ তপসোহধ্যজায়ত।—১০।১৯০।১

তপস্=জ্যোতি, যেমন তমস্=অন্ধকার। ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতার জ্যোতিকে বেদে বলে, "তপস্"; "যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ" ইতি শ্রুতেঃ। তাহাতে ঋষির তাৎপর্য্য এই যে, যাহাকে পণ্ডিতেরা ঋত এবং সত্য বলেন, সেই জগন্নির্ব্বাহক অক্ষর অচল অটল নিয়ম সকল ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতার জ্যোতিঃ হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। ঋষি তাহার পর বলিতেছেন যে, এই অচল অটল নিয়ম হইতেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি সাধিত হইয়াছে।

আর একজন ঋষি বলেন,—

অস্তভ্নাৎ দ্যামসুরো বিশ্ববেদা অমিমীত বরিমাণং পৃথিব্যাঃ।
আসীদদ্ বিশ্বাভুবনানি সম্রাট্ বিশ্বেত্তানি বরুণস্য "ব্রতানি"॥—৮।৪২।১

মার্টিন হোগ সাহেব অসুর শব্দে বুঝেন, Living God; ইহা ঠিক। সেই জীবন্ত, সর্ব্বজ্ঞ (বিশ্ববেদাঃ) পরমেশ্বরের যে সকল সৃষ্টির কার্য্য, তাহা কতক-গুলি "ব্রত" বা নিয়ম। তিনিই ব্রতের ব্যবস্থাপক ও ধারক; তাই তাঁহার প্রসিদ্ধ বৈদিক উপাধি "ধৃতব্রত"।

যে দেবরাতের কথা বলা হইয়াছে, তিনি বলিতেছেন,—

বেদমাসো "ধৃতব্রতঃ" দ্বাদশ প্রজাবতঃ। বেদা যো উপজায়তে॥ ১।২৫।৮

তৎকালের জ্যোতিষীগণ সময়ের চান্দ্র ও সৌরমানের পঞ্চসংবৎসরময় যুগের সমীকরণের জন্য একটি অধিমাস বা অধিক মাসের গণনা করিতেন। ইহা জ্যোতিষশাস্ত্রের অনুশীলনের ফল। ঈশ্বর বৎসরে বারমাসেরই নিয়ম করিয়াছেন, তদতিরিক্ত আর এক অধিমাসেরও নিয়ম করিয়াছেন। যাহা আপাততঃ নিয়মবহির্ভূত বলিয়া মনে হয়, অনুধাবন করিয়া দেখিলে, তাহাও অবশেষে নিয়মের অধীন বলিয়া বুঝা যায়; ইহাই ঋষির তাৎপর্য্য অর্থ। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর

মতে ভূমি বা পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থানীয়। তাহার ঊর্দ্ধে সূর্য্যমণ্ডল, তাহারও ঊর্দ্ধে চন্দ্রমণ্ডল, তাহারও ঊর্দ্ধে নক্ষত্র। সূর্য্যমণ্ডলের ঊর্দ্ধ স্থানের নাম দ্যুলোক; "সোম"দেব (চন্দ্র) সেই দ্যুলোকে বাস করেন। সূর্য্য—"আদিত্য,"—আবার দ্বাদশ মাসে এক সূর্য্যই দ্বাদশ আদিত্য বলিয়া কল্পিত হয়েন। মূলের "আদিত্যগণ" শব্দে সূর্য্যকেই বুঝিতে হইবে। দেবতাগণ সূর্য্যের উপরে বাস করেন, মনুষ্যেরা ভূমির উপর বাস করে। কিন্তু ভূমি ও সূর্য্য কাহার উপর ভর দিয়া রহিয়াছে? ঋষি বলিতেছেন, ভূমি "সত্যে"র উপর ও সূর্য্য "ঋতে"র উপর। অর্থাৎ, উভয়েই "নিয়মের" প্রভাবে আকাশে স্বীয় স্বীয় স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

জগন্নির্ব্বাহক সমুদায় নিয়মই অবগত আছেন ; কেন না, তিনিই তাঁহাদের ব্যবস্থাপক।

ইহাতে দেখা যায়, তৎকালীন ঋষিসমাজে বৈজ্ঞানিক ভাবের পূর্ণবিকাশ হইয়াছিল, তবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞান জড়িত ছিল। তাঁহারা সংসারকে অচল ও অটল নিয়মের অধীন বলিয়া জানিতেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল নিয়ম ঈশ্বরের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বলিয়া স্বীকার করিতেন।

এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, তৎকালে বৈজ্ঞানিক ভাবের এত দূর বৃদ্ধি বা এত দূর অতিবৃদ্ধি যে, কেহ কেহ সংসারে কেবল অটল নিয়মের একাধিপত্যদর্শনে এখনকার নাস্তিকদের ন্যায় ঈশ্বরের অস্তিত্ববিষয়েই সন্দিহান হইয়াছিলেন। গৃৎসমদ ঋষি সমসাময়িক নাস্তিকদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিতেছেন,—

যং স্মা পৃচ্ছন্তি কুহ সেতি ঘোরং উতেমাহু র্নৈষো অস্তীত্যেনং।—২। ১২। ৫

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করে, "ঈশ্বর কোথায় ?" আবার কেহ কেহ বলে, "তিনি নাই !" এক্ষণে পাঠকবৃন্দ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, মধুচ্ছন্দার যুগ অজ্ঞান বা অন্ধবিশ্বাসের যুগ ছিল না। মনুষ্যগণ তখন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও তৎপ্রসূত তর্কবিতর্কে ব্যাপৃত ছিল। সংসারে নিয়মের একাধিপত্য দেখিয়া অনেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত মানিতে চাহিত না। কিন্তু ঈদৃশ নাস্তিকের সংখ্যা তৎকালে বিরলই ছিল। ঈশ্বর কোথায় ? নাস্তিকেরা এই প্রশ্ন করিলে ঋষিরা বলিতেন, কেন ঐ দেখ তিনি "ঋতে" ! সংসারের অবিচলিত নিয়মেই তাঁহারা ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্য তাঁহাকে তাঁহারা "ঋতধামন্" এই নাম প্রদান করেন। "ঋতধামন্" ঈশ্বরের এইরূপ সংজ্ঞা আর কোনও দেশের ভাষায় আছে কি না, তাহা আমি অবগত নহি। যাহা ঋত, তাহাই ঈশ্বরের ধাম বা জ্যোতিঃ। ঈশ্বর প্রকাশিত একমাত্র "ঋতে"। অবশেষে "ঋত" ঈশ্বরেরই নামস্বরূপ পরিগৃহীত হইয়াছিল। "ঋতমেকাক্ষরং ব্রহ্ম" বলিয়া অনেকে ঋতের ব্যাখ্যা করিল। মধুচ্ছন্দার বেদে এই ঋতের জ্যোতিঃ কিরূপ প্রতিফলিত, তাহা আমরা বারান্তরে দেখিব।

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।

মহম্মদীয় নরক।

২

মুল্লামহম্মদবকির মজলিসি প্রণীত হায়াত আল্ কুলুব নামক পারস্ত ভাষায় লিখিত একখানি গ্রন্থে "মিরাজ" অর্থাৎ মহম্মদের স্বর্গারোহণ সম্বন্ধে কৌতুকাবহ ঘটনা বর্ণিত আছে। কথিত আছে, জিবরাইল, মেকাইল এবং ইস্রাফিল, এই দেবদূতত্রয় মহম্মদের নিকট "বুরাক" নামক সুবিখ্যাত পশু আনয়ন করেন। "বুরাক" গর্দ্দভ অপেক্ষা অল্প উচ্চ, কিন্তু উষ্ট্র অপেক্ষা ক্ষুদ্রকায়, ইহার দেহের গঠন বৃষের ন্যায় কিন্তু মুখ মনুষ্য-মুখের অনুরূপ; তাহার চক্ষু মরকতনির্ম্মিত এবং বক্ষ মুক্তাবিভূষিত। বুরাক সাধারণ পশুর ন্যায় নহে; পরমেশ্বরের আদেশ পাইলে সে এক নিশ্বাসে স্বর্গমর্ত্ত ঘুরিয়া আসিতে পারিত। মহম্মদ এই অশ্বে আরোহণ করিলে একজন দেবদূত বুরাকের বল্গা ধরিলেন, অপর এক জন রেকাব ধরিলেন, তৃতীয় ব্যক্তি মহম্মদের বিশৃঙ্খল বেশবাস সুসজ্জিত করিয়া দিলেন।

মহম্মদ ঊর্দ্ধপ্রদেশে চলিতে লাগিলেন; কিয়ৎক্ষণ পরে এক বিকট কোলাহলশব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। জিবরাইল বলিলেন, ইহা সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ডপাতের শব্দ, এই প্রস্তরখণ্ড সত্তর বৎসর পূর্ব্বে নরকের তীর হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, এই মিরাজের রাত্রে তাহা নরকের তলদেশ স্পর্শ করিল।

অনেক দূর গমনের পর মহম্মদের সহিত একটি বিকটমূর্ত্তি অপদেবতার সাক্ষাৎ হইল;—তাহার কুৎসিত মুখভঙ্গী ক্রোধোদ্দীপ্ত। জিবরাইল মহম্মদকে জ্ঞাত করিলেন, এ ব্যক্তি নরকের ভাণ্ডারী, যে দিন হইতে সে এই কর্ম্মভার প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই দিন হইতেই ইহার মুখভঙ্গী এইরূপ অপ্রসন্ন। তাহার পর এক দল লোকের সহিত মহম্মদের সাক্ষাৎ হইল, ইহাদের সকলেরই মুখই উষ্ট্রের ন্যায়, যমদূতেরা তাহাদের শরীর হইতে মাংস কাটিয়া তাহাদিগের মুখে নিক্ষেপ করিতেছে; বিস্মিত মহম্মদ জিবরাইলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহারা কে?" জিবরাইল বলিলেন, ইহারা জীবিতাবস্থায় বিশ্বাসীদিগের খুঁত ধরিত; তাই এই দশা ঘটিয়াছে।" আর এক স্থানে দেখিলেন, কতকগুলি লোক প্রস্তরাঘাতে স্ব স্ব বক্ষ বিদীর্ণ করিতেছে; জিজ্ঞাসায় মহম্মদ জানিতে পারিলেন, রাত্রিকালে শয্যাগ্রহণের পূর্ব্বে "নমাজি খুফতান" অর্থাৎ নৈশ প্রার্থনা না করাতে তাহা-

দের এই দুরবস্থা। অনেকের উদরের পরিধি এমন সুবিস্তীর্ণ ও গুরুভার যে, তাহারা উত্থানশক্তিরহিত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তথাপি তাহাদের নিশ্চিন্ত থাকিবার যো নাই, যমদূতেরা সকাল সন্ধ্যা দুবেলা তাহাদিগকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে; ইহারা কুসীদজীবী। অন্য কতকগুলি লোকের মুখে যমদূতেরা অগ্নি প্রবেশ করাইয়া দিতেছে, সেই অগ্নি তাহাদের মলদ্বারপথে বাহির হইয়া আসিতেছে; মহম্মদ শুনিলেন, ইহারা নাবালকের সম্পত্তি অবৈধরূপে গ্রাস করিয়া এইরূপ বিপদে পড়িয়াছে।

স্বর্গগমনের পথে নরকের ভিতর মহম্মদ এই প্রকার নানাশ্রেণীর প্রতারক ও প্রবঞ্চকের দুর্দশা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, কিন্তু যাহারা সাধারণের কোনও হিতকর কার্য্যের জন্য বা দুর্ভিক্ষপীড়িত অনাথের সাহায্যের নিমিত্ত চাঁদা আদায় করিয়া তদ্দ্বারা স্ব স্ব উদরের মঙ্গলানুষ্ঠানে রত থাকে, তাহাদের প্রতি মহম্মদ কিরূপ দণ্ডবিধান লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহা আমরা অবগত হইতে পারি নাই।

ইমামতাকি নামক কোরাণের এক ভাষ্যকার আরও লিখিয়াছেন, মহম্মদের জামাতা আলি তাঁহার স্ত্রী ফাতিমার সহিত এক দিন মহম্মদকে দেখিতে গিয়াছিলেন; গিয়া দেখিলেন, প্যাগম্বর নির্জ্জনে বসিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন; তাঁহার কাতরতাদর্শনে আলি ব্যাকুল হইয়া রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; তদুত্তরে মহম্মদ বলিলেন, "আমি যে দিন স্বর্গে নীত হইয়াছিলাম, সেই দিন পথপ্রান্তে কতকগুলি স্ত্রীলোককে অতি কঠোর দণ্ডভোগ করিতে দেখিয়াছি, তাহাদের যন্ত্রণায় আমি বড়ই কাতর হইয়াছি। আমি দেখিলাম, একটি স্ত্রীলোক কেশবদ্ধ অবস্থায় বিলম্বিত রহিয়াছে, এবং তাহার বিদারিত মস্তকের অভ্যন্তর হইতে মস্তিষ্ক বাহির হইয়া পড়িতেছে। আর এক জন স্ত্রীলোকের জিহ্বা টানিয়া তাহা রজ্জুবদ্ধ করিয়া তাহাতে ঝুলাইয়া রাখিয়াছে, এবং যমদূতেরা তাহার কণ্ঠনালীতে অত্যুষ্ণ জল ঢালিয়া দিতেছে; এক জন স্ত্রীলোক তাহার নিজ দেহের মাংস কুরিয়া খাইতেছে, তাহার পদতলে জলন্ত অগ্নির রক্তলোহিত জিহ্বা। আর একটি স্ত্রীলোক এক স্থানে হস্তপদবদ্ধ অবস্থায় পড়িয়া আছে, সর্প ও বৃশ্চিক তাহাকে অবিরত দংশন করিতেছে। একটি অন্ধ, বধির ও মূক রমণী অগ্নিময় বস্ত্রে আচ্ছাদিত রহিয়াছে, তাহার মস্তিষ্ক গলিত হইয়া নাসারন্ধ্র-পথে নির্গত হইতেছে ও গলিত কুষ্ঠে তাহার সর্ব্বশরীর খসিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। অগ্নিময় অস্ত্রে একটি স্ত্রীলোকের দেহ খণ্ডিত হইতেছে, অন্য এক জন

দগ্ধহস্তে নিজের অন্ত্র ভক্ষণ করিতেছে। এক জনের মস্তক শূকরের ন্যায় ও দেহ গর্দ্দভের তুল্য, সে সহস্র প্রকার দণ্ড ভোগ করিতেছে। এক জনের মুখ কুকুরের ন্যায়, যমদূতেরা উত্তপ্ত লৌহকুঠার দ্বারা তাহার মস্তক ও সর্ব্বশরীরে আঘাত করিয়াছিল।"—ফাতিমা পিতাকে এই সকল স্ত্রীলোকের অপরাধের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, যে স্ত্রীলোক কেশবদ্ধ অবস্থায় ঝুলিতেছিল, সে কখনও তাহার মস্তক বস্ত্রাবৃত করে নাই; যাহার জিহ্বা আবদ্ধ ছিল, সে তাহার স্বামীকে কঠোর বাক্যে মর্ম্মপীড়িত করিয়াছে; যে রমণী তাহার নিজ দেহমাংস ভক্ষণ করিতেছিল, সে তাহার স্বামীকে দাম্পত্য অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছিল; যাহার সর্ব্বশরীর অগ্নিময় বস্ত্রে বিজড়িত, সে ব্যভিচারিণী; যে হতভাগিনীর দেহ অগ্নিময় অস্ত্রে খণ্ডিত হইতেছে, সে ইহলোকে হাব ভাব কটাক্ষ দ্বারা মনুষ্যহৃদয়ে ইন্দ্রিয়লালসা উদ্দীপ্ত করিয়াছিল; যে দগ্ধহস্তে নিজের অন্ত্র আহার করিতেছিল, সে ইহলোকে রমণীদিগকে মুগ্ধ করিয়া পরপুরুষের সেবায় নিযুক্ত করিত; যাহার মস্তক শূকরের ন্যায়, সে মিথ্যাবাদিনী এবং সর্ব্বপ্রকার অপবাদের রচয়িত্রী; যাহার মুখ কুকুরের মত, সে গায়িকাবৃত্তির অবলম্বন করিয়া পৃথিবীতে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিল। একে একে সমস্ত স্ত্রীলোকের দুর্দ্দশার কারণ বলিয়া মহম্মদ উপসংহারে তাঁহার প্রিয়তমা কন্যাকে উপদেশ দিলেন, "যে হতভাগিনী তাহার স্বামীর ক্রোধোৎপাদনের কারণস্বরূপ হয়, তাহার অদৃষ্ট নিতান্তই মন্দ; কিন্তু যে রমণী স্বামীকে প্রীত রাখিতে পারেন, তিনি অতীব সৌভাগ্যবতী।"

অনুতাপ করিলে নরকে দণ্ডের অনেক লাঘব হইয়া থাকে। আব্দাল্লা ইবমাসুদ বলেন, মহম্মদের মতে যে সকল ব্যক্তির চক্ষু হইতে অনুতাপাশ্রু নির্গত হইয়া গণ্ডদেশে প্রবাহিত হয়, সেই সকল অশ্রুবিন্দু এক একটি মক্ষিকার মস্তক অপেক্ষা বৃহত্তর না হইলেও পরমেশ্বর তাহাদিগকে নরকাগ্নি হইতে রক্ষা করেন; কিন্তু তথাপি নরকে নারকীর সংখ্যা অল্প নহে, আব্দাল্লা ইব্রামের এ সম্বন্ধে মহম্মদবাক্যের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "আল্লা নারকীদিগকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিতে বলিলে, যমদূত তাঁহাকে তাহাদের সংখ্যার কথা জিজ্ঞাসা করিবে, তদুত্তরে তিনি প্রকাশ করিবেন যে, জনসংখ্যার হাজার-করা নয় শত নিরনব্বই জন এই শ্রেণীর অন্তর্গত।"

নরকের অবস্থান সম্বন্ধে এখনও কোন মত স্থির হয় নাই, তথাপি ইহা এক প্রকার ঠিক যে, সপ্ত তল পৃথিবী পর পর ঊর্দ্ধাধোভাবে অবস্থান করি-

তেছে; তাহার প্রথম তল মনুষ্য ও অন্যান্য প্রাণী এবং জীনদিগের দ্বারা অধ্যুষিত; দ্বিতীয় তল নিশ্বাসরুদ্ধকারী বায়ুমণ্ডলে পরিপূর্ণ, সেই দূষিতবায়ুসংস্পর্শে আদমবংশের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। তৃতীয় তল অগ্নিময় প্রস্তরে পরিব্যাপ্ত, জালাল বলেন, এই সকল প্রস্তরে প্রতিমা নির্ম্মিত হয়। চতুর্থে নরকের গন্ধক স্তূপীকৃত রহিয়াছে। পঞ্চম নাগবংশের বিচরণস্থান, ষষ্ঠ বৃশ্চিকে পরিপূর্ণ, এই অপার্থিব বৃশ্চিকগুলি কৃষ্ণবর্ণ, দেখিতে এক একটি অশ্বতরের ন্যায় এবং তাহাদের লাঙ্গুল সুবৃহৎ বল্লমের মত। পৃথিবীর শেষতলে স্বয়ং সয়তান তাহার সঙ্গীগণের সহিত বিচরণ করিতেছে। কাহারো কাহারো মতে নরক এই সপ্তম তলে অবস্থিত; আবার কেহ কেহ বলেন, পৃথিবীর নিম্নস্থ, চির-অন্ধকারাচ্ছন্ন সাগরসমূহের পরপারে ইহা অবস্থিত—কিন্তু এই সকল সাগরের সংখ্যা আজও অনির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।

যাহা হউক, নরকের অবস্থান কোথায়, তাহা নির্দ্দিষ্টরূপে নিরূপিত না হইলেও, নরকের রক্ষীবর্গের পরিচয়প্রাপ্তিসম্বন্ধে কোনও বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই। এই রক্ষীগণ সংখ্যায় উনিশটি, এবং ইহাদের সকলের দেহই অগ্নিময়। ইহাদের প্রকৃতি অতি ভয়ানক এবং ব্যবহার অত্যন্ত কঠোর। পাপীগণ তাহাদিগকে ডাকিয়া সবিনয়ে বলে, "তোমাদিগের প্রভুকে ডাকিয়া বল, তিনি যেন আমাদের এই যন্ত্রণা একদিনের জন্যও প্রশমিত করেন।" এই সকল রক্ষীর সর্দ্দারের নাম মালিক। পাপীর দল মালিককে ডাকিয়া বলে, "মালিক! তোমার প্রভু দেখিতেছি আমাদিগকে একেবারেই সারিয়া ফেলিবেন।" মালিক উত্তর করেন, "আর বড় বেশী দিন নয়, দশ হাজার বৎসর কোন রকমে সহিয়া থাক।" বাইদাউই বলেন, নারকীগণ মালিকের পূর্ণ নাম উচ্চারণ করিতেও ভরসা করে না, তাহাদিগকে মালি বলিয়া ডাকে।

আরব্য-উপন্যাসের পাঠক মাত্রেই "জীন"দিগের সহিত সুপরিচিত। কোন কোন লেখকের মতে জীনেরা আদমের জন্মের দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছিল; কেহ কেহ বলেন, ইহারা আদম ও ইভের সন্তান, উক্ত দম্পতি স্বর্গভ্রষ্ট হইবার পর ইহাদের জন্ম হইয়াছে। কাহারো কাহারো মতে ইহারা মনুষ্য হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন উপাদানে নির্ম্মিত। ইহাদের অনেকেই পরোপকারী, উদারপ্রকৃতি এবং শান্তস্বভাব, কিন্তু অনেকেই নিতান্ত দুর্বৃত্ত, এবং কপটহৃদয়, নিষ্ঠুর মানবের ন্যায়ই ভয়ানক। যে সকল জিন অসৎস্বভাব, তাহাদের সাধারণ নাম সয়তান। রাজর্ষি সলোমান অনেক জীনকে সত্যধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

মনুষ্যদেহ যেমন মৃত্তিকানির্ম্মিত এবং দেবদূতদিগের দেহ আলোক হইতে উৎপন্ন, জীনদের দেহও সেইরূপ নির্ধূম অগ্নি হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে যে মহাসাগর পরিব্যাপ্ত, তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া কাফ পর্ব্বত অবস্থিত; এই পর্ব্বত জীনদিগের বাসস্থান, কিন্তু ইহারা এই দৃশ্যমান পৃথিবীর মধ্যেও নানা স্থানে বাস করিয়া থাকে। ইহাদের উচ্চপদগৌরবের কথা চিন্তা করিলে কিন্তু ইহাদের এই পার্থিব বাসস্থানের প্রতি কিছুমাত্র শ্রদ্ধা না। কারণ, পৃথিবীতে সমাধিক্ষেত্র, পরিত্যক্ত নির্জ্জন ভগ্ন অট্টালিকা, অন্ধকারময় কূপ, দুর্গন্ধদূষিত নর্দ্দমা এবং পচা পুষ্করিণীই বাসোপযোগী স্থান বলিয়া ইহাদের দ্বারা বিশেষ আদৃত হইয়া থাকে। ইহাদের দেহ বায়বীয়, ইহারা উভচর এবং বহুরূপী। সর্ব্বপ্রকার পার্থিব বস্তুর মধ্যে লৌহই ইহাদের নিকট আতঙ্কজনক পদার্থ। জীনেরা পাঁচ ভাগে বিভক্ত, তাহার মধ্যে আফ্রিৎরাই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান; কথিত আছে, একটি আফ্রিৎ রাজর্ষি সলোমানের জন্য বাল্কিসের সিংহাসন ও সাবার রাজ্ঞীকে বহন করিয়া আনিয়াছিল।

জীনদিগের মধ্যে যাহারা মহৎপ্রকৃতি, তাহাদিগের নাম পরী; পক্ষ আছে বলিয়াই ইহারা ঐ নামে অভিহিত; কিন্তু পরী বলিতে সাধারণতঃ স্ত্রী জীনদিগকেই বুঝায়; ইহারা মানব অপেক্ষা দীর্ঘজীবী, কিন্তু পুনরুত্থানদিনে কেহই জীবিত থাকিবে না। উল্কাপাতে ইহাদের অনেকেরই মৃত্যু হয়, মৃত্যু হইলে ইহাদের রক্ত—যাহা অগ্নির রূপান্তরমাত্র,-শূন্যে বিলীন হইয়া যায়, এবং দেহ ভস্মরূপে পরিণত হয়।

ইবলিস্ অর্থাৎ সয়তানের কায়েম মোকাম কোথায়, এ সম্বন্ধে এখনও নানাপ্রকার তর্কবিতর্ক চলিতেছে, কিন্তু কিছু স্থির হয় নাই। কাহারো কাহারো মতে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রান্তবর্ত্তী সাগরে তাহার বাসস্থান। কেহ কেহ বলেন, সিজ্জিনেই তিনি বাস করিয়া থাকেন। কথিত আছে, আব্রাহাম লোষ্ট্রনিক্ষেপে সয়তানকে বিদূরিত করেন; কারণ সয়তান তাঁহার ইসমাইলের বলিদানকার্য্যে ব্যাঘাত উৎপাদন করিয়াছিল; এই জন্য সয়তানের আর এক নাম "রাজিম" অর্থাৎ লোষ্ট্রাহত। এই ঘটনার স্মরণার্থ এখন পর্য্যন্তও মুসলমানযাত্রীগণ মক্কায় উপস্থিত হইয়া মিনা নামক উপত্যকায় লোষ্ট্রনিক্ষেপ করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করে। সয়তানের আর এক নাম মারিদ অর্থাৎ বিদ্রোহী। তাহার পাঁচ পুত্র, পাঁচ জনই ধুরন্ধর এবং স্বনাম-প্রসিদ্ধ। এক জনের নাম তীর, তিনি অশুভ গ্রহের অবতারস্বরূপ; দ্বিতীয় পুত্রের নাম আওয়ার, তিনি অসদনুষ্-

তাঁহাকে সুগম করিয়া তুলেন; তৃতীয় দাসিম্, ইনি স্বামীস্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত করেন; চতুর্থ সুৎ, ইনি মিথ্যার জনক; পঞ্চম পুত্র আলাম্বর, ব্যবসায়কার্য্যে যত কিছু বিপদ, ইঁহার কৃপাতেই তাহা সংঘটিত হয়। এতদ্ভিন্ন সয়তানের কতকগুলি অবৈধ পুত্র কন্যাও আছে, নির্ধূম অগ্নি হইতে উৎপন্ন কোনও কামিনীর গর্ভে তাহাদের জন্ম। এই কন্যাগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রধানার নাম ঘুল। কুত্রব নামক পুত্রটি নরমাংসভোজী, সয়তানের আর এক পুত্র খান্দার মানুষ লইয়া ঘুরাইয়া মারে, শিকারী বিড়াল ইন্দুর লইয়া যেরূপ ব্যবহার করে, মনুষ্যের সহিত এই সয়তানপুত্রের ব্যবহারও তদ্রূপ। সয়তানের ডাল্লান নামক পুত্রটি অষ্ট্রিচ্ পক্ষীতে সওয়ার হইয়া কোথায় কোন জাহাজ ডুবিল, তাহারই সন্ধান করিয়া বেড়ায়; কারণ, সেই সকল জাহাজের বিপন্ন আরোহীদিগের মাংস তাহার পরমরুচিকর খাদ্য। সয়তানের অন্যতম পুত্র শিক, পথিকদিগের পথভ্রান্তি উৎপাদন করে; নিসাস নামক আর এক পুত্রের মুখ বক্ষঃস্থলে এবং মেষের ন্যায় তাহার একটি লাঙ্গুল আছে।

সুবিখ্যাত ফার্দ্দুসী-বিরচিত সানামা নামক গ্রন্থে অপদেবতাদিগের অনেক কীর্ত্তিকাহিনী বিবৃত আছে। গ্রন্থের উপক্রমণিকার একটি কবিতাতে দেখিতে পাওয়া যায়, একবার মারদাস নামক আরবদেশীয় এক রাজা সয়তানের কুচক্রে একটি গর্ত্তে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করেন। মারদাসের মৃত্যুর পর যিনি সিংহাসন লাভ করেন, তাঁহার নাম জাচাক; নীরো প্রভৃতি পৃথিবীর নিষ্ঠুরপ্রকৃতি নরপতিদিগের মধ্যে জাচাক এক জন। এক দিন সয়তান পাচকের বেশে জাচাকের সম্মুখে উপস্থিত হইল, এবং তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার পাচককার্য্যে নিযুক্ত হইল। উক্ত গ্রন্থকারের অনুমান যে, এই ছদ্মবেশী সয়তানই সর্ব্বপ্রথমে পৃথিবীতে নরমাংসভোজনে মনুষ্যের প্রবৃত্তি জন্মায়; জাচাক এই অভিনব খাদ্য দ্রব্য আস্বাদন করিয়া এতই প্রীত হইলেন যে, তাঁহার পাচকের নিকট কল্পতরু হইয়া বসিলেন, এবং তাহাকে তাঁহার নিকট যথেচ্ছ বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। পাচকরূপী সয়তান তখন কৃত্রিম বিনয়ের সহিত প্রার্থনা করিল, "মহারাজ বিয়াদবি মাপ করিবেন, যদি অনুমতি হয় ত আপনার সুচারু স্কন্ধদ্বয়ে একবার চুম্বন করিয়া মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি।" সয়তান কিছু ডিপ্লোমাটিষ্ট—আজ নহে চিরকালই এইরূপ—তাহার মনোবাঞ্ছা যে কি, তাহা রাজা পূর্ব্বে অনুমান করিতে পারেন নাই, সুতরাং বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার প্রার্থনায় স্বীকৃত হইলেন। এ দিকে উভয় স্কন্ধে সয়তানের ওষ্ঠস্পর্শমাত্রেই সেখানে দুই

ভীষণদর্শন, কৃষ্ণকায় অজগর সর্পের আবির্ভাব হইল। বিস্তর চেষ্টাসত্বেও সর্প-দ্বয় যখন স্কন্ধ হইতে অপসৃত কি নিঃসৃত হইল না, এমন কি, মস্তক কাটিয়া ফেলিলেও পুনর্ব্বার মস্তক গজাইয়া উঠিল, তখন সয়তান রাজাকে পরামর্শ দিল যে, প্রত্যহ যদি ইহাদিগকে জীবন্ত নরমস্তক ভক্ষণ করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহাদের দ্বারা রাজার কোনও প্রকার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। উক্ত ঐতিহাসিকশ্রেষ্ঠের মত এই যে, পৃথিবী নির্ম্মনুষ্য করিবার অভিপ্রায়েই সয়তান এই ষড়যন্ত্র করিয়াছিল।

বাল্মীকি বা ভার্জ্জিল হইতে দান্তে মিলটন্ মাইকেল, পূর্ব্বাপর সকল শ্রেষ্ঠ কবিই নরকবর্ণনায় আপনাদিগের কল্পনাশক্তিকে অসংযতভাবে নিয়োজিত করিয়া আসিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ পারস্ত কবি সাদীর 'বোস্তান' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, উপাসনাই স্বর্গরাজ্যের দ্বারের চাবি, মনুষ্যের নয়নসমক্ষে ইহা দীর্ঘ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সাদী বলিয়াছেন, "যদি তোমার পথ তোমাকে ঈশ্বরের দিকে না লইয়া অন্ত দিকে (নরকে) লইয়া যায়, তাহা হইলে তোমার উপাসনারূপ গালিচা (সেই) অগ্নিমধ্যেও তোমার জন্ত বিস্তৃত রহিবে।" ইহ-জীবন ও নরকের মধ্যে যে পথ, তাহা কত সত্বর অতিক্রম করিতে পারা যায়, সাদীর নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে ;—একজন পাপী কোনও উচ্চ স্তম্ভাগ্রভাগ হইতে হঠাৎ পড়িয়া যায়, পতনমুহূর্ত্তেই সে ব্যক্তি ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিল। তাহার পুত্র পিতার মৃত্যুতে যৎপরোনাস্তি বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল ; অনন্তর একদিন সে স্বপ্নে তাহার পিতার সাক্ষাৎ-লাভে সমর্থ হইল। তাঁহার তাৎকালিক অবস্থা-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে পিতা উত্তর করিলেন, "আমি নরক হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি, কিরূপে তাহা বলিতে পারি না, তবে স্তম্ভাগ্র হইতে পতনমাত্রেই দেখিলাম, আমি স্বর্গে উপ-স্থিত হইয়াছি।"

পারস্তভাষায় লিখিত "গোলেস্তাঁ" নামক সুপ্রসিদ্ধ কেতাবে একটি উপা-খ্যান আছে,—একজন ধার্ম্মিক লোক স্বপ্নে দেখিলেন, এক রাজা স্বর্গে আনন্দ ভোগ করিতেছেন, আর একজন সাধু ব্যক্তি নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছেন ; ধার্ম্মিক ব্যক্তি তাহাতে অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার কারণ কি ? রাজা বিলাসী, বিবিধকুক্রিয়াসক্ত এবং অধার্ম্মিক,—তাহার উর্দ্ধ-গতি হইয়া এরূপ ধার্ম্মিকের অধোগতি হইবার অর্থ কি ?" তৎক্ষণাৎ স্বর্গ হইতে দৈববাণী হইল, "রাজা দরবেশদিগের প্রতি অসাধারণ ভক্তিমান্ বলিয়া আজ

তিনি স্বর্গের অধিকারী, কিন্তু এই ধার্ম্মিক সাধু রাজসহবাসে পাপসঞ্চয় পূর্ব্বক নরকগামী হইয়াছেন।"

পারস্যের অন্যতম প্রসিদ্ধ কবি জামীর "বাহারিস্তান" নামক কাব্যের ষষ্ঠ সর্গে উল্লিখিত হইয়াছে, একদিন দুই কবি এক টেবিলের কাছে বসিয়া তদুপরিস্থ অত্যুষ্ণ "পালুদা" (জল, দুগ্ধ, মধু এবং ময়দা সংযোগে প্রস্তুত পিষ্টকবিশেষ) শীতল হইবার আশায় প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে একজন অন্যকে বলিলেন, "এই যে আমাদের খানা, ইহা অপেক্ষাও উত্তপ্ত জল ও ঘসাক্ কল্য নরকে তোমাকে পান করিতে হইবে।" বন্ধুবরের এই শুভাশীর্ব্বাদ শুনিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর করিলেন, তবে নরকে গিয়া তুমি তোমার একটি বায়েৎ শুনাইও, তাহা হইলে তুমি নিজেকে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকেও উদ্ধার করিতে পারিবে। অনন্তর তিনি গানের সুরে বলিলেন, যদি তুমি স্বর্গের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া শৈত্যগুণসম্পন্ন একটি অসম্পূর্ণ কবিতাও রচনা কর, তাহা হইলে নরকাগ্নির সমস্ত উত্তাপ বিদূরিত হইবে, এবং অত্যুষ্ণ জলরাশি তুষারশীতলতা প্রাপ্ত হইবে।

পারস্যভাষায় লিখিত "দেবিস্তাঁ" নামক আর এক খানি উৎকৃষ্ট পুস্তক আছে; ইহার প্রণেতা কে, এ সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত মতদ্বৈধ আছে, অনেকের মতে কাশ্মীরের সেখ মহম্মদ মসীন ইহার রচয়িতা। প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাচ্যভাষাবিৎ সুবিখ্যাত সার্ উইলিয়ম্ জোন্স্ সাহেব লিখিয়াছেন, এই গ্রন্থে যত গভীর জ্ঞানোপদেশ, যত কৌতুকাবহ কাহিনী, যেরূপ মধুর কবিত্ব, অদ্ভুত রচনাকৌশল [illegible] রহস্য এবং যেমন পরনিন্দা ও অশ্লীলতা একাধারে বিদ্যমান আছে, [illegible] কুত্রাপি তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এই মুসলমান গ্রন্থকর্ত্তার মতে পাঁচটি প্রধান ধর্ম্ম পৃথিবীতে আধিপত্য করিতেছে, এই পাঁচটি যথাক্রমে হিন্দুধর্ম্ম, পারস্যপ্রচলিত ধর্ম্ম, হিব্রু ও খৃষ্টীয় এবং মুসলমানধর্ম্ম। তিনি কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "নরক সম্বন্ধে মুসলমান দার্শনিক, আরবীয় হাকিম কিম্বা পারস্য জিরাকের মত কি?" এবং এই প্রশ্নের নিজেই সদুত্তর দিয়া বলিয়াছেন, "ইহা নিতান্তই যৎসামান্য।" মতান্তরে প্রকাশ, নরকের সপ্তদ্বার মনুষ্য দেহের বিভিন্ন অঙ্গমাত্র, সেই সকল অঙ্গের সহায়তায় পাপানুষ্ঠান হয় বলিয়া নরকের সপ্তদ্বার কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু অন্য একজন পারস্য কবি কহিয়াছেন, "তোমার দেহে সপ্তদ্বার বিদ্যমান বটে, কিন্তু আত্মা সাতটি কুলুপের দ্বারা ঐ সকল দ্বার আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে,

সেই সকল কুলুপের চাবি তোমার হস্তে, সাবধান, দ্বার খুলিয়া তোমার সর্ব্বনাশ সাধন করিও না।"

মুসলমান-ধর্ম্মও অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত; এই সকল সম্প্রদায় নরকসম্বন্ধে একমত নহে। আবদাল্লা ইব্ন মামুদ বলেন যে, মহম্মদ একদিন একটি সরল রেখা টানিয়া তাঁহার শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন, "ইহাই পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইবার পথ," তাহার পর,অনেকগুলি বক্র রেখা টানিয়া বুঝাইলেন, এই সকল পথে প্রতারক সয়তান গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছে। আবদাল্লা ইব্ন অমর বলেন, মহম্মদ বলিয়াছেন, ইস্রায়েলগণ দ্বিসপ্ততি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত, কিন্তু মুসলমানগণ ত্রিসপ্ততি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইবে, এবং একটি সৌভাগ্যবান্ সম্প্রদায় ভিন্ন আর সকলগুলিকেই নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইবে। কোন সম্প্রদায় এরূপ সৌভাগ্যশালী, মহম্মদের শিষ্যগণ তাহা জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, "আমি ও আমার সহচরগণ যে সম্প্রদায়ভুক্ত।" আর এক সময় মহম্মদের অনুচরগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মুক্তি সূর্য্য কাহাদের উপর কিরণ বর্ষণ করিবে?"—তাহাতে মহম্মদ উত্তর করিলেন, "সুন্নীদিগের উপর।"

"ওয়ারিদিয়া"তে লিখিত আছে, নরকসম্বন্ধে ইহাই সাধারণতঃ বিশ্বাস যে, যাহারা একবার নরকাগ্নিতে প্রবেশ করিবে, তাহারা আর কখন তাহা হইতে উদ্ধার পাইবে না, কিন্তু "মুমিন" অর্থাৎ বিশ্বাসীগণকে কখন সে অগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইবে না। কিন্তু "যাবাইয়া"তে ইহাও ব্যক্ত যে, বিশ্বাসীগণ অতি গভীর পাপে লিপ্ত হইয়া যদি মৃত্যুর পূর্ব্বে অনুতপ্ত না হয়, তবে নরকে তাহাদিগের বাস চিরস্থায়ী। "খাতাবিয়া"তে প্রকাশ, নরক সর্ব্বপ্রকার পার্থিব দুঃখ ক্লেশ ও যাতনার অবিচ্ছিন্ন ভোগমাত্র। "যাহামিয়া"তে জানিতে পারা যায়, নরকের অগ্নির চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণশক্তি আছে, সেই শক্তিবলে ইহা সমস্ত প্রাণীকে টানিয়া লয়।

হিজিরার দ্বিতীয় শতাব্দীতে ওয়াশিল ইব্ন আতা নামক একজন সংস্কারক আবির্ভূত হন, তিনি এই ধর্ম্মের অনেক গোঁড়ামী পরিত্যাগ পূর্ব্বক একটি নূতন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন; এই সম্প্রদায় সাধারণতঃ "ফরাজী" নামে খ্যাত। মহম্মদীয় ধর্ম্মে ইহারা স্বাধীনমতবাদী, এইজন্য অনেক গোঁড়া মুসলমান ইহাদিগকে নাস্তিক বলিতেও পশ্চাৎপদ নহে। ইহারা সওয়াল কবরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না; তুলাদণ্ডসম্বন্ধে ইহাদিগের মত এই যে, লঘুত্ব বা গুরুত্ব অনুসারে কর্ম্মফলের কোনও সম্বন্ধ নাই; কারণ কর্ম্মগুলিই দৈবাধীন, এবং

সেই পরিমাণে সৎ। ব্রহ্মনির্ব্বাণে যে আত্যন্তিক অতীন্দ্রিয় অনুপম সুখরসের প্রসঙ্গ শুনা যায়, বোধ হয়, ঐ পরা নির্বৃতি সেই জাতীয়। আর এই পরা নির্বৃতি সাধনের হেতু বলিয়াই বুঝি কবির এত গৌরব, এত মহিমা! তাই

সাম্রাজ্য ঐশ্বর্য্য বীর্য্য জগৎ নশ্বর
কবিতা অমৃত আর কবিরা অমর,

সেই জন্যই কবির এত উচ্চাসন,

যে কালতরঙ্গ
ঊর্দ্ধতম গ্রহ তারা করে তিরোধান,
যায় সেই কাল বহি, লহরী খেলিয়া
কবির চরণাম্বুজে করিয়া প্রণাম।

কুরুক্ষেত্রের কবি অমর কবি, তাঁহার আসন অতি উচ্চ। কুরুক্ষেত্র কাব্য ঐ পরানির্বৃতির প্রকৃষ্ট সাধন, অতএব অ-মৃত কাব্য।

কুরুক্ষেত্র কাব্য প্রধানতঃ কুরুপাণ্ডবের রণক্ষেত্র সেই ঐতিহাসিক ধর্ম্মক্ষেত্রের প্রসঙ্গ লইয়া বিরচিত। এ কাব্যের অঙ্কুর, কবির রৈবতক কাব্যে। ইহার উপাখ্যানভাগ কতক অংশে ঐ রৈবতকের সঙ্গে গাঁথা। ইহার অনেক চরিত্রের উন্মেষ রৈবতকে। উভয় কাব্যেই নরনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণদেবের অতিমানুষ কীর্ত্তিকথা গীত হইয়াছে। 'রৈবতকের ভিত্তিভূমি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আদ্যলীলা, কুরুক্ষেত্রের ভিত্তিভূমি তাঁহার অনন্তকালস্পর্শী মধ্যলীলা।' অর্থাৎ, রৈবতকে ভগবানের আদ্যচরিত এবং এই কুরুক্ষেত্রে ভগবানের মধ্যচরিত বর্ণিত হইয়াছে। লীলাময়ের উত্তরচরিত—প্রভাসক্ষেত্রে যাহার পূর্ণবিকাশ—কবে বর্ণিত দেখিব? রৈবতক পড়িয়া বাঙ্গালী পাঠক এই কৃষ্ণলীলাবিষয়ক মহাগীতির উত্তর তান শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিল। কবি তাহার মনস্কামনা আংশিক পূর্ণ করিয়াছেন। কিন্তু বাসুদেবের 'অক্ষয় কীর্ত্তির গান অমৃত সমান' এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। কবি প্রতিভার এই ঋণ পরিশোধ করুন। তাঁহার কাছেই শিখিয়াছি

যার যত উচ্চশক্তি তত উচ্চতর
কার্য্য তার, দেখ সাক্ষী খদ্যোত ভাস্কর। *

কবি ভাস্কর, আলোকবিকীরণে আপন উচ্চশক্তির সার্থকতা করুন। প্রতিভার গুরু ঋণভার আর বহন করেন কেন?

শুনিতেছি, কবি ঋণপরিশোধের ব্যবস্থা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের অন্ত্য-

* সেক্সপীয়রেও এই মর্ম্মের একটা কথা আছে,
Natures are not finely touched but to finer issues.

রাও বাহাদুর নীলকণ্ঠ জনার্দ্দন কীর্ত্তনে (Late Asst. Guardian and Tutor to H. H. The Nawab of Jawrah ; Guardian and Tutor and Councillor to H. H. of Dewas Junior Branch and Late Dewan of Manwral Katiawar.) এক জন সম্ভ্রান্তবংশীয় ও উচ্চপদস্থ সুশিক্ষিত ব্যক্তি। ইনি দেবাস রাজ্যের নায়েব দেওয়ান (৪)। ইঁহার সাহিত্যানুরাগ বিশেষ প্রশংসনীয়। ইনি সেক্স্‌পীয়র কৃত "টেম্পেষ্ট" নাটকের মারাঠা অনুবাদ," "ঘাশীরাম কোতয়াল—সমালোচন" (৫) "মহারাষ্ট্র ইতিহাস সমালোচন" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কার সম্বন্ধেও ইঁহার কয়েকটি ব্যাখ্যান আছে। পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাসের প্রতি ইঁহার বাল্যকাল হইতেই বিশেষ অনুরাগ। "মালব প্রদেশে প্রাপ্ত তিনটি তাম্রশাসন সম্বন্ধে বিচার" ও "মুসলমান শাসনকালে মহারাষ্ট্র দেশের অবস্থা" প্রভৃতি সুলিখিত প্রবন্ধ তাঁহার এই অনুরাগের পরিচায়ক। ইঁহার রচনা অতিশয় প্রাঞ্জল, মধুর অথচ সসার। মহারাষ্ট্র ইতিহাসের উপকরণস্বরূপ নানাবিধ প্রাচীন বখর, বংশতালিকা ও অন্যান্য ঐতিহাসিক কাগজপত্র সংগ্রহ করিয়া, "বিবিধজ্ঞানবিস্তার" ও "কাব্যেতিহাসসংগ্রহ" পত্রে প্রকাশিত করিয়াছেন। এইরূপে রাও বাহাদুর কীর্ত্তনে মাতৃভাষার সেবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া মহারাষ্ট্র সাহিত্যের গৌরববর্দ্ধন করিতেছেন।

গ্রন্থকারের পরিচয়।

বলিয়াছি, রাও বাহাদুর নীলকণ্ঠ জনার্দ্দন কীর্ত্তনে প্রণীত "মহারাষ্ট্র ইতিহাসের সমালোচনা" (A Review of Captain James Duff's History of the Marathas.) বা মহারাষ্ট্রীয়গণের সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণ" প্রবন্ধই মহারাষ্ট্রে ঐতিহাসিক আন্দোলনের মূলীভূত কারণ। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে মাননীয় কীর্ত্তনে যখন পুনা কলেজের জুনিয়ার ষ্টুডেণ্ট্ ছিলেন, সেই সময় "পুণা ইয়ং মেন্ এসোসিয়েশন্" নামক এক ছাত্রসভায় সর্ব্বপ্রথম এই প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেদিন স্বর্গীয় কৃষ্ণশাস্ত্রী চিপ্‌লুণ্‌কর (নিবন্ধমালা-প্রণেতা ৺ বিষ্ণু শাস্ত্রী মহোদয়ের পিতা) সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সেই ছাত্রসভায় ও প্রবন্ধপাঠকের গৌরববর্দ্ধন করিয়াছিলেন; এবং শ্রোতৃবর্গের মধ্যে খ্যাতনামা শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ পণ্ডিত মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই উক্ত প্রবন্ধের বিশেষ প্রশংসা করেন ও লেখককে উহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে বলেন। পরে উহা "ইন্দুপ্রকাশ" নামক সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত হয়। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে লেখক সংশোধিত ও বহুলরূপে পরিবর্দ্ধিত করিয়া উহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন।

সমালোচ্য গ্রন্থের বিবরণ।

এই সংস্করণে নূতন ছয়টি পরিশিষ্ট সংযোজিত হওয়ায়, ইহার আকার পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিশিষ্টে খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্র দেশে যে সকল রাজবংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। লেখক মহাশয় এই বিবরণ ডাঃ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর প্রণীত "History of the Deccan down

পরিশিষ্ট।

---

(৪) ইঁহার ভ্রাতা রাও বাহাদুর বিনায়ক জনার্দ্দন কীর্ত্তনে মহোদয়, বরদা (মহারাষ্ট্রীয় উচ্চারণ "বড়োদা" বা "বড়োদেঁ") রাজ্যের নায়েব দেওয়ান। ইনি "মাধব রাও পেশওয়ে" ও "জয়পাল" নামক দুই খানি উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করিয়াছেন।

(৫) "ঘাশীরাম কোতয়াল" মিশনারী-যুগে রচিত একটি উপন্যাস। ইহাতে জনৈক মিশনারী ভক্ত কর্ত্তৃক হিন্দুজাতি, হিন্দু সমাজ, হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু নীতির সর্ব্বপ্রকার হীনতা প্রদর্শিত হইয়াছে। রাও বাহাদুরের সমালোচনায় হিন্দুপক্ষ সমর্থিত হইয়াছে।

to the Mohomedan conquest." নামক গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেব স্বীয় ইতিহাসরচনার জন্য যে সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তৃতীয় পরিশিষ্টে তাহার নির্দ্দেশ ও তৎসম্বন্ধে মন্তব্যাদি প্রকাশিত হইয়াছে। চতুর্থ পরিশিষ্টে "মহারাষ্ট্র দেশে আর্য্যগণের উপনিবেশস্থাপনের কাল" নির্ণয়ের চেষ্টা করা হইয়াছে (৬)। পঞ্চম পরিশিষ্টে "মারাঠা জাতির উৎপত্তি" আলোচিত হইয়াছে। শেষ বা ষষ্ঠ পরিশিষ্টে লেখক মহাশয় দিল্লীর সম্রাট শেখ শাহ আলমের রচিত একটি কবিতার মহারাষ্ট্রীয় পদ্যানুবাদ প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত এই সংস্করণে মহাত্মা শিবাজী, তাঁহার ভবানী নামক তরবারি ও বাঘ-নখ, সাতারার কেল্লা ও রায়গড় দুর্গের উৎকৃষ্ট চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং অল্পের মধ্যে যে বইখানি বেশ ভাল হইয়াছে, তাহা অসঙ্কুচিতচিত্তে বলিতে পারা যায়।

মারাঠা (মহারাষ্ট্রীয়) জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের বর্ণনাপ্রসঙ্গে লেখক গ্রাণ্ট ডফ্ প্রণীত ইতিহাসের আলোচনা করিয়াছেন। অনেকে ডফ্ সাহেবের ইতিহাসকে masterly work অর্থাৎ অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু লেখকের বিবেচনায় উহা প্রথম শ্রেণীর ইতিহাস ত নহেই, উহা দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইবারও সম্পূর্ণ যোগ্য কি না সন্দেহ। কারণ, তিনি বলেন, "ডফ্ সাহেবের গ্রন্থ যে গভীর গবেষণাপূর্ণ ও আশানুরূপ হইয়াছে, এ কথা বলিতে পারা যায় না। সাহেব মহোদয় যেরূপ প্রচুর উপকরণ ও সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, (৭) তাঁহার গ্রন্থ তদনুরূপ হয় নাই। যাঁহারা মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় রচিত 'শিবাজীর বখর,' 'পুণার বখর,' 'পেশওয়েগণের বখর,' 'খার্ড়ার যুদ্ধের বখর' ও পাণিপতের যুদ্ধ সম্বন্ধে পেশওয়ে বালাজী বাজীরাওকে মল্লাররাও হোলকার প্রেরিত চিঠিপত্র পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তদ্ভিন্ন উল্লিখিত গ্রন্থনিচয়ে, স্বদেশপ্রেম ও ধর্ম্মানুরাগজনিত যে একপ্রকার মনঃপ্রাণমুগ্ধকর সৌন্দর্য্য বিকশিত হইয়াছে, সাহেব মহোদয়ের গ্রন্থে তাহা হয় নাই। তাঁহার গ্রন্থে সকল বিষয় যথোপযুক্তরূপে আলোচিতও

ডফ্ কোন্ শ্রেণীর ঐতিহাসিক?

---

(৬) ডাক্তার ভাণ্ডারকরের মতানুসরণ করিয়া লেখক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পাণিনির সময় মহারাষ্ট্র দেশ অনার্য্যনিবাস ছিল; খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীর পর এই দেশে আর্য্য উপনিবেশ স্থাপিত হয়। এ মত আমাদের সম্পূর্ণ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। এতৎসম্বন্ধে যাঁহারা বিস্তারিত জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে প্রথম বর্ষের সাধনার ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত "দাক্ষিণাত্যে আর্য্য উপনিবেশ" প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

(৭) গ্রাণ্ট ডফ্ বলেন, "(I had) access to the mass of papers, found in the apartments of the Peishwa's palaces. The records of Satara Govt. were under my own immediate charge. Besides 'these' important papers, records of temples and private repositaries were searched at my request; family legends, imperial and royal deeds, public and private correspondence and state papers in possession of the descendants of men once high in authority; law suits and law decisions and Mss. of every description in Persian and Mahratta, which had any reference to my subject, were procured from all quarters, cost what they might. Upwards of one hundred of these Mss., some of them histories at as voluminous as my whole work, were purposely translated for it."—preface pp. VI, VII (Duff's History).

হয় নাই। হিন্দুধর্ম্ম ও বেদান্ত সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া কোনও হিন্দুর পরিতুষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই।"

ডাঃ মিচেল এক স্থলে বলিয়াছেন, "The literature of the Maratha people may fairly be denominated a living literature."—(I. R. H. S. Bombay) দুঃখের বিষয়, গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেবের গ্রন্থে এতৎসম্বন্ধে কোনও উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। যে দেশে বার্ত্তিককার কাত্যায়ন, সপ্তশতীকার কবিবৎসল সুকবি শালিবাহন, দ্বিতীয়ব্যাসসদৃশ 'বৃহৎকথা'-প্রণেতা গুণাঢ্য, প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণকার বররুচি, মহাকবি ভবভূতি, মহারাষ্ট্রচূড়ামণি রাজশেখর, 'কোবিদগর্ব্বপর্ব্বতপবি' মুগ্ধবোধ ব্যাকরণাদি বিবিধ গ্রন্থের প্রণেতা বোপদেব, পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য 'মিতাক্ষরা'-প্রণেতা বিজ্ঞানেশ্বর, জ্যোতির্ব্বেত্তা ভাস্করাচার্য্য ও তদীয় বংশধরগণ, চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি-প্রণেতা মন্ত্রিচূড়ামণি 'হরিভক্তিপরায়ণ' হেমাদ্রি, আদি মহারাষ্ট্রকবি বিবেকসিন্ধু-নামক অদ্বৈতবাদপ্রতিপাদক গ্রন্থের প্রণেতা ব্রহ্মজ্ঞানী মুকুন্দরাজ, (১১৯১ খৃঃ) মানসোল্লাস বা অভিলাষার্থচিন্তামণি-প্রণেতা 'সর্ব্বজ্ঞভূপ' সোমেশ্বর (১১৩৮ খৃঃ) ধারাধিপতি ভোজ, অপরার্ক, সুবিখ্যাত মহারাষ্ট্র কবি, ভগবদ্গীতার টীকাকার জ্ঞানেশ্বর (১২৯০), 'ভাবার্থরামায়ণ'-প্রণেতা একনাথ স্বামী (১৫৩০ খৃঃ), ভক্ত কবি তুকারাম, শিবজীর দীক্ষাগুরু সমর্থ রামদাস স্বামী, শ্রীধর, বামন পণ্ডিত, মুক্তেশ্বর, মহীপতি, ও কবিশ্রেষ্ঠ ময়ূরপন্থ প্রভৃতি বহুসংখ্যক কবি, পণ্ডিত ও ব্রহ্মজ্ঞানী মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ এবং মহারাষ্ট্রীয় ও সংস্কৃত ভাষায় বিবিধ জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থাদি রচনা করিয়া দেশের গৌরববর্দ্ধন করিয়াছেন; সে দেশের সাহিত্য সম্বন্ধে গ্রাণ্টডফ্ সম্পূর্ণ মৌনাবলম্বন করিয়াছেন দেখিয়া আমরা অতিশয় বিস্মিত হইয়াছি। এ বিষয়ে অন্ততঃ সামান্য উল্লেখ না থাকিলে কোনও 'মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাস' সম্পূর্ণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।" রাও বাহাদুর কীর্ত্তনে অতি সংক্ষেপে ২।৪ জন মাত্র কবি ও পণ্ডিতের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু সে বিবরণ এত সংক্ষিপ্ত যে, এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিয়া কোনও ফল নাই। সময়ান্তরে আমরা এ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ পাঠকগণের গোচর করিব। যাহা হউক, লেখক তার পর বলিতেছেন,—

দ্বিতীয় দোষ।

মহারাষ্ট্র কবি ও গ্রন্থকারগণ।

"আর্য্যাবর্ত্ত হইতে আর্য্যগণ কোন্ সময়ে গিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন, এবং কোন্ সময়ে ও কিরূপে মহারাষ্ট্র দেশ তাঁহাদের কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়, প্রাচীনকালে কোন্ কোন্ রাজবংশ এই দেশে রাজত্ব করেন, এবং তত্তৎবংশীয়গণের মধ্যেই বা এখন কে কে অবশিষ্ট আছেন, ইত্যাদি প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবরণ গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেবের গ্রন্থে আলোচিত হয় নাই। এমন কি, অধুনাতন কালের সুপ্রসিদ্ধ 'ভোঁসলে,' 'পওয়ার' (Puar বা প্রমার), 'মহাড়ীক্,' ও 'শিন্দে' (সাল্কে বা চালুক্য) প্রভৃতি পঞ্চকুল, ছত্রিশকুল, ও ছিয়ানব্বই কুলের মারাঠাগণ কে? ইঁহারা কোথা হইতে আসিলেন? ইঁহাদের মধ্যে কোন্ কোন্ বংশ বা পরিবার পূর্ব্বদেশের রাজবংশ হইতে আগমন করিয়া এ দেশে বসতি করিয়াছেন, ইত্যাদি অনায়াস-লভ্য ও অত্যাবশ্যক বিবরণও তাঁহার গ্রন্থে সম্যক্ প্রদত্ত হয় নাই। আমাদের গ্রন্থকার ডফ সাহেব (Satara) সাতারার ছত্রপতির দরবারে এজেণ্ট ছিলেন। সাতারার বংশমর্য্যাদাভিমানী নৃপতিগণের মধ্যে অনেকেই এ সকল বিষয়ের বহুল আন্দোলন ও আলোচনা করিয়াছিলেন। এই সকল কথার বিচার করিলে, এ বিষয়ে সাহেব মহোদয়ের মৌনাবলম্বন অতিশয় বিস্ময়কর বলিয়াই বোধ হয়। সাহেব মহোদয় যদি ব্রাহ্মণ হইতেন, তাহা হইলে, আমাদের বিস্ময়ের কিছুমাত্র কারণ

অপরাপর দোষ।

থাকিত না। কারণ, তাঁহাদের বিশ্বাস যে, 'বিরাট্ পুরুষের বাহু ও পদযুগল হইতে ইতর জাতি ও তাঁহার বদন হইতে স্বজাতির উৎপত্তি হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ স্বজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কিছুই বলিতে পারেন না। কিন্তু রাজপুত ও মারাঠাগণ এ বিষয়ে ব্রাহ্মণগণের ন্যায় উদাসীন নহেন। সূর্য্য ও চন্দ্র হইতে বর্ত্তমান সময়ের অল্পবয়স্ক অমুক রাও বা অমুক সিংহ পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক পুরুষের নামাবলীবিশিষ্ট সুদীর্ঘ বংশতালিকাভিমানী ও এই সকল সুদীর্ঘ বংশতালিকার রচয়িতা ভাটগণের ভক্ত ও প্রতিপালক শত শত "ক্ষত্রিয়কর্ম্মাবলম্বী" পরিবার এখনও এ দেশে সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। ইঁহাদের প্রদত্ত বংশতালিকাসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান পূর্ব্বক (মহাত্মা কর্ণেল্ টড্ ও উইল্‌ফোর্ড সাহেবের ন্যায়) তৎসম্বন্ধে নিরপেক্ষভাবে স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করা ডফ্ সাহেবের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর হইত বলিয়া বোধ হয় না।

চরিত্রের অসম্পূর্ণতা।

"এতদ্ভিন্ন এই গ্রন্থে যে সকল মহাপুরুষ বা প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা একেই অতি সংক্ষিপ্ত, তাহার উপর আবার অনেক স্থলেই অসম্পূর্ণ। কারণ, যে সকল ঘটনাবলীর উপর তাঁহাদের চরিত্রের উৎকর্ষ, বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে, সাহেব মহোদয়ের গ্রন্থে অনেক স্থলেই তৎসমস্ত এককালেই পরিত্যক্ত হইয়াছে। (৮) এই সকল ত্রুটি নিবন্ধন, গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেবের গ্রন্থের History of the Marathas নামের পরিবর্ত্তে Account of the war in Maharastra এইরূপ নামকরণ করিলে অধিকতর সমীচীন হইত বলিয়া আমাদের মনে হয়।

ডফের স্বপক্ষে।

"ডফ্-প্রণীত ইতিহাসের এইরূপ দোষ প্রদর্শন করিতেছি বলিয়া যে আমরা তাঁহার ও তাঁহার গ্রন্থ সম্বন্ধে কোনওরূপ অসম্মান বা অনাদরের ভাব হৃদয়ে পোষণ করি, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। এই গ্রন্থ রচনাকালে তাঁহাকে যে সকল অনল্পনীয় অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা চিন্তা করিলে আমাদের হৃদয় তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়। মহারাষ্ট্রীয়গণের ইতিহাসসঙ্কলনবিষয়ে তিনিই সর্ব্বপ্রথম চেষ্টা করিয়াছেন, এবং তাঁহার এই প্রথম উদ্যমে তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা এক রকম ভালই হইয়াছে বলিতে হইবে। তাঁহার গ্রন্থ রচিত হইবার পর প্রায় ৬৫ বৎসর অতীত হইয়াছে; এ পর্য্যন্ত অপর কেহ এই বিষয়ে আর একখানি গ্রন্থ রচনা করিতে অগ্রসর হয়েন নাই। বলা বাহুল্য, ইহা সাহেব মহোদয়ের বিদ্যাবত্তা ও পরিশ্রমের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। এই গ্রন্থের জন্য তাঁহাকে অসুস্থশরীরেও যে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে, তজ্জন্য মহারাষ্ট্রদেশ তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।"

ইহার পর লেখক মহাশয় গ্রাণ্ট ডফের এতৎসম্পর্কীয় একখানি পত্র Bombay Saturday Review হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরা তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।—

"এই ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য আমাকে ভারতের সর্ব্বত্র 'এজেণ্ট' নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। এই গ্রন্থের রচনাকালে আমাকে প্রত্যহ অনবরত ১২।১৪ ঘণ্টা অপরাপর শ্রমসাধ্য কার্য্য করিতে হইত। এই সময় আমি অতি যন্ত্রণাদায়ক শিরঃপীড়ায় ভুগিতেছিলাম। অবশেষে এই পীড়া এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, পালাজ্বরের ন্যায় প্রতি পক্ষ দিবসে

---

(৮) মহাত্মা শিবাজীর জীবনের এইরূপ দুই তিনটি ঘটনা আমরা বিগত ৪র্থ বর্ষের সাহিত্যের ১৮৯ পৃষ্ঠায় ও "শিবাজীর মহত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধে (৩৭৬ হইতে ৩৭৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত) বিবৃত করিয়াছি।

আমাকে আক্রমণ করিত, এবং ছয় ঘণ্টা হইতে (সময়ে সময়ে) ১৬ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ইহার অবসান হইত না। এই সময়েও আমি মাথায় জলপটী বাঁধিয়া কাজ করিতাম। এই কারণে এই গ্রন্থের কোনও কোনও অংশে কিঞ্চিৎ অযত্নসহকারে লিখিত হইয়াছে। পীড়ার কিঞ্চিৎ অবসান হইলে আমি সময়ে সময়ে সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া কাজ করিতাম। এইরূপ অত্যাচারের জন্ত অতি অল্প দিনের মধ্যেই আমার শরীর অতিশয় অসুস্থ হওয়ায় আমি স্বদেশে (ইংলণ্ডে) পলায়ন করিতে বাধ্য হইলাম। এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ লিখিত ও প্রকাশিত হইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলে পর, মিঃ মরে (Murray) বলিলেন,—'এই পুস্তকের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া দিলে আমরা ইহা প্রকাশ করিতে পারি।' আমি বলিলাম, 'ইহাতে মরাঠা জাতির ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং ইহা History of the Marathas নামেই অভিহিত হইবার যোগ্য।' তিনি বলিলেন, 'মরাঠাগণের বিষয় কে জানে?' আমি বলিলাম, 'সেই জন্তই ত এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।' তিনি বলিলেন, 'কিন্তু তাহাদের বিষয় জানিতেই বা কাহার ইচ্ছা আছে? এই গ্রন্থের নাম যদি 'মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন ও ইংরাজগণের অভ্যুদয়' অথবা এই রকম একটা কিছু রাখা যায়, তাহা হইলে চলিতে পারে। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়গণের ইতিহাস!—উহা কখনই কেহ কিনিবে না।' আমি যদিও মিঃ মরের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিলাম, তথাপি সে জন্ত কিছুমাত্র নিরুৎসাহ হই নাই। পরিশেষে স্যার জেম্‌স্ ম্যাকিণ্টসের চেষ্টায় Longman and Co. ইহা প্রকাশ করিতে প্রস্তুত হইলেন। পরে কোন্ দেশে কত পুস্তক বিক্রীত হইতে পারে, তাহার অনুমানকরণকালে উক্ত কোম্পানী ভারতবর্ষের জন্ত অতি অল্পসংখ্যক পুস্তক রাখিলেন দেখিয়া আমি অতিশয় বিস্মিত হইলাম। তাঁহারা বলিলেন, 'ভারতের লোকে বই পড়ে—কিন্তু পয়সা খরচ করিয়া কিনিতে চায় না; তাহারা অপরের নিকট হইতে চাহিয়া পড়ে।' যাহা হউক, প্রকাশকগণ লাভ লোকসানের দায়ী হইয়া স্বীয় ব্যয়ে গ্রন্থ মুদ্রিত করিলেন। এই ইতিহাস সংকলন করিতে আমার বিংশতি সহস্রাধিক মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে। কোর্ট-অব্-ডাইরেক্টারগণ এই পুস্তকের ৪০ কাপি মাত্র গ্রহণ করিলেন। অন্ত পুস্তক হইলেও তাঁহারা ৪০ কাপিই গ্রহণ করিতেন। আমার বিশ্বাস, তাঁহাদের মধ্যে কেহই মৎপ্রণীত 'মহারাষ্ট্র ইতিহাস' একবার খুলিয়াও দেখেন নাই। যদিও আমি গবর্মেণ্টের জন্ত এই সকল বহুমূল্য উপকরণ (ঐতিহাসিক কাগজপত্র) সংগ্রহ করিলাম এবং আমার বহু পরিশ্রমে সঙ্কলিত একখানি অতি উৎকৃষ্ট মানচিত্র তাঁহাদিগকে প্রদান করিলাম, কিন্তু তাঁহারা ইহার (মানচিত্রের) প্রাপ্তিস্বীকার পর্য্যন্ত করিলেন না। তাঁহারা কখনই আমায় জিজ্ঞাসা করেন নাই, এবং আমিও কখনও তাঁহাদিগকে বলি নাই যে, এই সকল কার্য্যে আমার সপ্তদশ সহস্রাধিক মুদ্রা নষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, তাঁহাদের এইরূপ ব্যবহারের জন্ত আমি কিছু মাত্র দুঃখিত নহি।" (১)

ডফের পত্র।

মরে ও ডফ্।

ডফের প্রতি অবিচার।

"গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেবের এই পত্র পাঠ করিয়া আমাদের মনে কয়েকটি প্রশ্ন উদিত হয়। সাহেব মহোদয় এত অর্থ ব্যয় করিয়া তাঁহার ইতিহাসের জন্ত ভারতের নানা স্থান হইতে যে

(১) ডফ্ সাহেব কর্ত্তৃক তাঁহার জনৈক বন্ধুকে লিখিত এই পত্র, তদীয় ইতিহাসের চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায় সমস্ত উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পত্রে সাহেব মহোদয়ের কষ্ট পরিশ্রম সহিষ্ণুতা ও অদম্য উৎসাহের বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতবাসিগণ আর কতদিন পরে এই সকল গুণের অধিকারী হইবেন?

সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা এখন কোথায় ? তাঁহার গ্রন্থের পাদটীকাগুলি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তৎসংগৃহীত উপকরণের মধ্যে কতকগুলি তিনি Bombay Literary Societyতে রাখিয়াছেন। সনন্দপত্রাদি যাঁহাদের নিকট হইতে আনীত হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে অবশ্যই সে গুলি প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে, অনুমান করা যাইতে পারে। পেশওয়ার প্রাসাদে যে সকল বহুমূল্য কাগজপত্র পাওয়া গিয়াছিল, সে গুলি কোথায়, তাহা গবর্মেণ্টের সাহায্য ব্যতীত অবগত হইবার কোনও উপায় নাই। কিন্তু এতদ্ভিন্ন আরও অনেক বখর গ্রাণ্ট ডফ সংগ্রহ করিয়াছিলেন; সে গুলি কি হইল ? আমাদের দেশের অনেক প্রাচীন কারকুনের বিশ্বাস যে, সে গুলি দগ্ধ করিয়া ফেলা হইয়াছে। আমাদের সুবিজ্ঞ বন্ধু স্বর্গীয় দাজী সাহেব সরঞ্জামে (ইনাম-কমিটির এক জন কর্ম্মচারী) বলেন যে, তিনি ডফ সাহেবের ও দক্ষিণের কমিশনারের এতৎসংক্রান্ত যে কয়েকখানি চিঠিপত্র দেখিয়াছেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়া নির্ভয়ে বলা যাইতে পারে যে, ডফ্ সাহেবের ইতিহাস রচিত হইলে পর, তৎসংগৃহীত ঐতিহাসিক কাগজপত্রগুলির অধিকাংশ নষ্ট করিয়া ফেলা হইয়াছে। এ কথা যদি সত্য হয়, তবে মহারাষ্ট্র ইতিহাসের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর ব্যাপার আর কি হইতে পারে ? এরূপ হইতে পারে যে, যে সকল কাগজপত্রে বা বখরে বিশ্বাসযোগ্য কোনও কথা পাওয়া যায় নাই, (১০) হয় ত সেই গুলিই নষ্ট করা হইয়াছে। কিন্তু এরূপ কাগজপত্রও নষ্ট করা উচিত নহে।"

উপকরণ সযত্নে রক্ষিত।

অবশিষ্ট গুলির পরিণাম।

তৎপরে লেখক মহারাষ্ট্রীয়গণের অভ্যুদয়ের বিবরণ প্রদান করিয়া বলেন,—

"মহাত্মা শিবাজীর পিতা শাহাজীর বিবরণ গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেবের গ্রন্থে সমুচিত প্রদত্ত হয় নাই। * * শিবাজীর জীবনী তাঁহার ইতিহাসে যথাসম্ভব বিস্তৃতভাবেই প্রদত্ত হইয়াছে। শিবাজীর চরিত্র সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত আমাদের বিশেষ মতভেদ নাই। আমাদের বিবেচনায়, এ বিষয়ে ডফ্ সাহেবের একটি এই ত্রুটি হইয়াছে যে, শিবাজীর জীবনী সম্বন্ধে মহারাষ্ট্রীয় লেখকগণের লিখিত বিবরণের উপর তাঁহার যতটা নির্ভর করা উচিত ছিল, তিনি ততটা করেন নাই। এমন কি, মহারাষ্ট্রীয়গণের লিখিত ইতিহাসের প্রতি যতটা মনোযোগ প্রদান করা উচিত ছিল, তিনি ততটাও করেন নাই বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কারণ, তদীয় গ্রন্থে তিনি মুসলমান ইতিহাসলেখকগণের কথার উপর নির্ভর করিয়াই অনেক স্থলে শিবাজীর চরিত্রে দোষারোপ করিয়াছেন; এবং তৎসম্বন্ধে মহারাষ্ট্রীয় বখরকারগণের কথা বড় গ্রাহ্য করেন নাই, দেখা যায়। আফজুল খাঁর হত্যা সম্বন্ধে মুসলমান ইতিহাসলেখকগণের বর্ণনানুসারে তিনি শিবাজীর প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন; কিন্তু তৎসম্বন্ধে মহারাষ্ট্রীয় লেখকগণ যাহা বলেন, তাহার বিচার করা তাঁহার উচিত ছিল। দুঃখের বিষয়, গ্রাণ্ট ডফ্ তাহা করেন নাই।

ডফের অবিচার।

"মহারাষ্ট্রীয় লেখকগণ স্বদেশীয় নৃপতি অথবা বীরপুরুষগণের ইতিহাসলিখনকালে কখনই পক্ষপাতিতা প্রদর্শন করেন না। সেরূপ করা তাঁহাদের অভ্যাসই নয়। এই নিমিত্ত তাঁহাদের রচিত বখরে সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য করিবার উদাহরণ প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। এই সকল বখরে শিবাজীর যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতে নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন হয় যে, শিবাজী

মহারাষ্ট্রীয় লেখকের স্বভাব।

---

(১০) গ্রাণ্ট ডফ্ বলেন,—"The mass of meterials which were selected from a still larger mass read over, without discovering a single fact on which we can depend"—Preface XV (Fourth edition.)

হিন্দু শাস্ত্রে বর্ণিত প্রকৃত ও অতিশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়োচিত গুণগ্রামে অলঙ্কৃত ছিলেন। মারাঠাগণ এখনও তাঁহাকে অতিশয় প্রীতি ও ভক্তির সহিত 'ঈশ্বরাবতার' জ্ঞানে পূজা করে। তিনি প্রকৃতই সেইরূপ উদারচরিত্র ও ধার্ম্মিক না হইলে, কখনই সাধারণের এইরূপ প্রীতি ও ভক্তি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইতেন না।"

তৎচিত্রিত শিবাজী।

রাও বাহাদুর কীর্ত্তনে মহারাষ্ট্রীয় বখরকারগণের স্বভাব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে আমাদের সকল পাঠক হয় ত সম্মত হইবেন না। এই নিমিত্ত আমরা এতৎসম্বন্ধে জনৈক ইংরাজ ঐতিহাসিকের মত এ স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

"মারাঠাগণের ইতিহাসলেখকগণ (কেহ কেহ বোধ হয় তাঁহাদিগকে 'ঐতিহাসিক' সংজ্ঞা প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত হইবেন) অতি সরল ও আড়ম্বরশূন্য ভাষায় তাঁহাদের ইতিহাস লিখিয়াছেন। শব্দাড়ম্বরপূর্ণ ভাষা বা উদ্দাম কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া, তাঁহারা বর্ণনীয় বিষয়গুলি যথোপযুক্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। কুত্রাপি প্রতিকূল ঘটনার অনুকূল ভাবে বর্ণনা করিবার (মল্‌হার রাও হোলকার পেশওয়াকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা ব্যতীত) চেষ্টা করা হয় নাই। জয় পরাজয় অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। পরাজয়ের বিবরণ যেমন সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে, বিজয়ের বিবরণও সেইরূপ প্রত্যেক তুচ্ছ ঘটনাসমূহের বর্ণনা দ্বারা অতিবিস্তৃত করা হয় নাই। তাঁহারা পাঠকের চিত্তাকর্ষণ করিতে বা মিথ্যা কথা দ্বারা পাঠককে মতিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু কালনির্ণয়সম্বন্ধে এবং ঐতিহাসিকোচিত মন্তব্যপ্রকাশে তাঁহারা যে অভিজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।" (১১)—স্কট্ ওয়েরিং সাহেব প্রণীত "মহারাষ্ট্র ইতিহাস" (ভূমিকা) ১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ওয়েরিং-এর মত।

রাও বাহাদুর কীর্ত্তনের গ্রন্থ হইতে মহারাষ্ট্রীয় লেখকগণের সম্বন্ধে আরও কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সে উক্তি এই,—

"উৎকৃষ্ট ইতিহাসের লক্ষণ সম্বন্ধে এখনও অনেক মতভেদ দেখা যায়। তন্মধ্যে একটি মত এই যে, কোনও ঘটনা সম্বন্ধে ইতিহাসলেখকের স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করা উচিত নহে। যাহা ঘটিয়াছে, সরল ভাবে তাহার অবিকল বর্ণনা করিয়াই নীরব থাকা উচিত। যাঁহারা এই মতের পক্ষপাতী, তাঁহারা আমাদের বখরগুলি পাঠ করিয়া নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাবর্ণনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। সৈন্যগণ গমনকালে কোন্ কোন্ স্থানে অবস্থিতি করিয়াছিল? সেখানে বসিবার আসনগুলি কে পাতিয়াছিল? কে তাম্বূলাদি বিতরণ করিয়াছিল? তাহাদিগের নাম পর্য্যন্ত (অধিকাংশ) বখরে লিখিত থাকে। (বলা বাহুল্য, এই সকল বখর ঘটনাস্থলে উপস্থিত ব্যক্তিগণের দ্বারা লিখিত।) কিন্তু এই সকল

মহারাষ্ট্রীয় বখরের স্বরূপ-বর্ণন।

---

(১১) Their historians (some will deny them the name) write in plain simple and unaffected style, content to relate passing events in apposite terms, without seeking turgid imagery or inflated phraseology. [Excepting to the letter addressed to the Peshwa, by the great Malhar Rao Holkar,] no attempt is made to make the worse appear the better reason. Victory and defeat are briefly related; if they pass over the latter too hastily, they do not dwell upon the former with unnecessary minuteness. They do not endeavour to bias or mislead the judgment, but are certainly greatly deficient in Chronology and in historical reflections."—E. Scott Waring's "History of the Marathas," (1810) Preface. pp. 10.

বখরলেখকগণ যে গ্রন্থ রচনাকালে বিশেষ চিন্তা করিয়া বর্ণনীয় বিষয়গুলি মনে মনে গুছাইয়া লইয়া লিখিতে বসিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না। যাহা ঘটিয়াছে, কথায় কথায় তাহাই সরল ভাবে বলিয়া গিয়াছেন। এই নিমিত্ত তাঁহাদের গ্রন্থে কোনরূপ রচনাচাতুর্য্য বা চিন্তাশীলতার পরিচয় প্রায়ই পাওয়া যায় না। এই সকল গ্রন্থের ভাষা অতি সরল—শব্দযোজনার পারিপাট্যশূন্য। বাক্যগুলি সংক্ষিপ্ত—স্থানে স্থানে এত সংক্ষিপ্ত যে, প্রায় পূর্ব্বাপরসম্বন্ধবিহীন বলিয়া মনে হয়। আবার কোনও কোনও স্থলে অতিদীর্ঘ বাক্যাবলীও দৃষ্ট হয়;—দীর্ঘ বাক্যগুলি অনেক স্থলেই ব্যাকরণদুষ্ট। স্থানে স্থানে অযত্ন-প্রযুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার বাহুল্যে অর্থবোধ করাও কিয়ৎপরিমাণে দুর্ঘট হইয়া উঠে। ইহার কারণ এই যে, এই সকল গ্রন্থ সামান্যবিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন কারকুন (কেরাণী) শ্রেণীর লেখকগণের দ্বারা লিখিত। এই সরলস্বভাব লেখকগণের রচিত গ্রন্থে ফারসি ভাষার বাহুল্য ও মুসলমানগণের অনুকরণে স্বজাতিকে 'গনীম্' (শত্রু) নামে অভিহিত হইতেও দেখা যায়। আমাদের বখরকারগণের ব্যাকরণদুষ্ট দীর্ঘ বাক্যাবলীরচনার পদ্ধতিও মুসলমানগণের অনুকরণের ফল। কারণ, তাঁহাদের রচনায় এরূপ দোষ বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

"অধিকাংশ বখরের প্রারম্ভ সংস্কৃত পুরাণাদির ভূমিকার অনুকরণে লিখিত, অর্থাৎ মুনিগণের প্রশ্নানুসারে সৌতির পুরাণকথাবর্ণনের অনুকরণে, এই সকল বখরের প্রারম্ভে 'অমুক অমুককে অমুক ঘটনা বিবৃত করিতে আদেশ করায় তিনি বলিতে লাগিলেন যে,—' এইরূপ মর্ম্মের প্রস্তাবনা দেখা যায়। আবার কোনও কোনও বখরে প্রশ্নকর্ত্তা বা লেখকের কোনও উল্লেখ না করিয়া, পত্রলিখনপদ্ধতির অনুকরণে কেবলমাত্র 'নিবেদন এই যে,—' এইরূপ লিখিত থাকে। 'তাঁহার পাঁচটি পুত্র ছিল,' লিখিতে হইলে, এই বখরকারগণ প্রথমতঃ 'বিতপসীল' এই কথাটি লিখিয়া, জমা খরচ লিখিবার পদ্ধতির অনুকরণে সেই পাঁচ জনের নাম লিখিয়া, শেষে নীচে একটি রেখা টানিয়া 'একুনে ৫ পাঁচ পুত্র' এইরূপ লিখিয়া থাকেন। কোনও কোনও বখর সাতারার রাজপরিবারের আদেশক্রমে তাঁহাদের কারকুণগণ কর্ত্তৃক প্রাচীন ঐতিহাসিক (সরকারী) কাগজপত্র অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই সকল বখরের প্রামাণিকতা খুব বেশী। কোনও কোনও বখর মুসলমানগণের লিখিত 'তওয়ারিখ' (ইতিহাস) অবলম্বনেও রচিত হইয়াছে, দেখা যায়। এই সকল বখরের উপর সহজে নির্ভর করা যায় না। সে যাহা হউক, পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই সকল বখর স্থানে স্থানে বিরাম চিহ্নাদি প্রদান করিয়া মুদ্রিত করিতে পারিলে, দেশের অনেক উপকার হইবে।"

এই প্রবন্ধ লিখিত হইবার প্রায় ২০ বৎসর পরে, এই সকল বখর প্রকাশের জন্য "কাব্যেতিহাস সংগ্রহ" প্রকাশিত হয়।

সময়ান্তরে, রাও বাহাদুর কীর্ত্তনের মহারাষ্ট্র-ইতিহাস সম্বন্ধে অবশিষ্ট বক্তব্য পাঠকগণের গোচর করিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীসখারাম গণেশদেউস্কর।

নালাপাণি।

"নালাপাণি" নামটি শুনিলে সহজেই ইহার অর্থ বুঝিতে পারা যায়। "নালা" অর্থ পয়ঃপ্রণালী আর "পাণি" অর্থ জল, এই দুইটি শব্দ একত্র করিয়া অর্থ নিষ্কাশন করিলে খালের জল ছাড়া যে আর কোনও আধ্যাত্মিক অর্থ পাওয়া

যায় না, তাহা বোধ করি অধ্যাত্মবাদীগণও অসঙ্কোচে স্বীকার করিবেন। বাস্তবিকও নালাপাণির অন্য কোনও অর্থ নাই।

হিমালয় পর্ব্বতের একটি নিম্ন পাহাড় হইতে এই নির্ঝরটি বাহির হইয়াছে। এই ঝরণার জল এমন পরিষ্কার ও সুস্বাদু যে, তাহার সহিত কলিকাতার কলের জলেরও তুলনা হইতে পারে না; এতদ্ভিন্ন এ জলের এমন একটি গুণ আছে, যে জন্য দরিদ্র লোক বিশেষ কৃতজ্ঞ না হইলেও, অলস ধনী ও অজীর্ণরোগগ্রস্ত জীবন্মৃত ব্যক্তিগণ স্বর্গের সুধার সহিত এই জলের তুলনা না করিয়া থাকিতে পারে না। এ জল অসম্ভব ক্ষুধা বৃদ্ধি করে; যে দিনান্তে একবারও উদর পরিতৃপ্ত করিবার সম্বল সংগ্রহ করিতে পারে না, তাহার ক্ষুধা বৃদ্ধি হওয়া কষ্টকর, বরং ক্ষুধা হ্রাস করিবার কোনও উপায় থাকিলে তাহার উপকার হয়। কিন্তু যে সকল ধনীসন্তান পিতৃপিতামহের উপার্জ্জিত অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া দিবারাত্রি বিলাসসাগরে ডুবিয়া আছেন, এবং প্রতিদিন চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় দ্বারা উদর পূর্ণ করিয়া বয়স্যগণে পরিবৃত হইয়া তাহাদের মুখে নিজ কথার পুনরুক্তি শুনিতে শুনিতে তাকিয়ার উপর ভর দিয়া অলস মধ্যাহ্ন অতিবাহিত করেন এবং দিবাবসানে স্ফীতোদরের সুবিস্তীর্ণ পরিধিতে হস্তার্পণ পূর্ব্বক বলেন "আজ ক্ষিদেটা বড় মন্দা হে"—নালাপাণির জল তাঁহাদের সেই ক্ষুধাহীনতা রোগের মহৌষধ; ভিজিট দিয়া ডাক্তার ডাকিবার প্রয়োজন নাই, এক এক গণ্ডূষ তুলিয়া খাইলেই হইল, উদরাগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় তাহা কার্য্যকর হয় এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত খাদ্য জীর্ণ হইয়া যায়; অম্ল রোগেরও এই জল অব্যর্থ ঔষধ।

যে স্থান হইতে এই ঝরণা বাহির হইয়াছে, সেই পাহাড়ের নামও নালাপাণি, এবং গ্রামের নামও নালাপাণি হইয়াছে। গ্রাম বলিলে পাহাড়ে গ্রামের যাহা অর্থ তাহাই বুঝিতে হইবে, সেই আট দশ বিঘা জমীর উপর দশ পনের ঘর অধিবাসী; নালাপাণির অধিবাসী সংখ্যা খুব বেশী হইলেও পঁচিশ ঘরের অধিক হইবে না; ইহাদের অধিকাংশই নেপালী গুরখা।

এই নালাপাণিতে দুই খানি দোকান আছে; এক খানিতে আটা, ডাইল, লবণ, ঘৃত, লঙ্কা প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিক্রয় হয়, আর একখানিতে মহাশয় ইংরাজ গবর্মেন্টের সযত্নরক্ষিত, গৌরববাহিনী, বিপুল-অর্থ-প্রদায়িনী সুরা বিক্রয় হয়। পর্ব্বতের মধ্যে ২৫।৩০ ঘর গৃহস্থের জন্য পুণ্যসলিলা নালাপাণির পার্শ্বেই, সত্যসত্যই যে স্থান হইতে নালাপাণির ঝরণা বহির হই-

য়াছে, তাহারই পাত্রসংলগ্ন মদ্যালয়। যে দিন এই সুন্দর স্থানে, এমন পরিষ্কার, সুস্বাদু, সুপেয় নির্ম্মল জলের উৎস-সন্নিকটে এই মদের দোকান দেখিয়াছিলাম, সেই দিন পানদোষনিবারণের জন্য উৎসর্গীকৃতজীবন, লোলচর্ম্ম, পক্ককেশ, ঋষিপ্রতিম বৃদ্ধ ইভান্স সাহেবের সৌম্য মূর্ত্তি আমার নয়নসমক্ষে উদিত হইয়াছিল। অনেক দিন পরে তাঁহার জলদগম্ভীর কথাগুলির প্রতিধ্বনি যেন শুনিতে লাগিলাম। বহুদূরবর্ত্তী, হিমাচলক্রোড়স্থিত দেরাদুনের মিশন স্কুলের প্রকাণ্ড হল কম্পিত করিয়া বৃদ্ধ পরম-উৎসাহ-পূর্ণ হৃদয়ে যে হৃদয়স্পর্শী কথা কয়টি বলিয়াছিলেন, এতদিন পরে আজও যেন তাহা কর্ণে আসিয়া বাজিতেছে; বৃদ্ধ বলিয়াছিলেন, "দারু মৎ পিয়ো, খোদা গঙ্গাজীমে দারু নেহি ঢাল দিয়া, ইয়ে বহুৎ মিঠা পাণি ঢাল দিয়া, গঙ্গাজীকো পাণি ছোড়কে কাহে দারু পিতে হো!"—হায়, পরদুঃখকাতর আত্মত্যাগী বৃদ্ধ, তুমি যাহাদের এ কথা বুঝাইতে গিয়াছ, তাহারা মনুষ্যত্ববর্জ্জিত বর্ব্বর, নতুবা তোমার এই মধুর উপদেশ তাহাদের হৃদয়ে স্থান পাইল না কেন? এখনো ত দ্বিগুণ উৎসাহে মদ্য বিক্রয় হইতেছে। মানুষ যখন দিক্‌বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়, তখন বুঝি দেবতাও তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না। পশুত্বের নিকট দেবশক্তিও ব্যর্থ?

দেরাদুন হইতে এক মাইল উত্তরপূর্ব্বে নালাপাণির পাহাড়। দেরাদুনের মধ্য দিয়া দুইটি "নহর" (পয়ঃপ্রণালী) বহিয়া যাইতেছে। মসুরী পাহাড়ের পাদদেশে রাজপুর নামে একটি স্থান আছে, রাজপুরের একটা প্রকাণ্ড ঝরণাকে বাঁধিয়া রাজপুর হইতে দেরাদুনের রাস্তার পাশ দিয়া একেবারে নগরের মধ্যে আনিয়া ফেলা হইয়াছে। নগরের বাহির হইতেই তাহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, এক ভাগ কর্ণপুর নামক স্থান দিয়া ও অন্য ভাগ বাজারের পাশ দিয়া, প্রবাহিত করা হইয়াছে। এই দুইটি নহরের জলেই সহরের সমস্ত কাজ চলে, এতদ্ভিন্ন এই নহরের সঙ্গে প্রত্যেক বাড়ীর যোগ আছে, কিছু পয়সা খরচ করিলে আধ ঘণ্টা হউক বা এক ঘণ্টা হউক, যে যতখানি দরকার মনে করে, বাগানের কি অন্য কোনও ব্যবহারের জন্য ততখানি জল পাইতে পারে। এই জল যথারীতি যোগাইবার জন্য লোক নিযুক্ত আছে, এবং তাহাদের আফিসও আছে। পূর্ব্বে এই নহরের জলই লোকে পান করিত, কিন্তু এ জলের একটি মহৎ দোষ আছে। এই জল পান করিলে লোকের গলা ফুলিয়া যায়, এই জন্য যাহাদের অর্থ আছে, তাহারা লোক জনের দ্বারা দূরস্থ অন্য কোনও ভাল ঝরণা হইতে জল আনাইয়া পান করে। নালাপাণির এই জল

আবিষ্কৃত হইলে, কিছু দিন পর্য্যন্ত লোক নগরের মধ্যে আনাইয়া লইত, কিন্তু তাহা অপেক্ষাকৃত ব্যয়সাধ্য হওয়াতে সকলে আনাইতে পারিত না; পরে মিউ-নিসিপালিটী মাটীর নীচে পাইপ বসাইয়া এই জল নগরের মধ্যে আনিয়াছেন, এবং দেরাদুনের প্রশস্ত Parade groundএর দুই প্রান্তে দুইটি ঘর প্রস্তুত করিয়া তাহাদের গায়ে নল বসাইয়াছেন। সকলে সেই নলের মুখ হইতে বিনা পয়-সায় নালাপানির জল লইয়া যায়; নালাপানির জল সম্বন্ধে অধিক কিছু বলি-বার নাই।

কিন্তু এই জল ভিন্ন আরও কতকগুলি কারণে নালাপানি প্রসিদ্ধ। নালা-পানিতে এক জন সন্ন্যাসীর একটি সুন্দর আশ্রম আছে; এই সন্ন্যাসী সাধারণ সন্ন্যাসীর দল হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্নপ্রকৃতি, ইনি আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী। আর্য্য ধর্ম্মের অর্থ—স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর প্রচারিত ধর্ম্ম; উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ও পাঞ্জা-বের অনেক শিক্ষিত লোক এই ধর্ম্মাবলম্বী বটে, কিন্তু সন্ন্যাসী বা সাধু শ্রেণীর মধ্যে যে এ ধর্ম্ম বিস্তৃত হইয়াছে, আমার এরূপ জ্ঞান ছিল না। বিশেষতঃ, নানা কারণে সন্ন্যাসীদিগের উদার মত একটু বিস্ময়-উৎপাদক, তাই এই সন্ন্যাসীবরকে আমার বহুদিন হইতে দেখিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এত দিন সে আশা পূর্ণ হয় নাই। শুনিয়াছি, ইনি খুব পণ্ডিত এবং দর্শনশাস্ত্রে সবিশেষ পারদর্শী; ইনি মধ্যে মধ্যে দেরাদুন আর্য্যসমাজের সাপ্তাহিক অধিবেশনে উপস্থিত হন, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ তথাপি তাঁহার দর্শনলাভে সমর্থ হই নাই; কারণ, তিনি কোন্ দিন আসিবেন, তাহার কিছুমাত্র নিশ্চয় থাকিত না।

সুতরাং সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ করিবার ইচ্ছা বিশেষ প্রবল হওয়াতে, এক দিন অপরাহ্ণে আমি আমার জনৈক দীর্ঘকালপ্রবাসী বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া নালাপানি-দর্শনে যাত্রা করিলাম। নালাপানির পথে একটু অগ্রসর হইতেই একটি শুষ্ক নদী পার হইতে হইল;—এই নদীর নাম নাম রিচপানা, এই নদীর ধারে চুন প্রস্তুতের আড্ডা; এই নদীর মধ্যে এবং আশে পাশে অনেক "চুনা-পাথর" পাওয়া যায়, শীতের সময় সেই সকল পাথর কুড়াইয়া একত্র করে, তাহার পর বড় বড় গর্ত্ত কাটিয়া তাহার মধ্যে স্তরে স্তরে কাঠ ও ঐ পাথর সাজাইয়া রাখে, শেষে তাহাতে আগুণ ধরাইয়া দেয়; সমস্ত পুড়িয়া গেলে, গর্ত্ত হইতে সেগুলি তুলিলে দেখা যায়, পাথরগুলি অতি সুন্দর পরিষ্কার চুণে পরি-ণত হইয়াছে। এই 'রিচপানা' নদী পার হইয়া সামান্য দূরেই আমাদের অশ্বার-

ক্ষেত্র। এই শ্মশানভূমির পার্শ্ব দিয়া আমরা চলিতে লাগিলাম। এ ক্ষেত্রে আমি অনেকবার আসিয়াছি ; কত দিন সন্ধ্যার সময় ইহার নীরব গম্ভীর ভাব দেখিয়া স্তম্ভিতহৃদয়ে জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে কত কথা চিন্তা করিয়াছি, দুই একবার আমার আত্মীয় বন্ধুগণের স্নেহ ও প্রীতির অবলম্বন স্ত্রী ও পুত্র কন্যার অন্তিমকার্য্য শেষ করিতে আসিয়া, ইহকাল ও পরকালের এই সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া শোকসন্তপ্ত মনে অশ্রু মুছিয়াছি। নিকটেই আমার একজন পরম আত্মীয়ের প্রিয়তমার সমাধিমন্দির, এই ক্ষুদ্র সমাধিপার্শ্বে বসিয়া কত দিন তাঁহার স্বভাবের পবিত্রতা, তাঁহার আশ্চর্য্য সরলতা, এবং রমণীহৃদয়ের মধুরতার কথা চিন্তা করিয়া, তাঁহার অভাবে হৃদয়ে গভীর বেদনা অনুভব করিয়াছি ; বহুদূরবর্ত্তী এই বিদেশে, প্রবাসের গভীর অভাবের মধ্যে কতদিন তাঁহার আদর ও যত্নে মাতার করুণা ও ভগিনীর স্নেহ ফুটিয়া উঠিয়াছিল ! আজ তাঁহার ক্ষুদ্র বালকবালিকাগুলি নিরাশ্রয়, তাঁহার হতভাগ্য স্বামীর হৃদয় শোকাকুলিত ; এই শোকসন্তপ্ত পরিবারের হৃদয়ভারের কথা ভাবিয়া আমার অসীম দুঃখও ভুলিয়া যাই। যে দিন 'নালাপাণি' দেখিতে যাই, তাহার পাঁচ সাত দিন পূর্ব্বে আমার এক জন আত্মীয়াকে এই সমাধির নিকটেই দগ্ধ করিয়া গিয়াছি, চিতার অঙ্গার তখন পর্য্যন্ত পড়িয়া আছে দেখিলাম, তাহাতেই তাঁহার ইহজীবনের স্মৃতি বিজড়িত ছিল, সংসারে আর কেহ নাই যে, তাঁহার জন্য এক বিন্দু অশ্রু ত্যাগ করে। একবার চিতার নিকট নিঃশব্দে দাঁড়াইলাম, পরলোকগত আত্মার জন্য আর একবার, বুঝি শেষ বার, ভগবানের করুণা প্রার্থনা করিলাম, তাহার পর পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম।

এই স্থান হইতেই পাহাড়ে উঠিতে হয়। পাহাড় খুব উচ্চ নহে ; অল্প দূর উঠিয়াই সেই মুদীখানা দোকান, আর উদারপ্রকৃতি খৃষ্টান ইংরাজরাজের সমুন্নত মহিমা-ধ্বজা সেই শৌণ্ডিকালয়। সকল জিনিষ ক্রয়বিক্রয়েরই একটি নির্দ্দিষ্ট সময় আছে, কিন্তু "কোম্পানী বাহাদুরের অনুমতিক্রমে খুচরা আফিং গাঁজা মদ প্রভৃতি বিক্রয় করিতেছি" এই সাইনবোর্ড-যুক্ত ছোট দোকানে খরিদদারের সময় অসময় নাই। নিতান্ত যখন দেখিবে খরিদদার নাই, তখনও অন্ততঃ দুই চারিজন উমেদার শিকানবিশী করিতেছে, দেখিতে পাইবে। আজ রবিবার অপরাহ্ন, গুরখা পল্টনের সিপাহীগণ আজ বিশ্রাম পাইয়াছে, তাই আজ এ দোকান খুব সরগরম দেখা গেল। যখন আমরা সেই দোকানের নিকট উপস্থিত হইলাম, তখন সেখানে খুব হাসি তামাসা চলিতেছিল, বলা

বাহুল্য, সুরাসেবীরও উপাসনা চলিতেছিল; তবে তাহা দেখিবার ইচ্ছা ছিল না, প্রবৃত্তিও হয় নাই। পাশেই নালাপানি—আমরা সেই নালাপানির জল অঞ্জলি পুরিয়া পান করিতে লাগিলাম। হতভাগ্যেরা যখন হৃদয়ের শোণিত এবং প্রাণের বিনিময়ে উপার্জ্জিত অর্থে গরল পান করিতেছিল, তখন আমরা ভগবানের করুণাধারা প্রাণ ভরিয়া পান করিতেছিলাম। এমন স্বচ্ছ সুস্বাদু জলধারা—বিধাতার করুণাধারা ভিন্ন তাহাকে আর কিছু বলিয়াই তৃপ্তি হয় না। স্থানের সৌন্দর্য্য, তাহার উপর এমন মধুর গম্ভীর সন্ধ্যাকাল; চতুর্দ্দিকে শ্যামল লতাপল্লব, তাহার মধ্যে এই নির্ঝরিণীর আনন্দোচ্ছ্বাস; সঙ্গী বন্ধুর প্রাণ ভাবে বিভোর হইয়া উঠিল, তিনি আমাকে সেখানে বসিয়াই একটি গান গাহিতে বলিলেন। কি গান গাহিব, এমন স্থানে আসিয়া আর কোন গান মনে আসে? প্রাণের আনন্দ ও উচ্ছ্বাস সঙ্গীতে ধ্বনিত হয়, আমাদের হৃদয়ের গভীর আনন্দ ব্যক্ত করিবার উপযোগী সঙ্গীত সহজেই মনে পড়িল, দুই বন্ধুতে সেই নির্ঝরের পাশে দীর্ঘবাহু শালবৃক্ষের মূলদেশে উপবেশন করিয়া মুক্ত প্রাণে গাহিতে লাগিলাম :—

"তাঁহারি আনন্দ ধারা জগতে যেতেছে বয়ে,
এস সবে নরনারী আপন হৃদয় লয়ে।
সে আনন্দে উপবন, বিকশিত অনুক্ষণ
সে আনন্দে ধায় নদী আনন্দবারতা কয়ে।
যে পুণ্য নির্ঝর স্রোতে বিশ্ব করিতেছে স্নান,
রাখ সে অমৃতধারা পুরিয়া হৃদয় প্রাণ।
তোমরা এসেছ তীরে, শূন্যে কি যাইবে ফিরে,
শেষে কি নয়ননীরে ডুবিবে তৃষিত হ'য়ে।
চিরদিন এ আকাশ নবীন নীলিমাময়
চিরদিন এ ধরণী যৌবনে ফুটিয়া রয়।
সে আনন্দরসপানে চিরপ্রেম জাগে প্রাণে
দহে না সংসারতাপ সংসার-মাঝারে রয়ে।"

গানের শেষে মনে হইল, এই নির্ঝরপার্শ্বে, শৈল-অন্তরালবর্ত্তী এই তরুচ্ছায়ায়, প্রকৃতির এই রমণীয় নিভৃত কুঞ্জে, প্রকৃতির কবি পূজনীয় রবীন্দ্রনাথকে বসাইয়া যদি তাঁহার মুখে এই গানটি শুনিতে পাইতাম, তাহা হইলে চতুর্দ্দিকের এই পবিত্র সৌন্দর্য্য আরও সুন্দর বলিয়া বোধ হইত, এই সঙ্গীতশ্রবণে হয় ত তাহার যথার্থ উপভোগ হইত। এবং হৃদয়ের পিপাসাও কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইত। চক্ষু দ্বারা সর্ব্বদা সকল সৌন্দর্য্য অনুভব করা যায় না, কিন্তু কর্ণে যদি মধুর ভাষায় সেই সৌন্দর্য্যের মর্ম্ম ধ্বনিত হয়—এবং সঙ্গে সঙ্গে সকল সৌন্দর্য্যের যিনি কারণ, তাঁহার বিকাশ অনুভব করা যায়, তাহা হইলে হৃদয়ের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা অনেকাংশে পরিতৃপ্ত হয়। যখনই যে সুন্দর স্থানে গিয়াছি, কবিবরের রচিত সেই সকল স্থানের রমণীয় দৃশ্যবৎ সুন্দর গান গাহিতে ইচ্ছা হইয়াছে, কিন্তু এ ভাঙ্গা গলায় শুষ্ক হৃদয়ে কি তেমন করিয়া গাহিতে

পারা যায় ?—পারি নাই, তাই সেই দূর প্রবাসে, নির্জ্জন অরণ্য, মেঘমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ, উপলসঙ্কুল খরস্রোতা পার্ব্বত্য প্রবাহিণী, প্রকৃতির প্রমোদ উদ্যান, সকল সুন্দর স্থানেই কবিবরের অভাব বড় গভীর ভাবে অনুভব করিয়াছি। আমার পরম পূজনীয় পিতৃস্থানীয় আত্মীয় প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ পণ্ডিত ও জ্যোতিষী শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন দেরাদুনে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন, তখন একদিন এই সুরম্য স্থান দেখিয়া তিনি এতই আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, বলিয়াছিলেন,—"বড়ই ইচ্ছা করে, আমার যারা আপনার জন আছে, সকলকে ডেকে এনে এই সুন্দর ছবিখানি দেখাই—এ স্থানটি অতি সুন্দর, অতি সুন্দর!" দেরাদুনে অবস্থানকালে তিনি অনেক সময়ই বলিতেন,—"কে যেন কোনও এক সুন্দর দেশ হতে এই রমণীয় সহরটা চুরী করে এনে এই পাহাড়ের মধ্যে লুকাইয়া রেখে গেছে।"

ঝরণা দেখা শেষ হইলে, সন্ন্যাসীর আশ্রম দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইলাম। জানিতে পারিলাম, তাহা আরও উপরে; বিলম্ব না করিয়া সেই আঁকাবাঁকা পথ বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে সন্ন্যাসীর আশ্রমদ্বারে উপস্থিত হওয়া গেল; আমাদিগকে দেখিবামাত্র সন্ন্যাসী অতি সমাদরে আমাদিগকে তাঁহার আশ্রমপ্রাঙ্গণে আহ্বান করিলেন। দেখিলাম, তিনি তখন তিন চারিটি বালককে ব্যাকরণ শিক্ষা দিতেছিলেন। বালক কয়টি শরীর দুলাইয়া তাড়াতাড়ি ব্যাকরণ আবৃত্তি করিতেছিল। আমাদের দেশে পূজার সময় পুরোহিত ঠাকুরেরা যেমন চণ্ডী পাঠ করে, তাহার এক বর্ণও বুঝিবার যো নাই, ইহাদের এ আবৃত্তিও তদ্রূপ। আমরা বাহিরে জুতা রাখিয়া আশ্রমপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলাম; তিন চারি খানি সুন্দর পরিষ্কার ঘর, উঠানটি ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। চারিদিকে অনেকগুলি গাছ, ফলভরে বৃক্ষগুলি অবনত, সতেজ পত্রে স্নিগ্ধতা ক্ষরিত হইতেছে। তপোবনপ্রাঙ্গণে একটি বিল্বতরু, একটি রুদ্রাক্ষের গাছ অতি যত্নে রক্ষিত হইয়াছে। স্থানটি সন্ন্যাসী ও তাঁহার সঙ্গীগণের যত্নে তপোবনের ন্যায় শোভান্বিত হইয়াছে, তাহার স্নিগ্ধ ভাব দেখিলে হৃদয় জুড়াইয়া যায়। সন্ন্যাসী যে কঠোরপ্রকৃতি দার্শনিক নহেন, সেই শুষ্ক যোগসাধনার মধ্যেও কবিহৃদয় বর্ত্তমান, তাহা তাঁহার স্থাননির্ব্বাচনেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। স্থানটি এমন সুন্দর যে, সেখানে দাঁড়াইলে সমস্ত দেরাদুন সহরটি বেশ পরিস্ফুটরূপে দেখা যায়, একখানি চিত্রের ন্যায় সুশোভন ও নয়নরঞ্জন। দিবাবসানে এই তপোবনের উন্মুক্ত প্রান্তে দাঁড়াইয়া একবার দেরা-

দূনের সৌম্য শান্ত শোভা নিরীক্ষণ করিলাম, আলো ও ছায়ার মধুর মিলনে গিরিউপত্যকা-বিরাজিত, হরিৎশস্যবৃক্ষশ্রেণীপরিশোভিত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অট্টালিকা-পূর্ণ দেরাদুন সহর সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পরে যেন বিশ্রাম করিতেছে, এবং সান্ধ্যতপনের লোহিত প্রভা তাহার সর্বাঙ্গে প্রতিফলিত হইতেছে ; মধ্যাহ্নের অস্ফুট কলরব যেন ধীরে ধীরে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া এই শোভা দেখিয়া তপোবনের তরুচ্ছায়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

ধনীর অট্টালিকায় উপস্থিত হইলে তাঁহারা তাঁহাদের হস্তী অশ্ব গৃহসজ্জা প্রভৃতি দেখাইয়া থাকেন, সঙ্গে সঙ্গে হয় ত তাঁহাদের মনে কিঞ্চিৎ গর্ব্বেরও আবির্ভাব হইয়া থাকে ; আমাদের সন্ন্যাসী ঠাকুরের নিকটও সেই মানব রীতির ব্যবহারবিষয়ে ব্যতিক্রম লক্ষিত হইল না। তিনি আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার তপোবনের প্রত্যেক বৃক্ষ আমাদিগকে দেখাইতে লাগিলেন, কোন্ বৃক্ষটি কোন্ বৎসর রোপিত হইয়াছিল, এমন কি, কোনটি কবে ফলবান হইয়া-ছিল, তাহা পর্য্যন্ত তাঁহার মনে আছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভগবানের কৃপার কথা বলিতে লাগিলেন, অবশেষে বিগলিতহৃদয়ে বলিলেন, "আরে বাবা দীনদয়াল কঠিন প্রস্তরসে অমৃতধারা বাহার কর দিয়া।"—তাঁহার চক্ষুও অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল ; নিজের হৃদয়ের দিকে চাহিয়া দেখিলাম—তাহা মরুময়, পাষাণের অপেক্ষাও কঠিন ! ভগবানের নামে সহজে তাহা গলিতে চাহে না।

সমস্ত দেখা শেষ হইলে সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমরা একটি বাদাম গাছের তলে আসিয়া বসিলাম। সন্ন্যাসীর কয়েকজন শিষ্যও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আজ পল্টনের ছুটী, কেহ মদের দোকানে বসিয়া সুরাদেবীর সেবা করিতেছে; কেহ বা সপ্তাহান্তে আজ সন্ন্যাসীর কাছে আসিয়া এক সপ্তাহের জন্ত প্রাণের ক্ষুধা নিবারণের উপকরণ সংগ্রহ করিতেছে ; পুণ্যকথা শুনিতে শুনিতে এই সকল সিংহবিক্রম উদ্ধত সৈনিকপুরুষের হৃদয়ও মেষের ন্যায় শান্ত ভাব অব-লম্বন করে।

সন্ন্যাসী অনেক শাস্ত্র-কথা বলিলেন ; হরিশ্চন্দ্রের কথা, জন্মদুঃখিনী পুণ্য-বতী জানকীর পবিত্র কাহিনী, নল দময়ন্তীর দুর্দ্দশার বিবরণ প্রভৃতি পৌরা-ণিক বৃত্তান্তও বিবৃত করিতে লাগিলেন। এই সকল কথা বলিতে বলিতে হয় ত তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, আমরা যখন লেখা-পড়া-জানা লোক, তখন আমা-দের এ সকল কথা জানাই খুব সম্ভব, তাই গল্পের শেষে আমাদিগের দিকে চাহিয়া হিন্দীতে বলিলেন, "ইহারা অধিক লেখা-পড়া জানে না, ইহাদিগকে

এই সকল পুরাণকথা বলিলে ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে ইহাদের অনেক জ্ঞান হয়, ইহারা অনেক দূর হইতে আসিয়াছে, এবং এই সকল কথা শুনিতে ইহাদিগের আগ্রহ অত্যন্ত অধিক।"—যাহা হউক, এ সকল কথা সমাপ্ত হইলে তিনি আমাদের নিকট দর্শনের নিগূঢ়তত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ করিলেন, এবং "মায়াবাদ" "দ্বৈতাদ্বৈতবাদ" "অবতারবাদ" "জন্মান্তরবাদ" প্রভৃতি বিষয় বলিতে লাগিলেন। দেখিলাম, লোকটি বেশ তার্কিক; ইহার আর একটি বিশেষত্ব দেখিলাম, ইনি শাস্ত্রকে দূরে রাখিয়া তর্ক করেন। আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা প্রথমেই শাস্ত্র চাপিয়া ধরেন, এবং তর্কে পরাস্ত হইলে শাস্ত্রের উপর আপনার অপদস্থ পাণ্ডিত্যাভিমান স্তূপাকার করিয়া মুক্তকচ্ছে যে সকল বাপান্ত ও অভিশাপান্ত প্রয়োগ করেন, তাহা শাস্ত্রের উক্তি বলিয়া অতি অল্প লোকেরই ভ্রম হয়। এই জ্ঞানী সন্ন্যাসীর নিকট সেই সনাতন প্রথার ব্যভিচার দেখিয়া আমার মনে অত্যন্ত বিস্ময় উৎপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু প্রকৃত পণ্ডিত ও মূর্খ পণ্ডিতের পার্থক্য বুঝিয়া বড়ই আনন্দ বোধ হইল। ইনি বেদ অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন, আর্য্যধর্ম্মাবলম্বীদিগের ইহাই বিশ্বাস,—সন্ন্যাসী বলিলেন, তর্কক্ষেত্রে যাহা অভ্রান্ত, তাহাকে আনিয়া ফেলিলে স্বাধীন তর্কের পথ সহসাই রুদ্ধ হইয়া যায়, এবং ভ্রম ও সন্দেহের মধ্যে পড়িয়া প্রাণ আকুল হইয়া উঠে; যাহা প্রাণের বস্তু, বিশ্বাসের নির্ভর, তর্কের যুদ্ধে তাহাকে বর্ম্মরূপে ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ যদি সেই বর্ম্ম ভেদ করিয়া অস্ত্রের আঘাত লাগে, তবে তাহা অত্যন্ত সাংঘাতিক হইয়া উঠে। ইঁহার মুখেই আমি প্রথমে শুনিলাম,

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীনে বিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥"

এই শ্লোকটি পরে বোধ হয়, পূজ্যপাদ বঙ্কিম বাবুর প্রাণে বিশেষরূপে বাজিয়াছিল। সে কালের পণ্ডিতশ্রেণীর মধ্যে এরূপ স্বাধীন মতের কথা প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না, তাই বঙ্কিম বাবুর বিরুদ্ধে সেকেলে পণ্ডিতদিগের আক্রোশের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এমন কি, সেই জন্যই বোধ হয় কেহ কেহ তাঁহাকে হিন্দুত্বের সীমা হইতে নির্ব্বাসন করিতেও কুণ্ঠিত নহেন; কিন্তু উল্লিখিত শ্লোকটিও প্রাচীন পণ্ডিতদিগের রচনা, ইহা হইতেই আমরা প্রাচীন পণ্ডিতদিগের উদারতা, যুক্তির প্রতি গভীর ভক্তি এবং কর্ত্তব্যের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা এবং তাঁহাদের আধুনিক চেলাদিগের ভণ্ডামী ও অশ্রদ্ধের বাক্যকৌশলের পরিচয় পাই। কিছু দিন পূর্ব্বে "সাধনার" উক্ত পত্রিকার অনেক প্রবন্ধের লেখক প্রাচীন শুশ্রূষার সম্বন্ধে কথাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন, ইয়ো-

জীতে একটি গল্প আছে যে, কিল্‌কেনির বিড়ালেরা এমন যুদ্ধ করিত যে, যুদ্ধাবসানে তাহাদের লেজগুলি ভিন্ন আর কিছু অবশিষ্ট থাকিত না। কিন্তু প্রাচীন শূন্যবাদীদিগের তর্কযুদ্ধে লেজ দূরের কথা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলই উড়িয়া যাইত। এ কথা প্রাচীন পণ্ডিতদিগের সম্বন্ধে যতখানি না খাটুক, আধুনিক পণ্ডিতদিগের সম্বন্ধে খাটে বটে! আমার এক জন শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু অনেক সময়ই বলিয়া থাকেন, "উদরে কিঞ্চিৎ গব্যরস (অর্থাৎ ইংরাজী বিদ্যা) না পড়িলে স্বাধীন যুক্তির দ্বার মুক্ত হয় না ;" আমার বর্ত্তমান সন্ন্যাসী ঠাকুর কিন্তু এক জন honourable exception, যাহা হউক, সন্ন্যাসী মহাশয়ের স্বাধীন মত কিরূপ, তাহা জানিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, দেশকালপাত্রভেদে আইনের যেমন নজীর গঠিত হয়, সেইরূপ এখন শাস্ত্রাদিসম্মত বিধিরও "রদ বদল" করা উচিত কি না। সন্ন্যাসী এই কথা শুনিয়া বিশেষ তেজের সহিত বলিয়াছিলেন, "আল্‌বৎ!" অবশেষে কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া যেন একটু বিষণ্ণভাবে বলিলেন, "আরে বাবা, বহুৎ রদ্ বদল হো গেয়া ; আভি হিন্দু লোগোঁনে হরওয়াক্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য সমাজ মে চালায় লেতেঁ হি।"—তাঁহার কথার ভাবে এই বুঝিলাম, রদ বদল চাই, তবে এখন যেরূপ ভাবে তাহা হইতেছে, সেরূপ প্রার্থনীয় নহে ; জানি না, আমাদের বঙ্গের চূড়ামণি ও বাগ্যন্তবাগীশ এবং কলিকাতার সপ্তাহিকপত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাস পরাশর মহাশয়দিগের এ সম্বন্ধে বক্তব্য কি ?

প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল দেখিয়া আমরা সন্ন্যাসীর নিকট বিদায় লইয়া উঠিলাম। সন্ন্যাসী আমাকে দুই তিনটা অপক্ক রুদ্রাক্ষ আনিয়া দিলেন, এবং বন্ধুকে একটি সুপক্ক বৃহৎ "পেঁপে" উপহার দান করিলেন ; আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, সেই পুণ্য তপোবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক লোকালয়ের দিকে অগ্রসর হইলাম।

পথে আসিতে আসিতে সঙ্গী বন্ধুকে বলিলাম, দেরাদুনের চতুষ্পার্শ্বে যাহা দেখিবার, তাহা সমস্তই দেখা শেষ হইল, বোধ হয়, আর কিছু দেখিতে বাকি থাকিল না ; বন্ধু আমার গর্ব্ব চূর্ণ করিবার নিমিত্ত অল্প হাসিয়া বলিলেন, তিনি আমাদের বাসস্থানের অতি নিকটেই এমন কিছু দর্শনযোগ্য বস্তু দেখাইতে পারেন, যাহা আমি সে প্রদেশে দেখিবার আশা করি না। আমি আকাশ পাতাল ভাবিয়া সেরূপ কোনও বস্তুর আবির্ভাব কল্পনা করিতে পারিলাম না, তখন তিনি সেই দিনই সেই অকাঙ্ক্ষিত বস্তু দেখাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

আর অধিক বেলা নাই দেখিয়া আমরা তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিলাম। শীঘ্রই পূর্ব্বকথিত শ্মশানের নিকট উপস্থিত হইলাম। সেখান হইতে সমুখদিকে আসিলেই আমরা বাসায় উপস্থিত হইতে পারি, কিন্তু সে দিকে না আসিয়া বন্ধুটি আমাকে দক্ষিণ পাশের একটি জঙ্গলময় পথে লইয়া চলি[illegible]ন। কিছু দূর জঙ্গল ভাঙ্গিয়া আমরা "রিচপানা" নদীর তীরে আসিয়া পড়িলাম। সেখান হইতে একটু নীচে নদীর [illegible] পারে সহর দেখা যাইতেছে, যেন প্রতিমুহূর্ত্তে অন্ধকারের শান্তিময় ক্রোড়ে দেরাদুন ঢাকিয়া যাইতেছে। নদীতীরে আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, একটি ক্ষুদ্র বনের আড়ালে অল্পপরিসর একটু স্থান লৌহ রেলিংএ পরিবেষ্টিত, তাহার মধ্যে দুইটি চতুকোণ ক্ষুদ্র প্রস্তরনির্ম্মিত স্তম্ভ বিরাজিত। না জানি কোন মহাত্মার নশ্বর দেহের ধ্বংসাবশেষ এই রমণীয় নির্জ্জন প্রদেশে জীবনের অবসানে পরম শান্তি উপভোগ করিতেছে। কৌতূহলপূর্ণ হৃদয়ে ক্ষুদ্র লৌহকবাট ঠেলিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম; তখন সন্ধ্যা বেশ গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্তম্ভের গাত্রের দিকে চাহিলাম; দেখিলাম, স্তম্ভদ্বয়ের গাত্রে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে সুস্পষ্ট ইংরাজী অক্ষরে কি লেখা আছে। অন্ধকার হইয়াছিল, তথাপি বিশেষ যত্ন করিয়া লেখাগুলি পড়িয়া দেখিলাম; দক্ষিণ দিকের স্তম্ভের পশ্চিম পার্শ্বে লিখিত আছে;—

To the Memory of
Major General Sir ROBERT ROLLO GILLISPIE K. C. B.
Lieutenant O'HARA, 6th N. J.
Lieutenant GOSLING, LIGHT BATTALION
Ensign FOTHERGILL, 17th N. J.
Ensign ELLIS, Pioneers.
Killed on the 31st October 1814.
Captain CAMPBELL, 6th N. J. Lieut. LUXFORD,
Horse Artillery,
Lieutenant HARRINGTON, H. M. 53 Regt.
Lieutenant CUNNINGHAM, 13th N. J.
Killed on the 27th November,
And of the non-commissioned officers and men
Who fell at the Assault.

কোন্ কোন্ সৈন্যদল যুদ্ধ করিয়াছিল, এই স্তম্ভের পূর্ব্ব পার্শ্বে তাহাদিগের তালিকা আছে; তাহা উদ্ধৃত করা বাহুল্য।

দ্বিতীয় স্তম্ভের পূর্ব্ব পার্শ্বে এইরূপ লিখিত আছে;—

This is inscribed
As a tribute of Respect for our adversary
Bulbudder
Commander of the Fort
And his brave Gurkha's
Who were afterwards
While in the Service of RANJIT SING
Shot down in their Ranks to the last men.
By Afgan Artillery.

পশ্চিম পার্শ্বে;—

On the highest point
Of the hill above this Tomb
Stood the Fort of Kalunga;
After two assaults
On the 31st October and 27th November,
It was captured by the British troops
On the 30th November 1814.
And Completely razed to the Ground.

সমস্ত পাঠ করিয়া আমি অবাক্। এই শান্তিপূর্ণ বিজন প্রদেশে, এই স্নিগ্ধ সন্ধ্যাকালে, আমার মানস নয়নে একটি শোচনীয় ঐতিহাসিক দৃশ্য উদ্ঘুক্ত হইল; শত শত বীরের হৃদয়শোণিতে কর্দ্দমিত কোলাহলপূর্ণ সংগ্রামক্ষেত্রে আমি দণ্ডায়মান! বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে এই স্থানে অস্ত্রে অস্ত্রে ঝঞ্ঝনা বাজিয়া উঠিয়াছিল, বজ্রানল বক্ষে ধারণ করিয়া মৃত্যুস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল!—আজ সমস্ত নীরব, শুধু এই দুইটি স্তম্ভ এবং কয়েকটি অক্ষর নীরব ভাষায় আগন্তুক পথিকের নিকট সেই ধ্বংসকাহিনী ঘোষণা করিতেছে। ভয়ে ও বিস্ময়ে সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম।

বিদ্যালয়ে যে ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়াছি, তাহাতে এই ঘটনাসম্বন্ধে এক-বর্ণ পড়িয়াছি বলিয়া মনে হইল না; Talboys Wheeler সাহেব তাঁহার ইতিহাসে অনেক কথা লিখিয়াছেন,—এ যুদ্ধ ব্যাপার সম্বন্ধে তিনিও বিশেষ কিছু উল্লেখ করেন নাই; শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের বিদ্যালয়পাঠ্য ভারত-ইতিহাসে কলুঙ্গার নামমাত্র উল্লেখ আছে। কিন্তু এই কলুঙ্গার যুদ্ধক্ষেত্র পরাক্রান্ত গুর্খা সৈন্যের অসাধারণ সাহস, অবিচলিত বীরত্ব এবং গভীর কর্ত্তব্যের বিকাশস্থল; হলদীঘাট ও থর্ম্মাপলীর ন্যায় বীরত্বের ইহাও এক মহাতীর্থ, কিন্তু ইতিহাস এখানে মূক!

শ্রীজলধর সেন।

প্রতিশোধ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অপরাহ্ণ হইয়া আসিয়াছে। অস্তগামী সূর্য্যের হিরণ্ময় কিরণরাশি খড়িয়া নদী-স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল। পশ্চিমের আকাশে মেঘের উপর মেঘস্তর রবি-করসম্পাতে অপূর্ব্ব বর্ণরাজি উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল। এমন সময়ে জগতির ঘাটে এক শুষ্কমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ মহাব্যস্তভাবে আসিয়া পৌঁছিলেন। ব্রাহ্মণের চরণযুগলে কর্দ্দমের বিশেষ অভাব না থাকিলেও, অনেকগুলি কাঁটার ছড় সোজা পথে তাঁহার দ্রুত আগমন সূচিত করিতেছিল। ঠাকুরের বস্ত্র এবং উত্তরীয় অনেকদিন রজকগৃহ দর্শন করে নাই বটে, কিন্তু তাঁহার দেহলগ্ন উপবীত গাছটিকে সে অপবাদ দেওয়া যায় না; অতএব পুঁটুলি মাত্র সম্বল ব্রাহ্মণ ঠাকুর ঘাটে উপস্থিত হইয়া পাটুনিকে দেখিতে না পাওয়ায় যে শাপসম্পাতের কিছুই বাকী রাখিলেন না, তাহা বলা বাহুল্য। পাটুনীর বাস্তবিক দোষও যথেষ্ট ছিল। সে ডোঙ্গা খানি পর্য্যন্ত অপর পারে বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

ব্রাহ্মণ ঠাকুর মহাবিপদে পড়িলেন। তিনি কন্যাদায়ে বিব্রত হইয়া অনেক কষ্টে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং এই নদীটি পার হইতে পারিলেই ভালোয় ভালোয় সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ী পৌঁছিতে পারেন। নহিলে দস্যুসঙ্কুল দেশে সন্ধ্যার পর কোনও যাত্রীর পরিত্রাণ নাই। ঠাকুর দিনদেবকে পাটে বসিতে দেখিয়া নিজেও সেই নদীতীরে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখের ঘন ঘন দুর্গা-নাম, এবং নাসারন্ধ্রের দীর্ঘশ্বাসগুলি সান্ধ্য সমীরে মিলাইয়া যাইতেছিল।

এমন সময়ে একখানা সওয়ারি নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিল। ব্রাহ্মণ আশ্বস্ত হইয়া ভাবিলেন, মা দুর্গা এ যাত্রা রক্ষা করিলেন। নৌকার ভিতর একটি বাবু গুড়গুড়িতে ধূমপান করিতেছিলেন। ঠাকুর দুই হাতে পৈতা জড়াইয়া তীর হইতে উদ্দেশে প্রার্থনা করিলেন, তাঁহাকে নদী পার করিয়া দেওয়া হোক্!

ব্রাহ্মণের তখনকার আকার প্রকার কতকটা হাস্যরসাত্মক হইয়া উঠিয়াছিল। মাঝিমাল্লাদের কেহ কেহ হাসিয়া বলিল, "বিটলে বামুনের রকম দেখ। খেয়ার নৌকো পেলে আর কি!"

বাবুটি ঠাকুরকে ভিতরে ডাকাইয়া আনিলেন। প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা

করিলেন, "অত তাড়াতাড়ি ওপারে যেতে ব্যস্ত কেন ঠাকুর? বসুন, তামাক ইচ্ছা করুন।"

মাল্লারের এক জন ব্রাহ্মণের হুঁকায় জল পুরিয়া ঠাকুরের হাতে দিল। এতক্ষণ ঠাকুরের মুহূর্ত্তমাত্র শত বৎসর বোধ হইতেছিল, কিন্তু তাম্রকূটের সুরভি ধূম তাঁহাকে বলিয়া দিল, বাবুটো আমীর গোছের বটে। চাইলে কোন্ দু চার টাকা না দেবে! কাজেই কোমরের পুঁটুলিটি একটু সামলাইয়া লইয়া তিনি তামাকু সেবনে মন দিলেন।

ততক্ষণ নৌকারোহী, সেই শুষ্কমূর্ত্তি ব্রাহ্মণের আপাদমস্তক দেখিয়া লইতে-ছিলেন। তামাক খাওয়ার সময় ঠাকুরের কথা কহার অবসর ছিল না। অত-এব ধূমপান শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত নৌকারোহীও কিছু বলিলেন না।

হুঁকা ছাড়িয়া ঠাকুর বলিলেন, "বাবু মশায়কে খুব আমীর বলে বিবেচনা হয়। আমরা আপনাদিকে সতত আশীর্ব্বাদ করে থাকি। কন্যাদায়ে পড়ে কথঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করা হয়েচে, এখনও বিস্তর বাকী। কিন্তু বিশে ডাকাতের ভয়ে যা কিছু পেয়েছি, তাই নিয়ে আমায় বাড়ী ফিরতে হয়েচে। আজ সন্ধ্যার আগে পৌঁছিতে না পারলে, ব্যাটার কোন লোকের হাতে প্রাণ যাবে! এই যে পাটনীটে দিন থাকতে ওপারে নৌকো বেঁধে পালিয়েচে, সে হয় ত বিশে ডাকাতেরই লোক। কি তার মতলব আছে, কে জানে!"

বাবুটির আরক্ত চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। হাসিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, বিশে ডাকাত তোমার মত কন্যাভারগ্রস্তের টাকা নিয়েছে, কখন এমন শুনেচো কি?"

ঠাকুর। আর বাবা, সে ব্যাটার আবার সে সব বোধ আছে। জাত বাগ্দী, বামুনের মর্য্যাদা সে বুঝবে কি? সেদিন শুনলাম, ত্রিবেণীর তর্কপঞ্চাননের উপর ভারি জুলুম করেচে। ভদ্রলোক সেজে গিয়ে জিজ্ঞেস্ করলে, "দেবতা, কৃপণের ধনে কার্ অধিকার?" তর্কপঞ্চানন কি অত ছাই জানেন, তিনি শাস্তর আউড়ে দিলেন। আর যাবে কোথা! ব্যাটা বলে কি, "তস্করেরও যদি অধিকার, তবে মশায়ের মত কৃপণের ধনে আমার অধিকার আছে। তর্ক-পঞ্চানন কি করেন, সুড় সুড় করে পাঁচটি হাজার টাকা গুণে দিলেন।

নৌকারোহী উচ্চ হাস্য করিলেন, বলিলেন, "দেবতা, তর্কপঞ্চানন কোম্পা-নির বেতন খান, তিনি আর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কিসে? অত বড় পণ্ডিত, কিন্তু কখন একটি কাঙ্গালী ভোজন করান না। আর বিশে ডাকাত মূর্খ বাগ্দীর ছেলে হলেও কত অপৈতকের পৈতা দিয়ে আর, কত কন্যাদায়গ্রস্তের মেয়ের

বিয়ে দিয়ে দিয়েচে, কত অনাথা বিধবার ভরণপোষণ করে, তা তুমি জান না ঠাকুর!"

ঠাকুর। কথায় বলে, গোরু মেরে বামুনকে দান। অমন দানের মুখেও ছাই, আর যে বামুনের ছেলে অমন ডাকাতির টাকা গ্রহণ করে, তার মুখেও ছাই! বল্‌বো কি মশাইগো, এমনি দিন কাল পড়েচে যে, টাকার জোরে ডাকাত বিশে বাগ্দীও বিশ্বনাথ বাবু হয়ে দাঁড়াল। কোম্পানি বাহাদুর হুকুম দিয়েচেন, যে তাকে ধরিয়ে দিতে পারবে, সে দশহাজার টাকা পুরস্কার পাবে। কিন্তু ব্যাটার কেমন জোর কপাল, আর কিচলিমি বুদ্ধি, কেউ তাকে ধরিয়ে দিতে চায় না।

শ্রোতা বলিলেন, "ঠাকুর, বিশে ডাকাতকে অত গাল দিলে, সে শুন্‌লে তোমার কি ভাল হবে?"

ঠাকুর চকিত দৃষ্টিতে নৌকার ভিতর বাহির একবার দেখিয়া লইলেন। মাঝিমাল্লারা বাহিরে বসিয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছিল। ঠাকুরের এতক্ষণে সন্দেহ হইল, এই লোকগুলো যদি বিশে ডাকাতের সংস্পৃষ্ট হয়! তাঁহার শুকমুখ আরও শুকাইয়া উঠিল। কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, "বাবু, লোকে অসাক্ষাতে রাজার মাকে ডান বলে। আমি সামান্য ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, আমার নিন্দায় কি এসে যায়? আমি আপনাকে কথার কথা একটা বল্‌ছিলাম, আর কি। বুঝলেন কি না?"

নৌকারোহী হাসিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, যাকে গাল দিলে, সে তোমার সামনে বসে! আমিই বিশে ডাকাত! কি আছে তোমার পুঁটুলিতে?"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সে মুহূর্ত্তে সম্মুখে বজ্রপাত হইলেও ব্রাহ্মণ ঠাকুর অধিকতর বিস্মিত হইতেন না। বিশ্বনাথের মূর্ত্তিতে ভীতিব্যঞ্জক কিছুই ছিল না। তাহার নাতিদীর্ঘ কৃষ্ণদেহে লাবণ্য উছলিয়া পড়িতেছিল। আকর্ণায়ত চক্ষু যুগলে অনন্যসাধারণ একটা জ্যোতি থাকিলেও তাহা কঠোরতামাত্রশূন্য। দেখিলে মনে হয় না, এই ব্যক্তি দীন ভক্তমাত্র। ব্রাহ্মণ প্রথম দর্শনে তাহাকে একজন সদ্বংশজাত এবং জমীদার গোষ্ঠের লোক ভাবিয়াছিলেন, দস্যুদলের নায়ক বিশ্বনাথ বাগ্দী বলিয়া সহসা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। একান্তে বলিলেন, "বাবু, তুমি বিশ্বনাথ হও, আর যেই হও, আমি তোমার হাতে পড়েছি। কোকর

কথা তোমার কাছে লুকাই নাই। দয়া করে আমায় যদি পার করে দাও, প্রাণ ভোরে আশীর্ব্বাদ করে যাই!"

বিশ্বনাথ হাসিয়া বলিল, "দেবতা, এখনও আপনকার বিশ্বাস হয় নি যে, সত্যসত্যই আমি বিশে ডাকাত। বুঝতেই পারবেন, কেড়েকুড়ে নেওয়া আমার ব্যবসা। আপনাকে পার করে দেব বটে, কিন্তু পুঁটুলিটি নৌকোয় রেখে যেতে হয়েছে ঠাকুর। এতদিন ডাকাতিই করেছি, পাটুনিগিরি কখন করি নি! পুঁটুলিটি খেয়ার কড়ি বলে দিয়ে যান।"

ব্রাহ্মণ নিরুপায়—লোকটা তবে বিশে ডাকাতই বটে। যথাসর্ব্বস্ব যায় যাক্, প্রাণটা বাঁচিলে আবার ভিক্ষা মিলিবে। ঠাকুর পুঁটুলিটি খুলিয়া বিশ্বনাথের সম্মুখে রাখিলেন। বলিলেন, "আচ্ছা বাবা, গরিব বামুনের যা কিছু আছে, নাও। না জেনে তোমায় অনেক কটু কথা বলেচি। কিছু মনে করো না। এখন আমায় পার করে দাও।"

বিশ্বনাথ। ঠাকুর, কতগুলি টাকা সংগ্রহ করেছ। কন্যাদায়ে উদ্ধার হতে কত টাকা তোমার চাই?

ঠাকুর। শ দুই টাকা পেয়েছিলাম বাবা, আরও শ দুইয়ের যোগাড় করতে পারলে তবে এ যাত্রা উদ্ধার হতাম। কিন্তু সে কথায় আর কাজ কি? তুমি হুকুম করে দাও বাবা, আমি পার হয়ে যাই।

বিশ্ব। ঠাকুর, অত ব্যস্ত হবেন না। আজ রাত্রে দয়া করে এই নৌকায় বাস করুন। প্রাতে বাড়ী যাবেন। অধম বাগ্দীর দান নিতে যদি ঘৃণা না করেন, পাঁচশ টাকা কাল প্রণামী দেব।

ব্রাহ্মণ চমৎকৃত হইলেন। বলিলেন, "তুমি বিশ্বনাথ বাবুই বটে। শাপভ্রষ্ট হয়ে বাগ্দীকুলে জন্মেছ। দস্যুব্যবসায়ী হলেও তোমার মত মহৎ এ কালে দেখা যায় না। বাবা, কত লোকের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে আজ তিন মাস ধরে দু শ টাকা সংগ্রহ করেছি, আর একেবারে তুমি পাঁচ শ টাকা আপনা থেকে দিতে রাজি হলে! কিন্তু অত টাকার আমার দরকার নেই বাবা। যদি দয়া করলে, তবে গরিব ব্রাহ্মণের পুঁটুলিটি ফিরিয়ে দাও, আর তোমার লোক দাও আমায় বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসুক।"

বিশ্বনাথ হাসিয়া উঠিল। "বুঝেছি ঠাকুর, ডাকাতকে যে এতটা বাড়ালে, সে কেবল পাপের টাকাটা না নেবার জন্যে। আচ্ছা, আমার ডাকাতির টাকা নিতেই দোষ, ভিক্ষা করে যদি আপনাকে প্রণামী দিই, তাতে ত দোষ

নেই। আমি একখানি চিঠি দিচ্ছি। আপনি নিজে না যান, কাউকে দিয়ে চিঠিখানি পাঠিয়ে দিলেই রাজবাড়ী থেকে পাঁচ শ টাকা আস্‌বে।"

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। মাল্লা-বেশধারী কেহ একজন প্রদীপ জ্বালিয়া দিল। বিশ্বনাথ বাক্স খুলিয়া মসীপাত্র এবং লেখনী সংগ্রহ করিয়া চিঠি লিখিতে বসিল। এমন সময়ে অপর পার হইতে কেহ শিস দিল। মাঝি হাঁকিল, "বৈদ্যনাথের লোক।"

"আচ্ছা, নৌকো পারে নাও," বলিয়া বিশ্বনাথ চিঠি লিখিতে লাগিল। ব্রাহ্মণকে বলিল, "ঠাকুর, ছেলেবেলায় পাঠশালায় দিনকতক লিখেছিলাম, তাই চিঠিখানা, পত্তরখানা লিখ্‌তে পারি। কিন্তু ভাল পারিনে। তা মা কালীর প্রসাদে এতেই কাজ চলে যাচ্চে।"

নৌকা ভিড়িতে না ভিড়িতে চিঠি লেখা সম্পূর্ণ হইল। বিশ্বনাথ ব্রাহ্মণের হাতে পত্র দিয়া তাহার পদধূলি লইল, এবং বিনীতভাবে বলিল, "ঠাকুর, অপরাধ নেবেন না। নিজের অনেক বড়াই করেছি, কিছু মনে কর্‌বেন না। এ অধম বাগ্দীকে যখন ইচ্ছা মনে কর্‌বেন, প্রসাদ খেয়ে আস্‌ব। গরিব দুঃখীকে বলে দেবেন, দরকার হলে আমার কাছে যেন আসে। আমি সবারই মিত্র—কেবল জুলুমবাজের শত্রু। কোম্পানি বাহাদুর শুন্‌চি আমার মাথাটা নেবার জন্যে হুলিয়া করেচে, কিন্তু মা কালী জানেন, বিশে বাগ্দী হতে কোম্পানির কোন ক্ষতি আজ পর্য্যন্ত হয় নি। কিন্তু সাহেব গুলো কি না বেনের জাত, বড়মানুষের টাকাগুলো গরিবের ঘরে যায়, এটা ওরা সইতে পারচে না। ঠাকুর আশীর্ব্বাদ করে যেও, বিশে যেন ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের সেবা কর্‌তে কর্‌তে মর্‌তে পারে।"

ব্রাহ্মণ বিস্ময়ে কতকটা নির্ব্বাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলেন, "বাবা, লোকে বলে বিশ্বনাথ বাবু, আমি বলি, রাজা বিশ্বনাথ। মা কালী তোমার প্রতি প্রসন্ন, তোমার আবার ভয় কি?"

ঠাকুর বিদায় হইয়া গেলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

সহযোগী সাহিত্য।

প্রত্নতত্ত্ব।

ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী।

ডাক্তার অপার্ট ভারতবর্ষের আদিম নিবাসীদিগের সম্বন্ধে যে পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাহাতে এত নূতন ও প্রণিধানযোগ্য বিষয় আছে যে, তাহা পাঠ করিয়াই মনে হয়, ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে সার উইলিয়ম জোন্স প্রভৃতি মহোদয়দিগের "এসিয়াটিক সোসাইটী" সংস্থাপনের সুফল সত্য সত্যই ফলিতেছে। ভারতের অধিবাসীদিগের সহিত প্রাচীন আর্য্যজাতির একটা সম্বন্ধের প্রশ্ন এখন উঠিতেছে—এত দিন পরে এই আর্য্যশাখার সহিত আর্য্যজাতির সম্বন্ধ-নির্ণয়ের কথাটা আবার বিস্মৃত অতীতের অন্ধকারগর্ভ হইতে নব বেশভূষায় সুসজ্জিত একটা নূতন প্রশ্নের মত করিয়া সভ্যজগতের সম্মুখে উপনীত করা হইল কেন? কেন—ইহার মীমাংসা সহজ নহে—তবে অধ্যাপক সাইসের মত প্রকাশের পর হইতে সভ্যতাভিমানী জাতিদিগের মনে এই প্রশ্ন উঠিয়াছে। অধ্যাপকের মত আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহাতে নিতান্ত এক দিক টানা হইয়াছে। তবে অধ্যাপকের পাণ্ডিত্যাভিমান আছে, এবং বিজিত ইতিহাস-হীন জাতির উপর জেতার অধিকারও তাঁহার সহায়—কাজেই সব শোভা পায়।

সংপ্রতি "কলিকাতা রিভিউ" পত্রে উক্ত পুস্তকের এক সুদীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। জানি না, কেন এই সমালোচনায় অভিনয় যবনিকার অন্ধকার অন্তরালে সম্পাদিত হইয়াছে;—লেখকের পূর্ণ নাম নাই; তাহা ভিন্ন, বর্ণ নামক যে প্রথাটার সম্বন্ধে ইংরাজ ও ভারতবর্ষীয়ের মধ্যে বিরোধ প্রবল, তাহার উপর লেখকের ঝোঁক দেখিয়া সহজেই মনে হয় যে, লেখকের জাতিনির্ণয় দুরূহ সাধন নহে। যাহা হউক, প্রবন্ধটিতে শিক্ষার বিষয় যথেষ্ট আছে—আমরা গ্রন্থকার ও সমালোচকের মতামত, পাঠকের বিচারের জন্য এখানে সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

সুবিধা ও অসুবিধা।

যাঁহারা এই হতভাগ্য উষ্ণপ্রধান দেশের প্রাচীন ইতিহাস ও এই হতভাগ্য জাতির বিবরণ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে দুই শ্রেণী উল্লেখযোগ্য। জোন্স প্রভৃতি "এসিয়াটিক সোসাইটী"র সংস্থাপক-সমূহ ও জর্ম্মাণ পণ্ডিতগণ। প্রথমোক্তদিগের কার্য্যে বিঘ্ন দুইটি—তাঁহাদিগের বিশ্বাস ছিল যে, প্রায় চারি সহস্র বৎসর হইতে মানবসৃষ্টির আরম্ভ—এই বিশ্বাস যে ভ্রান্তিমূলক, তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে; কিন্তু এই বিশ্বাসবলে টড প্রভৃতি নিঃসঙ্কোচ সাহসের সহিত ভারতের ইতিহাসের তারিখ সংশোধন করিয়াছেন। আর এক অসুবিধা, তখন মানবের জাতিগত দৈহিক পার্থক্য সম্বন্ধে লোকের বিশ্বাস এত সম্পূর্ণ ছিল না। জর্ম্মাণ পণ্ডিতদিগের অসুবিধা, ভারতবর্ষীয়দিগের সহিত পরিচয়াভাব। বর্ত্তমান লেখকের এই সকল অসুবিধা নাই—অধিকন্তু, তিনি ইংরাজ ও জর্ম্মাণ পণ্ডিতদিগের গ্রন্থ হইতে সাহায্য পাইয়াছেন।

জাতিগত দৈহিক পার্থক্য প্রধানতঃ দুই লক্ষণে ধরা যায়—বর্ণ ও মস্তকের গঠন। ইহাদিগের উপর কালের প্রভাব নিতান্ত অপ্রতিহত ও অসীম নহে—বহু শতাব্দী পূর্ব্বের নরমস্তক পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যে স্থানে ঐ মস্তক পাওয়া গিয়াছে, সেই স্থানের

বর্ত্তমান অধিবাসীদিগের মস্তকের গঠনও সেইরূপ। বর্ণ সম্বন্ধে কথাটা একটু বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিতে হয়। দেখা যায় যে, উষ্ণপ্রধান দেশে লোক কৃষ্ণ ও

জাতিগত দৈহিক পার্থক্য।

শীতপ্রধান দেশে লোক শ্বেতকায় হয়; কিন্তু যদি কিছু তারতম্য-বিশিষ্ট বর্ণযুক্ত তিন জন শ্বেতকায়কে বহু দিন কোনও উষ্ণপ্রধান দেশে রাখা যায়, তবে তাহারা অবশ্যই কৃষ্ণাঙ্গ হইয়া আসিবে; কিন্তু সেই কৃষ্ণত্বের মধ্যেও সেই তারতম্যটুকু বজায় থাকে। আরও একটু বিশেষত্ব এই যে, সন্তানগণের বর্ণ সেই আদিম জাতীয় বর্ণের দিকে অগ্রসর হয়। মিশরের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে চিত্রিত অনেক চিত্রে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়গণের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ চিত্রিত আছে—আজও সেই বর্ণবৈচিত্র্যের বিচার করিয়া সেই সকল জাতীয়দিগকে পৃথক করা যায়। প্রাচীন গ্রন্থে যে জাতির যে বর্ণ বর্ণিত আছে, আজও তাহাই।

সার উইলিয়ম জোন্সের মত অবলম্বন করিয়া, পণ্ডিত বর্গ সংস্কৃত, ল্যাটিন, গ্রীক প্রভৃতি ভাষার মধ্যে সাদৃশ্য দেখান। তখন স্থির হয় যে, আর্য্যগণ কতক পশ্চিমে ও কতক পূর্ব্বে গমন করেন। সুতরাং সেই মতানুসারে বিজিত বলহীন বঙ্গবাসী ও

ভাষা।

তাহার শাসনকর্ত্তা শ্বেতকায় ইংরাজ ও তাহার ভীতির কারণ পিশাচ-প্রবৃত্তিপরায়ণ ইংরাজ সৈনিক একই বংশসম্ভূত। রাজনৈতিক হিসাবে ইহা অত্যন্ত মূল্যবান, ইহাতে যে কেবল বিজিতই একটা অতৃপ্ত আশার স্তূপের উপর দাঁড়াইয়া আপনাকে জেতার সহিত একজাতীয় বলিয়া মনে করিয়া হৃদয়ের নিভৃত অন্তঃপুরে একটা তৃপ্তি ও গর্ব্ব অনুভব করিত, এমন নহে; জেতাও আপনাকে বিজিতের স্বজাতীয় জানিয়া, আপনার গর্ব্বিত উচ্চাসন হইতে তাহার প্রতি একটু করুণাময় কোপহীন কৃপাকটাক্ষপাত করিতে পারিত, এবং যে সহানুভূতি ইংরাজ যত্নের সহিত আপনার হৃদয় হইতে দূর করে, তাহা থাকিলে, বিজিতের শাসনকার্য্য সহজে সুসম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল। সমালোচক বলেন যে, জাতিগত দৈহিক পার্থক্য চাইনিস ও কাফ্রির মধ্যে যত প্রবল, ইংরাজ ও দেশীয়ের মধ্যেও তত প্রবল, তবেই আশমান জমীন তফাৎ।

ডাক্তার অপার্ট বলিয়াছেন, গড দ্রাবিড়ীয়দিগের মধ্যে দৈহিক প্রভেদ সাধারণতঃ খুব অধিক বোধ হয়; কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস, স্থান, ব্যবসায় এবং পারিবারিক ও রাজনৈতিক-জীবনের পার্থক্য, কালে এই প্রভেদ আনিয়াছে। একই মহাজাতি

জাতি।

য়ুরোপ ও এসিয়ায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীরাও সেই জাতি হইতে সমুদ্ভূত, এবং তাহাদিগকে ফিনিস্-উগরিয়ন বা তুরাণীয়ও বলিয়া থাকে। এই ফিনিস্-উগরিয়ন ও তুরাণীয়ের অর্থ গ্রন্থকার কি করিয়াছেন, তাহা সম্যক্ অবগত হওয়া কিছু কষ্টকর। তুরাণীয় কথাটার খুব নির্দ্দিষ্ট অর্থ আছে কি না সন্দেহ, এবং ফিনিস্‌দিগের সম্বন্ধে আবার সেই জাতিগত দৈহিক পার্থক্যের প্রশ্ন আসিয়া ব্যাপারটা কিছু জটিল করিয়া তোলে; কোনও জাতির সহিত কোনও জাতির সাদৃশ্য দেখান বড় সহজ নহে, তবে এমন অনেক স্থানে হয়, সাদৃশ্য সহজেই দৃষ্টিপথে পতিত হয়। গ্রন্থকার একস্থানে (২৮৪ পৃষ্ঠা) বলিতেছেন যে, ভারতের প্রাচীন অধিবাসীদিগের অধিকাংশই পুরাতন একেডিয়ান ও সালডিয়ানগণ যে জাতির অন্তর্গত, সেই জাতীয়। কথাটার ঠিক মীমাংসা হয় না। তবে যখন তিনি হাঙ্গেরিয়ান, ফিনস্ প্রভৃতির সহিত ভারতবর্ষীয়দিগের একত্ব নিরূপিত করিতেছেন, তখন তিনি—সমালোচকের মতে—জাতিগত দৈহিক পার্থক্যের মস্তকে পদাঘাত করিতেছেন।

গ্রন্থকার বলেন যে, তাঁহাদিগের মহাবক্তা ও মনুর কথিত মহাবক্তার সাদৃশ্য দেখিয়া মনে

হয় যে, ঐ বিবরণ, হয়, মনু মৃত্তাবশিষ্টদিগের বংশধরগণের নিকট অবগত হইয়াছিলেন,—নয়, অন্য প্রকারে অবগত হইয়াছিলেন; কারণ, ঐ সময় আর্য্যগণ ভারতে প্রবেশ করে নাই, মনুও আসেন নাই। এই কথায় তিনটি কথা আসিয়া পড়ে। প্রথম—অধিকাংশ পণ্ডিতের মত এই যে, মনুর বন্যা ও বাইবেলের বন্যা এক নহে; দ্বিতীয়—সানডিয়ার বন্যা ও বাইবেল-কথিত বন্যার মধ্যেও প্রায় ৪০ সহস্র বৎসরের ব্যবধান বোধ হয়; তৃতীয়—আর্য্যগণ তখনও ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন নাই।—এই কথাটি আরও ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে হয়—কারণ কবে যে আর্য্যগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহার ঐতিহাসিক কোনও মীমাংসাই এখন পাওয়া যায় না। মনুষ্যজাতির প্রাচীনত্বের সীমা নির্দ্ধারণ করা প্রায় দুরূহ ব্যাপার। কাজেই এ মীমাংসাও বড় সহজ নহে—বড় সহজ নহে কেন—অসম্ভবই বলিতে হইবে। ইহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে, গ্রন্থকারের হৃদয় হইতে বহু যুগের প্রচলিত ভ্রমাত্মক বিশ্বাস মুছিয়া যায় নাই, এবং তিনি ঠিক ইতিহাসও অবলম্বন করেন নাই। এই স্থানে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, ইতিহাসাতীত কালের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক স্থানে অনুমানের উপর নির্ভর না করিলে চলে না।

মহাবন্যা।

গ্রন্থকার আর্য্যগণের আগমনের পূর্ব্বেও ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগকে ভরত নামে অভিহিত করিয়াছেন, এবং বলেন যে, তাহাদিগের নাম হইতেই দেশের নাম ভরতবর্ষ ও ক্রমে ভারতবর্ষ দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার মতে, এই ভরতগণ পর্ব্বতবাসী জাতি ছিল এবং ভর ধাতু হইতে তিনি তাহাদিগের উৎপত্তি নির্দ্ধারিত করেন। তিনি বলেন, পূর্ব্বে এই ভরতগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, এবং দুই নামে অভিহিত হইত—কুরুপাঞ্চাল এবং কৌরব ও পাণ্ডব। এবং মনে হয় যে, এই দুই বিভাগ কখনই পরস্পরের সহিত সৌহৃদ্য সংস্থাপন করে নাই। ইহাদের মধ্যে বিরোধভাব প্রবল ছিল। সংস্কৃতজ্ঞ পাঠক অবগত আছেন, ভারতবর্ষ নামের উৎপত্তির অন্য বিবরণ এদেশে প্রচলিত ছিল এবং বোধ হয় আজও পর্য্যন্ত আছে।

ভারতবর্ষ।

খুঁটিনাটি করিয়া ধরিতে গেলে ভারতবর্ষের অনেক জাতির মধ্যে দৈহিক একতা নির্দ্দেশ করা একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

গ্রন্থকার প্রমাণ করিয়াছেন যে, দ্রাবিড়ীয় পার্ব্বত্যজাতি ভাল করিয়া দেখিলে ভারতবর্ষের অনেক জাতির মধ্যে সাদৃশ্য দেখা কঠিন নহে। তিনি বলেন, বর্ত্তমান চণ্ডালগণ পূর্ব্বের চণ্ডাল হইতে ভিন্ন নহে, আর্য্যগণ কর্ত্তৃক ইহারা পরাভূত হয় এবং গণ্ডগণও ইহাদিগের একজাতীয়। পরিশেষে তিনি স্বীকার করিয়াছেন,—তাঁহার অনুমানে যথেষ্ট ভ্রমের সম্ভাবনা আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে তাঁহার পুস্তকপাঠের পর যদি কেহ নবসভ্যতালোকপ্রাপ্তদিগের নিকট হইতে প্রাপ্য সম্মান প্রাচীন জাতিদিগকে দিতে সম্মত হয়েন, তাহা হইলেই তিনি শ্রম সার্থক বিবেচনা করিবেন। তাহা হইলেই যথেষ্ট। ভিন্ন ভিন্ন জাতিদিগের সম্বন্ধে গ্রন্থকার এত পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন যে, এ কথা বোধ হয় সাহসের সহিত সাধারণ সমক্ষে ব্যক্ত করা যায় যে, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, এতদুভয় কালের প্রত্নতত্ত্ববিদগণের নিকট এই গ্রন্থ মূল্যবান বলিয়া অনুমিত হইবে, এবং ইহা এইরূপ জাতীয় অধ্যয়নের নবপ্রভাত সূচিত করিয়াছে।

জাতীয় একতা।

এখন জড়জগৎ ছাড়িয়া ভারতবর্ষীয়দিগের গর্ব্বের বস্তু চিন্ময় জগতে প্রবেশ করি। গ্রন্থকার প্রথমেই আর্য্য ও অনার্য্যদিগের ধর্ম্মবিশ্বাসের আলোচনা করিয়াছেন। পরে তিনি বলিতেছেন যে, বৈদিক প্রাকৃতিক শক্তির উপাসনা হইতে আর্য্যগণ অজ্ঞেয় অনন্ত অশরীরী পরমেশ্বরের উপাসনায় উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু অশরীরী কল্পনা সাধারণের ক্ষমতাতীত [illegible]

ক্রমে পালন ও ধ্বংসের ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তা নির্দ্দেশ করিয়া, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই ত্রিমূর্ত্তিতে উপনীত হইতে হয়। ক্রমে অন্য এক মহাশক্তির স্থায়িত্বে লোকে বিশ্বাসবান হইয়া পড়ে এবং ব্যাবিলোনিয়া প্রভৃতি দেশে প্রচলিত স্ত্রীশক্তির আবির্ভাব ভারতখণ্ডে ব্যাপ্ত হয়। ভারতবর্ষে শালগ্রামই ইহার বিশেষ চিহ্ন, কিন্তু ক্রমে বিষ্ণুর কল্পনায় পরিণত হইয়াছে। ইহাই গ্রন্থকারের মত। গ্রন্থকারের মত যে, এই স্ত্রীশক্তির উপাসনা প্রথম তুরাণীয়দিগের মধ্যেই উদ্ভূত। কিন্তু বাস্তবিক দেখিতে পাই যে, প্রাচীন রুসিয়ানগণ ও পলিনেশীয়ানগণ ভিন্ন ভিন্ন রূপে এই স্ত্রীশক্তির উপাসক।

ত্রিমূর্ত্তি।

গ্রন্থকার বলেন যে, অনার্য্যদিগের বিশ্বাস আর্য্যদিগের ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর যথার্থ প্রভাব সংস্থাপন করিয়াছিল, এবং অনার্য্যদিগের আরাধ্য প্রেত নৃপদেবতা হইতে ক্রমে ব্রহ্মা—শিবমূর্ত্তিতে ভূতনাথ—অন্য যে শক্তি বিষ্ণুতে লিপ্ত ছিল, তাহা উমায় আনীত। এই উমা শব্দ লইয়া কিছু তর্ক উপস্থিত হইতে পারে। কেন উপনিষদে উমার উল্লেখ দেখা যায়। ব্রহ্মা দেবগণের পক্ষে কোনও যুদ্ধে জয় লাভ করেন—দেবগণ আপনাদিগের এই জয়লাভে উল্লাস প্রকাশ করেন। ব্রহ্মা যক্ষরূপ ধারণ করেন। দেবগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত অগ্নি প্রভৃতি ইঁহার পরিচয় অবগত হইতে না পারিয়া প্রত্যাগত হয়েন, এবং সেই অজ্ঞেয় শক্তির নিকট পরাজয় স্বীকার করেন। ইন্দ্র অগ্রসর হইলে সেই অজ্ঞেয় শক্তি সহসা অদৃশ্য হইলেন। তখন সেই ঈশ্বর রাজ্যে ইন্দ্র এক জ্যোতির্ম্ময়ী সুন্দরী রমণীর সাক্ষাৎ পাইলেন; তিনিই বলিলেন যে, ঐ অজ্ঞেয় শক্তি ব্রহ্মা—সেই রমণী উমা হৈমবতী।

শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে উমাজ্ঞান—কেবল নারীমূর্ত্তিতে জ্ঞান (বিদ্যা উমারূপিণী) সায়ণাচার্য্যও বলিয়াছেন যে, উমাই জ্ঞান; সেই জ্ঞানের সাহায্যে আমরা অসীমকে অবগত হইতে পারি। স্লাভোনিক ভাষায় উমো ধাতুর ঠিক এই অর্থ। স্লাভোনিক ভাষা হইতে ঐ কথা সংস্কৃতে প্রচলিত হইয়া ঐ জ্ঞান অর্থে ব্যবহৃত হওয়া আশ্চর্য্য নহে। সংস্কৃত জীবন স্লাভোনিক ভাষায় ব্যবহৃত। সেখানেও জীবন অর্থে জীবনের দেবী বুঝায়। সমালোচক—কেন জানি না—বলেন যে, উমা ও বাচ একই কথা। প্রাচীন সাহিত্যামোদী অবগত আছেন, কুমারসম্ভব গ্রন্থে কালিদাস উমার উৎপত্তির অন্য এক বিবরণ দিয়াছেন। তাহা কবির কল্পনাসৃষ্ট বলিলেও, সমালোচকের মতের কোনও কারণ দেখি না। তবে অম্বিকা সম্বন্ধে সমালোচক বলেন যে, ইতিহাসকালাতীত কালে যখন আর্য্য ও দ্রাবিড়ীয়গণ একত্র হইয়াছিলেন, তখন একের বাচ ও অন্যের অমা একত্র হইয়া অম্বিকা সৃষ্ট হয়।

গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, প্রাচীন আর্য্যদিগের দেবতারাজত্বে পুরুষের প্রাধান্য প্রতিপাদিত করা দুরূহ নহে। দেবীগণ দেবগণের স্ত্রীসর্ত্তেই কিছু ক্ষমতাবান; ক্ষমতায় তাঁহারা দেবগণের অপেক্ষা হীন। দুই মহাদেশে দৃষ্টিপাত করি—মিনার্ভা ও জুনোও প্রধান দেবগণের বাসনার অধীন; বেদে দেখা যায়, ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতির পত্নীগণ কখন ক্ষমতায় প্রাধান্য লাভ করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। অনার্য্যদিগের মধ্যে স্ত্রীশক্তির উপাসনা প্রচলিত ছিল, এবং ক্রমে ক্রমে আর্য্যগণ তাহা গ্রহণ করেন এবং হিমাচল হইতে কুমারীকা পর্য্যন্ত অনেক স্থানের দেবালয়েই এখন কালী, শক্তি প্রভৃতিরূপে দেবীপূজা সম্পাদিত হইয়া থাকে—দুর্গোৎসবের অষ্টমীর দিন শক্তির পূজা বিশেষ ভাবেই হইয়া থাকে।

স্ত্রীশক্তি।

আর্য্যগণ অনার্য্যদিগকে জয় করিয়া তাহাদিগের দেশে আবাস স্থাপন করেন, এবং সেই বিজিত জাতির প্রতি নিতান্ত সমাবস্থের মত ব্যবহার করিতেন বলিয়াও মনে হয় না। তবে ধর্ম্মমতের এই আদান প্রদান হইতে অবশ্য অনেক সময় আবশ্যক হইয়াছিল। কালের কুটিল

পবন বেতার হৃদয় হইতে বিজয়গর্ব্ব ও বিজিতের হৃদয় হইতে অপমান শীতল করিয়া আনিয়াছিল এবং সে সময় জাতিগত ও বিদ্যাগত গর্ব্ব এত অধিক স্থায়ীও ছিল না ; সুতরাং গর্ব্বের পুণ্যপ্রয়াগ মহাতীর্থে এইরূপই মত স্রোতস্বতীর সুখসম্মিলন সহজেই সম্পন্ন হইয়াছিল।

বর্ত্তমান গ্রন্থের মত একখানি গ্রন্থের সম্যক সমালোচনা এত সংক্ষেপে করা সম্ভব নহে। আমরা কেবল গ্রন্থকারের (এবং সমালোচকের) কতকগুলি মতামত ও স্থানে স্থানে আমাদিগের ধারণা এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম। সমালোচকবিশেষ বা পাঠকবিশেষের নিকট এই গ্রন্থ আদরণীয় না হইলেও ইহাতে শিক্ষণীয় বিষয় যে যথেষ্ট আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভ্রমণবৃত্তান্ত।

দার্দিস্থান।

ডাক্তার লিটনার দার্দিস্থান সম্বন্ধে যে পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে দার্দদিগের সম্বন্ধে অনেকটা অবগত হওয়া যায়। তাহাদিগের সরল আচার ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক অশ্রুতপূর্ব্ব অদ্ভুত রহস্য এই পুস্তকে সংগৃহীত আছে।

কাশ্মীরের উত্তরে পোলো খেলার প্রতাপ অপ্রতিহত অসীম। নাড়কীরা ও বালটীরা এই ক্রীড়া বড় ভাল বাসে—গিলগিটীরাও ইহাতে অপটু নহে। গ্রামের পার্শ্বেই প্রায় গ্রামের সমূল বিস্তৃত ক্রীড়াভূমি—কোনও বিশেষ আনন্দ বা ছুটীর সময় সকলে একত্র হইয়া সেইখানে ক্রীড়ামত্ত হয়—সে ক্রীড়ার মধ্যে একটা বিশেষ সজীবতা ও উত্তেজনা দৃষ্ট হয়। ডাক্তার বলেন যে, যে দিবস তিনি অ্যাসটরে গিয়াছিলেন, সেই দিবসেই একজন অশ্বপৃষ্ঠচ্যুত পোলো-খেলোয়াড়ের চৈতন্য সম্পাদন করিতে তাঁহাকে যথেষ্ট কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। সাধারণতঃ ধনুর্ব্বাণশিক্ষায় ইহারা মনোযোগ দিয়া থাকে, এবং শরসন্ধানশিক্ষায় সবিশেষ মনোযোগ দেয়। শীতকালে শীকার করা খুব সাধারণ। তবে অ্যাসটরে প্রধান তিনটি পর্ব্বতে কোনও শীকার নিহত হইলে নবাব তাহা পাইয়া থাকেন, শীকারী কেবল শীকারের মস্তক, পদ প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট অংশ পাইয়া থাকে। গিলগীটে যে যাহা শীকার করে, সে তাহা লয়,—তাহাদের কিন্তু নবাবকে তাহার কিছু না কিছু দিতে হয়। কোথায় শীকার আছে তাহার সন্ধান লইবার জন্য পূর্ব্বেই লোক নিযুক্ত হয়, তাহারা সন্ধান পাইলে নিকটবর্ত্তী গ্রামে সংবাদ পাঠাইয়া দেয়—সংবাদ পাইলে গ্রামস্থ ব্যক্তিরা বাদ্যকর প্রভৃতি লইয়া শীকারে গমন করে। বাদ্যকর ও শীকারীরা—যেখানে শীকার থাকে—তাহার চারিদিকে ঘেরিয়া দাঁড়ায়—প্রভাত হইলে বাদ্য আরম্ভ হয়—বিকট বাদ্যে বিরক্ত, বিড়ম্বিত ও ভীত হতভাগ্য পশু বাহির হইয়া আইসে, এবং শীকারীর অব্যর্থ সন্ধানে সেইখানে আপনার পশুজন্ম সার্থক করে।

খেলা ও শীকার।

বন্দুককে গিলগিটীরা "তারমাক" ও অ্যাষ্টরীরা "তামাক" বলে। সেখানে প্রচলিত বন্দুকগুলি অগ্নি সংযোগ করিয়া ছাড়িতে হয়—সেই বাব্বাতার আমলের বন্দুক। গিলগিটীরা প্রায় বন্দুক প্রস্তুত করিয়া লয়। পাথরের উপর সিসা খুঁড়িয়া তাহার গুলি প্রস্তুত করে। জরুর ছুড়িতে হইলে ছোট ছোট প্রস্তরখণ্ডও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হান্জা ও নাগরের লোকেরা বন্দুকের সহিত কাঠের ডাণ্ডা লাগাইয়া লয়। তাহাদের বন্দুক ছোট ও হাল্কা এবং ইহাতে মহারাজার সৈন্যদের বন্দুকের গুলি অপেক্ষা ছোট ছোট গুলি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইহারা অব্যর্থলক্ষ্য। বন্দুক ছুড়িতে বালবৃদ্ধ সকলেই খুব সুনিপুণ।

লেখক একদিন গিলগিটবাসী সকল দার্দদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাহাদিগের সংখ্যা অল্প নহে—তাহাদিগের আহারের জন্য রুটি ফল ছাড়া কয়েকটি মেষও বলিদান হইয়া-

ছিল। বহু কষ্টে বাজাকর আনা হইয়াছিল—লেখক নিমন্ত্রিতদিগকে নৃত্যগীত আরম্ভ করিতে বলিলেন।

আমোদ প্রমোদ।

প্রথমে তাহারা এক এক জন করিয়া নাচিতে লাগিল, এবং কেহ কম্পানে সঙ্গীতের সহিত তালে রাখিতে লাগিল। ধীরে ধীরে এক হস্ত বিস্তৃত করিয়া দিয়া তাহারা নাচিতে লাগিল, এবং বাম পদই তাড়নাকার্য্যে অধিক ব্যবহৃত হইতে লাগিল। তাহার পর বার জন একত্রে সামরিক নৃত্য করিতে উঠিল—দুই পাশে ছয় জন ছয় জন করিয়া সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইল—যেমন করিয়া তরবারি ঘুরায়, তেমনই করিয়া হাত ঘুরাইতে লাগিল। এইরূপ নৃত্যে তাহারা সত্যসত্যই তরবারি ব্যবহার করে, তবে এখানে তাহা আনে নাই। কখন বৃত্তাকারে, কখন সারি বাঁধিয়া, তাহারা নাচিতে লাগিল, এবং সে তাড়নে অশোক মুকুলিত হইবার সম্ভাবনা না থাকিলেও, তাহাতে এত ধূলিকণা উড়িয়াছিল যে, লেখক সেই নৃত্যভূমি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

অ্যাষ্টরীয়া ও চিনাশীরা খুব মদ্যপ্রিয়। তাহারা ব্যবহারের জন্য মদ্য প্রস্তুত করে। পাঁচ বা ছয় সের শস্য জলে সিদ্ধ করিয়া কাপড় দিয়া ঢাকিয়া লওয়া হয়। তাহার পর সেই সিদ্ধ শস্যের সহিত লাড়ক হইতে আনীত প্যাপস নামক দ্রব্য মিশাইয়া তাহা মৃৎপাত্রে রাখা হয়; পরিমাণ মত জল দিয়া পাত্রের মুখ চামড়া দিয়া বাঁধা হইলে তাহা গ্রীষ্মকালে সূর্য্যতাপে ও শীতকালে অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে রাখা হয়। বার দিন পরেই মদ্য প্রস্তুত হয়। সময় সময় দুই তিন বার জল দিয়া আর এক প্রকার মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে তদ্দেশীয়গণ "মো" বলে। শিলশিটিয়াও বড় মদ্যপ্রিয়;—বাগরে দ্রাক্ষা হইতে মদ্য প্রস্তুত হয়।

মো।

দারিপবাসীরা মৃতব্যক্তির সমাধিপার্শ্বে উপবেশন করিয়া দ্রাক্ষা, সুপারী প্রভৃতি ভক্ষণ করে। দার্দগণ অনেক সময় খাদ্য দ্রব্য মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখে। তাহারা ভিন্ন আর কেহই সে সকলের সন্ধান পায় না। যখন মহারাজার সেনাগণ গিলগিট আক্রমণ করিয়াছিল, তখন আহারীয় অভাবে তাহারা যৎপরোনাস্তি যাতনা পাইয়াছিল, অথচ তাহাদিগের নিকটেই খাদ্য দ্রব্য প্রোথিত ছিল, তাহারা সন্ধান পায় নাই। সন্তান জন্মিলে পিতা মাতা কিছু খাদ্য এইরূপে মৃত্তিকায় প্রোথিত করে, এবং সেই সন্তানের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইলে তাহা বাহির করিয়া বিতরণ করে। খাদ্য দ্রব্যের সহিত ঘৃতও প্রোথিত করা হয়—অবশ্যই এতদিনে ঘি লোহিতবর্ণ ও বিস্বাদ হইয়া যায়, কিন্তু তদ্দেশবাসীরা মনে করে যে, তাহাতে সুন্দর ও সুন্দরীর সৌভাগ্য সূচিত হয়। যে দেশে যেমন আচার।

আহারীয়।

সমালোচনা।

হ্যামলেট ও ডনকুইক্‌সোট।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য ছাড়িয়া দিয়া যদি সূক্ষ্ম আলোচনায় অনুবীক্ষণের সাহায্যে সাহিত্য দর্শনে সক্ষম হওয়া যায়, তবে দেখা যায় যে, সাহিত্যের মধ্যে চিরদিনই দুইটা বিপরীতগামী স্রোত পরস্পরের ঘাতপ্রতিঘাতে বিপর্য্যস্ত না হইয়া আপন আপন গন্তব্যপথে চলিয়াছে; আনন্দ ও বিষাদের এই দুই স্রোত চিরকাল সাহিত্যক্ষেত্রের শ্যামল বক্ষের উপর বহিতেছে। এক হইতে আনন্দাত্ম ও অন্য হইতে বিষাদাত্ম পুস্তকের সৃষ্টি। হ্যামলেট ও ডনকুইক্‌সোট এই দুই স্রোতের পরিচায়ক; প্রথমোক্ত, পাঠকের হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে বিষাদের ব্যথিত ব্যাকুল দীর্ঘশ্বাস উত্থিত করে, শেষোক্ত বিতাড় গভীর কঠোর দার্শনিকের

অধরপ্রান্তেও হাস্যরেখা অঙ্কিত করিয়া যায়। প্রসিদ্ধ রুস ঔপন্যাসিক আইভান তুরগিনিফ রুসিয়ান ভাষায় এই দুই পুস্তকের যে তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন, আগষ্ট সংখ্যা "ফর্টনাইটলী রিভিউ" পত্রে কুমারী মিকলাস তাহার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন; প্রবন্ধটি আশাতীত সুন্দর এবং অসীম পাণ্ডিত্য ও বিশ্লেষণশক্তির পরিচায়ক; সেই জন্য তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া আমরা রুসিয়ান সমালোচকের মতামত পাঠকদিগকে উপহার দিলাম।

প্রকাশ। হ্যামলেটের প্রথম সংস্করণ ও ডনকুইক্‌সোটের প্রথম ভাগ, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে একই বৎসরে প্রকাশিত হয়। যে দুইখানি পুস্তকে মানবচরিত্রের দুই সম্পূর্ণ বিপরীত অংশ প্রদর্শিত হইয়াছে; সে দুই খানি একই বৎসরে প্রকাশিত হইয়াছিল। আনন্দ অপেক্ষা বিষাদে জটিলতা অবশ্য অধিক, তাই হ্যামলেটে কবি জটিলতার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ, এবং ডনকুইক্‌সোটে প্রকার সরল স্বচ্ছ সুন্দর রচনাপ্রণালীর জন্য প্রসিদ্ধ। কিন্তু জগতে মনুষ্যমাত্রেই অল্লাধিক পরিমাণে হয় হ্যামলেট, নয় ডনকুইক্‌সোট। লেখক দুঃখ করিয়াছেন যে, রুসিয়ান ভাষায় ডনকুইক্‌সোট গ্রন্থের ভাল অনুবাদ নাই। আর তিনি বলিয়াছেন যে, আজকাল কুইক্‌সোট অপেক্ষা হ্যামলেটের সংখ্যাই অধিক।

আদর্শ। প্রত্যেক মনুষ্যই যথাসম্ভব একটা আদর্শের অনুসরণ করে, বা করিতে চেষ্টা করে। কেহ কেহ সেই আদর্শটা একেবারে মনের মধ্যে যেমন পায়, অমনই গ্রহণ করে, কেহ বা তাহা বিশ্লেষণ করিতে চাহে। আদর্শটা প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখি—স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা, অথবা আপনি ও আপনা ভিন্ন কিছু; কেহ আপনাকেই সর্ব্বস্ব ভাবে, কেহ আপনা অপেক্ষা আর কিছু মহৎ বা উচ্চকে সর্ব্বস্ব ভাবে।

ডনকুইক্‌সোট। প্রথম ভাগের কুইক্‌সোটের ক্রমবিকাশ, দ্বিতীয় ভাগে দেখিয়া মনে হয় যে, সেই অদ্ভুত মানবের মধ্যে একটা সহৃদয়তা আছে, সে আপনাকে লইয়া ব্যস্ত নহে, সে অন্যের জন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত। সে কল্পনানুসারে ন্যায়পরতা ও সত্যের রাজ্য স্থাপন করিতে ও একটা আদর্শের অবিচ্ছিন্ন ভাবে অনুসরণ করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। অনেকে বলিবেন যে, এই আদর্শ তাহার বিকৃত কল্পনার সৃষ্ট; সত্য—কিন্তু সেই পবিত্রতার জন্য তাহা নিশ্চয়ই উপযুক্ত আদর্শ। তাহার হৃদয়ে স্বার্থপরতার লেশমাত্র নাই। সে মানবজাতির অপকার দূরীকরণ ও উপকার সংসাধনে বদ্ধপরিকর, তাই সে সকল অবস্থাতেই সন্তুষ্ট। শান্তিপ্রিয়, মহৎহৃদয়, সরল কুইক্‌সোট সেই জন্য শিক্ষার উপযোগী। সে আদর্শের দাস,—সেই আলোকে তাহার চিত্র সমুজ্জ্বল।

হ্যামলেট। হ্যামলেটের চরিত্রের প্রধান লক্ষণীয় বিষয় আত্মদর্শন, তাহার পর আত্মসর্ব্বস্বতা, তাহার পর বিশ্বাসের শিথিলতা। তিনি কেবল আপনার জন্যই এই মুক্ত বিশাল জগতে বাস করেন। সকলকে, জগতকে অবিশ্বাস করিয়া, ক্রমে হ্যামলেট আপনাকেও অবিশ্বাস করিতে আরম্ভ করেন, তিনি আপনার মধ্যে আপনাকে লইয়াই সন্তুষ্ট হইতে পারেন না, এবং আপনার চরিত্রের দৌর্ব্বল্যও তাঁহার অবিদিত নহে। তিনি আপনাতে বিশ্বাস করেন না, তবুও তিনি গর্ব্বিত; তিনি জীবনের কি উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন না, তবুও জীবন তাঁহার প্রিয়; দুঃখ তাঁহার নিকট জনজীবনকে প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। অবশ্য এইখানে বলিয়া রাখি, হ্যামলেটের যাতনায় উন্মাদকতা ছিল, সে দুঃখের তুলনায় কুইক্‌সোটের দুঃখ যাতনা কিছুই নহে।

দুইটি চরিত্রে প্রভেদ যথেষ্ট। ডনকুইক্‌সোট হাস্যের অবতার, হ্যামলেট মূর্ত্তিমান বিষাদ। কুইক্‌সোটের নাম এখন উপহাসস্থলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, হ্যামলেট নামে কাহারও আপত্তি

নাই। তবুও হ্যামলেটকে ভালবাসিতে পারি না, কারণ তিনি কাহাকেও ভালবাসেন নাই।

প্রভেদ।

এই সকল প্রভেদ। রাজপুত্র হ্যামলেট নিহত পিতার প্রেতাত্মা কর্তৃক তাঁহার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াও তাহা পারিলেন না; (অবশ্য, কাব্য-হিসাবে ইহা চরিত্রের মাধুরী অনেক বাড়াইয়া তুলিয়াছে) আর হতভাগ্য দরিদ্র, বিদ্যাবুদ্ধিবিহীন কুইক্‌সোট স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া পরহিতসাধনব্রত গ্রহণ করিয়াছিল। অবশ্য, সকল সময় তাহার উদ্দেশ্যের অনুরূপ ফল ফলে নাই, তাহাতে তাহার দোষ নাই—জগতে কয় জন উদ্দেশ্যের অনুরূপ কর্ম্মফল পাইয়া থাকে?

সাধারণ লোকের সহিত এই দুই চরিত্রের সম্বন্ধ—হ্যামলেটে পোলোনিয়াস্ চরিত্রে ও ডনকুইক্‌সোটে স্যান্‌কোপাঞ্জা চরিত্রে প্রকটিত হইয়াছে। কর্ম্মঠ, বৃদ্ধ, স্বল্পহৃদয় পোলোনিয়াস

পোলোনিয়াস ও স্যান্‌কোপাঞ্জা।

হ্যামলেটকে অনেকটা শিশুর মত দেখেন, হ্যামলেট রাজপুত্র না হইলে হয় ত তিনি তাহাও পারিতেন না। তিনি হ্যামলেটের উপর বিশ্বাস-সংস্থাপনে সক্ষম নহেন, এবং তাঁহার নির্বুদ্ধিতাকে প্রেমের বিকার হইতে উৎপন্ন মনে করেন। যাহাদের আপন জীবনের কোনও স্থির লক্ষ্য নাই, তাহারা অন্যকে চালিত করিতে পারে না, তাই সাধারণ লোকেরা হ্যামলেটকে ভালবাসিতে পারে না। আবার স্যান্‌কোপাঞ্জা কুইক্‌সোটের উন্মত্ততা এবং তাহার সহিত গমনে বিপদ জানিয়াও, তিনবার আপনার জন্মস্থান, প্রাণপ্রিয় পত্নী ও দুহিতাকে পরিত্যাগ করিয়া তাহারই অনুসরণ করে। যাহারা প্রথমে উপহাস সহ্য করিয়াও আপন গন্তব্য পথে গমন করে, সাধারণ জনগণ তাহাকেই ভালবাসে। তাই ডনকুইকসোট সাধারণের প্রিয়।

ডনকুইকসোট সমস্ত প্রাণ দিয়া তাহার কল্পনাসৃষ্ট ডালসিনিয়াকে ভালবাসে; সে তাহারই কল্পনার সৃষ্টি। সে বহির্জগতের ডালসিনিয়াকে ভালবাসে না। ডালসিনিয়া অন্তর্জগতে। সে প্রেমে স্বার্থপরতা নাই, ইন্দ্রিয়বিকার নাই। তাই বলিয়াছি, সে আদর্শের দাস। সেক্‌স্‌পীয়র

ভালবাসা।

জানিতেন যে, হ্যামলেটের ন্যায় স্বার্থপর ও অবিশ্বাসী মানবের হৃদয়ে প্রেম থাকিতে পারে না, তাই অভাগিনী ওফিলিয়া মধ্যাহ্ন তপনতাপ-দগ্ধ যূথিকার মত শুকাইয়া গেল। হ্যামলেট কি ভাল বাসিতে পারিতেন? তিনি আপনিই এক স্থানে ওফিলিয়াকে বলিয়াছেন, "আমি তোমাকে ভালবাসি নাই"—I loved you not।

হ্যামলেট ভালর অস্তিত্বে সন্দিহান, কিন্তু মন্দের অস্তিত্বে তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাসবান; কারণ তিনি সর্ব্বদা তাহার সহিত সংগ্রামরত। তাই দেখিতে পাই, জগতে হ্যামলেটের মত লোকেরা বুদ্ধিমান ও বিবেচক হইলেও, ভাল কাজ করিতে পারে না। আর অল্পবুদ্ধি কুইক্‌সোটেরা কার্য্যসংসাধনে সর্ব্বদাই সমর্থ। তবে কি সত্যে বিশ্বাসবান হইবার জন্য মানব উন্মত্ততার

বুদ্ধি।

আশ্রয় লইবে? অন্য উপায় কি বাস্তবিকই নাই? তাহা নহে; কারণ এই উভয়ের সামঞ্জস্যই জীবিতের উপযুক্ত। হ্যামলেটের এই বিশ্বব্যাপিনী প্রিয়তার কারণ এখনকার লোকের বিষাদের দিকে ঝোঁক।

উত্তরপ্রদেশীয় কবি আপনার মধ্য হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া হ্যামলেটের চিত্র পাঠকের সম্মুখে ধরিয়াছেন। কারণ, উত্তরদেশীয়গণ সর্ব্বদাই চিন্তারত, বিষাদাবনত। আবার দক্ষিণদেশীয়ের হৃদয়োত্থিত স্বাভাবিক সুবিমল উচ্চ হাস্য ডনকুইক্‌সোটের প্রত্যেক ছত্রে প্রতিফলিত। দুইখানি দুইপ্রকার। এ কথা কে অস্বীকার করিবে যে, সেক্‌সপীয়রের ক্ষমতা কুইক্‌-

উত্তর ও দক্ষিণ।

সোট-রচয়িতার ক্ষমতা অপেক্ষা অধিক। কিন্তু তাঁহারও অসামান্য অসাধারণ অসীম প্রতিভা ছিল। সেক্‌স্‌পীয়র স্বর্গ মর্ত্ত্য সকল স্থান হইতে তাঁহার রচনার সামগ্রীসংগ্রহে সমর্থ, সফলযত্ন; আর কুইক্‌সোট-রচয়িতা সারভ্যান্টিস্ তাঁহা-

বই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সামগ্রী হইতে রচনার বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহার রচনার যদি উন্মাদক কিছু না থাকে, তবে তাহাতে মহা কার্য্যের প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যের কিছুমাত্র অভাব নাই। তাহাও পাঠককে মুগ্ধ করিতে সক্ষম। আর দুই গ্রন্থকারই এক সময়ের এবং একই দিবসে (২৬শে এপ্রিল ১৬১৬ খৃষ্টাব্দ) উভয়ের মৃত্যু হয়, লোকে তাহা অবগত আছে। উভয়ের রচনাতেই মধ্যযুগের বর্ব্বর নৃশংসতার ছবি পড়িয়াছে।

সরলতা ও স্বার্থত্যাগের জন্য ডনকুইকসোট প্রসিদ্ধ, আর জটিলতা ও স্বার্থপরতা হ্যামলেটের মজ্জাগত রোগ। কুইকসোট প্রচলিত আচার ব্যবহার ও রাজারাজড়াদিগের প্রতি ভক্তিবিশিষ্ট, তবুও সে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিশেষ পক্ষপাতী। হ্যামলেট উচ্চ, কোমল।

চরিত্র-সমালোচনা। হ্যামলেট সময় সময় কাপুরুষ এবং নৃশংস-হত্যার সহিত তাঁহার নাম লিপ্ত, কিন্তু কুইকসোট কেবল পরের জন্য সব দিয়াছে। কুইকসোট কখন অধীর নহে,—শান্ত, ধৈর্য্যপরায়ণ। হ্যামলেট অধীর, সহিষ্ণুতাবিহীন। প্রভেদ অনেক। ডনকুইকসোট-গণ দেশ আবিষ্কার করে, হ্যামলেট-গণ তাহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে। মানব-চরিত্রের মধ্যে এই দুই ভাবই প্রচ্ছন্নভাবে প্রবহমান, এই দুই প্রবৃত্তির সামঞ্জস্যই মানুষের কর্ত্তব্য, তাহা করাই সকলের উচিত।

নানাবিধ।

ভূতের গল্প।

উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতায় সর্ব্বপ্রকার বিশ্বাসের মূল ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিতেছে। আমরা জগতের সীমাবদ্ধ যুক্তিতর্ক অবলম্বন করিয়া, কোনও বিষয়ই আজকাল আর কেবল মানিয়া লইতে চাহি না। সকল তত্ত্বকেই আজকাল সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম সাক্ষ্য-সাবুদ সমেত লোকের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে হয়; নহিলে বিজ্ঞান-গর্ব্বিত শিক্ষিতাভিমানীর মস্তিষ্কে স্থান পাইবার তাহাদের কোনও অধিকার নাই। কিন্তু,

"There are more things in heaven and earth, Horatio,
Than are dreamt of in your philosophy."

এখনকার লোকে ভূতের কথায় সহজে বিশ্বাস করিতে চাহেন না। ভূতও ছাড়িবার পাত্র নহেন। মাঝে-মাঝে অবিশ্বাসীর জাগ্রত নয়ন সমক্ষে আপনার অস্তিত্ব বিলক্ষণ জাহির

ভূতে বিশ্বাস। করিয়া যান। এইরূপ ভূতযোনির আবির্ভাবের কথা মানুষ চিরদিন শুনিয়া আসিতেছে। আর, বিজ্ঞানবাদী যাহাই বলুন, মানুষের মনের ভিতর এই বিষয়ের একটা স্বাভাবিক ভিত্তিও আছে। কবিগুরু সেক্সপীয়র তাঁহার কয়েকখানি নাটক এই ভিত্তিভূমির উপর সংস্থাপিত করিয়াছেন। অধুনাতন কাব্যোপন্যাসেও মাঝে মাঝে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। নাটক-নবেল, কাব্য-কল্পনার কথা ছাড়িয়া দিলে, ইতিহাসেও ইহার অভাব নাই। শুনা যায়, সিজারের মৃত্যুকালে

"The graves stood tenantless and the sheeted dead
Did squeak and gibber in the Roman streets."

আর, কিছু দিন হইল, সভ্যতার কেন্দ্রস্থল এই কলিকাতার সহস্র লোকের সমক্ষে এক অসহায়া বালিকার প্রতি যে অত্যাচার হইয়া গিয়াছে, তাহা পাঠক বোধ হয় আজিও বিস্মৃত হন নাই।

ভূমিকার বাড়াবাড়ি না করিয়া, আমরা আগষ্ট মাসের "নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরী" হইতে একটা

অদ্ভুত কাহিনী পাঠকদের গোচর করিতেছি। লেখক, (ডাক্তার রসেল) তাঁহার এক বন্ধুর বিষয়ে বলিতেছেন ;—

"প্রায় ত্রিশ বৎসর গত হইল, আমার বন্ধু হাইলাণ্ড প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন। এক রাত্রি তিনি তাঁহার কোনও বন্ধুর বাটীতে বিশ্রাম করিবার মানস করিয়া তাঁহাকে সংবাদ প্রেরণ করেন। কিন্তু পথিমধ্যে দৈবদুর্ব্বিপাক উপস্থিত হওয়াতে, তিনি যথাকালে তথায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না। তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া গৃহস্বামী অপর এক ব্যক্তিকে তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট গৃহে শয়ন করিতে দিলেন। তার পর তিনি আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে, বন্ধু নিরুপায় হইয়া তাঁহাকে কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী আর একটা গৃহ দেখাইয়া দিলেন। ঐ গৃহে বহু পূর্ব্বে একটা ভীষণ কাণ্ড হইয়া গিয়াছিল। গৃহস্বামী সে সব কথার উত্থাপন না করিয়া কেবল বলিয়া দিলেন—'মাথার উপর ঘড়িটা বড় টক্ টক্ করে ; আপনার নিদ্রার সুবিধা হইবে না। কিন্তু উপায় নাই। অদ্য রজনী কষ্টে সৃষ্টে এইখানেই যাপন করুন।'

ভূতের ঘরে বাস।

"ঘড়িটার বিষম শব্দের সহিত বারোটা বাজিয়া গেল। বন্ধু পোষাক ছাড়িয়া শয়ন করিলেন। দিবসের শ্রান্তিবশতঃ শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হইলেন। হঠাৎ তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মনে হইল, কে যেন অতি শীতল ক্ষুদ্র হস্তের দ্বারা ধীরে ধীরে তাঁহার মুখ স্পর্শ করিয়া গেল। তিনি ডাকিলেন—'কে তুমি ?' কোনও উত্তর নাই। ঘরে উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছে। কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তখন মনে হইল, বুঝি নিদ্রিতাবস্থায় পার্শ্বপরিবর্ত্তনের সময় মশারীবন্ধনের লম্বমান সূত্রগাছটি তাঁহার মুখে আসিয়া লাগিয়া থাকিবে। পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, উহা হইবার সম্ভাবনা নাই। হয় ত নেংটি ইঁদুর তাঁহার মুখের উপর দিয়া সোজা রাস্তা প্রস্তুত করিয়া থাকিবে। কিন্তু স্পর্শটা যে নিতান্ত শীতল ও সজিলবৎ।

ভূতের স্পর্শ।

"তখন ভাবিলেন, ইহা নিশ্চয়ই অপরগৃহশায়ী কোনও যুবকের practical joke ; সেই ঘরের দরজায় গিয়া দেখিলেন, উহা বাহির হইতে রুদ্ধ। ঘরে কি ফিস্‌ফিস্ শব্দ হইতেছে, মনে হইল, কে হাসিতেছে। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন,—'আমার নিদ্রার ব্যাঘাত করিবে না, প্রতিজ্ঞা কর ; নতুবা অদ্য রাত্রে তোমাদের আর বাহির হইবার উপায় রাখিব না।' কাহারও সাড়াশব্দ নাই। তখন ক্রুদ্ধ হইয়া ঘরে টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি যে সকল ভারি ভারি জিনিষ ছিল, টানিয়া আনিয়া দরজার গায়ে জমা করিয়া রাখিলেন। পুনর্ব্বার শুইয়া আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। শব্দের মধ্যে কেবল ঘড়ীর টক্ টক্। ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন। আবার সেই স্পর্শ।—পাঁচটি অঙ্গুলী অতি স্পষ্টরূপে কে তাঁহার মুখের দক্ষিণ হইতে বামভাগে বুলাইয়া দিয়া গেল।

আবার আবির্ভাব।

"ক্রোধে ও বিস্ময়ে তিনি শয্যা হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। রাত্রি সাড়ে তিনটা বাজিয়া গিয়াছে ; এই নিষ্ঠুর আমোদের জন্য এ পর্য্যন্ত কাহারও জাগিয়া থাকা সম্ভব নহে। তবুও ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিলেন। অবশেষে, শ্রান্ত ও বিরক্ত হইয়া তিনি কেবল একটি প্লেড্ মাত্র গায়ে জড়াইয়া, বিলিয়ার্ড খেলিবার ঘরে গিয়া একটা সোফার উপর শয়ন করিলেন। অকস্মাৎ একটা বিকট আর্ত্তনাদে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চাহিয়া দেখিলেন, উজ্জ্বল সূর্য্য-রশ্মি বাতায়নপথ বাহিয়া তাঁহার বিছানার উপর পড়িয়াছে। কিন্তু এবারকার এই চীৎকারটা ভৌতিক ক্রিয়া নহে। গৃহের রূপসী পরিচারিকা সকালবেলা জানালা খুলিতে আসিয়া দেখিল, একটা অর্দ্ধদিগম্বর দীর্ঘ-মূর্ত্তি সোফার উপর শায়িত রহিয়াছে। সেই আর্ত্তনাদ এই দৃশ্যেরই বিজ্ঞাপনবিশেষ।

"তখন বেলা সাতটা। তথাপি বন্ধুবর বর্ত্তমান শয্যা ত্যাগ করিয়া সন্নিহিত অট্টালিকার একটা আফিস-গৃহের আশ্রয় লইলেন। তিনি না ঘুমাইয়া ছাড়িবেন না।

"এদিকে গৃহস্বামী ভূতের ঘরে তাঁহার দর্শন না পাইয়া চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। অনেক অন্বেষণের পর তাঁহার সন্ধান মিলিল;—বন্ধু রাত্রির কাহিনী সমস্ত বিবৃত করিলেন। গৃহস্বামী তখন তাঁহাকে কয়েক বৎসরের জন্য রহস্যগোপনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া নিম্নলিখিত ইতিহাস শুনাইলেন,—

"প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বের কথা। এখানকার আরল্ ডুইবেন্ বাস করিতেছিলেন। তাঁহার মাতা আপন পরিবারের নষ্ট ঐশ্বর্য্য পূরণ করিবার মানসে, এক সম্পত্তিশালিনী যুবতীর সহিত পুত্রের বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিয়া, তাঁহাকে সংবাদ পাঠাইলেন। আরল্ আসিবার যোগাড় করিতে লাগিলেন। কিন্তু জননীর মনে কেমন একটা সন্দেহ উপস্থিত হইল। হেলেন-নাম্নী তাঁহার এক সুন্দরী জ্ঞাতিকন্যা তাঁহারই আশ্রয়ে পালিত হইতেছিল। পুত্রের প্রবাস-বৃত্তান্ত তিনি নিজে যত জানেন, হেলেন তদপেক্ষা অনেক অধিক অবগত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। তিনি রহস্যের সন্ধানে রহিলেন। একদিন্ কয়েকখানা চিঠি তাঁহার হস্তগত হইল। পত্রগুলির শিরোনামায়,—'আমার একমাত্র প্রিয়তম প্রেয়সী হেলেন,' আর সহির স্থলে 'তোমার চিরপ্রেমাধীন আরল্' পাঠ করিয়া, জানিবার কিছুই বাকী রহিল না।

ভূতের গোড়া।

"কাউণ্টেস্ ক্রোধে অন্ধ হইয়া উঠিলেন। বলিলেন,—

"সর্ব্বনাশী! তুই আমার সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছিস্! তুই এখনই আমার বাটী হইতে দূর হইয়া যা'?"

"হেলেন,—ম্রিয়মাণা অথচ গর্ব্বিতা—কহিল, 'প্রাণ থাকিতে নহে! যতদিন আরল্ ফিরিয়া আসিয়া আমাকে এই গৃহের অধিকারিণী না করেন, আমি ইহা পরিত্যাগ করিব না। তাঁহার নিকট এই প্রতিজ্ঞাই করিয়াছি। ঈশ্বরের চক্ষে তিনিই আমার স্বামী; আর আমিই তাঁহার পত্নী।'

"বৃদ্ধার প্রাণ আরও জ্বলিয়া উঠিল। তিনি ভৃত্যগণকে আদেশ করিলেন,—'ছুঁড়ীর ঘাড় ধরিয়া লইয়া উহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখ্। উহাকে বিউলির কুমারী-মঠে পাঠাইয়া দিব।'

"অসহায়া হেলেন পলায়নের উদ্দেশে একটা দরজা খুলিতে যাইতেছিল। বুড়ী রাক্ষসীর ন্যায় একটা তরবারি লইয়া তাহার মণিবন্ধে এরূপ আঘাত করিল যে, উহা ছিন্ন হইয়া পড়িয়া গেল। কিয়ৎকাল পরে অভাগিনীর দেহবন্ধনও বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিল। আরলও প্রত্যাগমনকালে তরণীসহ জলমগ্ন হইয়া প্রিয়তমার অনুগমন করিলেন।"

প্রেমিক যুগলের পরিণাম কি হৃদয়ভেদী!

ইংরাজী সাহিত্যে টেনিসন্।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, যন্ত্রণাময় জীবন-সংগ্রামের সময়ে, দর্শন-বিজ্ঞানের বিকট বিভীষিকাময় কালে, কবিতা রচনা করিয়া টেনিসনের যেরূপ যশোলাভ হইয়াছে, তেমন্ বুঝি আর কাহারও ভাগ্যে হয় নাই। ক্ষুদ্র দ্বীপের নিভৃত-নিবাস-নিবাসী, দীর্ঘকেশ, শ্বেতশ্মশ্রু, সরলস্বভাব কবির বীণাঝঙ্কারে মুগ্ধ হইয়া,

কার্য্যব্যবসায়ী, কর্ম্মপূজক ইংরাজ তাহার হৃদয়ের হৃদয় হইতে টেনিসনকে যে পূজা দিয়াছে, তেমন পূজা সে বুঝি আর কাহাকেও দেয় নাই; পাউণ্ডপূজক ইংরাজের কঠিনতার কঠোর আবরণাবৃত হৃদয়ের নিভৃত অন্তঃপুরে তবে এত কোমলতা, এত গুণগ্রাহিতা, এত সৌন্দর্য্যবোধ, এত মাধুরীর স্বপ্ন লুকাইয়াছিল! টেনিসনের কবিতা সঞ্জীবনমন্ত্রের মত তাহাদের সজাগ করিয়া তুলিয়াছিল। টেনিসনের কবিতায় এই অতিরিক্ত, অসম্ভব আদর কেন?

কবিতা সময়ের উপর নির্ভর করে। যখন কোনও দেশব্যাপী আনন্দোৎসবে দেশবাসীগণের হৃদয় আনন্দময় থাকে, সেই সময়ে রচিত সকল কবিতার মধ্যে আনন্দের এক অন্তঃসলিল প্রবাহ প্রবাহিত হইতে থাকে। চসার ইংলণ্ডের "কবিপিতা" বলিয়া গণ্য হয়েন। যে সময় তাঁহার কবিতা সকল লিখিত হইয়াছিল, সে সময় ইংলণ্ডবাসীগণ কয়েকটি প্রধান যুদ্ধে জয় লাভ করে; সেই কারণে, তখন তদ্দেশীয়দিগের হৃদয় আনন্দপূর্ণ ছিল। এবং সেই দেশব্যাপী আনন্দ-তরঙ্গের শেষ অভিঘাত চসারের কবিতায় দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাঁহার কবিতায় উত্তেজক কিছুই নাই; তাহা স্নিগ্ধ মধুর—নিস্তব্ধ, নির্ম্মল, অমল ধবল নৈশ চন্দ্রকিরণের মত। চসারের পর, তাঁহারই কবিতার ধরণে ইংলণ্ডে কবিতা রচিত হইতে লাগিল। পোপ, গোল্ডস্মিথ্ প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্তস্থল। তাহার পর, য়ুরোপের রাজনৈতিক আকাশে এক প্রবল প্রলয়-ঝটিকা প্রবাহিত হইয়া গেল। ফ্রান্স সেই বিপ্লবের জননী—ফ্রান্সেই তাহার উৎপত্তি, ফ্রান্সেই তাহার লয়।

সত্য বটে, ফরাসী-বিপ্লব ফ্রান্সে উৎপন্ন হইয়া ফ্রান্সেই লয়প্রাপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু সে বিপ্লব কেবল ফ্রান্সকে বিপর্য্যস্ত করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। য়ুরোপের অন্য দুই এক ভাগেও তাহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। যে বিপ্লবতরঙ্গে ফ্রান্সের সামাজিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক, সর্ব্ববিধ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার দুই একটি আঘাত যে পার্শ্ববর্ত্তী ইংলণ্ডেও পড়িবে না, ইহা সম্ভব নহে। সেলী ও বায়রণ, এই দুইজন কবিই প্রকৃতপক্ষে ফরাসী-বিপ্লবের কবি। তাঁহাদিগের কবিতায় স্নিগ্ধমধুর ভাবের পরিবর্ত্তে এক উন্মাদক, জ্বালাময়, অগ্নিময় ভাব দৃষ্ট হয়। তাহা অগ্নিশিখার মত; কিন্তু তাহার সেই উন্মাদক ভাব আপাততঃ ভীষণ উন্মাদক হইলেও বহুক্ষণস্থায়ী নহে। এই শ্রেণীর কবিদিগকে বায়রণের পদানুসরণকারী কবি বলা যায়। চসারের ধরণের ও বায়রণের ধরণের কবিদিগকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়—আদিশ্রেণী ও বায়রণশ্রেণী।

কবি গ্রে, এই দুই শ্রেণীর কবিতার বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, আদি শ্রেণীর কবিতা শান্ত, স্থিরনীর গভীর হ্রদের মত; তাহা শান্ত, কিন্তু তাহার গভীরতা অধিক; আর বায়রণ শ্রেণীর কবিতা খরস্রোতস্বতী নদীর মত, তাহার গভীরতা অধিক নহে, কিন্তু তাহার প্রবাহবেগ বড় ভীষণ; সম্মুখে যাহা পড়ে, তাহাই ভাসাইয়া লইয়া যায়।

ক্রমে ইংলণ্ডে বায়রণের আদর এমনই বাড়িয়া উঠিল যে, সকল যুবক-কবিই বায়রণের অনুকরণ করিয়া কবিতা লিখিতে লাগিলেন। বায়রণের বিশেষরূপ 'জামার কলার' যুবক মহলে ব্যবহৃত হইতে লাগিল—এমন কি, বায়রণ অল্প খঞ্জ ছিলেন বলিয়া, কোনও কোনও যুবকও সেইরূপ খঞ্জ ভাবে চলিতে আরম্ভ করিলেন। তখন উন্মাদক ভাব না থাকিলে কবিতার আদর হইত না, লোকে তাহা পাঠ করিত না। কিন্তু মানবহৃদয় পরিবর্ত্তনপ্রিয়; কালে লোকে সেইরূপ কবিতার প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল, এবং পূর্ব্বের সেই আদি শ্রেণীর কবিদিগের কবিতার আদর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। কাজেই সেইরূপ কবিতার, সেইরূপ সরল শান্ত, মধুর কবিতার পুনরায় প্রচলন আবশ্যক হইল। টেনিসনই প্রথম তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

কিন্তু কেবল সেই জন্যই তাঁহার আদর এত অধিক হয় নাই। তাঁহার আরও কতকগুলি প্রধান গুণ ছিল। তাঁহার কবিতা কেবল শান্ত, মধুর নহে, পরন্তু তাহার মধ্যে আশ্চর্য্য সংযত ভাব দৃষ্ট হয়। তিনি মানব-হৃদয়ের প্রেমাদি উন্মাদকারী বৃত্তি সকলকেও শান্ত পরিচ্ছদে আবৃত করিয়াছেন, সূর্য্যকিরণকে চন্দ্রকিরণে পরিণত করিয়াছেন। এখানে একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি। তাঁহার এনক-আর্ডেনে (Enoch Arden) এনক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া যখন সুখতপ্ত গৃহমধ্যে অগ্নিকুণ্ডপার্শ্বে তাহার পত্নীর নবপতি ও তাহার পরিবার-বর্গকে দেখিতে পাইল, তখন সে যাহা বলিল, তাহাতে হাহুতাশ বা উচ্চরোদন নাই, তাহা শান্ত ও পবিত্র, এবং তাহাতে ঈশ্বরে কবির দৃঢ়বিশ্বাস দৃষ্ট হয়। সে বলিল :—

"এ যে অসহ্য যন্ত্রণা। কেন আমাকে তাহারা সেই নিভৃত দ্বীপ হইতে এখানে আনিয়াছিল? হে সর্ব্বশক্তিময় ঈশ্বর, সেই জনহীন দ্বীপে তুমি আমার হৃদয়ে বল দান করিয়াছিলে, আরও কিছুক্ষণের জন্য আমাকে বল দাও, আমাকে সাহায্য কর, আমাকে বল দাও, যেন আমি তাহাকে (পত্নী অ্যানিকে) এ কথা বলিয়া না ফেলি। যেন কখনও তাহাকে এ কথা না জানিতে দিই। আমাকে সাহায্য কর, আমি যেন তাহার শান্তিতে বাধা না দি। আমার সন্তানগণ! আমি কি তাহাদিগের সহিতও কথা কহিব না? তাহারা ত আমার চিনে না,

আমি আত্মপ্রকাশ করিব না। পিতা হইয়া সন্তানের মুখচুম্বন আমার ভাগ্যে নাই। ঐ বালিকার সহিত তাহার জননীর এত প্রকৃতিগত সাদৃশ্য, আর ঐ বালক,—সে ত আমারই পুত্র।"

ইহাতে হাহুতাশ বা উচ্চরোদন নাই বটে, কিন্তু ইহার এই কোমল করুণ ভাবে ও বাক্যবিন্যাসে মানব-হৃদয়ের অন্তর্নিহিত সহানুভূতি ও দুঃখ জাগাইয়া তুলে। প্রেমরাজ্যে কবিদিগের বিশেষ অধিকার, তাহার শত ভাব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কবিগণ শত চিত্র অঙ্কিত করেন, কিন্তু টেনিসনের মত প্রেমকে পবিত্রতম, নিঃস্বার্থ প্রবৃত্তি করিয়া বুঝি আর কোনও কবিই গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই।

তাহার পর টেনিসনের গভীর অথচ যথাসম্ভব সরলভাব এবং সরল ভাষা। টেনিসনের সকল কবিতাতে ভাব যত গভীর হউক না কেন, ভাষা নিতান্ত সরল। তাঁহার বাক্যবিন্যাস অত্যন্ত সুন্দর। এক একটি কথায় তিনি সময় সময় হৃদয়ের সকল ভাব ফুটাইয়া তুলিতে পারেন। তাঁহার আপনার ভাষায় বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার রচনায় সময় সময় "All the charm of all the Muses often flowering in a lonely word." দেখিতে পাই। তাঁহার বাক্যগুলি অনেক স্থানে ভাবের প্রতিধ্বনির মত শুনায়; তাঁহার শব্দগুলি এমন করিয়া সাজান যে, অর্থ ভিন্নও তাঁহার কবিতার দুই একটি ছত্র যেন স্মরণে আবদ্ধ থাকে। টেনিসন অনেক সময় প্রচলিত কঠিন বাক্য পরিত্যাগ করিয়া সহজ সরল পুরাতন বাক্য ব্যবহার করিতেন। মধুসূদনও তাঁহার কাব্যে এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। পুনঃপরিণীতা পত্নীর নব স্বামীর গৃহসংলগ্ন উদ্যান হইতে এনকের পলায়ন, তিনি কেমন স্বাভাবিক ভাবে বর্ণিত করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন:—

"সেই জন্য,—পাছে পদতলস্থ কঙ্কর হইতে শব্দ উৎপন্ন হয়, সেই ভয়ে, চোরের মত ধীরে ধীরে এনক ফিরিল, এবং পাছে মূর্চ্ছিত হইলে ভূমিতলে পতিত হইয়া তাহাদিগের দৃষ্টিগোচর হয়, সেই ভয়ে, প্রাচীর স্পর্শ করিয়া চলিতে লাগিল। দ্বারের নিকট আসিয়া তাহা মুক্ত করিল, লোকে যেমন করিয়া নিঃশব্দে রোগীর কক্ষদ্বার রুদ্ধ করে, তেমনই করিয়া তাহা রুদ্ধ করিল, এবং বাহিরে আসিয়া পড়িল।"

এই বাক্যবিন্যাসেই টেনিসনের ক্ষমতা। ইহাতে অন্য কোনও ইংরাজ কবি তাঁহার সমকক্ষ নহেন।

চরিত্র ও চিত্র-অঙ্কণে তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা এই যে, তাঁহার অঙ্কিত চরিত্রে ও চিত্রে কোনও অংশই পরিত্যক্ত হয় না। ইহা তাঁহার প্রত্যেক বর্ণনীয় বিষয়েই আমরা দেখিতে পাই। তিনি বর্ণনীয় বিষয়ের সকল খুঁটিনাটিগুলি দেখিতে

পান ; সেইজন্তই তাঁহার বর্ণনা এত সুন্দর। তাঁহার বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে বর্ণনীয় বিষয় যেন সত্য সত্যই জীবন্ত হইয়া পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত হয়, নয়নের সম্মুখে যেন সত্য সত্যই তাহার ছবি ভাসিতে থাকে, পাঠক একেবারে কবির বর্ণনীয় বিষয়ের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। বাস্তবিক, সেই সুখময় শৈশবের অবিস্মৃত উজ্জ্বল স্মৃতির মত সেই সকল বর্ণনা পাঠকের হৃদয়ে অনপনেয় হইয়া থাকে।

টেনিসনের কবিতাগুলিকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

প্রথমগুলির সহিত জগতের বাস্তব সত্যের বড় সম্পর্ক নাই। মারম্যান, (The Merman) মারমেড (The Mermaid) লোটস-ইটার্স (The Ltos-Eaters) প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্তস্থল। জগতের বাস্তব সত্যের সহিত সম্বন্ধ না থাকিলে কবিতা প্রায় হৃদয়স্পর্শী হয় না ; কিন্তু এই সকল কবিতায় টেনিসন তাঁহার রচনাকৌশল ও ভাষাবিন্তাসের সবিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। "মারমেড" কবিতার প্রথম শ্লোকটি এইরূপ :—

"Who would be
A mermaid fair,
Singing alone,
Combing her hair
Under the Sea,
In a golden curl
With a comb of pearl,
On a throne ?"

এমন সৃষ্টিছাড়া বিষয়ের কবিতাকেও টেনিসনের মধুর শব্দবিন্তাসপ্রণালী সৌন্দর্য্যসজীব করিয়া তুলিয়াছে। টেনিসনের কবিতার প্রধান বিশেষত্ব, এই সকল কবিতাতেও দৃষ্ট হয়। এই সকল কবিতায় উত্তেজনায় কিছু নাই, ভাষা ও ভাব পাশাপাশি মৃদু মৃদু বহিয়া যাইতেছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতায় তিনি মানবহৃদয়ের প্রেমাদি প্রবল প্রবৃত্তিগুলিকে প্রচণ্ড আবেগহীন স্নিগ্ধমধুর প্রবৃত্তি করিয়া তুলিয়াছেন। টেনিসনের লেখনীর সম্মুখে তাঁহার কল্পনারচিত মানবগণের হৃদয়ে ইহারা এক এক ক্ষুদ্র অংশ অধিকার করে মাত্র, বা আপনার কোমলতার কমনীয় আবরণান্তরালে আপনাকে পাঠকের দৃষ্টিপথের বাহিরে রাখিতে চেষ্টা করে। হৃদয়ের অন্ত সকল সাধারণ প্রবৃত্তির মধ্য হইতে তাহাদিগকে টানিয়া বাহির করিতে হয়। কবিও তাঁহার রচনায় বিষয়ের জন্ত আবশ্যক বৃত্তিটিকে কেবল একটু বিশেষভাবে বাছিয়া বাহির করিয়া লইয়াছেন। "এনক আর্ডেন," "ডোরা" প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্তস্থল। এই সকল কবিতায় সেই সকল উন্মাদকরী বৃত্তি, স্নিগ্ধ মধুরভাবে পরিশোভিত। বায়রণের শ্রেণীর কবিরা ইহাদিগকে যে প্রচণ্ড, জ্বালাময় তীব্র

ভাব দিয়াছিল, টেনিসন তাহা বিচ্যুত করিয়া ইহাদিগকে সুস্থ, স্নিগ্ধ মধুর প্রভায় প্রভাবিত করিয়া গিয়াছেন।

তৃতীয়গুলিই টেনিসনের গৌরবস্তম্ভের সর্ব্বোচ্চ সোপান, এইগুলিতে তিনি ধর্ম্ম ও ঈশ্বরবিষয়ক যে সকল তর্ক য়ুরোপীয় সমাজ আলোড়িত করিতেছে, সেই সকলের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

য়ুরোপে মানবগণ হয় কার্য্য, নয় আমোদ, এই উভয়ের একের পশ্চাতে ধাবিত; সেখানে অন্য কোনও কার্য্যরতদিগের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। ম্যাথু আর্ণল্ড সেখানকার লোকের যেরূপ বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, সেখানে উচ্চশ্রেণীস্থ ধনীগণ প্রায় বর্ব্বর; মধ্যশ্রেণীর মানবগণ সর্ব্বদা কেবল অর্থের পশ্চাতে ধাবিত; তাহারা পাউণ্ড, শিলিং, পেন্স ভিন্ন আর কিছু ভাবিবার বড় সময় পায় না; সাধারণ শ্রেণী অসভ্য এবং অজ্ঞ। টেনিসন বুঝিয়াছিলেন, কোনও জাতিতে এইরূপ ভাব বড়ই ভীষণ ও হেয়, তাই তিনি মানবগণকে নীতিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। বন্ধুর শোকে রচিত In Memoriam গ্রন্থই তাঁহার এতদ্বিষয়ক প্রধান রচনা। তাহা ভিন্ন তাঁহার শেষ বয়সের অনেক কবিতাই আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ। সে সকল এই তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, জগৎ এক সর্ব্বনিয়ন্তার অলঙ্ঘনীয় নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে। তিনি সেই জন্য বলিয়াছেন :—

"I curse not nature, no, nor death ;
For nothing is that errs from law."

তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে দৃঢ়বিশ্বাসবান ছিলেন, এবং মানবগণকেও তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাসবান করিয়া ধর্ম্মপথে আনিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এই নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক বিপ্লবের সময়, তাহাও য়ুরোপে তাঁহার এত আদরের এক কারণ।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মত টেনিসনের জীবনের স্থির লক্ষ্য ছিল যে, সুখস্রোতে গা ঢালিব না, কেবল সুখ লইয়া ব্যস্ত হইব না, কিন্তু মহৎজীবন যাপন করিব। এই সকল গুণে টেনিসনের সকল দোষ ঢাকিয়া গিয়াছে, এবং তাঁহার কবিতা স্থানে স্থানে সামান্য দোষে দুষ্ট হইলেও, ইংরাজী সাহিত্যে তাঁহার আদর এত অধিক।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

সাধনা। আশ্বিন ও কার্ত্তিক। এই সংখ্যার বিজ্ঞাপনে দেখা গেল, শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "সাধনার" সম্পাদকতা পরিত্যাগ ও 'যোগ্যতর হস্তে সম্পাদকীয় কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়া', অবসর গ্রহণ করিলেন। সম্পাদকের বিজ্ঞাপনে প্রকাশ,—"কিন্তু একথা গোপন করিবার আবশ্যক দেখি না, যে, যে পরিমাণ সমাদর প্রাপ্ত হইলে বহুব্যয়সাধ্য 'সাধনা' স্বচ্ছন্দে স্থায়িত্বলাভ করিতে পারিত, তাহা 'সাধনার' অদৃষ্টে ঘটে নাই। তাহাতে হয় ত আমাদের অক্ষমতা অথবা দুর্ভাগ্য অথবা উভয়ই প্রকাশ পাইতেছে।" সাহিত্য হিসাবে "সাধনা" সফল হইয়াছে; বঙ্গদেশে সাহিত্যচর্চ্চার অত্যন্ত দুরবস্থা না হইলে, "বহুব্যয়সাধ্য" "সাধনার" আকার প্রকার পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন হইত না। সুধীন্দ্র বাবু তিন বৎসর দক্ষতার সহিত "সাধনার" সম্পাদকতা করিয়া বিদায় লইলেন,—আমরা তাঁহার যত্নে এই তিন বৎসর সাহিত্য ক্ষেত্রে যে আনন্দ ও উপকার লাভ করিয়াছি, তজ্জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দি। তিনি "সাধনার" সফলতায় অপ্রত্যয় বটে, কিন্তু আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি, তাঁহার "সাধনা" সিদ্ধ হইয়াছে। এবারকার "সাধনার" সর্ব্বপ্রথমে, "মেঘ ও রৌদ্র" নামক একটি গল্প। গল্পটির সহজকরুণ উপসংহারভাগ পড়িতে চোখের পাতা আপনি ভিজিয়া আসে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ফরাসী ও ইংরাজ" প্রবন্ধটি পাঠ্যযোগ্য। "অন্তর্য্যামী" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি দীর্ঘ কবিতা। "মেয়েলি ছড়া" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি রচনা। এই প্রবন্ধটি চৈতন্য লাইব্রেরীর সভায় পঠিত হইয়াছিল,—কিন্তু রচয়িতা "সাধনার" তাহার উল্লেখ করেন নাই। ইহা নিতান্ত অন্যায় ও অসঙ্গত মনে করি। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য,—আমরা গত মাসের সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকার সমালোচনায় ব্যক্ত করিয়াছি, এ স্থলে তাহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক। "মেয়েলি ছড়া",—ছেলে ভুলাইবার জন্য বঙ্গগৃহলক্ষ্মীদের মুখে যে সব অদ্ভুত অথচ সরল ও সুমিষ্ট ছড়া শুনা যায়, তাহার একটি বিস্তৃত সমালোচনা। সমালোচনাটি রবীন্দ্র বাবুর স্বভাবসিদ্ধ সুললিত ছন্দে লিপিবদ্ধ। ভাবগুলি ক্ষুদ্র পার্ব্বতীয় প্রবাহিণীর ন্যায় ভাষার কঠিন উপলখণ্ডের উপর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। স্রোতস্বিনীর কলধ্বনি রচনার ঝঙ্কারে পরিণত। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে, সমালোচনায় কিছু বাহুল্য হইয়াছে। এই সকল ছড়ায় যে কোনও বিশেষ দার্শনিক বা নৈতিক তত্ত্ব নিহিত নাই, সে কথা না বলিলেও চলিত। এই ছড়াগুলি যে রমণীদের স্বপ্নরাজ্য হইতে সংগৃহীত, ইহা সহজবুদ্ধিমাত্রেরই বোধগম্য। ছেলেদের কথার ন্যায় ভাঙ্গা-চোরা ও উদ্দেশ্যরহিত কবিতায় যে আর্য্যসমাজের কোনও প্রাচীন সত্য সংমিশ্রিত আছে, ইহা ভাবিবার লোক এই নীরস বাঙ্গালীর মধ্যেও বোধ করি নিতান্ত বিরল। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে রবীন্দ্র বাবুর একটি কথার অনুমোদন করি। ছেলেদের কাছে আমাদের দেশের মা সরস্বতী নিতান্ত ভয়ের বস্তু; তাঁহার অত্যাচারে ও আবদারে বালকেরা নিতান্ত শীর্ণ। পড়াশুনার মধ্যে যে একটা আমোদ আছে, কূটবুদ্ধি নৈয়ায়িকও তাহা বালকদের বুঝাইয়া দিতে পারেন কি না সন্দেহ। অতএব, বর্ত্তমান অবস্থায় কেহ যদি বালকদিগের জন্য আমোদজনক দু একটি সরল গাথা বা দু একটি স্বপ্নরাজ্যের কাহিনী রচনা করেন, তিনি বঙ্গীয় বালকবালিকাদিগের পিতামাতার নিতান্ত কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন। বঙ্গভাষায় Fairy taleএর সৃষ্টি হইলে বালকদের মধ্যে অকালপক্কতার স্রোত কথঞ্চিৎপরিমাণে নিবারিত হইবে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ভারতবর্ষে" এখনও চলিতেছে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "স্বর্গীয় প্রহসন" আমাদের ভাল লাগিল

না। শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্করের "মিজাম জাতীর মর্ম্মচূর্ণ" একটি অতি ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ভূগর্ভস্থ জল এবং বায়ুপ্রবাহ" একটি উপকারী ও শিক্ষাপ্রদ রচনা।

ভারতী। আশ্বিন। এবারকার প্রথম প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের "আকবরসাহের হিন্দুপ্রীতি"—দ্বিতীয় প্রস্তাব। এখনও সমাপ্ত হয় নাই। সদারঙ্গের খেয়াল—স্বাক্ষরিত "গোলাপি কাওয়ারি" বেশ হইয়াছে। স্থানে স্থানে জেঠামি কিছু অতিরিক্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য যে, লেখকের রচনায় মুন্সিয়ানা আছে। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের "মহম্মদ ও তাঁহার ধর্ম্মমত" এই সংখ্যায় শেষ হইয়াছে। "ভুল" শ্রীমতী হিরন্ময়ী দেবীর একটি সেন্টিমেণ্টাল কবিতা। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের "চক্র" এবারেও আছে, বোধ হয়, এখানি বড় উপন্যাস হইবে। শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্তের "সৌরপ্রতিকরণ" একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। "সমুদ্রলঙ্ঘন" একটি কষ্টকল্পিত রসিকতা—সমুদ্রযাত্রার আন্দোলন উপলক্ষ করিয়া, কোনও অজ্ঞাত লেখক ছদ্মবেশে এই বানর-সংবাদ রচনা করিয়াছেন। আমরা ইহার প্রশংসা করিতে অক্ষম। "মুদ্রাবিপ্লব ও ভারত গবর্ণমেণ্ট" একটি রাজনৈতিক রচনা। নামেই প্রবন্ধের বিষয় ব্যক্ত হইতেছে। "বদরিনাথ" শ্রীযুক্ত জলধর সেনের ভ্রমণবৃত্তান্ত; বেশ হইয়াছে।

সমীরণ। দ্বাদশ সংখ্যা। এবারকার প্রথমে "প্রাইভেট টিউটারের দুঃস্বপ্ন" নামক একটি গল্প;—'গল্প' না বলিয়া 'নক্সা' বলিলে বোধ করি আরও সঙ্গত হয়। রচনাটি অতি সুন্দর হইয়াছে। ভাষা ও রচনায় বেশ একটু বৈচিত্র্য আছে। গল্পাংশের অনুপাতে স্থলবিশেষে বর্ণনা অতিরিক্ত ও খাপছাড়া হইয়া পড়িয়াছে—কিন্তু লেখকের সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ শক্তি প্রশংসনীয়। মোটের উপর, লেখকের রচনা সফল হইয়াছে বলিতে হইবে। "ধর্ম্ম-সাধনা" একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" এবারও প্রকাশিত হইয়াছে।

বামাবোধিনী পত্রিকা। "শিশুপালন" প্রবন্ধে ভাল করিয়া এই বিষয়ের আলোচনা করা উচিত। "শ্রীমা"-স্বাক্ষরিত "শুভযাত্রিক" কবিতাটি আমাদের ভাল লাগিল না। মূক ও বধির বিদ্যালয়ের প্রতি আমাদের আন্তরিক অনুরাগ আছে, ইহার উদ্যোগীগণও প্রশংসার্হ, এবং উক্ত বিদ্যালয়ের কোনও শিক্ষক মূক বধিরদের শিক্ষাদানপ্রণালী শিক্ষা করিতে বিলাত যাত্রা করিয়া আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন, স্বীকার করি। কিন্তু তাঁহার বিলাত-গমন উপলক্ষে, "ভারতমাতা" "বঙ্গলক্ষ্মী" "বঙ্গবালা" প্রভৃতিকে কবিতায় জড় না করিলে চলিবে না, এ কেমন কথা? প্রত্যেক বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়া কবিতা লিখিতে বসিলে কবিতার অপব্যবহার হয় মাত্র। বিষয়নির্ব্বাচনের উপর অনেক নির্ভর করে।

ভ্রমসংশোধন।

গত বারের "মাসিক সাহিত্যে" বঙ্গীয় "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার" সমালোচনায় আমরা লিখিয়াছিলাম, উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত "আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়" প্রবন্ধটি অ্যালবার্ট হলের সভায় পঠিত হইয়াছিল, কিন্তু সম্পাদক তাহার উল্লেখ করেন নাই। পরে দেখিলাম, সম্পাদক যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করেন নাই বটে, কিন্তু "সাময়িক প্রসঙ্গে" এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। আমরা অনবধানক্রমে তাহা দেখি নাই। সুতরাং এই অনবধানের জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করি। কিন্তু এই প্রবন্ধটি বক্তৃতার পূর্ব্বে যে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল,—সে বিষয়ে মতান্তর হইবার কোনও কারণ নাই—অতএব এ সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য অব্যাহত থাকিতেছে।—সাহিত্য-সম্পাদক।

ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন।

সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের লিখিত "নূতন তাম্রশাসন" শীর্ষক প্রবন্ধটি আমরা সাগ্রহে পাঠ করিয়াছি। * উমেশ বাবু যে একখণ্ড নূতন তাম্রশাসনের বিবরণ প্রথমেই বাঙ্গলা সাময়িক পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালী পণ্ডিতগণের দ্বারা যে সকল তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার হইয়াছে, সে সকল ইংরেজী সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। উমেশ বাবু সেই প্রাচীন প্রথা পরিহার করিয়া বাঙ্গালী পাঠকের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধের সহিত তাম্রফলকের একখণ্ড "লিথো" কিম্বা "ফটোজিংকোগ্রাফ" প্রকাশিত হইলে, প্রবন্ধটি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইত। কারণ, আমাদের বিবেচনায়, উমেশ বাবুর উদ্ধৃত পাঠের স্থানে স্থানে ভ্রম-প্রমাদ পরিলক্ষিত হয়। প্রবন্ধের সহিত তাম্রশাসনের প্রতিলিপি গ্রথিত থাকিলে, আমরা তাহার সংশোধনের চেষ্টা করিতে পারিতাম; কিন্তু এক্ষণে আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে উমেশ বাবুর উদ্ধৃত পাঠে নির্ভর করিতে হইবে।

উমেশ বাবুর মতে এই তাম্রফলক ব্রহ্মোত্তরের সনন্দ। আমাদের বিবেচনায়, ইহা দেবোত্তরের সনন্দ। সুতরাং তাঁহার সহিত আমাদের এক বিষয়ে সম্পূর্ণ বিরোধ উপস্থিত হইতেছে। অন্যান্য তাম্রশাসন দেখিলেই উমেশ বাবু ভ্রম সংশোধন করিতে পারিতেন, কিন্তু "নারায়ণ ভট্টারক" অর্থাৎ নারায়ণ দেবতাকে "বেণীসংহার"-প্রণেতা ভট্টনারায়ণ বলিয়া অবধারণ করিবার জন্য তিনি এরূপ অধিক মাত্রায় ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে, ক্ষণকালের জন্যও সেই সকল বিষয় তাঁহার মনে উদিত হয় নাই।

ব্রাহ্মণদিগকে যে নিষ্কর ভূমি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাই ব্রহ্মোত্তর আখ্যা দ্বারা আখ্যাত হইয়া থাকে। ব্রহ্মোত্তরের সনন্দগুলি সর্ব্বত্রই এক প্রণালীতে লিখিত। যথা—গোত্র, প্রবর, বেদ ও তদন্তর্গত শাখা দ্বারা পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক পিতা, পিতামহের নাম উল্লেখ করিয়া, গ্রহীতার নাম লিখিত হইত। উদাহরণস্বরূপ কয়েকখণ্ড তাম্রশাসনের সেই সেই অংশ এ স্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

অন্যান্য রাজ্যের অধিপতিবর্গের তাম্রশাসন পাঠ করিবার পূর্ব্বে, বাঙ্গলার প্রাচীন সনন্দগুলির আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

---

* সাধনা ; ১৩০১ বঙ্গাব্দ, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়।

বাঙ্গলার সেনরাজগণের ক্ষোদিত লিপিসমূহের মধ্যে তিনখানি ব্রহ্মোত্তরের সনন্দ। দুইখানি মহারাজ লক্ষ্মণসেনদেবের তাম্রশাসন। অন্য একখণ্ড কেশবসেনদেবের সনন্দ। লক্ষ্মণসেনের তর্পনদীঘির তাম্রশাসনে লিখিত আছে ;—

"হুতাশনদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় মর্কণ্ডদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় লক্ষ্মীধরদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় ভারদ্বাজসগোত্রায় ভারদ্বাজ-আঙ্গিরস বার্হস্পত্যপ্রবরায় সামবেদকৌথুমিশাখাচরণানুষ্ঠায়িনে হেমাশ্বরথমহাদানাচার্য্যশ্রীঈশ্বরদেবশর্ম্মণে পুণ্যেঽহনি বিধিবদুদকপূর্ব্বকং ভগবন্তং শ্রীমন্নারায়ণভট্টারকমুদ্দিশ্য মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যযশোঽভিবৃদ্ধয়ে কনকহেমাশ্বরথমহাদানে দক্ষিণাত্বেনোৎসৃজ্য আচন্দ্রার্কক্ষিতিসমকালযাবৎ ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন শাসনীকৃত্য প্রদত্তোঽস্মাভিঃ।"*

"ভগবান শ্রীমৎনারায়ণ দেবতার উদ্দেশে মাতাপিতা এবং নিজের পুণ্য ও যশোবৃদ্ধির জন্য" মহারাজ লক্ষ্মণসেনদেব সনন্দের লিখিত ভূমি দান করিয়াছিলেন।

মহারাজ লক্ষ্মণসেনদেবের সুন্দরবনের তাম্রশাসনেও এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়। তাহাতে গ্রহীতার পরিচয়স্থলে লিখিত আছে যে, "জগদ্ধর দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র, নারায়ণধর দেবশর্ম্মার পৌত্র, নরসিংহধর দেবশর্ম্মার পুত্র, গার্গ-গোত্রজ, অঙ্গিরা-বৃহস্পতি-শিন-গর্গ-ভরদ্বাজ-প্রবর, 'ঋগ্বেদাশ্বলায়নশাখাধ্যায়িনে শান্ত-শাবিক' শ্রীকৃষ্ণধর দেবশর্ম্মাকে, মাতাপিতা ও নিজের পুণ্যযশোবৃদ্ধিকামনায় বিধিবদুদকপূর্ব্বক, ভগবান শ্রীমৎনারায়ণ দেবতার উদ্দেশে" ভূমিদান করিলাম।

মহারাজ কেশবসেনের তাম্রশাসনেও প্রায় ঐরূপ বর্ণনা দেখা যায়। ঘটনাক্রমে সম্প্রতি প্রাচীন ত্রিপুরাপতিগণের প্রদত্ত অনেকগুলি বাঙ্গলা তাম্রশাসন আমাদের হস্তগত হইয়াছে। সে সমস্তই ব্রহ্মোত্তরের সনন্দ। সেই সকল তাম্রশাসনে লিখিত আছে, "৺বিষ্ণুপ্রীতে" অমুক ব্রাহ্মণকে এত দ্রোণ ভূমি দান করিলাম। সুতরাং ইহা পরিষ্কাররূপে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, সংস্কৃতে "ভগবন্তং শ্রীমন্নারায়ণভট্টারকমুদ্দিশ্য," বাঙ্গলায় "৺বিষ্ণুপ্রীতে" শব্দ দ্বারা রূপান্তরিত হইয়াছে। প্রীতে শব্দের আভিধানিক অর্থ যাহাই হউক না কেন, নারায়ণ কিম্বা অন্য দেবতার নামে ভূমি উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দান করাই প্রথা ছিল।

পালবংশীয় নরপতিবর্গের অনেকগুলি ক্ষোদিত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে দুইখানিমাত্র ব্রহ্মোত্তরের সনন্দ। "এসিয়াটিক রিসার্চ" নামক সাময়িক পত্রিকার প্রথম খণ্ডে, মহারাজ দেবপালদেবের যে তাম্রশাসনের অনুবাদ

* J. A. B. B. XLIV. p. 12.

ও বিবরণ সার চার্লস উইলকিন্‌স কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পড়িলে জানা যায় যে, ভট্টবিশ্বরথের পৌত্র, ভট্টবৃহদ্রথের পুত্র, ঔপমানব্যগোত্র * ঋগ্বেদ আশ্বলায়নশাখাধ্যায়ী ভট্টবিষ্ণুরথকে কুমিলার অন্তর্গত মিসিকগ্রাম দান করা হইয়াছিল।

বিজ্ঞবর হরনুলী সাহেব আমগাছির তাম্রফলকের যে পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়, মহারাজ নরপালের পুত্র মহারাজ বিগ্রহপালদেব বেদান্তউপাধ্যায় অর্কদেবের পুত্র শাণ্ডিল্যগোত্র সামবেদকৌথুমি-শাখাধ্যায়ী, ব্রহ্মচারী (খোভূত) দেবশর্ম্মাকে "ভগবন্ত (বু) দ্ধ ভট্টারক উদ্দিশ্য" ভূমি দান করিয়াছিলেন।

উল্লিখিত তাম্রশাসনে আমরা নারায়ণভট্টারকের পরিবর্ত্তে "বুদ্ধভট্টারক" শব্দ পাইতেছি। প্রকৃতপক্ষে ভট্টারক-শব্দের আভিধানিক অর্থ যাহাই হউক না কেন, তাম্রশাসন কিম্বা প্রস্তরলিপিসমূহে কেবল রাজা ও দেবতার নামের সহিতই ইহার সংযোগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা শত ক্ষোদিত লিপি হইতে ইহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি। ক্ষোদিত লিপিসমূহে ব্রাহ্মণদিগের নামের সহিত ভট্ট, আচার্য্য, উপাধ্যায় কিম্বা মহামহোপাধ্যায় পদ সংযুক্ত রহিয়াছে। "ভগবান" ও "ভট্টারক" পদ কোনও ব্রাহ্মণের নামের সহিত সংযুক্ত থাকার একটি উদাহরণ, উত্তর ভারতে উমেশ বাবু তাম্রশাসন কিম্বা শিলালিপি হইতে দেখাইতে পারিবেন না। †

ব্রহ্মোত্তরের সনন্দগ্রহীতার যেরূপ বর্ণনা করিবার প্রথা প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল, বাঙ্গলার পাল ও সেন রাজগণের পাঁচ খণ্ড তাম্রশাসন হইতে তাহা প্রদর্শিত হইল। অন্যান্য প্রদেশের অধিপতিবর্গের তাম্রশাসন হইতেও এরূপ বর্ণনা সংগ্রহ করা যাইতে পারে। বাহুল্যবিবেচনায় আমরা তাহা হইতে বিরত হইলাম।

উমেশ বাবুর প্রকাশিত ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনের কিয়দংশ এ স্থলে উদ্ধৃত হইল।

---

* ঔপমানব্য বাৎস্যগোত্রের শাখা। (C. I. I. III. 199.)

† উমেশ বাবু টানিয়া বুনিয়া দুইটি উদাহরণ দক্ষিণাপথ হইতে আমাদের বিরুদ্ধে উপস্থিত করিতে পারেন। কয়েকজন জৈন গুরুর নামের সহিত "ভট্টারক" ও "ভট্টারকসূরি" শব্দ সংযুক্ত দেখা যায়। লাটদেশীয় পাশুপত সম্প্রদায়ের আদিগুরুকে শিবাবতার বলিয়া "ভট্টারক" আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার নামের সহিত "ভগবান"-শব্দ সংযুক্ত নাই।

"মতমস্তু ভবতাং।

"মহাসামন্তাধিপতিশ্রীনারায়ণবর্ম্মণা দূতকযুবরাজশ্রীত্রিভুবনপালমুখেন বয়মেবং বিজ্ঞাপিতাঃ যথাঽস্মাভির্মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যাভিবৃদ্ধয়ে শুভস্থল্যাং দেবকুলং কারিতস্তত্র প্রতিষ্ঠাপিতভগবন্নন্ননারায়ণভট্টারকায় তৎপ্রতিপালকলাটদ্বিজদেবার্চ্চকাদিপাদমূলসমেতায় পূজোপস্থানাদিকর্ম্মণে চতুরো গ্রামান্ অত্রত্যহট্টিকাতলবাটকসমেতান্ দদাতু দেব ইতি।"

"ততোঽস্মাভিস্তদীয়বিজ্ঞপ্ত্যা এতে উপরিলিখিতকাশ্চত্বারো গ্রামাস্তলবাটকহট্টিকাসমেতাঃ স্বসীমাপর্য্যন্তাঃ সোদ্দেশাঃ সদশাপচারাঃ অকিঞ্চিৎ প্রগ্রাহ্যাঃ। পরিহৃতসর্ব্বপীড়াঃ ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন চন্দ্রার্কক্ষিতিসমকালং তথৈব প্রতিষ্ঠাপিতাঃ।"

মূলের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া আমরা ইহার এইরূপ অনুবাদ করিলাম।

"তোমরা অবগত হও।

"মহাসামন্তাধিপতি শ্রীনারায়ণ বর্ম্মা কর্ত্তৃক দূতস্বরূপ যুবরাজ ত্রিভুবনপালের মুখে আমরা (ধর্ম্মপাল) এইরূপে বিজ্ঞাপিত হইয়াছি যে, 'আমা (নারায়ণ বর্ম্মা) কর্ত্তৃক মাতা পিতা ও নিজের পুণ্যবৃদ্ধির জন্য শুভস্থলীতে একটি দেবকুল (দেউল) নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। তাহাতে স্থাপিত ভগবান্ নন্ননারায়ণ ভট্টারক (দেবতা) কে তাঁহার প্রতিপালক (পরিচর্য্যাকারক) লাটদেশীয় ব্রাহ্মণ ও দেবপূজক প্রভৃতি পরিচারকের সহিত পূজা ও উপাসনাদি কার্য্যনির্ব্বাহ করিবার জন্য তথাকার হাট বাট খাল ইত্যাদির সহিত চারিখানা গ্রাম, মহারাজ দান করুন।'

"সেই হেতু আমার (ধর্ম্মপাল) দ্বারা তাঁহার (নারায়ণবর্ম্মার) বিজ্ঞাপন অনুসারে উপরের লিখিত স্বসীমান্তর্গত চারি খানা গ্রাম হাট বাট খাল ইত্যাদি ও সর্ব্বপ্রকার ভূমির অবস্থা পরিবর্ত্তনের সহিত, আমাদের গ্রহণীয় কর প্রভৃতি রহিত করিয়া, সর্ব্বপ্রকার বাধা বিঘ্ন পরিহার পূর্ব্বক, চন্দ্র সূর্য্য ও পৃথিবীর স্থিতিকাল পর্য্যন্ত 'ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়ে' * সেইরূপ প্রদত্ত হইল।"

ইহা দ্বারা তাম্রশাসনের মর্ম্ম আমরা এইরূপ স্থির করিয়াছি যে, মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মপালের অধীনস্থ সামন্ত নরপতি নারায়ণবর্ম্মা শুভস্থলী নামক স্থানে এক দেবকুল নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে "নন্ননারায়ণ" নামক এক (বিষ্ণু) দেবতা স্থাপন করেন। তিনি সেই দেবতার সেবা পূজা প্রভৃতির নির্ব্বাহ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য, লাটদেশীয় কতকগুলি ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত সামন্ত নরপতি নারায়ণ বর্ম্মা, যুবরাজ ত্রিভুবন পালের দ্বারা, দেবতার সেবা পূজার ব্যয় এবং পূজক প্রভৃতির জীবিকানির্ব্বাহের জন্য, চারি খানা গ্রাম নিষ্কর প্রদান করিবার কারণ ধর্ম্মপালের নিকট প্রার্থনা করেন। কারণ,

---

* প্রায় সকল দানপত্রেই "ভূমিচ্ছিদ্র" শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ডাক্তার বুলার ইহার অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন—"কৃষিঅযোগ্য ভূঃ"।

অন্যান্য তাম্রশাসনপাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, সামন্ত নরপতিবর্গের এরূপ নিষ্করভূমিপ্রদানের অধিকার ছিল না; এজন্য নারায়ণবর্ম্মা ধর্ম্মপালের নিকট এরূপ প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ধর্ম্মপাল নারায়ণবর্ম্মার সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করেন।

উদ্ধৃত অংশের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া উমেশ বাবু লিখিয়াছেন :—

"তাম্রশাসনের যে প্রতিলিপি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায়, পুণ্ড্রবর্দ্ধন বা মাজবায়েদেশে * শুভস্থলী নামক স্থানে রাজা ধর্ম্মপালের মহাসামন্তাধিপতি শ্রীনারায়ণ বর্ম্মা এক দেবকুল বা দেউল নির্ম্মাণ করিয়া তাহার প্রতিপালনের ভার লাটদেশীয় কতকগুলি দ্বিজের উপর ন্যস্ত করেন, এবং ভট্টনারায়ণ উক্ত দ্বিজগণের স্থানে অতিথিস্বরূপ আগমন করেন। লেখায় প্রণালীতে উক্ত লাটদেশীয় দ্বিজেরা বিশেষ গণ্য মান্য ও পূজ্য লোক ছিলেন বোধ হয়; কেন না অভ্যাগত ভট্টনারায়ণ "তৎপ্রতিপালক লাট দ্বিজ দেবার্চ্চকাদি" পাদমূল সমেত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। "পাদমূলসমেত" শব্দে উক্ত ব্রাহ্মণেরা ভট্টনারায়ণের গুরুশ্রেণীর লোক ছিলেন বিবেচনা করিতে হইবে।"

উল্লিখিত ব্যাখ্যা আমাদের বিবেচনায় নিতান্ত অসমীচীন বোধ হইতেছে; কারণ,—

দেবকুলে একটি দেবতা থাকা আবশ্যক; নচেৎ দেবকুল হইতে পারে না। দেবতা স্থাপিত না হইলে দেবার্চ্চকের প্রয়োজন কি? দেবতা না থাকিলে পূজা উপাসনাদি কাহার হইবে? মাতাপিতা এবং নিজের পুণ্যবৃদ্ধির জন্য কেবল একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিলে চলে না, তাহাতে দেবতাস্থাপন করা চাই।

নারায়ণভট্টারক যদি নারায়ণভট্ট হয়েন, তাহা হইলে, "তত্র (অর্থাৎ সেই দেবালয়ে) প্রতিষ্ঠাপিত ভগবন্নারায়ণভট্টারকায়" এই সমস্ত অর্থাৎ সমাসযুক্ত সুদীর্ঘ পদের সম্পূর্ণ অর্থ উমেশ বাবু কি স্থির করেন, তাহা আমরা জানিতে ইচ্ছা করি। যদি ভট্টনারায়ণ কবিকে ভূমিদান করা হইয়াছিল বলা হয়, তাহা হইলে "পূজোপস্থানাদিকর্ম্মণে" শব্দ ব্যবহার করিবার কি প্রয়োজন ছিল?

"পাদমূলসমেত" কথার অর্থ উমেশ বাবু কি করেন? আমাদের বিবেচনায়, সেই নারায়ণ দেবতার পূজক প্রভৃতি পরিচারকবর্গকেই "পাদমূল" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যেরূপ দেবতার সেবা পূজার ব্যয়নির্ব্বাহ হইবে, সেইরূপ সেই চারি খানা গ্রামের উপস্বত্ব দ্বারা দেবপূজক প্রভৃতি পরিচারকবর্গেরও জীবিকানির্ব্বাহ হইবে। পরিচারকবর্গ-

* পুণ্ড্রবর্দ্ধন অর্থে সমগ্র বাঙ্গালার সুবাহ নয়।

কেও সেই দেবতার এক একটি অঙ্গ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। নিকৃষ্ট অঙ্গবোধে "পাদমূল" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

নারায়ণভট্ট-নামক ব্যক্তিকে যদি চারি খানা গ্রাম দান করা হইত, তাহা হইলে ব্রহ্মোত্তরের সনন্দের নিয়মানুসারে, নারায়ণভট্টের পিতা, পিতামহের নাম এবং গোত্রপ্রবরাদি অবশ্যই তাম্রশাসনে লিখিত হইত।

দেবল ব্রাহ্মণ হইতে অভ্যাগত নারায়ণ ভট্টকে উমেশ বাবু নিকৃষ্ট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, অথচ সেই নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণকেই তিনি কেবল রাজা, দেবতা ও তপঃপরায়ণ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের উপযুক্ত স্বামিত্ব-বোধক উপাধি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার উক্তিসমূহ পরস্পরবিরোধী হইয়া দাঁড়াইতেছে। কি আশ্চর্য্য, সেই দেবল ব্রাহ্মণদিগের শিষ্যশ্রেণীর লোক নারায়ণ "ভগবান" ও "ভট্টারক" বলিয়া বর্ণিত হইলেন।

বেণীসংহারনাটক-রচয়িতা ভট্টনারায়ণ মহারাজ ধর্ম্মপালের সমসাময়িক হইতে পারেন? তৎসম্বন্ধে আমরা কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু উমেশ বাবু যে তাঁহাকে তাম্রশাসনের লিখিত "নারায়ণ ভট্টারক" নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাই আমাদের বিবেচনায় নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হইতেছে। উমেশ বাবু বলিয়াছেন যে, "পঞ্চালরাজ ভট্টনারায়ণের গ্রন্থের উপযুক্ত সমাদর করিলেন না, এজন্য তিনি জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালের নিকট গমন করিলেন।" পাটলীপুত্র নগরে ধর্ম্মপালের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না। তিনি এক লম্ফে কান্যকুব্জ হইতে একবারে পুণ্ড্রবর্দ্ধনে উপনীত হইলেন; তত্রত্য সামন্ত নরপতি নারায়ণ বর্ম্মা বেণীসংহারের অভিনয়দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহাকে চারি খানা গ্রাম দান করিবার সঙ্কল্প করিয়া, যুবরাজ ত্রিভুবনপালের দ্বারা ধর্ম্মপালের নিকট প্রার্থনা করিলেন। বেণীসংহার লইয়া যে ভট্টনারায়ণ ধর্ম্মপালের নিকট গমন করিয়াছিলেন, তাহার কোনও উল্লেখই হইল না। অথচ উমেশ বাবু বিশেষ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, স্বদেশে বেণীসংহারের সমাদর না হওয়াতে, ভট্টনারায়ণ সেই গ্রন্থ লইয়া, গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালের নিকট আসিয়াছিলেন। উমেশ বাবুর লেখা অনুসারে, ভট্টনারায়ণ স্বকৃত কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ চারি খানা গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাম্রশাসনে তাঁহাকে "কবি" বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই,— তাহাতে তাঁহাকে দেবতার ন্যায় বর্ণনা করা হইয়াছে। তাম্রশাসনের লিখিত নারায়ণ ভট্টারক কখনই বেণীসংহার-রচয়িতা ভট্টনারায়ণ হইতে পারেন না।

পালবংশীয় নরপতি মহারাজাধিরাজ নারায়ণপালদেবের এইরূপ এক খণ্ড দেবোত্তরের সনন্দ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই তাম্রশাসনপাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, মহারাজাধিরাজ নারায়ণপালদেব কালপোত নামক স্থানে স্বয়ং "সহস্রায়তন" (ডাক্তার মিত্র মহাশয়ের মতে সহস্র দেবমন্দির) নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে "ভগবতঃ শিবভট্টারক (শিবদেবতাকে) কে" প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া, পরিষদ (অর্থাৎ পরিচারক) পাশুপত আচার্য্যকে নিযুক্ত করিয়া, সেই দেবতার "পূজাবলিচরুসত্র" ইত্যাদি নির্ব্বাহের জন্য, মুকুতিকা গ্রাম দান করিয়াছিলেন।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের ভ্রমাত্মক অনুবাদ দেখিয়া উমেশ বাবু "ভগবতঃ শিবভট্টারক" কে শিবভট্ট-নামক ব্যক্তি অবধারণ করিয়াছেন। মিত্র মহাশয় উপরিলিখিত অংশের অনুবাদ করিয়াছেন,—

"Narayan-pala Deva himself has established thousands of temples and where he has placed the honorable Siva Bhatta and Pasupati Acharya."

পুরাতত্ত্ববিভাগে মিত্র মহোদয় বঙ্গীয় লেখকদিগের পথপ্রদর্শক। তাঁহার জীবিতাবস্থায় আমরা বিবিধ প্রবন্ধে তাঁহার ভ্রমপ্রমাদ প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করি নাই; কিন্তু এখন তিনি স্বর্গগত, এক্ষণে তাঁহার ভ্রমপ্রমাদের কথা উল্লেখ করা আমাদের পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর কার্য্য। কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, তৎকৃত নারায়ণপালদেবের তাম্রশাসনের অনুবাদ ভ্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ। "ভগবতঃ শিবভট্টারককে" Honorable Siva Bhatta লেখা সঙ্গত কি না, পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন। এই তাম্রশাসনের প্রতিলিপি ও অনুবাদ, তিনি প্রথমতঃ ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদনন্তর, তাহা তাঁহার Indo-Aryans গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। পশ্চাৎ পুনর্ব্বার আমাদিগকে নারায়ণপালদেবের তাম্রশাসনের কথা উল্লেখ করিতে হইবে।

আমরা উমেশ বাবুকে "সিয়াদোনীর শিলালিপি" পাঠ করিতে অনুরোধ করি। উক্ত শিলালিপিতে "শ্রীবিষ্ণুভট্টারক," "শ্রীনারায়ণভট্টারক," "বামনস্বামীদেব" এবং "চক্রস্বামীদেব" প্রভৃতি দেবতাকে ভূমি দান করা হইয়াছে। উক্ত শিলালিপির অনুবাদক ডাক্তর কিল্‌হরণ তৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"From the above abstract it will appear that most of the donations recorded here were made in favour of the god Vishnu, under the name of *Vishnu-bhattaraka, Narayana-bhattaraka*, Vamanasvamideva and Chakrasvamideva."—*Epigraphia Indica*; Vol. I. p. 168.

"সিউকি" (হিয়োৎসাঙের ভ্রমণবৃত্তান্ত) গ্রন্থপাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, হিয়োৎসাঙের ভারতভ্রমণের অল্পকাল পূর্ব্বে নেপালে অংশুবর্ম্মণ নামে এক নরপতি ছিলেন। * উক্ত নরপতির নামাঙ্কিত কতকগুলি খোদিত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে কয়েক খণ্ড শিলালিপির আরম্ভে এইরূপ বর্ণনা আছে,—"ভগবৎপশুপতিভট্টারকপাদানুগৃহীতো বপ্পপাদানুধ্যাতঃ অংশুবর্ম্মা কুশলী।" আমাদের স্বদেশীয় পণ্ডিত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র "ভগবতঃ শিবভট্টারক" শব্দের অনুবাদ করিয়াছিলেন—Honorable Siva Bhatta. আর বিদেশী পণ্ডিত ডাক্তার বুলার উদ্ধৃত অংশের অনুবাদ করিয়াছেন,—

"The illustrious Amsuvarman, who has been favoured by the feet of *the divine Lord Pasupati* and meditates on the feet of Bappa.—*Inscriptions from Nepal*. pp. 7, 8, 9, 10.)

১১৯ খৃষ্টাব্দে শিবদেব নামক নরপতি নেপাল শাসন করিয়াছিলেন। কাটমুণ্ডের অন্তর্গত লগনতোল নামক স্থানস্থিত একটি ক্ষুদ্র মন্দিরগাত্রে উক্ত শিবদেবের যে খোদিত শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহার প্রথম তিনটি পংক্তি এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

"ওঁ স্বস্তি শ্রীকৈলাসকূটভবনাৎ লক্ষ্মীলতালম্বনকল্পপাদপো ভগবৎপশুপতিভট্টারকপাদানুগৃহীতো বপ্পপাদানুধ্যাতপরমভট্টারকমহারাজাধিরাজশ্রীশিবদেবকুশলী।"

ডাক্তার বুলার ইহার অনুবাদ করিয়াছেন :—

"Om. Hail! From the famous palace (called) Kailaskuta! The supreme Lord and great King of kings illustrious Sivadeva, who resembles a tree of Paradise to which the creeper, Fortune, clings, who has received favour from the feet of *the lord, the divine Pasupati*, and meditates on the feet of Bappa,"—*Inscriptions from Nepal*. pp. 13, 14.

উচ্চকল্প মহারাজ সর্ব্বনাথের ১৯৩ (গুপ্ত) অব্দের তাম্রশাসনে "প্রতিষ্ঠাপিত" দেবতার "বলি, চরু, সত্র, গন্ধ, ধূপ, মাল্য, দীপ" প্রভৃতি দান জন্য ভূমি প্রদত্ত হইয়াছিল। তাহাতে প্রতিষ্ঠিত দেবতাকে "ভট্টারক" শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। †

মগধাধিপতি মহারাজাধিরাজ (দ্বিতীয়) জীবিত গুপ্তের "দেওবরণার্কের" খোদিত লিপি পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, মহারাজ বালাদিত্য বরুণিকা নামক

---

* Beal's Si-yu-ki. Vol. II. p. 81.

† Corpus Inscriptionum Indicarum. Vol. III. p. 127.

গ্রাম বরুণবাসী নামক দেবতাকে দান করিয়াছিলেন, তাহাতে সেই দেবতার নাম "ভগব-শ্রীবরুণবাসী ভট্টারক" এইরূপ লিখিত হইয়াছে। *

তাম্রশাসন কিম্বা শিলালিপিতে যেস্থানে কোনও নামের পূর্ব্বে "ভগবান" এবং অন্তে "ভট্টারক" শব্দ সংযুক্ত হইয়াছে, সেই স্থলে সেই নামটি যে কোনও দেবতার নাম হইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না। তাম্রশাসন ও শিলালিপিসমূহের আলোচনা করিলে, উমেশ বাবু অবশ্যই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন। আপাততঃ এ বিষয়ে আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

উমেশ বাবু ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনের "লাটদ্বিজ" পদের "লাট" শব্দ লইয়া কিছু গণ্ডগোল করিয়াছেন। এক্ষণে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিব।

আমরা বিবিধ ক্ষোদিত লিপিতে লাটদেশীয় ব্রাহ্মণের উল্লেখ দর্শন করিয়াছি। উদাহরণস্বরূপ দুই একটির কথা উল্লেখ করিব।

চেদীরাজ্ঞী অহলণদেবীর ভেরাঘাটের ক্ষোদিত লিপিতে "লাটবংশীয় পাশুপততপস্বী রুদ্ররাশির নাম গ্রথিত রহিয়াছে। † (লাটান্বয় পাশুপত-তপস্বী শ্রীরুদ্ররাশি—। ৩১ শ্লোক।)

বিরিঞ্চিপুরের নিকটবর্ত্তী এক দেবমন্দিরের ক্ষোদিত লিপিতে লাটদেশীয় ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে। ‡

লাটদেশীয় ব্রাহ্মণেরা যে তদানীন্তন আর্য্য-সমাজে বিশেষরূপে পরিচিত ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। §

উমেশ বাবুর মতে লাটদেশ কান্যকুব্জের নামান্তর এবং প্রাচীন পঞ্চালের একাংশ। আমাদের বিবেচনায়, উমেশ বাবুর এই মত নিতান্ত ভ্রমাত্মক। আমাদের মতের সমর্থক প্রমাণ প্রদর্শনের পূর্ব্বে, এ সম্বন্ধে উমেশ বাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সমালোচনা করিব।

উমেশ বাবু কুলাচার্য্যদিগের একটি বচন উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে, আদিশূরের সময়ে "বিশিষ্টবিপ্রনিলয় কোলাঞ্চদেশ" হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, কান্যকুব্জ ও কোলাঞ্চ অভিন্নদেশ। কিন্তু কোলাঞ্চ যে লাটদেশের অন্য নাম, উমেশ বাবু তাহার কিছুমাত্র প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন নাই।

---

* Corpus Inscriptionum Indicarum. Vol. III. p. 216.
† Epigraphia Indica Vol. II. p. 13.
‡ South-Indian Inscription. Vol. I. pp. 82, 84.
§ Epigraphia Indica Vol. I. p. 156.

মন্দসরের শিলালিপির কথা উমেশ বাবু উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত শিলালিপির প্রতিকৃতি (Photo-Lith.), প্রতিলিপি ও অনুবাদ ফ্লিট্ সাহেব প্রথমতঃ Indian Antiquary পত্রিকার পঞ্চদশ খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদনন্তর তাঁহার Corpus Inscriptionum Indicarum Vol. III গ্রন্থের ৭৯ পৃষ্ঠা হইতে ৮৮ পৃষ্ঠায় উহা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

উক্ত শিলালিপির ত্রয়োদশ পংক্তিতে লিখিত আছে,—

> চতুঃসমুদ্রান্তবিলোলমেখলাং সুমেরুকৈলাসবৃহৎপয়োধরাম্।
> বনান্তবান্তস্ফুটপুষ্পহাসিনীং কুমারগুপ্তে পৃথিবীং প্রশাসতি।

চতুঃসমুদ্রের প্রান্তরেখা যাহার চঞ্চল মেখলা, সুমেরু ও কৈলাস পর্ব্বত যাহার বৃহৎ পয়োধর, বিকসিত বনকুসুম যাহার হাস্য, তাদৃশ সুন্দরীরূপা বসুন্ধরাকে কুমারগুপ্ত যৎকালে শাসন করিতেছিলেন।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে, এই কুমারগুপ্ত কে? ফ্লিট সাহেব কুমারগুপ্তকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র এবং স্কন্দগুপ্তের পিতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ফ্লিট সাহেবের গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পর, ভূগর্ভ হইতে একটি মুদ্রা প্রকাশিত হইয়া তাঁহার যুক্তিতর্কের কিয়দংশ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া গিয়াছে।* উক্ত মুদ্রা অবলম্বন করিয়া গুপ্তবংশের নিম্নলিখিত বংশাবলী লিখিত হইল।

মহারাজা শ্রীগুপ্ত।
|
মহারাজা শ্রীঘটোৎকচ।
|
মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্রগুপ্ত, মহাদেবী কুমার দেবী।
|
মহারাজাধিরাজ শ্রীসমুদ্রগুপ্ত, মহাদেবী দত্ত দেবী।
|
মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্রগুপ্ত (দ্বিতীয়), মহাদেবী ধ্রুবদেবী।
|
মহারাজাধিরাজ শ্রীকুমারগুপ্ত, মহারাণী অনন্তদেবী।

মহারাজাধিরাজ স্কন্দগুপ্ত। — মহারাজাধিরাজ পুরগুপ্ত, মহাদেবী শ্রীবৎসাদেবী।
|
মহারাজাধিরাজ নরসিংহ গুপ্ত, মহাদেবী শ্রীমতী দেবী।
|
মহারাজাধিরাজ কুমার গুপ্ত (দ্বিতীয়)

ফ্লিট সাহেব, মন্দসরের শিলালিপিতে ৪৯৩ মালবসম্বৎ প্রাপ্ত হইয়া টমাস, কনিংহাম প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মত গ্রহণ করিয়া, গুপ্তরাজগণের যে সময়াবধারণ করিয়াছিলেন, মন্দসরের শিলালিপিতে উৎকীর্ণ কুমারগুপ্তকে দ্বিতীয়

* Journal Asiatic Society, Bengal. Vol. LVIII. part I. p. 89

কুমারগুপ্ত অবধারণ করিলে, ক্লিট সাহেব কিরূপে যে তাহার যুক্তি তর্ক স্থির রাখিবেন, তাহা বলিতে পারি না। যাহা হউক, এস্থলে সে তর্ক উপস্থিত করা নিষ্প্রয়োজন। মন্দসরের শিলালিপিতে লিখিত কুমারগুপ্ত, প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত, যিনিই হউন না কেন, তাঁহার শাসনকালে "লাট" (আমাদের বিবেচনায় লাঢ়) দেশ হইতে এক দল পট্টবস্ত্রবয়নকারী তন্তুবায় দশপুর নগরে গিয়া বাস করেন। উক্ত তন্তুবায়গণ সুচিক্কণ ও সুবিচিত্র পট্টবস্ত্র বয়নে সুনিপুণ ছিলেন। তাঁহারা সেই দশপুর (মন্দসর) নগরে এক সূর্য্যমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উল্লিখিত তন্তুবায়গণের আদি নিবাসভূমিতে ক্লিট সাহেব "লাটবিষয়" পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা শিলালিপির প্রতিকৃতির ঐ স্থানটি পাঠ করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি (Photo-leth, 3rd Line) অক্ষর এরূপ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে যে, ক্লিট সাহেব যে স্থলে "লাট" পাঠ করিয়াছেন, আমরা সে স্থলে লাঢ় পাঠ করিলে, কোনও আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে না, এবং আমাদের মতে সেই শ্লোকটি এইরূপ পাঠ করিতে হইবে,—

"কুসুমভারানততরুবরদেবকুলসভাবিহাররমণীয়াৎ।
লাঢ়বিষয়ান্নগাবৃতশৈলাজ্জগতি প্রথিতশিল্পা॥

লাঢ় দেশ কুসুমভারাবনত তরুরাজি দ্বারা বিশোভিত, তথায় বহুতর দেবকুল, সভা ও (বৌদ্ধ) বিহার ছিল, তথাকার পর্ব্বত সকল তরুগুল্মে আবৃত ছিল।

উমেশ বাবু বলেন, এই বর্ণনা কান্যকুব্জ দেশের পক্ষেও খাটে; তিনি বিশ্বকোষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া চীনপরিব্রাজক হিয়োনসাঙের লিখিত কান্যকুব্জের বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু বিশ্বকোষপ্রণেতা হিয়োনসাঙের বর্ণনার অবিকল অনুবাদ করেন নাই। যাহা হউক, কান্যকুব্জের বর্ণনায় হিয়োনসাঙ এক স্থানে লিখিয়াছেন যে,

Not far to the south of the stone *Vihara* is a temple of Sun-Deva. Not far to the south of this is a temple of Mahesara. The two temples are built of a blue stone of great lustre, and are ornamented with various elegant sculptures. (Si-Yu-Ki. Vol. I. p. 223.)

হিয়োনসাঙের বর্ণনা অনুসারে কান্যকুব্জ নগরে একটি সূর্য্যমন্দির ছিল। তদনুসারে উমেশ বাবু লিখিয়াছেন যে, "লাটদেশীয় তন্তুবায়েরা কনোজের নীলপ্রস্তরনির্ম্মিত সূর্য্যমন্দিরের অনুকরণ করিয়াই দশপুরের সূর্য্যমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিল। কেবল সূর্য্যমন্দির দর্শন করিয়াই যদি লাট (লাঢ়) দেশ নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে আমরা মুলতানকেই লাট (লাঢ়) দেশ স্থির করিতে পারি। কারণ, যদিও প্রাচীন ভারতের অনেক স্থলেই সূর্য্যমন্দির নির্ম্মিত হইয়া-

ছিল, * কিন্তু মুলতানের সূর্য্যমন্দিরের ন্যায় এরূপ উৎকৃষ্ট প্রাচীন মন্দির অন্য কোনও স্থানে ছিল না। পরিব্রাজক হিয়োনসাঙ মুলতানের সূর্য্যমন্দিরের ও সূর্য্যদেবের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

There is a temple dedicated to the Sun, very magnificient and profusely decorated. The image of the Sun-deva is cast in yellow gold and ornamented with rare gems. Its devine insight is mysteriously manifested and its spiritual power made plain to all. Women play their music, light their torches, offer their flowers and perfumes to honour it. This custom has been continued from the very fast. (Si-Yu-Ki. Vol. II. p. 274.)

প্রাচীন মুসলমান ভ্রমণকারী এবং ইতিহাস ও ভূগোল বিবরণের লেখকগণও উক্ত সূর্য্যমন্দিরের বিশেষ বর্ণনা করিয়াছেন†; মহম্মদ বিনকাসিম এই সূর্য্যদেবের গলদেশে গোমাংসহার বিলম্বিত করিয়াছিলেন।

হিয়োনসাঙের সময়ে ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই, দেউল, সঙ্ঘাগৃহ ও বৌদ্ধবিহার ছিল। ইহা দ্বারা কান্যকুব্জ ও লাঢ় দেশ অভিন্ন হইতে পারে না।

"লাঢ়বিবরান্ নগাবৃত শৈলাৎ" এই বর্ণনা কোনও রূপেই কান্যকুব্জের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। এই তরুগুল্মসমাচ্ছাদিত শৈলাকীর্ণ লাঢ়দেশ কোথায়, তাহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে।

---

* ইন্দ্রপুরের (বুলান্দ সহরের অধীন ইন্দোর) সূর্য্যমন্দির, তমসানদীর তীরস্থিত (মধ্যভারতের অন্তর্গত) আশ্রমাকর সূর্য্যমন্দির, গোয়ালিয়ারের সূর্য্যমন্দির, মগধের অন্তর্গত দেববরুণার্কের (সাহাবাদ জেলার অন্তর্গত) সূর্য্যমন্দিরের ক্ষোদিত লিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। প্রাচীন ভারতের সর্ব্বত্রই সূর্য্যোপাসনা প্রচলিত ছিল। প্রস্তরক্ষোদিত সূর্য্যমূর্ত্তি, সূর্য্যচক্র, ও সূর্য্যরথ, বিবিধ স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিবিধ রাজ্যের নরপতিগণ ক্ষোদিত লিপিসমূহে "পরমাদিত্যভক্ত" বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এমন অবস্থায় কান্যকুব্জের সূর্য্যমন্দিরের অনুকরণ করিয়া দশপুরের সূর্য্যমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, এরূপ অবধারণ, উমেশ বাবুর ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সঙ্গত কার্য্য হয় নাই। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যে সকল সূর্য্যমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তন্মধ্যে কোণার্কের সূর্য্যমন্দির সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু তাহা ১১৬০ শকাব্দে নির্ম্মিত বলিয়া, উমেশ বাবুর প্রকাশিত মতের বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করিলাম না।

† ভূগোলবেত্তা ইবন হাকল ৯৭৭ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন :—There is an idol in the place held in great venaration by the Hindus and people from distant parts undertake a yearly pilgrimage to its temple and there expend vast sums of money. * * The idol has a human shape, and is seated with its legs bent in a quadrangular posture, on a pedestal made of brick and mortar. Its whole body is covered with a red skin like Morocco leather, but its eyes are open. * * The eyes of the idol are of some precious gem, and its head is covered with a crown of Gold. (Elliot's India, Vol. I. p. [illegible].)

উমেশ বাবু লিখিয়াছেন যে,

"কুমারগুপ্ত কান্যকুব্জের একজন প্রসিদ্ধ সম্রাট। তক্ষকেরা কথন লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে যে, কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে আমরা এদেশে (দশপুরে) আসিয়াছিলাম, তখন কি সিদ্ধান্ত হইতেছে না যে, তাহারা কুমারগুপ্তের রাজ্যের প্রজা ছিল? তাহাতে লাট দেশ কি কান্যকুব্জের অন্তর্গত হইতেছে না?"

বিজ্ঞবর টমাস, কনিংহাম, স্মিথ ও ফ্লিট সাহেব বিশেষ ভাবে গুপ্তবংশের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই গুপ্তরাজগণকে একমাত্র কান্যকুব্জের রাজা বলিয়া বর্ণনা করেন নাই। গুপ্তরাজগণের রাজধানীর স্থিতিস্থল নির্ণয় করিবার জন্য স্মিথ সাহেব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন। সমস্ত ক্ষোদিত লিপি ও আবিষ্কৃত মুদ্রাসমূহের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া স্মিথ সাহেব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, পাটলিপুত্র নগর তাঁহাদের রাজধানী ছিল। * ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে স্মিথ সাহেব লিখিয়াছেন, But, I am still of opinion that Pataliputra has the best claim to be considered the Gupta capital. প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত প্রিন্সেপ সাহেব প্রাচীন মুদ্রার শ্রেণী বিভাগ করিতে গিয়া গুপ্তরাজগণের মুদ্রাকে কনোজ শাখার (Konuj series) অন্তর্গত নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তদনুসারে একটি ঐতিহাসিক ভ্রম সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছে; তৎসম্বন্ধে স্মিথ সাহেব লিখিয়াছেন,

---

এল মাসাদি ইবন হাকুলের প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে লিখিয়াছেন :—"In it is the idol also known by the name of Multan. The inhabitants of the Sind and India perform pilgrimages to it from the most distant places: they carry money, precious stones, ale-wood, and all sorts of perfumes there to fulfil their vows. (Elleot's India. By Dowson. Vol. I. p. 23.)

মোরোক্কোদেশীয় বিখ্যাত ভূগোলবেত্তা এল ইদ্রিসী, খৃষ্টাব্দের একাদশ শতাব্দীতে লিখিয়াছেন :—"There is an idol here, which is highly venerated by the Indian, who came on pilgrimages to visit it from the most distant parts of the country, and make offerings of valuables, ornaments, and immense quantities of perfumes. * * * It is in the human form with four sides, and is sitting upon a seat made of bricks and plaster. It is entirely covered wiih a skin like red morocco, so that the eyes only are visible. * * The eyes are formed of precious stones and upon its head there is a gold crown set with jewels. * * The temple of this idol is situated in the middle of Multan, * * There is no idol in India or Sind woich is more highly venerated. (Elliot's India. By Dawson. Vol. I. p. 82.)

* Smith's Gold coins of the Imperial Gupta Dynasty. (J. A. S. B. LIII. I. 161.) * Smith's The coinage of the Early or Imperial Gupta Dynasty of Northern India. (J. R. A. S. XXI. 56.)

The Guptas had no more to do with Kanauj than they had to do with Mathura or Gaya, or any other big city in their empire; but errors die hard, and I suppose that, because Prinsep used an incautious phrase fifty years ago, people will still fifty years hence, insist on speaking of 'the Guptas of Kanauj.

সমুদ্রগুপ্তের লাট প্রস্তরলিপি এবং মন্দসারের শিলালিপি পাঠে অনুমিত হয় যে, যে লাঢ়দেশ হইতে তন্তুবায়গণ দশপুরে গমন করিয়াছিলেন, সেই লাঢ়দেশ এবং দশপুর, উভয়ই গুপ্তসম্রাটগণের সামন্ত নরপতির দণ্ডাধীন ছিল। এই লাঢ় কিম্বা লাটদেশের সহিত কান্যকুব্জের কোন সংস্রব নাই।

বাঙ্গলাদেশের পশ্চিমাংশ অদ্যাপি আমাদের নিকট রাঢ়দেশ বলিয়া পরিচিত রহিয়াছে। পালিগ্রন্থ সমূহে রাঢ়কে লাঢ় বা লাল লেখা হইয়াছে।* শকাব্দের দশম শতাব্দীর চোলরাজ "কো-পরকেশী বর্ম্মণ" নামান্তর "রাজেন্দ্র চোলদেবের তিরুমলির পর্ব্বতগাত্রে ক্ষোদিত লিপিতেও বঙ্গের পার্শ্বস্থিত উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তাহাতে উত্তর রাঢ়কে "উত্তির লাঢ়" এবং দক্ষিণ রাঢ়কে "তক্কন লাঢ়" লেখা হইয়াছে। হিয়ানসাঙের বর্ণনা অনুসারে রাঢ়দেশের উত্তরাংশ কচ্ছ গৌড়ের, মধ্যভাগ করণ সুবর্ণের এবং দক্ষিণাংশ তাম্রলিপ্তরাজ্যের অধীন হইতেছে। ইহাতে বহুসংখ্যক বৌদ্ধবিহার, সভাগৃহ ও দেবমন্দির হিয়োনসাঙ দর্শন করিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য লেখকদিগের একটা রোগ আছে, তাঁহারা "লাঢ়" শব্দ পাইলেই তাহাকে গুর্জ্জরের অন্তর্গত লাট দেশ স্থির করিয়া বসেন। প্রাচীন মুসলমান লেখকগণ গুর্জ্জরের অন্তর্গত লাটদেশকে "লারদেশ" লিখিয়াছেন, এবং এই লারদেশ যে অনহিলবাড়াপত্তনের দক্ষিণদিকে অবস্থিত, তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন।† কুমারপালের "বদ নগর" প্রশস্তিতে ইহাকে "লার" লেখা হইয়াছে। উক্ত প্রশস্তির অনুবাদক ভুলার টীকায় সেই লারকে "লাট" স্থির করিয়াছেন।‡ যাহা হউক, গুজরাটের দক্ষিণ ও মধ্যভাগের প্রাচীন নাম লাটদেশ এবং আমাদের রাঢ়দেশের প্রাকৃত বা "পালি" নাম লাঢ়দেশ। আমাদের বিশ্বাস, কুমারগুপ্তের শাসনকালে লাঢ় বা রাঢ়দেশীয় পট্টবস্ত্রবয়নকারী একদল তন্তুবায় দশপুরে গমন করিয়াছিলেন। রাঢ়দেশীয় পট্টবস্ত্রবয়নকারী তন্তুবায়গণ প্রাচীনকাল হইতে জগতে যে আত্মপ্রাধান্য লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন,

---

* টর্ণরের প্রকাশিত মহাবংশ,—ভূমিকা ১৩ পৃষ্ঠা ও মূলগ্রন্থ ৬০ পৃষ্ঠা।
† Elliot's India. Vol. I, p. 39.
‡ Epegraphia Indica. Vol. I. p. 297.

অদ্যাপি তাহা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয় নাই। উমেশ বাবু কি প্রাচীন রোমকদিগের লিখিত কটদ্বীপের (কাঁটোয়ার) নামও অবগত নহেন? অদ্যাপি মুর্শিদাবাদের চেলির কাপড় জগতে অপরিচিত নহে। মন্দসারের শিলালিপিতে লিখিত "লাঢ়" দেশ যে পশ্চিমদেশীয় "লাট" নহে, উক্ত শিলালিপিতেই তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্ত শিলালিপির সপ্তদশ পংক্তিতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি লিখিত রহিয়াছে,—

"বিস্তীর্ণতুঙ্গশিখরং শিখরিপ্রকাশং অভ্যুদ্গতেন্দ্বমলরশ্মিকলাপগৌরম্।
যদ্ভাতি পশ্চিমপুরস্য নিবিষ্টকান্তচূড়ামণিপ্রতিসমন্নয়নাভিরামং॥

তন্তুবায়গণের নির্ম্মিত সূর্য্যমন্দির পশ্চিমদেশীয় দশপুর নগরের চূড়ামণিস্বরূপ হইয়াছিল ¶। দশপুর নগরের বহুদূর পশ্চিমে লাটদেশ অবস্থিত এবং বহুদূর পূর্ব্বে লাঢ় (রাঢ়) দেশ অবস্থিত, সুতরাং পূর্ব্বদেশীয় তন্তুবায়গণই দশপুরকে পশ্চিমদেশীয় নগরী বলিতে পারেন। উমেশ বাবুর সিদ্ধান্ত অনুসারে যদি কান্যকুব্জই লাটদেশ হইত, তাহা হইলে এস্থলে "পশ্চিমপুরস্য" না লিখিয়া দশপুরকে দক্ষিণদেশীয় নগরী বলা হইত। কারণ, কান্যকুব্জের দক্ষিণ দিকে দশপুর অবস্থিত।

উমেশ বাবুর মতে, কান্যকুব্জ ও লাট, উভয়ই প্রাচীন পঞ্চালের অন্তর্গত। উমেশ বাবু অলঙ্কারশাস্ত্র হইতে "লাটানুপ্রাস" নামক শব্দালঙ্কারের উল্লেখ করিয়াছেন। সেই অলঙ্কারশাস্ত্র দ্বারাই তাঁহার মত খণ্ডিত হইতেছে। "রীতিবিবেচনায়" প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ বলিয়াছেন:—

বৈদর্ভী চাথ পাঞ্চালী গৌড়ীয়াবন্তিকী তথা।
লাটীয়া মাগধী চেতি ষোঢ়ারীতি।—

মতান্তরে (সাহিত্যদর্পণ, নবম পরিচ্ছেদ)

বৈদর্ভী চাথ গৌড়ী চ পাঞ্চালী লাটিকা তথা॥

* * * *

গৌড়ী উদ্ভরবন্ধা স্যাৎ বৈদর্ভী ললিতক্রমা।
পাঞ্চালী মিশ্রভাবেন লাটী তু মৃদুভিঃ পদৈঃ॥

পঞ্চাল ও লাট যে স্বতন্ত্র দেশ, ইহা অলঙ্কারশাস্ত্র দ্বারাও নির্ণীত হইতেছে।

বিবিধ তাম্রশাসন ও প্রস্তরলিপির আলোচনায় অনুমিত হয় যে, আধুনিক গুজরাট দেশ প্রাচীনকালে দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। উত্তর ভাগ গুর্জ্জর, মধ্য

¶ হিয়োঁয় থাঙের ভারতভ্রমণের বহুকাল পূর্ব্বে যে রাঢ়দেশে সূর্য্যোপাসনা প্রচলিত ছিল, তল্লিখিত (মুঙ্গেরের) সূর্য্যমন্দিরের বর্ণনা দ্বারা এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

ও দক্ষিণাংশ লাটদেশ। উদয়পুর প্রশস্তি পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, মালবরাজ (প্রথম) বাকপতি গুর্জ্জর ও লাট রাজগণের সম্মিলিত সৈন্য জয় করিয়াছিলেন। * উক্ত প্রশস্তিতে ইহাও লিখিত আছে যে, প্রথম বাকপতির বৃদ্ধ প্রপৌত্র এবং দ্বিতীয় বাকপতির পৌত্র, নবসাহসাঙ্ক বা সিন্ধুরাজের পুত্র ভোজরাজ, গুর্জ্জর, লাট এবং অন্যান্য দেশ জয় করিয়াছিলেন। হর্ষচরিতে লিখিত আছে যে, মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্দ্ধনের পিতা প্রভাকরবর্দ্ধন উত্তরদিকস্থ গান্ধার এবং হূণরাজ্য জয় করেন এবং দক্ষিণদিকস্থ মালব, গুর্জ্জর ও লাটদেশে বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা পঞ্চাল ও লাট পৃথক দেশ নির্ণীত হইতেছে। চেদীপতি কেয়ূরবর্ষের বিজয়বৃত্তান্ত, জব্বলপুরের অন্তর্গত বিল্হারির শিলালিপিতে অতি আশ্চর্য্য ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে ভারতের উত্তর, পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম সীমায় অবস্থিত পাঁচটি দেশের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

গৌড়ী গাঢ়মনোমনোরথকরঃ কর্ণাটকান্তাকুচ-
ক্রীড়াশৈলতটীবিহারহরিণো লাটীললাটাঙ্কদঃ।
কাশ্মীরীবিহিতস্মরব্যতিকরস্তম্মাংকলিঙ্গাঙ্গনা-
সদ্গানব্যসনী সনীতিনকনঃ কেয়ূরবর্ষোত্তবং॥

Epigraphia Indica Vol. I. p. 256.

উক্ত শ্লোকের লিখিত গৌড় ও কলিঙ্গ ভারতের পূর্ব্ব সীমায় অবস্থিত, কর্ণাট দক্ষিণ দেশ, কাশ্মীর উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত, কেবলমাত্র লাট পশ্চিম সাগরের তীরস্থিত দেশ।

লাট যে পঞ্চালের অন্তর্গত কিম্বা কান্যকুব্জের অন্য নাম নহে, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ উমেশ বাবু কিছুমাত্র উপস্থিত করিতে পারেন নাই, এবং পারিবেনও না।

উমেশ বাবুর প্রকাশিত নূতন তাম্রশাসনে ধর্ম্মপালদেবের গুণানুকীর্ত্তন করিয়া কয়েকটি শ্লোক লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে আমরা দুইটি শ্লোক এ স্থলে উদ্ধৃত করিব।

যেহভূবন্ পৃথুরামরাঘবনলপ্রায়া ধরিত্রীভুজ-
স্তানেকত্রদিদৃক্ষুণেব নিচতান সর্ব্বান্ সমং বেধসা।
অজ্ঞানেষনরেন্দ্রমানমহিমা শ্রীধর্ম্মপালঃ কলৌ
লোলশ্রীকরিণীনিবন্ধনমহাস্তম্ভঃ সমুজ্জৃম্ভিতঃ॥

পৃথু, ভৃগুরাম, রামচন্দ্র, নল প্রভৃতি যে সকল নরপতি ছিলেন, বিধাতা সেই সকলকে একত্র সমাবেশিত দেখিবার জন্যই যেন সমস্ত নরপতিগণের সম্মান এবং পরাক্রমধ্বংসকারী

---

* Epigraphia Indica. Vol. I. p. 235.

এবং চঞ্চলা লক্ষ্মীরূপা কল্পিণীর বন্ধনের নিমিত্ত কলিকালে শ্রীধর্ম্মপাল-রূপ মহাস্তম্ভ সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

> ভোজৈর্ম্মৎস্যৈঃ সমদ্রৈঃ কুরুযদুযবনাবন্তিগান্ধারকীরৈ-
> র্ভূপৈর্ব্ব্যালোলমৌলিপ্রণতিপরিণতৈঃ সাধুসঙ্গীর্য্যমাণঃ।*
> হৃষ্যৎপঞ্চালবৃদ্ধোদ্ধৃতকনকময়স্বাভিষেকোদকুম্ভো
> দত্তঃ শ্রীকন্যকুব্জঃ সললিতচলিতভ্রূলতালক্ষ্ম যেন॥

উমেশ বাবু উক্ত শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; যথা,—

"অর্থাৎ ধর্ম্মপাল রাজা কান্যকুব্জের অধিপতিকে স্বীয় অভিষেকোদককুম্ভ প্রদান করেন। কনোজরাজ শত্রু দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া রাজ্য হারাইয়াছিলেন। ধর্ম্মপাল সেই শত্রুগণকে তাড়াইয়া কনোজরাজকে পৈতৃক সিংহাসন প্রদান করিলে, পঞ্চাল বৃদ্ধেরা হৃষ্ট হইয়াছিল এবং ভোজ মৎস্যাদি জনপদের রাজারা যাহারা কনোজের শাসনাধীন ছিল পুনরায় কনোজরাজের বশ্যতা অঙ্গীকার করিল।"

উমেশ বাবুর ব্যাখ্যা সঙ্গত বোধ হইতেছে, কিন্তু মূল শ্লোক সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। কারণ, "সাধুসঙ্গীর্য্যমাণঃ" শব্দের অর্থ বটব্যাল মহাশয় পরিত্যাগ করিয়াছেন। সঙ্গীর্য্যমানঃ বিশেষণ পদটির বিশেষ্য কে? তাহার স্থির করা কঠিন। শ্লোকে প্রথমান্ত দুইটি বিশেষ্য আছে। একটি উদকুম্ভঃ, দ্বিতীয়টি কন্যকুব্জ। কুম্ভকে সাধুবাদ প্রদান করা সঙ্গত বোধ হয় না। সুতরাং কন্যকুব্জপতি পিতৃসিংহাসনে পুনর্ব্বার অধিষ্ঠিত হইলে (অধিষ্ঠাপয়িতা ধর্ম্মপালকে সাধুবাদ না দিয়া) কন্যকুব্জপতিকে সাধুবাদ প্রদান করা সঙ্গত বোধ হইতেছে না। "দত্তঃ" পদেরই বা বিশেষ্য কে? কন্যকুব্জের বিশেষণ যদি উদকুম্ভ ও দত্ত হয়, তাহা হইলে, ব্যাকরণশাস্ত্রানুসারে "দত্তঃ" পদটি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। উদকুম্ভঃ, দত্তঃ এবং শ্রীকন্যকুব্জঃ, এই তিনটি প্রথমান্ত পদ, সুতরাং একটি বিশেষ্য এবং দুইটিকে বিশেষণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

সে যাহা হউক, উমেশ বাবু লিখিয়াছেন,—"নারায়ণপালের তাম্রশাসনে উপরি-উক্ত ঐতিহাসিক বার্ত্তার টীকাস্বরূপ শ্লোক দেখা যায়,—

> জিত্বেন্দ্ররাজপ্রভৃতীনরাতীন্ উপার্জ্জিতা যেন মহোদয়শ্রীঃ।
> দত্তা পুনঃ সা বলিনার্থয়িত্রে চক্রায়ুধায়ানতবামনায়॥

তিন জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত উত্তরোক্ত এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু

---

* সাধুসঙ্গীর্য্যমাণের পাঠান্তর "সাধুসঙ্গীয়মানঃ।"

এ পর্য্যন্ত ইহার অর্থ সম্যক্ পরিস্ফুট হয় নাই। প্রথমতঃ, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই শ্লোককে আক্রমণ করিয়া তর্জ্জমা করেন। যথা—

Having conquered Indra Raja and other kings, he (Dharma Pala) earned the glorious Sri (goddess of fortune) whom he presented as a sacrifice, to the father of weath, Vamana, the weilder of the descus.—(*Iudo-Aryans*. vol. II. p. 270.)

এই ব্যাখ্যা অসমীচীন বিবেচনায় ডাক্তর হুলজ্ (হুলট্স?) * অনুবাদ করিয়াছেন:—

This mighty one again give the soverignty, which he had acquared by defeating Indra Raja and other enemies, to the begging Chakrayudha who resembled a dwarf in bowing—just as formerly Bali had given the soverignty (of the three worlds) which he had acquired by defeating Indra and his other enemies (the gods) to the begging Chrkrayudha (visnu) who had descended to earth as a Dwarf. (Indian Antiquary. XV. p. 307.)

ডাক্তার হুলজের পর গটিঙ্গের অধ্যাপক কিল্‌হরণ † সাহেব দেখাইয়া দেন যে, শ্লোকে যে "মহোদয়শ্রী" শব্দ আছে, তাহাতে কান্যকুব্জের রাজত্ব বুঝিতে হইবে। মহোদয় শব্দ কান্যকুব্জের নামান্তর মাত্র, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। ‡ অধ্যাপক কিল্‌হরণের ব্যাখ্যা অতি সুন্দর, সন্দেহ নাই।" (সাধনা, ১৩০১, জ্যৈষ্ঠ—৫৬, ৫৭ পৃষ্ঠা।)

আমরা নারায়ণ পালের তাম্রশাসনের উদ্ধৃত শ্লোকের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছি:—

বলি যেরূপ ইন্দ্র প্রভৃতি শত্রুবর্গকে জয় করিয়া বিপুল লক্ষ্মীলাভ করিয়া বিনীত (ভিক্ষুক) চক্রধারী (বিষ্ণু) বামনকে তাহা দান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পরাক্রমশালী (ধর্ম্মপাল) ও ইন্দ্ররাজ প্রভৃতি অরাতিবর্গকে জয় করিয়া মহোদয় (কান্যকুব্জ) রাজশ্রী উদ্ধার পূর্ব্বক অবনত-মস্তক (যাচক) চক্রায়ুধকে তাহা দান করিয়াছিলেন।

১২৮৮ বঙ্গাব্দে ক্ষোদিত লিপি অবলম্বন করিয়া আমরা কনোজপতিগণের

---

* E. Hultysch, Ph. D.

† Professor F. Kielhorn, Ph. D. C. I. E. Gottingen.

‡ উমেশ বাবুর চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ব্বে (প্রাচীন তাম্রশাসনের সাহায্যে) আমরা কান্যকুব্জ ও মহোদয় অভিন্ন নগর অবধারণ করিয়াছি। (বান্ধব, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ, ৫৩৪ পৃষ্ঠা।) ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ফ্লিট সাহেব কান্যকুব্জ ও মহোদয় দুইটি স্বতন্ত্র নগর অবধারণ করেন। (Indian Antiquary. Vol. XV. pp. 105 &) ডাক্তার মিত্র মহোদয় বিশেষ দক্ষতার সহিত ফ্লিট সাহেবের উক্ত সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়াছিলেন। (Proceedings of the Asiatic soty of Bengal. 1886. page 118 to 121.)

যে বংশাবলী প্রকাশ করিয়াছি, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। * ইহাতে "চক্রায়ুধ" নামে কোনও নরপতির উল্লেখ নাই। কিন্তু আমাদের বিবেচনায়, রামভদ্র দেবের পুত্র ভোজদেব ও চক্রায়ুধ অভিন্ন নরপতি। ইন্দ্ররাজ অবশ্যই রাষ্ট্রকূটাপতি হইবেন। উমেশ বাবুও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু রাষ্ট্রকূটা রাজবংশের ইতিহাস বিশেষরূপ আলোচনা না করিয়া তিনি এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। কারণ রাষ্ট্রকূটা রাজবংশের বংশাবলীতে আমরা তিন জন "ইন্দ্ররাজ" প্রাপ্ত হইতেছি। তন্মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় ইন্দ্ররাজ ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন। আমরা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে ইহার মীমাংসা করিব। পশ্চিম ভারতে যেরূপ রাষ্ট্রকূটা-বংশীয়গণ বিশেষ পরাক্রমশালী ছিলেন, পূর্ব্ব ভারতে পালবংশীয়গণ তদ্রূপ প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। রাষ্ট্রকূটাবংশের ৭৪৪ শকাব্দের ১২ বৈশাখের একখানি তাম্রশাসনপাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, "গৌড়েশ্বরের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য মালবাধিপতি কর্করাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।" †

রাষ্ট্রকূটা ও পাল রাজবংশ পরস্পর বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। মহারাজাধিরাজ দেবপাল দেবের তাম্রশাসনপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ধর্ম্মপালের ঔরসে ও রাষ্ট্রকূটা রাজকন্যা রণ্ণাদেবীর গর্ভে দেবপাল জন্মগ্রহণ করেন। ‡ পালবংশীয় ষষ্ঠ নরপতি রাজ্যপাল দেব রাষ্ট্রকূটার রাজকন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন।

---

* শ্রীপ্রবলস্তদুহিতুঃ ক্ষৌণিপতিস্তা রাষ্ট্রকূটাতিলকস্য রণ্ণা দেব্যাঃ (মুঙ্গেরের তাম্রশাসন, নবম শ্লোক।)

† ১। দেবশক্তি দেব। (৬৭৯ শকাব্দ)
২। বৎসরাজ দেব। (৭০২) শকাব্দ)
৩। নাগভট্ট দেব। (৭২৪ শকাব্দ)
৪। রামভদ্র দেব। (৭৪৮ শকাব্দ)
৫। ভোজদেব (চক্রায়ুধ?) (৭৭১ শকাব্দ) (৭৮৪, ৭৯৮, ৮০৪ শকাব্দ।)
৬। মহেন্দ্রপাল, নির্ভয়নাম্ন বা মহীশ পাল। (৮২৫ শকাব্দ, ৮২৯ শকাব্দ)
৭। ভোজদেব। ৮। বিনায়কপাল। ৯। ক্ষিতিপাল, মহীপাল বা হেরম্বপাল।
১০। দেবপাল। (৮৭০ শকাব্দ)।

‡ J. A. S. B. Vol. VIII. p. 303. প্রফেসার লাসেন বলেন,—গৌড়েশ্বর গোপা-

উমেশ বাবুর আবিষ্কৃত নূতন তাম্রশাসনপাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, ধর্ম্ম-পালের মাতার নাম "দেদ্দদেবী"। কিন্তু আমাদের বোধ হয় দেদ্দদেবী না হইয়া "দন্দদেবী" হইবে। লাটদেশাধিপতি "দন্দ" রাজকুল হইতে ইহার উদ্ভব, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। এই রাজবংশের স্থাপনকর্ত্তার নাম দন্দ। তাঁহার পৌত্রের নাম দন্দ। তদনুসারে এক পুরুষ অন্তর প্রত্যেক রাজার নাম দন্দ রাখা হইত। এইরূপ দন্দ নাম অন্য কোনও রাজবংশে দৃষ্ট হয় না। প্রাচীনকালে অনেক রাজবংশে ভগিনীর নামের সহিত একটি আকার মাত্র সংযুক্ত করিয়া, ভ্রাতা ভগিনীর এক নাম রাখিবার প্রথা ভারতে প্রচলিত ছিল। অনেকগুলি কোদিত লিপিতে ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বোধ হয়, এই সূত্রেই লাটদেশীয় ব্রাহ্মণগণ বাঙ্গালায় আগমন করিয়াছিলেন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে কোদিত লিপির সাহায্যে পাল ও সেন রাজগণের ইতি-হাস প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু আমাদের প্রবন্ধ ও পুস্তিকা প্রকাশ হওয়ার পর এরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি, যদ্দ্বারা আমাদের মত কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সুতরাং পুনর্ব্বার এ বিষয়ে আমাদিগকে লেখনী ধারণ করিতে হইবে। অদ্য একটি সংশোধিত বংশাবলী মাত্র নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

উমেশ বাবু লিখিয়াছেন, "জয়চন্দ্র † মহম্মদ ঘোরীর সময় কনোজের রাজা ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকজন কনোজাধিপতি রাষ্ট্রকূটা বা রাঠোরবংশীয় ছিলেন।" রাজপুতনার ভট্টকবিদিগের পদানুসরণ পূর্ব্বক কোনও কোনও সাহেব এই মত প্রচার করিয়াছেন। ভট্টকবিদিগের গ্রন্থগুলি কিরূপ অপ্রামাণ্য, তাহা মিবাররাজামাত্য "মহামহোপাধ্যায়" পণ্ডিত "কবিরাজ" শ্যামল দাস প্রদর্শন করিয়াছেন। জয়চন্দ্র ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের অনেকগুলি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই সকল সনন্দে ইঁহাদিগকে "গাহড়বাল" (বা ঘড়ওয়ার ক্ষত্রিয়) বংশজ লেখা হইয়াছে। সুতরাং আমরা ভট্টকবিবর্গকে বিশ্বাস করিতে পারি না। উমেশ বাবু স্বয়ং পরিচয় দিতেছেন যে, তিনি ব্রাহ্মণ; আমরা যদি কয়েকজন লেখক "জবরদস্তি" করিয়া বলি—তিনি কায়স্থ, তাহা হইলে কাহার কথা বিশ্বাস্য হইবে? পণ্ডিতপ্রবর মেক্স-মুলর ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রকেও ব্রাহ্মণ লিখিয়াছিলেন।

লের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য মালবাধিপতি, রাষ্ট্রকূটবংশীয় দ্বিতীয় কর্ক-রাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

† তাম্রশাসনে "জয়চন্দ্র"।

সমগ্র বাঙ্গালা দেশের অধিপতি পাল রাজবংশ।

১। মহারাজ গোপাল দেব।
রাজ্ঞী বাণীশ্বরী দেবী (বলভীর রাজকন্যা)।
রাজ্ঞী দন্দ দেবী (ভদ্রদেশীয় রাজকন্যা ?)

২। মহারাজ ধর্ম্মপাল। — বাক্পাল।
রাজ্ঞী রন্না দেবী।

যুবরাজ ত্রিভুবনপাল দেব। — ৩। মহারাজ দেবপাল দেব। — জয়পাল।

যুবরাজ রাজ্যপাল। — ৪। মহারাজ বিগ্রহপাল বা সুরপাল দেব।
রাজ্ঞী লজ্জাদেবী (চেদীয় রাজকন্যা)।

৫। মহারাজ নারায়ণ পাল। — ৬। মহারাজ রাজ্যপাল দেব।
রাজ্ঞী ভাগ্যদেবী (রাষ্ট্রকুটার রাজকন্যা)

৭। মহারাজ——পাল।

৮। মহারাজ বিগ্রহপাল (দ্বিতীয়)।

৯। মহারাজ মহীপাল দেব (প্রথম)।

১০। মহারাজ নয়পাল দেব।
(চেদীপতি কর্ণদেবের সমসাময়িক)।*

১১। মহারাজ বিগ্রহপাল (তৃতীয়)।

১২। মহারাজ মহীপাল (দ্বিতীয়)।
(চোলরাজ দ্বারা বাঙ্গালা হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন।)

সেনরাজবংশ।

১। মহারাজ বিজয় সেন।
(বিজয়সেনের পূর্ব্বপুরুষগণ দক্ষিণাপথবাসী ছিলেন, তিনিই বঙ্গে সেনবংশের স্থাপয়িতা।)

২। মহারাজ বল্লাল সেন।

৩। মহারাজ লক্ষণ সেন।
(বখতিয়ার খিলজী দ্বারা নবদ্বীপ হইতে তাড়িত হইয়া বঙ্গে আশ্রয় লয়েন, তদীয় পুত্র মাধব ও কেশবসেন ও পৌত্র দনুজমাধব বা বেদানুজমাধব পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিতেন।)

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

---

* শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় এই কর্ণদেবকে "king of karnya (probably kanuj) লিখিয়াছেন। আমরা "ভারতী"তে দেখাইয়াছি যে, শরৎবাবু যাঁহাকে নেপালপতি জ্যোতির্ব্বর্ম্মা লিখিয়াছেন, তাঁহার প্রকৃত নাম অংশুবর্ম্মা। তদৃষ্টে শরৎবাবু আত্মভ্রম সংশোধন করিয়াছেন। (Indian Pandits in the Land of snow. p. 47.) এ স্থলে আমরা শরৎবাবুকে একটি কথা বলিব,—কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলে মহত্ব নষ্ট হয় না।

ছুটি খাঁর মহাভারত।

"পরাগলী মহাভারত" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম, পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁও মহাভারতের অনুবাদ করাইয়াছিলেন। তখন সেই মহাভারতের দু এক পাতা মাত্র পাইয়াছিলাম। সম্প্রতি এসিয়াটিক সোসাইটির পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ ও আমি, বহু অনুসন্ধান করিয়া, ছুটি খাঁর আদেশে রচিত মহাভারতের সমস্ত অশ্বমেধ পর্ব্বটি পাইয়াছি। যে পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহার হস্তলিপি প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বের। অশ্বমেধ পর্ব্ব ভিন্ন মহাভারতের অন্যান্য অংশও ছুটি খাঁর আদেশে অনুবাদিত হইয়াছিল কি না, বলিতে পারি না; বিশেষতঃ, পরাগল খাঁর আদেশে রচিত সমস্ত মহাভারত থাকা সত্ত্বেও, তাঁহার প্রিয়পুত্র ছুটি খাঁ আবার মহাভারতের অনুবাদ করাইলেন কেন, সেও একটি গুরুতর প্রশ্ন।

"পরাগলী মহাভারত" প্রবন্ধে আমার কয়েকটি গুরুতর ভ্রম হইয়াছিল। আমি লিখিয়াছিলাম, পরাগল খাঁর খুল্লতাত নসরৎ সাহার আদেশে, মহাভারত অনুবাদিত হইয়াছিল। ঐ প্রবন্ধ লিখিবার সময় পরাগলী মহাভারত আমার নিকটে ছিল না, সুতরাং স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়াই অনেক কথা লিখিয়া ফেলিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি, সেই নসরৎ সাহা পরাগল খাঁর খুল্লতাত নহেন, তিনি হুসেন সাহার বিখ্যাত পুত্র নসরৎ সাহা—গৌড়ের পরবর্ত্তী সম্রাট। আর একটি ভুল—আমি লিখিয়াছিলাম, শ্রীসুর নন্দী ছুটি খাঁর আদেশে মহাভারতের অনুবাদ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি শ্রীসুরনন্দী নহেন, শ্রীকর নন্দী; প্রাচীন হস্তলিপিতে 'ক' আর 'সু' প্রায় একইরূপ দেখায়, সেই জন্যই এই ভুলটি হইয়াছে।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীকর নন্দী ছুটি খানের নিবাসভূমি পরাগলপুরের নিম্নলিখিত বর্ণনা দিয়াছেন—

নসরত সাহা তাত (১) অতি মহারাজা।
রামবৎ নিত্য পালে সব প্রজা॥
নৃপতি হুসেন সাহ হয় ক্ষিতিপতি।
সাম দান দণ্ড ভেদে পালে বসুমতী॥
তান এক সেনাপতি লস্কর ছুটি খান।
ত্রিপুরার উপরে করিল সন্নিধান॥
চাটিগ্রাম নগরের নিকট উত্তরে।
চন্দ্রশেখর পর্ব্বত সুন্দরে॥

---

(১) নসরৎ সাহা মগদিগকে দমন করিতে চট্টগ্রামে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাই চট্টগ্রামবাসীগণ হুসেন সাহা অপেক্ষা নসরৎ সাহাকে অধিক চিনিতেন।

চারমোল (?) গিরি তার পৈতৃক বসতি॥
বিধি এ নির্ম্মিল তাকে কি কহিব অতি॥
ফণী নামে নদী এ বেষ্টিত চারিধার।
পূর্ব্ব দিগে মহাগিরি পার নাহি তার॥

ছুটিখাঁর মহাভারত।

রাজসভার রীতি অনুসারে, বহু উপমা ও অতিরঞ্জিতপ্রশংসাপূর্ণ ছুটি খাঁর একটি স্তুতিগান আছে। যথা,—

"লস্কর পরাগল খানের তনয়।
সমরে নির্ভয় ছুটিখান মহাশয়॥
আজানুলম্বিত বাহু কমল লোচন।
বিলাস হৃদয়ে মত্ত গজেন্দ্র গমন॥
চতুঃষষ্টি কলা বসতি গুণের নিধি।
পৃথিবীবিখ্যাত সে যে নির্ম্মাইল বিধি॥
দাতা বলি কর্ণ সম অপার মহিমা।
শৌর্য্যে বীর্য্যে গাম্ভীর্য্যে নাহিক উপমা॥
পণ্ডিতে পণ্ডিত সভা খণ্ড মহামতি।
একদিন বসিলেক বান্ধব সংহতি॥
শুনন্ত ভারত তবে অতি পুণ্য কথা।
মহামুনি জৈমিনি কহিল সংহিতা॥
অশ্বমেধ কথা শুনি প্রসন্ন হৃদয়।
কপট নাহিক যে তাঁর প্রসন্ন হৃদয়।
রাম সম পিতৃভক্ত খান মহাশয়॥
তাহার যত গুণ শুনিয়া নরপতি। (১)
সম্ভাষিয়া আনিলেক কুতূহল মতি॥
নৃপতি অগ্রেতে তাঁর বহুল সম্মান।
ঘোটক প্রসাদ পাইল ছুটিখান॥
লস্করি বিষয় পাইয়া মহামতী।
সাম দণ্ড ভেদে পালে বসুমতী॥
*   *   *   * (২)
সভাখণ্ডে আদেশিল খান মহাশয়॥
দেশ ভাষায় এহি কথা রচিল পয়ার।
সঞ্চারৌক কীর্ত্তি মোর জগত সংসার॥
তাহান আদেশ মাল্য মস্তকে ধরিয়া।
শ্রীকর নন্দী কহিলেক পয়ার রচিয়া॥

ছুটিখাঁর মহাভারত।

আমরা পরাগলী-মহাভারতের প্রণেতা কবীন্দ্র পরমেশ্বরের অন্য কোনও পরিচয় পাই নাই; এই শ্রীকর নন্দী সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ রহিয়াছি। যদি অনুসন্ধানে ইহাঁদের কোনও বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি, তাহা হইলে পরে বিদিত করিব।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, নসরৎ খাঁর আদেশে আদৌ মহাভারত অনুবাদিত হয় (৩)। বোধ হয়, সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া, পরাগল খাঁ ও তৎপুত্র ছুটি খাঁ মহাভারত অনুবাদিত করাইয়াছিলেন। এই সব মহাভারত পড়িতে পড়িতে কাশীদাসের উপর শ্রদ্ধা ও আস্থার ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। কাশীদাসী মহাভারত ঐ গুলির প্রতিবিম্ব বলিয়া বোধ হয়; কিম্বা উভয় পক্ষই কথকদিগের রচনা হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারেন। যেরূপেই হউক, কাশীদাসের অনু-

(১) হুসেন সাহা।

(২) এই স্থলে ত্রিপুর নৃপতির সহিত ছুটি খাঁর সন্ধিবিগ্রহাদি বর্ণিত আছে, ঐতিহাসিক সেই বিবরণে কতদূর আস্থাবান হইবেন, বলিতে পারি না। এই স্থানে সেই অংশ অনাবশ্যক বিবেচনায় পরিত্যক্ত হইল।

(৩) "শ্রীযুত নায়ক সে যে নসরত খান।
করাইল পাঞ্চালী যে গুণের নিধান"।—পরাগলী মহাভারত।

বাদের মৌলিকত্ব কোনও ক্রমেই থাকিতেছে না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, নসরৎ সাহার আদেশে রচিত মহাভারত, পরাগলী ও ছুটি খাঁর মহাভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী। উহা অবশ্যই পশ্চিম বঙ্গে প্রচলিত ছিল। হইতে পারে, তাহা হইতেই এক দিকে পরাগলী ও ছুটি খাঁর মহাভারত, এবং অপর দিকে কাশীদাসের মহাভারত, এই ত্রিধারার উৎপত্তি হইয়াছে। এই সব মহাভারতের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে আর একখানি মহাভারত প্রচলিত ছিল, সেইখানিই আদি গ্রন্থ, তাহা সঞ্জয়ের কৃত। এই পুস্তক সম্বন্ধে আমরা পরে প্রবন্ধ লিখিব।

আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী এক প্রবন্ধে লিখিয়াছি, বঙ্গীয় কবিগণের কয়েকটি নির্দ্ধারিত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয় ছিল; তাহাই উপলক্ষ করিয়া তাঁহাদের কাব্য-প্রতিভা বিকাশ পাইয়াছে; এই দাস জাতির কবিগণ স্বাধীন ক্ষেত্রে বায়রণ কি শেলির মত নব ঐশ্বর্য্যের সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। তাঁহারা পদ-চিহ্নিত পথ দেখিয়া পদচারণ করিয়াছেন। কবিকঙ্কণ, কাশীদাস, ভারতচন্দ্র, ইহাঁরা সকলেই পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনগণের শরণাপন্ন ও ঋণে আবদ্ধ। ইংলণ্ডীয় কবিগণের ন্যায় ইহাঁদের ব্যক্তিগত কবিত্ব আমাদিগকে বিস্মিত করে না। এক এক খানা কাব্যের রচনায় অসংখ্য হস্তের চিহ্ন দেখিতে পাই, তাই কাহার গলে কবিকণ্ঠশোভী যশঃপুষ্পহার প্রদান করিব, এই প্রশ্ন মনে হইয়া ইতস্ততঃ করিতে হয়। কেবল পূর্ব্ববর্ত্তী কবির পদানুসরণেই দাসত্বের একমাত্র পরিচয় নহে। সংস্কৃত এই সব প্রাচীন বঙ্গীয় কবির প্রতিভাকে দৃঢ় নিগড়ে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল;— রূপবর্ণনা পড়িতে গেলেই পক্ক বিম্বের সহিত ওষ্ঠের, দাড়িম্ব-বীজের সহিত দন্তের, উৎপলের সহিত অক্ষির, ও বেণীর সহিত ফণীর তুলনার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হয়; প্রাচীন সময়ের সহিত দূরত্ব নিবন্ধন রুচির অনেক পার্থক্য ঘটিয়াছে, তাই পূর্ব্বোক্ত উপমাগুলি কর্ণে সহ্য করিতে পারিলেও, লম্বোদর, নাভি সুগভীর ও আজানুলম্বিত বাহু, নিতান্তই বিস্বাদ বোধ হয়। কচিৎ প্রতিভাবান কবি স্বীয় অন্তর্দৃষ্টির বলে এই অনুকরণপ্রবৃত্তির ঊর্দ্ধে উঠিয়াছেন। যথা কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে কালকেতুর রূপবর্ণনায়—

"দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু।
বলে মত্ত গজপতি, রূপে যেন রতিপতি
সবার লোচন সুখ হেতু।
নাক মুখ চক্ষু কাণ, কুন্দে যেন নিরমাণ
দুই বাহু লোহার সাবল।
রূপ গুণ শীল বাড়া, বাড়ে যেন হাতিকড়া

যেন শ্যাম চামর কুন্তল।
বিচিত্র কপাল তটী, গলায় জালের কাটি
কর-যোড়া লোহার শিকলি।
বুক শোভে ব্যাঘ্র-নখে, অঙ্গে রাঙ্গা ধুলি মাখে
কটিতটে শোভয়ে ত্রিবলী।
দুই চক্ষু যিনি নাটা, ঘেনে রাঙ্গা জনিকাটা।

কাণে শোভে কুণ্ডল সুন্দর।
পরিধান রাঙ্গাধুতি, মস্তকে কাজের বতী
শিরমাঝে যেমন মণ্ডল।
সহিত্যশতেক ঠেলা, যার সঙ্গে করে খেলা

তার হয় জীবন সংশয়,
যে জন আকুড়ি করে, তাহাকে ধরণীধরে
তারে কেহ নিকটে না যায়।
ইত্যাদি।

এই বর্ণনার নিকট কাশীদাসের মহাভারতে

"দেব দ্বিজ, মনসিজ জিনিয়া মুরতি।
পদ্মপত্র যুগ্ম নেত্র পরশয় শ্রুতি।"

কবিত্বে দাঁড়ায় না। ইহা মনোহর, কিন্তু কবিত্বের গতি শৃঙ্খলাবদ্ধ;—বঙ্গীয় মহাভারত যদি সংস্কৃতের ঠিক অনুবাদ হইত, তবে এ সব বলিতাম না। প্রাচীন মহাভারত গুলি পড়িতে পড়িতে এইরূপ নানা কথাই মনে হইয়াছে; কাশীদাস ও পূর্ব্ববর্ত্তী মহাভারত-রচকদিগের ভাষায় কত দূর সাদৃশ্য, তাহা দেখাইবার জন্য কিছু কিছু উদ্ধৃত করিব।

যযাতির পতন।

অষ্টক বোলেন্ত তুমি কোন মহাজন।
পরিচয় দিয়া কহ জানাইয়া আপন।
অগ্নিপ্রায় তেজঃপুঞ্জ দেখি ত সাক্ষাৎ।
কোন পাপে স্বর্গে হইল স্বর্গপাত।

* * * * *

যযাতি আমার নাম কহি শুন তোক।
নহুষ নৃপতি সুত পুরুর জনক।
করিলে সুকৃতি নর যেবা নরে কহে।
নরকে ত বাস হয় পুণ্য হয় ক্ষয়।
কহিলুম ইন্দ্রের ঠাই কথা সকল।
পুণ্য ক্ষয় হইয়া মুই পড়িল ভূমিতল।"

সঞ্জয়-কৃত ভারত; আদিপর্ব্ব।

অষ্টক বলিল তুমি কোন মহাজন।
কোন নাম ধর তুমি কাহার নন্দন।
সূর্য্য অগ্নি চন্দ্র তেজ দেখি যে তোমায়।
স্বর্গ হৈতে পড় কেন না বুঝি নিশ্চয়।
রাজা বলে নাম আমি ধরে যে যযাতি।
পুরুর জনক আমি নহুষে উৎপত্তি।
পুণ্যবান জনের করিলাম অনাস্থা।
সেই হেতু হইল আমার ক্ষীণ পুণ্য।

কাশীদাস; আদিপর্ব্ব।

দ্রৌপদীর সহিত সুদেষ্ণার আলাপ।

সুদেষ্ণা এ বোলেন্ত শুনহ বরনারী।
মাথে করি তোমারে রাখিতে আমি পারি।
নারী-সবে তোমা দেখি পাসরিতে নারে।
কেমতে পুরুষ আছে ধৈর্য্য রাখিবারে।
রাজাএ দেখিলে তোমা মজিবেক মন।
রাণী বলে সৈরিন্ধ্রী তোমার রূপ দেখি।
স্ত্রীজাতি হইয়া পাসরিতে নারী আঁখি।
নৃপতি দেখিয়া লোভ করিবে তোমারে।
মন শক্তি নহিবে ধারণ করিবারে।
বল করি ধরিতে রাখিবে কোনজন।
আপন কণ্টক আমি আপনি করিব।
মৃত্যু এ ধরিলে যেন বৃক্ষ আরোহিব।
কর্কটীর গর্ভ যেন মৃত্যুর কারণ।
তেন মত দেখি আমি তোমারে ধারণ।

গঙ্গাদাস-ভারত; বিরাটপর্ব্ব।

তোমা দেখি আদর না করিবে আমারে।
আমি উদাসীন হব রাখি তোমা ঘরে।
আপনার ঘাড়ে কাঁটা রোপিব আপনে।
কর্কটীর গর্ভ যেন মৃত্যুর লক্ষণে।

কাশীদাস-ভারত; বিরাটপর্ব্ব।

বৃষকেতু ও যুবনাশ্বসংবাদ।

আকর্ণ পূরিয়া ধনু টঙ্কার করিল।
উচ্চস্বরে রাজা বৃষকেতুরে বলিল॥
অতি শিশু দেখি তুমি বীর অবতার।
মোকে পরিচয় দেও শিশু আপনার॥
কাহার পুত্র তুমি কিবা তোমার নাম।
কোন দেশে বসতি কিবা মনস্কাম॥
কি লাগিয়া নেও ঘোড়া কারণ কিবা তার।
কি নিমিত্ত কর মোর সৈন্যের সংহার॥

* * * *

রাজার বচন শুনি হাসে কুমার।
পরিচয় লও অহে নৃপতি আমার॥
যাহার উদয়ে হয় তিমির নাশ।
যাহার উদয়ে হয় জগৎ প্রকাশ॥
মোর পিতামহ সেই জন দিবাকর।
তার পুত্র উপজিল কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
ত্রিভুবনে বিখ্যাত বীর দাতার অগ্রণী।
যার বলে দুর্য্যোধন ভুঞ্জিল মেদিনী॥
তাহার পুত্র বৃষকেতু হেন জান মোকে।
কটাক্ষে নরপতি নাহি গণি তোকে॥

ছুটিখানের মহাভারত; অশ্বমেধপর্ব্ব।

বৃষকেতু দেখিয়া বলিছে নৃপবর।
কাহার তনয় তুমি মহা ধনুর্দ্ধর॥
কি নাম তোমার হে আসিলে কি কারণ।
পরিচয় দেহ আগে তোমরা দুজন॥
যুবনাশ্ব বচনেতে বৃষকেতু বীর।
পরিচয় দিল নৃপে প্রফুল্ল শরীর॥
রবির তনয় কর্ণ জানে এ জগতে।
জনম হইল মোর কুন্তীর গর্ভেতে॥
কর্ণের তনয় আমি নাম বৃষকেতু।
তুরঙ্গ লইনু যুধিষ্ঠির যজ্ঞ হেতু॥

কাশীদাস-মহাভারত; অশ্বমেধ পর্ব্ব।

আমাদের প্রবন্ধ দীর্ঘ হইতেছে; নতুবা এরূপ অসংখ্য স্থলে ভাষা ও ভাবগত সাদৃশ্য আছে,—আমি বাছিয়া উঠাই নাই। এক জৈমিনিসংহিতা দেখিয়া সব গুলি সংকলিত, এই যুক্তি দ্বারা এই সাদৃশ্যের একটা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে; কিন্তু সে যুগের অনুবাদ শব্দে শব্দে হইত না—ভাষাগত এত দূর ঐক্য স্বাবলম্বিত অনুবাদে হইয়াছে, এরূপ বোধ হয় না।

কবিকঙ্কণ অনুকরণকারী হইলেও গঠনকারী; কাশীদাস শুধু অনুকরণকারী। তাঁহার গুণ, তিনি ভাষাটি একটু সহজ ও মার্জ্জিত করিয়াছেন। ললিতশব্দগ্রন্থনে নিপুণতা হেতু, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, সঞ্জয় ও শ্রীকর নন্দী তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছেন। এই জঙ্গলপূর্ণ নিকেতনে অশ্রয় গ্রহণ করিয়াও তাঁহারা আর জীবনধারণ করিতে পারিলেন না। মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাবে নব শক্তি লাভ করিয়া কাশীদাস এখন তাঁহাদিগকে তাড়াইতেছেন। অগত্যা, ঐ সব কবিদিগকে শেষ কেল্লা এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকাগারে আশ্রয় লইতে হইবে।

কাশীদাসের অশ্বমেধ পর্ব্বে ৪৫০০ শ্লোক। ছুটি খানের মহাভারতে উক্ত পর্ব্ব ৩০০০ শ্লোকে সম্পূর্ণ। ভাষা সম্বন্ধে সঞ্জয়, পরাগলী ভারত, ও ছুটিখাঁর অশ্বমেধ পর্ব্ব, এক অদ্ভুত স্থান অধিকার করিবে। ভাষাতত্ত্ববিদের নিকট এই সব গ্রন্থ বিবিধ-অপূর্ব্ব সত্যের অক্ষয় ভাণ্ডার। বাঙ্গলা ভাষা যে প্রাকৃতের

রূপান্তর, এই কয়েক খানা পুঁথি পাঠ করিলে কাহারও সে বিষয়ে কণিকা-মাত্রও সন্দেহ থাকিবে না।

রচনার গুণাগুণ সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য নাই। ভারতের প্রসঙ্গ যে ভাবে যিনি বর্ণনা করুন, বিষয়ের গুণে, বিশেষতঃ হিন্দুর নিকট, তাহা অমৃতবর্ষী। প্রত্যেক হিন্দুর হৃদয় সেই প্রাচীন কাহিনীতে বিগলিত হয়। বিষয়ের গৌরবে সমালোচনার প্রবৃত্তি লুপ্ত হয়। কিন্তু তথাপি শ্রীকর নন্দীর সরল ও অনাড়ম্বর বর্ণনার প্রশংসা, সমালোচক পৃথক ভাবে করিবেন। পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের অনুসৃত পথ অতিক্রম করিয়া, স্বভাবদত্ত গুণে তাঁহারও দু একটি স্বকীয় উপমা বাহির হইয়াছে; যথা,—

"পৌষ মাসে রজনী যেন পড়য়ে নীহার।
হেন মতে বাণ দোহে বর্ষয় অপার॥"

স্থলে স্থলে স্বভাববর্ণনায় স্বভাবের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। গুণ না থাকিলে এত কাল ইহা আদর পাইবে কেন? ৪০০ বৎসর এই বিপ্লবপূর্ণ পর-পীড়িত হিন্দু ক্ষেত্রে যাহার জীবন লুপ্ত হয় নাই, সমালোচক দয়া করিয়া সেই পুস্তককে তাঁহার সম্মার্জ্জনীর ভয় নাও দেখাইতে পারেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের অনুকরণে ইউরোপেও পুস্তক লিখিত হইয়া থাকে। মারলো, গেটে এবং ইদানীং রেনল্ডসও একই কষ্ট লিখিয়াছেন। কেইডম্যানের মানবের পতন এবং ভার্জ্জিল ও ডান্টের নরকবর্ণনার দৃষ্টান্তে মিল্টন প্যারাডাইস লষ্ট লিখিয়াছেন। এস্‌কাইলের জগৎপ্রসিদ্ধ প্রমিথিউস লইয়া শেলি পুনরায় কিছু নাড়া চাড়া করিয়াছেন। অনুবাদিত গ্রন্থ সম্বন্ধে এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক বেশি; চ্যাপমান পোপের পরে, ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রী ইলিয়াডের পদ্যানুবাদের প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু বঙ্গদেশে এই অনুকরণপ্রবৃত্তি যত অধিক, এরূপ আর কোথাও নহে। ইংরেজাধিকারের পূর্ব্বে বঙ্গীয় কবিগণ কয়েকটি নির্দ্ধারিত বিষয়ে স্বীয় প্রতিভা নিযুক্ত রাখিয়া নিরুদ্ধগতি হইয়াছিলেন। মঙ্গলচণ্ডী, ষষ্ঠী, শনিঠাকুর, মনসা, প্রায় সমস্ত বঙ্গীয় কবিকে সেবক নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রসাদে বঙ্গে কবিতার স্রোত প্রবাহিত ছিল; এবং তাঁহাদেরই অত্যাচারে সেই স্রোত স্বাধীন পথ অবলম্বন করিতে পারে নাই। তাঁহারা ধন্যবাদের পাত্র, না নিন্দার ভাজন?

এই প্রথা সম্পূর্ণ দোষাবহ নহে। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে স্বাধীন প্রতিভার স্ফূর্ত্তি না থাকিলেও, ক্রমান্বয়ে অধ্যবসায়শীল কবিগণ একই বিষয়ে হস্তক্ষেপ

করাতে, চিত্রগুলি পরিস্ফুট ও সুন্দর হইয়াছে। একজনের পর অন্য জন অনুসরণ করিয়া, পূর্ব্ববর্ত্তী চেষ্টার আরও একটু বিকাশ করিয়াছেন। কৃত্তিবাসের মহাভারতের পর, কাশীদাসে সেই বিকাশ আছে। কিন্তু মাধবাচার্য্যের পর কবিকঙ্কণে যত দূর, তত দূর নহে; তাহা হইতে অনেক ন্যূন।

আর একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। সঞ্জয়, কবীন্দ্র, শ্রীকর নন্দী, মন্ত্রীবর গঙ্গাদাস, রামেশ্বর নন্দী, কাশীদাস প্রভৃতি সমস্ত মহাভারত-লেখকই জৈমিনি-সংহিতা দেখিয়া অনুবাদ সংকলন করিয়াছেন। বঙ্গের মৃদু-সমীর-স্পর্শ-সুখে কি ব্যাস ঋষি নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন? জৈমিনির প্রতি সকলের লক্ষ্য হইল কেন?

যাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মের পুনরুত্থানকারী, জৈমিনি তাঁহাদের অগ্রণী। তাঁহারই শিষ্য ভট্টপদ রাজা সুধন্বার সময়ে বৌদ্ধ কুল বিজয় করেন। শঙ্কর ইঁহাদের পরবর্ত্তী। জৈমিনি ভারত-গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত করেন। মহাভারত শাস্ত্রকারদিগের মতে দুস্তর ভবসাগর পার হইবার একমাত্র সেতু। কিন্তু ব্যাসের বিরাটার্ণব সন্তরণ করা সহজ নহে। তাই জৈমিনি সহজ পথের আবিষ্কার করিয়া ভবার্ণবের বিপন্ন পথিকদিগের ত্রাণ করিলেন। জৈমিনি ভারত দেশময় প্রচলিত হইয়াছিল; অনেক বাঙ্গলা প্রাচীন পুঁথিতে জৈমিনি ভারতের উল্লেখ পাওয়া যায়। চণ্ডীকাব্যে শ্রীমন্তের বিদ্যারম্ভে:—

> "জৈমিনি ভারত, সূত্র ভবে পড়ে মেঘদূত
> নৈষধে কুমারসম্ভবে।"

ইদানীং কালীপ্রসন্ন সিংহ, বাবু প্রতাপ রায় ও বঙ্গবাসীর কার্য্যাধ্যক্ষগণ, ব্যাস ঋষিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু এত উদ্যোগ ও অর্থব্যয় সত্ত্বেও, জৈমিনি-সংহিতার পাঠক ভাগই সমধিক। কারণ, কাশীদাস জৈমিনির প্রতিবিম্ব।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

বৈজ্ঞানিক সংগ্রহ।

অদ্ভুত বালুকা।

পর্য্যটকগণ সুবিধা পাইলে, ভ্রমণবৃত্তান্তে দুই একটা আজগুবি বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে ছাড়েন না,—এই জন্যই অনেক ফরাসী পর্য্যটক লিখিয়াছেন, ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিয়া কৃতকার্য্য হইতে হইলে, লেখকের একটু কবি-সুলভ কল্পনা থাকা আবশ্যক, এবং সঙ্গে সঙ্গে কল্পিতাংশের

সহিত [illegible] [illegible] বিশিষ্ট প্রকার জানা নাই। [illegible] কথাটা সত্য হইলেও, সম্প্রতি ভ্রমণবৃত্তান্তে প্রকাশিত একটি প্রাকৃতিক বিবরণ সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। বেটস্, বার্ড প্রভৃতি বিখ্যাত পর্য্যটকগণের লিখিত ভ্রমণবৃত্তান্তে, প্রশান্তমহাসাগরস্থ স্যাণ্ডউইচ দ্বীপমালায়, একপ্রকার সঙ্গীতশীল বালুকার বিবরণ লিখিত আছে। এই বিবরণ পড়িয়া, ক্যারিংটন, বোল্টন, ডাক্তার আলেক্সিস্ প্রভৃতি কয়েকজন খ্যাতিমান পণ্ডিত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ব্যাপারটি প্রত্যক্ষ করিবার জন্য স্যাণ্ডউইচে যাত্রা করিয়াছিলেন, এবং পর্য্যটকগণের মধ্যে কেহই এই বালুকার অত্যাশ্চর্য্য গুণের কোনও কারণ প্রদর্শন করেন নাই বা বৈজ্ঞানিক প্রথা-মতে কারণানুসন্ধানের কোনও চেষ্টা করেন নাই দেখিয়া, ইঁহাদের আবিষ্কারেচ্ছা অত্যন্ত উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছিল। ভ্রমণ ও পরীক্ষাদি কার্য্য সমাপ্ত করিয়া, ক্যারিংটন সম্প্রতি সঙ্গীতশীল বালুকার একটি চিত্তাকর্ষক বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন। ভ্রমণকারী সাহেব বলেন, কেবল সমুদ্রের অনতিদূরবর্ত্তী ভূভাগে এই অদ্ভুত বালুকার স্তূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সমুদ্রের জল হইতে দুই শত হাত ব্যবধানে এই জাতীয় বালুকা বড় দেখা যায় না। এই বালুকাস্তূপগুলি আকারে নিতান্ত ছোট নয়, অনেকেই উচ্চতায় পঞ্চাশ হাতের ঊর্দ্ধ হইবে, আবার ইহাদের উপরিভাগ ক্রমনিম্ন হওয়ায়, এক একটি স্তূপ অনেকস্থান অধিকার করিয়া থাকে। এই সকল বালুকাস্তূপ হইতে স্বভাবতঃই একপ্রকার শব্দ নির্গত হইতে থাকে, দূর হইতে ইহা অনুরণিত পিয়ানোর নিম্নগ্রামের স্বরগুলির মত মধুর ও গম্ভীর শুনায়; কিন্তু নিকটবর্ত্তী হইলে, এই ধ্বনি ক্রমেই কতকগুলি বেসুরো স্বরের সম্মিলনজাত শব্দের ন্যায় অপ্রীতিকর হইয়া পড়ে। ক্যারিংটন সাহেব বলেন, নিকট হইতে শুনিলে, এই বালুকানিঃসৃত শব্দ কতকটা কুকুরের ডাকের ন্যায় বোধ হয়; এজন্য সাহেবটি ইহাকে 'বার্কিং স্যাণ্ড' (Barking Sand) নামে অভিহিত করিয়াছেন।

কোনও প্রকারে বালুকা আন্দোলিত হইলেই এই শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে; বিশেষতঃ, ইহার উপর দিয়া চলিয়া বেড়াইলে বা স্তূপের উপরিস্থ বালুকারাশি হস্তদ্বারা করিয়া নিম্নে গড়াইয়া দিলে, শব্দ অত্যন্ত প্রবলতর হইয়া উঠে; এমন কি, শব্দজাত-কম্পনে নিকটবর্ত্তী দর্শ-কের হস্ত পদাদি পর্য্যন্ত কম্পিত হইতে থাকে। এতদ্ব্যতীত, রৌদ্রতাপের বৃদ্ধি হইলে, শব্দও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ক্যারিংটন সাহেব বলেন, রৌদ্রোত্তাপবশতঃ বালুকা নীরস হইয়া স্তূপাগ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অধিক পরিমাণে নিম্নে পড়িতে আরম্ভ হয় বলিয়া, শব্দ প্রবল হয়। ভ্রমণকারী সাহেবেরা যে দিন বালুকা পরীক্ষার্থে স্যাণ্ডউইচে প্রথম উপস্থিত হন, সেদিন আকাশ বেশ পরিষ্কার ও চারি পাঁচ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বালুকাস্তর সম্পূর্ণ নীরস ছিল বলিয়া, ইহার প্রবল ধ্বনি বহুদূর হইতে শ্রুত হইয়াছিল। নিকটবর্ত্তী হইলে এই শব্দ দ্বারা ইঁহাদের অশ্ব সকল এত চঞ্চল ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল যে, সাহেবেরা বহু যত্নে অশ্বগুলি সংযত করিতে পারিয়াছিলেন। স্থানান্তরে নীত হইলে, বালুকার এই অদ্ভুত শব্দগুণের বিশেষ কোনও বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় না; একটি থলির মধ্যে ইহা আবদ্ধ রাখিয়া নাড়া চাড়া করিলে, এই অদ্ভুত শব্দ অতিস্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়।

স্যাণ্ডউইচের আদিম অসভ্য অধিবাসীগণ এই বালুকার শব্দ ভীষণ অমঙ্গলসূচক লক্ষণ বলিয়া বিবেচনা করে। বালুকাই যে শব্দোৎপত্তির কারণ, ইহারা তাহা আদৌ স্বীকার করে না। ইহারা বলে, বিজনপ্রান্তরস্থ উপদেবতাগণ মনুষ্যের নানা দুষ্কৃতি দ্বারা উপেক্ষিত হইয়া, এই শব্দ সাহায্যে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকে। অতি প্রাচীনকালে, এই বালুকাক্ষেত্রে শব সমাহিত হইত, এইরূপ প্রবাদ থাকায়, অধিবাসীগণের বিশ্বাস আজও সম্পূর্ণ অটল রহিয়া গিয়াছে।

পর্য্যটকগণ অদ্ভুত শব্দশীল বালুকাক্ষেত্রের পরিদর্শনাদি শেষ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে, ইহার আমূল বৃত্তান্ত শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন, এবং কয়েকটি খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক আবশ্যক বিবরণ সংগ্রহ করিয়া; বালুকাজাত শব্দের প্রকৃত তত্ত্বের নির্ণয়ে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অনুসন্ধানরত পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে দুই একটি যুক্তি দেখাইয়া ব্যাপারটির মীমাংসা করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু সকলের চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একমাত্র ক্যারিংটন ও ডাক্তার জুলিয়েনের সমবেত চেষ্টার ফলই আধুনিক পণ্ডিত সমাজে অভ্রান্ত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

শেষোক্ত সিদ্ধান্তীদ্বয় বলেন, সিক্তবালুকাস্থ জল যখন তাপসাহায্যে বাষ্পীভূত হইতে আরম্ভ করে, তখন সমস্ত বাষ্পই আকাশে বিক্ষিপ্ত হয় না, ইহার কিয়দংশ স্বভাবতঃই বালুকাকণাগুলির চতুর্দ্দিকে সংলগ্ন হইয়া থাকে। প্রত্যেক কণাটি এই প্রকারে বাষ্পাচ্ছাদিত হওয়ায়, স্তূপমধ্যে থাকিয়াও ইহারা পরস্পর সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থান করে,—মধ্যে বাষ্পের ব্যবধান থাকিয়া যায়। যদি এই সকল বালুকাকণা কোনও প্রকার অতি অল্প মাত্রও চাপ পায়, তাহা হইলে তৎসংলগ্ন বাষ্প ক্রমে আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইয়া, বালুকাকণাগুলিকে চঞ্চল স্প্রিঙ্গের উপরিস্থ পদার্থের ন্যায়, আন্দোলিত করিতে থাকে। বৈজ্ঞানিকদ্বয় বলেন, বালুকাকণার এই প্রকার আন্দোলনজাত বায়ুকম্পন দ্বারাই, ইহা হইতে অদ্ভুত শব্দ নির্গত হইতে থাকে। সিক্ত বালুকা শুষ্ক হইয়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইবার সময় বা বালুকারাশিতে পদসঞ্চালনকালে, কণা সকল সহজেই আন্দোলিত হইয়া শব্দ প্রবলতর করিয়া তোলে। বালুকামাত্রেই স্বরবিশিষ্ট হয় না কেন—এই প্রশ্নের উত্তরে ইহারা বলেন, এই গুণটি বালুকার বাহ্যিক আকার ও তাহার রাসায়নিক প্রকৃতির উপর অনেকটা নির্ভর করে। এতদ্ব্যতীত, কেবলমাত্র ধূলি বা অপরপদার্থবিহীন পরিষ্কার বালুকা হইতেই শব্দ নির্গত হইতে দেখা যায়।

তাপহীন আলোক।

প্রকৃতির জড় ও অন্ধ শক্তিগুলিকে আয়ত্তাধীন রাখিয়া ব্যবহারোপযোগী করা, আধুনিক ভৌতিক বিজ্ঞানের একটি মহৎ উদ্দেশ্য—বোধ হয়, বর্ত্তমান যুগে এই উদ্দেশ্যের আংশিক সফলতার জন্যই আজ জগতে বিজ্ঞানের এত আদর। সম্প্রতি ল্যাংলে নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক, জোনাকি পোকার তাপহীন উজ্জ্বল আলোক দেখিয়া, তাপহীন সুলভ আলোক উৎপাদন করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন। প্রকৃতি দেবী যে উপায়ে জোনাকিকে উজ্জ্বল করেন, সে উপায়ই বা কি, এবং সে শক্তিই বা কি—ল্যাংলে, এখন সেই ঘোর রহস্যের উদ্ভেদ করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত আছেন। উপস্থিত চেষ্টা সফল হইলে, ল্যাংলে ঈপ্সিত ফল লাভ করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। যদি সেই তাপ-হীন আলোক-উৎপাদন, আধুনিক আলোক-উৎপাদনের অপেক্ষা অল্পব্যয়সাধ্য হয়, তবেই তাহার অশেষ অনুসন্ধান ও গবেষণা জগতের কাযে লাগিবে।

আমরা এখন যে উপায়ে আলোক-উৎপাদন করিয়া থাকি, তাহা বিজ্ঞানবিদ্গণের চক্ষে বড়ই ক্ষতিকর ও অযথাশক্তিসাধ্য বলিয়া বোধ হয়। এখনকার আলোকের সহিত তাপ অবিচ্ছিন্নভাবে বর্ত্তমান থাকে; গৃহ ও রাজপথাদি আলোকিত করিবার জন্য আমরা যে আলোকের উৎপাদন করি, তাহাতে তাপের কোনও আবশ্যক নাই, ইহা আমাদের কোনও কাযে লাগে না,—অনর্থক আকাশে বিক্ষিপ্ত হইয়া অন্তর্হিত হইতেছে। এই জন্যই ল্যাংলে বলিতেছেন, প্রকৃতির ভাণ্ডারস্থ তাপশক্তির এই অপব্যবহার অসহ্য, এই শক্তি উপযুক্ত কার্য্যে-

নিয়োজিত করিয়া; এখন যাহাতে সুলভ উপায়ে তাপহীন আলোক উৎপন্ন হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করা বড়ই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

সাহেবটি নানা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, ক্ষুদ্র বাতির আলোক হইতে, অত্যুজ্জ্বল তাড়িতালোক প্রভৃতি সকল প্রকার আলোকেই তাপবিকীরণ হইয়া থাকে, এবং এই কারণে কার্য্যশক্তির (Energy) অনেক অপচয় হয়। হিসাব করিলে দেখা যায়, সাধারণ বাতিতে আলোকজননার্থ প্রযুক্ত শক্তির শত-করা ৯৯ ভাগের অপব্যয় হয়, এবং কেবলমাত্র শত-করা এক ভাগ আলোকে পরিণত হয়। সুতরাং, যদি সমগ্র প্রযুক্ত শক্তিকে আলোকশক্তিতে পরিণত করিবার সদুপায় পরিজ্ঞাত থাকিত, তাহা হইলে, তাহার সাহায্যে আমরা অনায়াসেই অদ্যকার একটি বাতিতে একশত গুণ উজ্জ্বল আলোকপ্রাপ্তির আশা করিতে পারিতাম। *

বিজ্ঞানানুরাগী পাঠক জানেন, আলোক ও বিক্ষিপ্ত তাপ (Rediant heat) উভয়েই একই তাপশক্তির দুইটি রূপান্তরমাত্র,—কাজেই তাপশক্তি ব্যতিরেকে আলোক উৎপন্ন হইতে পারে না, এবং যে তাপশক্তিটুকু আলোকে পরিণত হয়, তাহাকে অপচয় বলিতে পারা যায় না। তবে তাপশক্তিকে আলোকে পরিণত করিতে হইলে যথেষ্ট উষ্ণতার (Temperature) উৎপাদনার্থে যে অদৃশ্য বিক্ষিপ্ত তাপ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া অন্তর্হিত হয়, তাহা অবশ্যই শক্তির ঘোরতর অপব্যবহার বলিতে হইবে। কিন্তু আমাদের পরিজ্ঞাত উপায়ের আলোক উৎপাদন করিতে গেলে, শক্তির এই অপব্যবহার অপরিহার্য্য। উষ্ণতাসহযোগে, সর্ব্বব্যাপী ইথর নামক অতি সূক্ষ্ম পদার্থের কম্পন আরম্ভ হইলে, তাপশক্তি আলোকরূপে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এই উষ্ণতার একটি সীমা আছে, যে কোনও উপায়ে তাপকে এই উষ্ণতার সীমান্তর্গত করিতে পারিলেই, আলোক উৎপন্ন হইয়া থাকে, নচেৎ তাহা তাপই থাকিয়া যায়। তাপকে উষ্ণতার এই সীমাবর্ত্তী করিবার দুইটি বিভিন্ন উপায় দেখিতে পাওয়া যায়—প্রথম,—ক্রমে উষ্ণতা বৃদ্ধি করিয়া তাপকে সীমার সন্নিহিত করা; এবং দ্বিতীয়,—উষ্ণতার মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় না আনিয়া ইহাকে এককালে সীমায় উপনীত করা। আমরা সাধারণ উপায়ে আলোক-উৎপাদনকালে অযথাশক্তিনাশক প্রথমোক্ত উপায়টিই অবলম্বন করিয়া থাকি। দ্বিতীয় উপায় অনুসারে আলোকজননপদ্ধতি আমরা জানি না। পিয়ানোর চাবি টিপিলেই, অত্যুচ্চ সুরও যেমন যথেচ্ছ বাজাইতে পারা যায়, পূর্ব্ববর্ত্তী নিম্ন সুরগুলি একে একে বাজাইবার আবশ্যক হয় না, তাপকে নির্দ্দিষ্ট উষ্ণতার সীমাবর্ত্তী করিবার এই প্রকার একটি কোনও উপায় আবিষ্কৃত না হইলে আর আলোকজননজনিত তাপশক্তির অপব্যবহারের প্রতিকার হইবার কোনও আশা নাই।

জোনাকি কীট প্রভৃতি কয়েক জাতীয় জীব ও অন্যান্য পদার্থের স্বভাবতঃ আলোক বিতরণ করিবার ক্ষমতা আছে। অতি সূক্ষ্ম তাপমান যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে, ইহাদের উজ্জ্বলাংশে তাপের কোনও চিহ্নই অনুভূত হয় না, কাজেই ইহাতে তাপশক্তির অপব্যবহার হয় না। এই জন্যই ল্যাংলে সাহেব বলিতেছেন,—যে উপায়ে এই সকল পদার্থ জ্যোতিষ্মান, সেই প্রণালী অবলম্বন করিলে বোধ হয় তাপহীন আলোক উৎপাদিত হইতে পারে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা যায়, তাপ দ্বারা কোনও পদার্থ, সাধারণ জোনাকির ন্যায় উজ্জ্বলআলোকসম্পন্ন করিতে হইলে, পদার্থটিকে অন্যূন, ফারণহিটের ২০০০ ডিগ্রি পরিমাণ উষ্ণ করিতে হয়, অথচ কীটশরীরে কোনও উত্তাপ দৃষ্ট হয় না। এই সকল কারণে অনুমান করা যায়,

---

* See results of an investigation by S. P. Langley read before the National Academy in 1888 and given in *Science* for June 1888.

সম্ভবতঃ আলোকজননের পূর্ব্ববর্ণিত দ্বিতীয় উপায়টি দ্বারাই এই জাতীয় আলোকের উৎপত্তি হইতেছে। যাহাই হউক, এইটিই সম্ভবপর ভাবিয়া, সাহেব আজও নানাবিধ অনুসন্ধান ও গবেষণায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। কিন্তু জোনাকি ও অপর পদার্থের তাপহীন আলোকের প্রকৃত কারণ অদ্যাপি ঘোরতমসাচ্ছন্ন রহিয়াছে। এই রহস্যের উদ্ভেদ না হইলে, উপস্থিত প্রশ্নটির মীমাংসা করা বড়ই দুরূহ।

নবাবিষ্কৃত বাষ্প।

ভারতের অতি প্রাচীন পণ্ডিতগণ সমগ্র জগৎ পাঁচটি ভূত পদার্থে রচিত, এই মত প্রচার করিয়াছিলেন;—কিন্তু বৈদেশিক জড়বিদ্যার বহুল বিস্তার হওয়ায়, আজকাল পঞ্চভূতের অস্তিত্ব কেবল মাত্র পুঁথিগত হইয়া পড়িয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে স্পষ্টই দেখা যায়, ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত, ভূত পদবাচ্যই নয়; ইহারা কতকগুলি ভূতের সমষ্টিজাত আকার মাত্র। এ ত গেল ভারতের অতি প্রাচীন ভূতের কথা,—পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-সম্মত আধুনিক ভূতের সংখ্যারও স্থিরতা নাই; রসায়ন-শাস্ত্রের উন্নতি ও বিশ্লেষণোপযোগী নানাবিধ যন্ত্রাদি রচনার সহিত ভূতসংখ্যারও ক্রমিক বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে—কাজেই বৈজ্ঞানিক উন্নতির খর স্রোতে এই সংখ্যা যে ভবিষ্যতে অটল থাকিবে, তাহা বলা যায় না; হয় ত কোনও ভবিষ্যৎ রসায়নবিদের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে, কোনও হয়বেশী ভূত অভূত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া, সংখ্যা হ্রাস হইতে হইতে আমাদের প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষের পঞ্চভূতে মিলাইতে পারে। মৌলিক পদার্থ সংখ্যার এই পরিবর্ত্তনের সহিত যৌগিক পদার্থেরও নানা পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। সে যাহা হউক, সম্প্রতি কয়েক জন ইংরাজ রসায়নবিৎ একটি অপরিজ্ঞাত বাষ্পের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন; বাষ্পটি, ভূত ও যৌগিক এই উভয়ের মধ্যে কাহার সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে, তাহা আজও স্থিরীকৃত হয় নাই। পদার্থটি হটাৎ আবিষ্কৃত হইয়া পড়িয়াছে। সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লর্ড র‍্যালে কতকগুলি বাষ্পের গুরুত্বনিরূপণকালে, বায়ুজ নাইট্রোজেন্ বাষ্পের গুরুত্ব, অন্য উপায়ে সংগৃহীত নাইট্রোজেন্ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক হইতে দেখিয়া, বায়ুজ নাইট্রোজেনে নিশ্চয়ই অপর একটি অপরিজ্ঞাত বাষ্প সংমিশ্রিত আছে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। র‍্যালে অপরিজ্ঞাত বাষ্পের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এই সামান্য সন্ধান পাইয়া, কিছুদিন ধরিয়া বায়ু লইয়া নানাবিধ পরীক্ষা ও গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন, এবং বায়ুতে নাইট্রোজেন্ ও অক্সিজেন্ ব্যতীত অন্য কোনও পদার্থ বর্ত্তমান আছে কি না, তাহার নির্ণয়ে, প্রথমে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। নানা চেষ্টার পর অবশেষে তড়িৎপ্রবাহ দ্বারা বায়ুবিশিষ্ট করিয়া, এবং বিশ্লেষণজ নাইট্রোজেন্ ও অক্সিজেন্ স্থানান্তরিত করিয়া, র‍্যালে সর্ব্বপ্রথমে এই বাষ্পসংগ্রহে কৃতকার্য্য হন, এবং রশ্মিনির্ব্বাচনযন্ত্র সাহায্যে (Spectroscope) পরীক্ষা করিয়া, ইহাতে পরিজ্ঞাত মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের কোনও চিহ্ন দেখিতে না পাইয়া, ইহা একটি সম্পূর্ণ নূতন বাষ্প বলিয়া প্রচার করেন। আজও এই বাষ্পের সম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই। আবিষ্কারক লর্ড র‍্যালে এবং অধ্যাপক র‍্যাম্‌জে, উভয়েই ইহার প্রকৃতিনির্ণয়ে নিযুক্ত আছেন। হাইড্রোজেন্ অপেক্ষা ইহার গুরুত্ব প্রায় কুড়িগুণ অধিক বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, এবং রশ্মিনির্ব্বাচনযন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে, ইহার বর্ণচ্ছত্রে (Spectrum) একটি মাত্র নীল রেখা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা নাইট্রোজেনের বর্ণচ্ছত্রস্থ নীল রেখা অপেক্ষা অনেক গাঢ় বর্ণবিশিষ্ট ও সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

রামমোহন রায় ও রামজয় বটব্যাল।

মহাত্মা রামমোহন রায়কে বাড়াইতে গিয়া, তাঁহার জীবনচরিত-লেখক শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, অপর একজন নিরপরাধী মৃত ব্যক্তির নামে কলঙ্ক দিয়াছেন। বোধ হয়, অনবধানতাবশতঃ, অথবা ভ্রান্তিমূলক কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করাতে, এইরূপ ঘটিয়াছে।

উক্ত জীবনচরিতের দ্বিতীয় সংস্করণের ৩৯ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে :—

"কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত রাধানগর গ্রামে রামজয় বটব্যাল নামক এক ব্যক্তি চারি পাঁচ হাজার লোক লইয়া এক প্রধান দলপতি হয়। রামমোহন রায় পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ ও ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করেন বলিয়া সে ব্যক্তি তাঁহাকে নানা প্রকার কষ্ট দিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বটব্যালের লোক সকল অতি প্রত্যুষে আসিয়া রামমোহন রায়ের বাটীর নিকট ক্রমাগত কুক্কুটধ্বনি করিত; এবং সন্ধ্যার পর তাঁহার অন্তঃপুরে গোহাড় প্রভৃতি পদার্থ নিক্ষেপ করিত। এই প্রকার অত্যাচার দ্বারা পরিবারগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। কিন্তু রামমোহন রায়ের অসাধারণ ধৈর্য্য কিছুতেই পরাভব মানিল না। কোন প্রকার প্রতিহিংসা করা দূরে থাকুক তিনি সর্ব্বদাই সদ্ভাব দ্বারা অসদ্ভাবকে জয় করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাঁহার মিষ্ট কথায় ও সদুপদেশে তাহারা ভুলিবার লোক ছিল না। বরং তাঁহাকে একান্ত ধৈর্য্যশীল দেখিয়া উৎপাত আরো বৃদ্ধি করিয়াছিল। পরিশেষে আপনা আপনি সকলই থামিয়া গেল।"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া উপরি-উক্ত বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহা আমরা অবগত নহি। তবে স্থানীয় বৃদ্ধগণের মুখে যাহা শুনা যায়, তাহাতে উল্লিখিত চিত্রটি নিরবচ্ছিন্ন কল্পনামূলক বলিয়া বোধ হয়। রায় বংশের সহিত বটব্যাল বংশের দলাদলির অনেক কথা। সে সমুদায় এখানে লেখা অনাবশ্যক। উভয় বংশই খানাকুল কৃষ্ণনগরের আদিম নিবাসী নহেন। প্রথম, বটব্যাল বংশের আদিপুরুষ খানাকুলে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার বংশধরগণ বর্দ্ধমান রাজসরকারে চাকুরি করিয়া, এবং অন্যান্য উপায়ে ধনশালী হয়েন, এবং সমাজে তৎকালোচিত সৎকার্য্যাদি দ্বারা প্রচুর মান সম্ভ্রম উপার্জ্জন করেন। ঐ সময়ে রায় বংশের আদিপুরুষ রাধানগরে আসিয়া বাস করেন। ক্রমে তাঁহারা বংশপরম্পরায় উন্নত হইয়া দেশে মান সম্ভ্রম স্থাপনের জন্য যত্নবান হয়েন, এবং কৃষ্ণনগর অঞ্চলে একটি দলের সৃষ্টি করেন।

রাজা রামমোহন রায়ের পিতা রামকান্ত রায়, বর্দ্ধমান রাজসংসারে ইজারা ইত্যাদিতে অনেক টাকা ঋণগ্রস্ত হয়েন। রামজয় বটব্যাল তৎকালে রাজসংসারে একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকায়, ঐ টাকা আদায়ের তদ্বিরের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। ঐ টাকা আদায়ের যত্ন করায়, এবং ইজারা হইতে

[illegible] প্রথমে রায় ও বটব্যাল বংশের মধ্যে শত্রুতার সূত্রপাত হয়। বৃদ্ধগণের মুখে ইহাই প্রকৃত কথা বলিয়া শুনা যায়। রামমোহন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন বলিয়া দলাদলির সূত্রপাত হয় নাই।

রামমোহন রায় ও রামজয় বটব্যালের মধ্যে কে কাহার প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলেন, হুগলীর বিচারালাত সমূহের নথি অনুসন্ধান করিলে, তাহার কতক কতক নিদর্শন আজিও পাওয়া যাইবে। নিম্নে একটি ফয়শালার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

"২৪১ নং। ৪৯ কানুন। জেলা হুগলীর জজ্ শ্রীযুক্ত ওকিলী সাহেব। ১৮১৮। ১৫ এপ্রেল। বাদী রামজয় বটব্যাল। প্রতিবাদী রাম মোহন রায়। বাদীর আরজি এই যে প্রতিবাদী রাম মোহন রায় ১২২১ শালে লাটমজকুর পত্তনী তালুক খরিদ্ করিয়া ১২২২ শালের ২০ এ অগ্রহায়ণ তারিখে তালুকদার রাম মোহন রায় ও উহার নায়েব জগন্নাথ মজুমদার একশতের অধিক লাটিয়াল লোক লইয়া দলাদলীর আথেজে দাঙ্গা হাঙ্গামা দ্বারায় রামনগর গ্রামের ৭৯/২।০ বিঘার মধ্যে ৫১৸১০ জমির ধান্ত কশল ও মৌজে বিরুক গ্রামে ১০/১৩ দাইনামগ্রামে ৮।৪ বাগানের আম্র ইত্যাদি ১৭৫টা গাছ কাটিয়া ৭০। বিঘা জমী হইতে বেদখল ও আবাদী ধান্ত কশল লুট তরাজ করে। একারণ ২০৯২, টাকার দাবিতে নালীশ।"

এই মকদ্দমায় জজ্ আদালতে ও সদর দেওয়ানী আদালতে বাদী ডিক্রি পাইয়াছিলেন। *

ইহার উপর টীকা টীপ্পনি করা আমরা অনাবশ্যক বোধ করি। কেন না, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়কে খর্ব্ব করা আমার অভিপ্রায় নহে। তিনি যে সকল গ্রাম্যকলহে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার গ্রামের লোক এখনও বিস্মৃত হয় নাই; কিন্তু সে সকল কথা একণে প্রচার করায় কাহারও কোনও ফল নাই। তাঁহার সৎকার্য্য ও সদভিপ্রায় সকলই আমাদের স্মরণীয় হওয়া উচিত। তাঁহার জীবনচরিত-লেখক মহাশয় যদি অনর্থক ৺রামজয় বটব্যালের উপর কলঙ্ক দিয়া তাঁহাকে বাড়াইবার চেষ্টা না করিতেন, তাহা হইলে, এই প্রতিবাদ আবশ্যক হইত না। গ্রন্থকার মহাশয় যদি রামজয়কে চিনিতেন, তাহা হইলে, যেরূপ অমর্য্যাদার সহিত তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ঘটিত না। আর প্রকৃতপক্ষে রামজয় রামমোহনের উপর উৎপাত করা দূরে থাকুক, রামমোহনই তাঁহার উপর উৎপাত করিয়াছিলেন। শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।

---

* এই বিবরণ ও ফয়শলার নকল রামজয়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ বটব্যাল আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

আগ্রায় তিন দিন।

২৭শে ফেব্রুয়ারি। দিল্লী হইতে প্রত্যূষে রওনা হইয়া বেলা ১টার সময় আমরা টুণ্ডলা ষ্টেশনে পৌঁছিলাম; এই স্থানে গাড়ী বদলাইতে হয়। আমরা দিল্লীর গাড়ী হইতে নামিয়া আগ্রার গাড়ীতে উঠিলাম। প্রায় এক ঘণ্টা পরে গাড়ী ছাড়িল।

বেলা প্রায় ২॥ টার সময় মধ্যাহ্ন-সূর্য্যকিরণপ্রদীপ্ত, পৃথিবীতে অতুলনীয় তাজমহল আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। আমরা অনিমিষ নয়নে মুগ্ধহৃদয়ে দেখিতে লাগিলাম। অবশেষে গাড়ী যমুনা পার হইয়া আগ্রা ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। আমরা সকলে নামিলাম। কয়েকটি বন্ধু আমাদিগকে অতি সমাদরে নির্দ্দিষ্ট বাসায় লইয়া গেলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা জুম্মা মসজিদ্ দেখিতে যাই। দিল্লীর জুম্মা মসজিদের সহিত ইহার তুলনাই হইতে পারে না। তবে ইহাও প্রকাণ্ড, এবং আগা-গোড়া লাল পাথর দিয়া বাঁধান। দিল্লীর জুম্মা মসজিদের ন্যায় ইহারও তিনটি বৃহৎ গম্বুজ এবং সম্মুখে বিস্তৃত অঙ্গন আছে। ভিতরটাও দেখিতে অনেকটা সেইরূপ।

পরদিন সকাল সকাল আহারাদি করিয়া ফতেপুর শিক্রি দেখিতে যাই। ইহা আগ্রা হইতে ২৪ মাইল দূরে অবস্থিত। প্রায় ১২টার সময় তথায় পৌঁছি। এইখানেই প্রথমে আকবরের প্রাসাদ ছিল, কিন্তু স্থানটি অস্বাস্থ্যকর এবং নিকটে কোনও নদী নাই বলিয়া, আকবর সাহ এ স্থান ত্যাগ করিয়া আগ্রায় আসিয়া বাস করেন। দিল্লীর ন্যায় এখানেও অনেক অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে, কিন্তু প্রাসাদমধ্যবর্ত্তী অট্টালিকা গুলি এখনও অভগ্ন অবস্থায় আছে। প্রাসাদের প্রবেশদ্বারের নাম 'বোলান্দর দরওয়াজা'। ইহা অতিশয় উচ্চ (প্রায় ১৩০ ফুট বা ৮৬ হাত) এবং আকবর সাহের প্রাসাদের উপযুক্ত। হণ্টার সাহেব ইহাকে পৃথিবীর মধ্যে উচ্চতম এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রকাণ্ড প্রবেশদ্বার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকাণ্ড গির্জাঘরের দরজার ন্যায় খিলান-করা দরজা, দরজার উপরে ও পাশে দেয়ালে আরবি লেখা, সকলের উপরে নাতিবৃহৎ তিনটি গম্বুজ এবং দরজার উপরে আরও ছোট ছোট ১৩টি গম্বুজ শোভা পাইতেছে। দ্বার পার হইয়া একটি প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ। অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া বামদিকে জুম্মা মস্জিদ্ (দিল্লীর মস্জিদ্ অপেক্ষা অনেক ছোট) এবং সম্মুখে

দিকে সেখ সলিম চুস্তির (আকবরের পীর) শ্বেতমর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত একটি স-গম্বুজ মাঝারি ধরণের সমাধিমন্দির। চুস্তি সাহেবকে আকবর সাহ গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন, এবং ইহার নামানুসারেই যুবরাজ সেলিমের নাম রাখিয়াছিলেন। তাই আকবর নিজ প্রাসাদের মধ্যে এক সুন্দর সমাধি নির্ম্মিত করাইয়া, মৃত পীরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। সমাধির পার্শ্বে আর একটি ক্ষুদ্র অট্টালিকা আছে। ইহার পর আমরা আকবরের উষ্ট্রশালা ও অশ্বশালা প্রভৃতি দেখিলাম। পরে বীরবলের ভবনে প্রবেশ করিলাম, ইহা এক্ষণে ডাকবাঙ্গালারূপে ব্যবহৃত হইতেছে। বাহিরের ও ভিতরের দেওয়ালে নানা প্রকার কারুকার্য্য ক্ষোদিত রহিয়াছে। ইহা অনেকটা হিন্দুদিগের গৃহের ন্যায় নির্ম্মিত, কেবল দুইটি গম্বুজ আছে। কালের মাহাত্ম্যে বাদসাহের মন্ত্রীর ভবন এক্ষণে সাহেবদিগের ডাকবাঙ্গলায় পরিণত! বীরবলের ভবনের পর আর একটি গৃহ আছে, এটিতে নাকি আকবরের খ্রীষ্টান স্ত্রী "মেরিয়ান বেগম" বাস করিতেন। এই গৃহে এখন 'আর্কিয়লজিক্যাল সোসাইটীর' আফিসের আড্ডা। তার পর পাঁচমহল। এই পঞ্চতল গৃহটির প্রত্যেক তল ক্রমান্বয়ে নানা প্রকার খোদকারী-করা থামের উপর স্থাপিত। রাজপুত্র ও রাজকন্যাদিগের বায়ুসেবনের জন্য ইহা ব্যবহৃত হইত। পাঁচমহল হইতে কিছু দূরে লাল প্রস্তরে নির্ম্মিত দেওয়ান-ই-খাস; এটি দিল্লীর দেওয়ান-ই-খাস অপেক্ষা সৌন্দর্য্যে অনেক হীন; এবং মাঝখানে একটি উচ্চ স্তম্ভ আছে,—সেইখানে বসিয়া আকবর দরবার করিতেন। ইহার একটু দূরে দেওয়ান-ই-আম,—দেখিতে তত ভাল নয়। এই সমস্ত দেখিয়া বেশ বুঝা যায় যে, আকবর সৌন্দর্য্য এবং বাহ্য পারিপাট্যের পক্ষপাতী ছিলেন না। দেওয়ান-ই-খাসের পাশে আঁখ-মিচৌলি, ইহা কি জন্য ব্যবহৃত হইত, তাহা ভাল বুঝা যায় না। তবে এখানকার "পাণ্ডারা" বলিল যে, আকবর সাহ এই স্থানে বেগম সাহেবদের সহিত "লুকাচুরি" খেলিতেন। কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। বিলাস-বিরাগী আকবর যে সাম্রাজ্যের গঠন ও দৃঢ়ীকরণে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, সেই রাজকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিনি যে লুকোচুরি খেলায় তৃপ্তিলাভ করিতেন, ইহা আমার বিশ্বাস হয় না। দেওয়ান-ই-খাসের সম্মুখে একটি বড় অঙ্গন, এবং এই অঙ্গনে "পঁচিশি" খেলিবার ছক। তার পর হামাম (পাথর দিয়া বাঁধান একটি বড় জলাশয়) এবং তাহার তিন পার্শ্বে বেশবিন্যাসের সারি সারি ঘর। তার পর বাদসাহের শয়নকক্ষ শ্রেণি। ঘরটি নিতান্ত ক্ষুদ্র; দেখিলে বোধ হয় না যে, এইরূপ একটি

সামান্ত প্রকোষ্ঠ আকবরের শয়নকক্ষরূপে ব্যবহৃত হইত। অবশেষে "যোধা-বাই"র মহলে প্রবেশ করি। ইনি মুসলমানের গৃহে থাকিয়াও হিন্দুর আচার ব্যবহার অনেকটা রক্ষা করিয়া চলিতেন। বাস্তবিক দেখিলেও বোধ হয় যে, এটি একটি স্বতন্ত্র কোনও হিন্দুর গৃহ। গৃহটি দ্বিতল চকমিলান, এবং প্রধান ঘর-গুলি অষ্টকোণবিশিষ্ট। ঘরগুলি আমাদের চক্ষে ভাল বোধ হইল না। তবে অন্যান্য গৃহ অপেক্ষা ইহা প্রশস্ত এবং অধিক পরিমাণে বায়ু চলাচলের উপ-যোগী বটে। অবশেষে আমরা কতিপয় সামান্ত গৃহ দেখিয়া, সন্ধ্যার সময় বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

২৮ শে ফেব্রুয়ারি, প্রাতঃকালে সেকেন্দ্রাবাদে আকবরের সমাধিগৃহ দেখিতে যাই। ইহা আকবরের পিতা হুমায়ুন বাদসার সমাধির ন্যায় প্রকাণ্ড। চতুর্দ্দিকে সুন্দর সুবিন্যস্ত উদ্যান এবং স্থানে স্থানে ফোয়ারা। ইহার ফটকও দেখিতে পরিপাটী। আকবর, মৃত্যুর পূর্ব্বে আপনার সমাধিনির্ম্মাণ আরম্ভ করেন, এবং জাহাঙ্গিরের সময় সমাধিনির্ম্মাণ শেষ হয়। নীরেট লাল পাথরে, হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্যের সম্মিলনে, এই সমাধিভবন নির্ম্মিত হইয়াছিল। উপরিভাগ শ্বেত মর্ম্মরপ্রস্তরে গঠিত। ইহার উপরে বড় গম্বুজ আদৌ নাই, কিন্তু গম্বুজের স্থানে জগদ্বিখ্যাত কহিনুর স্থাপিত হইয়া সম্রাট-সমাধির শোভা সম-ধিক বর্দ্ধিত করিয়াছিল। কহিনুর পরে সাজাহান তুলিয়া লইয়া ময়ূরসিংহাসনে বসান। ভিতরে দেওয়াল এবং ছাত অতি সুন্দররূপে চিত্রিত ছিল, কিন্তু এখন মলিন হইয়া গিয়াছে। প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ যখন ভারতবর্ষ দেখিতে আসেন, তখন একটি স্থান মেরামত করিয়া পূর্ব্ববৎ করা হইয়াছিল। এই সমাধির মধ্যস্থলে অন্ধকারময় একটি কক্ষে বাদসাহের সমাধি রহিয়াছে। গভ-র্মেণ্ট হইতে সমাধি আবৃত করিবার জন্য বহুমূল্য সুবর্ণকারুকার্য্যখচিত যে বস্ত্র প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা কোন পাপিষ্ঠ চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। এই স্থান এত অন্ধকার যে, দিবসেও প্রদীপের সাহায্য ব্যতিরেকে কিছুই দেখা যায় না। আকবরের সমাধিগৃহের নিকট আর একটি গৃহ ক্ষুদ্র আছে; তথায়, যোধা বাই আকবরের মৃত্যুর পর নির্জ্জন-বাস করিয়াছিলেন। আকবরের সমাধি দেখিয়া আমরা প্রায় ৯॥ টার সময় বাসায় ফিরি।

আবার বেলা ১১ টার সময় তাড়াতাড়ি তাজমহল দেখিতে বাহির হই। বিচিত্র রক্তপ্রস্তররচিত প্রবেশদ্বার দিয়া আমরা তাজের সম্মুখবর্ত্তী উদ্যানে প্রবেশ করিলাম। যেমন তাজ, তেমনই তাহার উৎপলশ্রেণীসুশোভিত উদ্যান।

প্রবেশদ্বার হইতে নিজ তাজ পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে অনেকগুলি উৎস এক লাইনে স্থাপিত; এবং ইহার মধ্যস্থলে শ্বেত পাথর দিয়া বাঁধান একটি কুণ্ড, এবং এই কুণ্ডের মধ্যে পদ্মের ন্যায় আকৃতি পাঁচটি উৎস রহিয়াছে। উৎসের সারির দুই পার্শ্বে লাল পাথরে বাঁধান দুইটি পথ, এবং পথের দুই পার্শ্বে নানা বর্ণের গোলাপ, চন্দন, লবঙ্গ ও অন্যান্য সুন্দর ফুল গাছ, ও বিলাতি ঝাউ গাছ রোপিত রহিয়াছে। বাগানের পরে তাজ। আমরা জুতা খুলিয়া একটা সিঁড়ি দিয়া তাজে উঠিলাম। চতুর্দ্দিকে প্রশস্ত অঙ্গন, এবং মাঝখানে সেই অমল ধবল বৃহৎ সৌধ। অঙ্গনের চতুষ্কোণে চারিটি বৃহৎ শ্বেতস্তম্ভ। উত্তর দিকে যমুনা কলকল রবে তাজের পদপ্রক্ষালন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। অবশেষে আমরা সমাধির মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ঠিক মাঝখানে বড় গম্বুজের নীচে পাথরের জাফ্রি দ্বারা বেষ্টিত মমতাজমহলের সমাধি; তাহার পার্শ্বে সাহাজাহান বাদসার সমাধি। শুভ্র প্রস্তরের গাত্রে নানাবিধ প্রস্তরের সন্নিবেশে অঙ্কিত লতাপাতার প্রতিরূপগুলি দেখিতে অতি চমৎকার। এই স্থানে কথা কহিলে বা শব্দ করিলে, তাহার দশগুণ গম্ভীর প্রতিধ্বনি শ্রুত হয়। এই জন্য তাজের প্রতিধ্বনি জগদ্বিখ্যাত। তাজের আরও অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ আছে। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠই কারুকার্য্যে পরিপূর্ণ, এবং সাজাহানের মার্জ্জিত শিল্পরুচির পরিচায়ক। কি দেয়ালে, কি ছাদে, কি মেঝেয়, সর্ব্বত্রই সৌন্দর্য্য ফুটিয়া রহিয়াছে; আগাগোড়া নিখুঁত শ্বেতমর্ম্মরপ্রস্তরের দ্বারা নির্ম্মিত। উপরের বড় গম্বুজের চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্রাকার আরও চারিটি গম্বুজ আছে, এবং চারিদিকে বৃহৎ খিলানকরা দ্বার আছে। আমরা তাজমহল বেশ করিয়া দেখিয়া একটি স্তম্ভে আরোহণ করিলাম; অবশেষে স্তম্ভ হইতে নামিয়া বাগানের মধ্যে সমস্ত স্থানে বেড়াইয়া তাজমহল হইতে বাহির হইলাম।

এবার যমুনা পার হইয়া রামবাগ বা আরামবাগ নামক একটি প্রাচীন উদ্যান দেখিতে যাই। উদ্যানটি যমুনাপুলিনে অবস্থিত; এবং যদিও ইহার সৌন্দর্য্য অনেক নষ্ট হইয়াছে, তবুও দেখিতে নিতান্ত মন্দ নয়। আরামবাগ দেখা শেষ হইলে, এৎ-মৎ-উদ্দৌলার সমাধিগৃহ দেখি। এই স্থানে নূরজাহানের পিতা মাতা নিদ্রা যাইতেছেন। এটি নূরজাহানের ইচ্ছানুসারে জাহাঙ্গীর কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহারও একদিকে যমুনা এবং অন্য দিকে সুন্দর উদ্যান; দূর হইতে দেখিলে সমাধিমন্দিরটি যেন একখানি ছবি বলিয়া বোধ হয়। ইহাতেও স্থাপত্যের অনেকবিধ নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু তাজমহলের নৈপুণ্যের সহিত

কোনও অংশে তুলিত বা সমকক্ষ হইতে পারে না। ইহার গম্বুজটি অনেকটা হিন্দুদের গম্বুজের ন্যায়, চারি কোণে চারিটি নাতিবৃহৎ স্তম্ভ থাকায় ইহার শোভা-বৃদ্ধি হইয়াছে। এই সব দেখিতে, সন্ধ্যা হইল। সন্ধ্যার সময় ইৎ-মৎউদ্দৌলার সমাধিগৃহ ত্যাগ করিয়া আমরা আবার তাজমহলে আসিলাম। তখন বেশ রাত্রি হইয়াছিল, শুক্লচতুর্দ্দশীর চন্দ্র নির্ম্মল আকাশ হইতে কিরণমালা বিস্তার করিয়া রাত্রির শোভা শতগুণ বৰ্দ্ধিত করিতেছিল। চারিদিক নিস্তব্ধ, কেবল যমুনার মৃদু কল্লোলধ্বনি কর্ণগোচর হইতেছিল। আমরা চন্দ্রালোকে তাজ দেখিবার নিমিত্ত অতি কষ্টে প্রবেশদ্বারের শিখরদেশে আরোহণ করিলাম। অতি কষ্টে—কারণ তাজমহল ও অন্যান্য বড় বড় সমাধির প্রবেশদ্বারের উপরে উঠা বড় সহজ কথা নয়, এক একটি গোলকধাঁধাঁ বিশেষ। কিন্তু সেখান হইতে ভাল করিয়া দেখিতে না পাওয়ায়, আবার নামিয়া অন্য দিকে গিয়া দেখিতে লাগিলাম। তাজমহলের এই দৃশ্যটি সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর। চন্দ্রালোকবিভাবিত তাজের শোভা যিনি একবার দেখিয়াছেন, তিনি জীবনে তাহা কখনও ভুলিতে পারিবেন না। শ্বেত সৌধের উপর শুভ্র জ্যোৎস্না পড়াতে, তাজ আকাশপটের সহিত মিলাইয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাজকে তখন কোনও পার্থিব বস্তু বলিয়া বোধ হইল না—যেন কি স্বর্গীয় পদার্থ ধীরে ধীরে উপর হইতে নামিয়া আসিয়া সেই স্থানে আশ্রয় লইয়াছে। অথচ নীচের দিকে ছায়া পড়াতে বোধ হইতেছিল, যেন ভূমি স্পর্শ করে নাই, মলিন পৃথিবীর কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে রহিয়াছে। যাঁহারা চন্দ্রালোকে তাজ দেখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এক-বাক্যে ইহা স্বীকার করিবেন। আমাদের দক্ষিণে "সুবিমলজল যমুনা," সম্মুখে চন্দ্রের শুভ্রকিরণস্নাত অপার্থিব সৌন্দর্য্যের সেই আধার, এবং বামে "সঙ্গত-তরুগণ-পরিবৃত-কুঞ্জবন,"—তাহা হইতে সুমিষ্ট সৌরভ আসিতেছে; এই সক-লের মধুর সংমিশ্রণে একরূপ অপূর্ব্ব কবিত্বের সৃষ্টি হইয়াছিল। আমরা মুগ্ধ হইয়া প্রায় এক ঘণ্টাকাল এই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিলাম। অবশেষে অধিক রাত্রি হওয়ায়, অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠিয়া ধীরে ধীরে তাজের উদ্যানসীমা অতিক্রম করিয়া বাসায় ফিরিলাম।

পরদিন কোর্টের পাশ যোগাড় করিয়া কোর্ট দেখিতে গেলাম। আগ্রার কেল্লার ফটক ও প্রাচীর দিল্লীর কেল্লার ন্যায়, তবে আগ্রার দুর্গ বেশী মজ-বুত বলিয়া বোধ হইল। আমরা কেল্লার প্রবেশ করিয়া বৃটিশ সৈন্য-নিবাস পার হইয়া মতিমসজিদে আসিয়া পৌছিলাম। ইহাও দিল্লীর মতিমসজিদের

স্থার চারিদিকে ঘেরা এবং আগাগোড়া শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তরের দ্বারা নির্ম্মিত বটে, কিন্তু সৌন্দর্য্যে অনেক পরিমাণে হীন। ইহার বাহিরে এক ধারে মীনা-বাজার, এইখানেই খোসরোজের উৎসব হইত। কিন্তু এখানে কোনও গৃহাদি নাই। ইহার কিঞ্চিৎ দূরে দেওয়ান-ই-আম। অনেকটা দিল্লীরই মত, তবে ইহাতে বর্ণনার উপযুক্ত বিশেষ কিছুই নাই। বাদশাহেরা মাঝে মাঝে এখান হইতে হস্তী, অশ্ব ইত্যাদির যুদ্ধ দেখিতেন। ইহার নিকট মচ্ছিভবন এবং চিতোর কটক। পূর্ব্বদিকে কতকগুলি কক্ষ অতিক্রম করিয়া দ্বিতলে উঠিলেই দেওয়ান-ই-খাস। দিল্লীর অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট, অনেকটা হিন্দুদিগের স্থাপত্যপ্রণালী অনুসারে নির্ম্মিত। সম্মুখে খোলা ছাদ, তাহার পূর্ব্ব এবং পশ্চিম পার্শ্বে দুইটি কৃষ্ণ ও শ্বেত মর্ম্মরপ্রস্তরে গঠিত বেদী বা আসন আছে। পূর্ব্বদিকের কৃষ্ণ বেদীতে স্বয়ং আকবর বসিতেন; সম্মুখস্থ শ্বেত-বেদীতে উপবিষ্ট মন্ত্রী বীরবলের সহিত যমুনার শোভা দর্শন করিতে করিতে কথোপকথন করিতেন। এখন কৃষ্ণ বেদী দুই-চির হইয়া ফাটিয়া গিয়াছে। তথাকার পাণ্ডা বলিল, দিল্লী দখল করিয়া জাঠ সূরযমল দর্পসহকারে পাদুকা সহিত ঐ বেদীতে উঠিয়াছিলেন, সেই জন্য উহা অভিমানে ফাটিয়া গিয়াছে; এবং কতকগুলি লাল দাগ রক্তের চিহ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিল। কথাটি কত দূর সত্য, তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। দ্বিতল হইতে নামিয়া খাসমহল (বাদসার বসিবার ঘর) সমন-বুরুজ (বোধ হয় এখানে বেগম থাকি-তেন), অঙ্গুরিবাগ (একটি নাতিবৃহৎ উদ্যান, ইহার পথগুলি লাল পাথর দিয়া বাঁধান এবং স্থানে স্থানে উৎস আছে) ইত্যাদি দেখি। অঙ্গুরিবাগের উত্তরে শিশমহল অর্থাৎ স্নানগৃহ;—ভিতরে অতি সুন্দর কাজ করা। লতা পাতা ইত্যাদি নানাপ্রকার চিত্রের মধ্যে কাচ বসান থাকায়, ইহার সৌন্দর্য্য সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে। এখন অনেক স্থান হইতে কাচ স্খলিত হইয়া গিয়াছে, এবং চিত্রগুলিও মলিন হইয়াছে। শিশমহল হইতে বাহিরে আসিয়া কিছু দূরে একটি কক্ষে রেলিং দ্বারা বেষ্টিত দারুময় বৃহদাকার এক জোড়া কপাট দেখিতে পাইলাম। ইহাই সোমনাথের দ্বারের কপাট ভাবিয়া লর্ড এলেনবরা আফগানিস্থান হইতে আনাইয়াছিলেন। কিন্তু অনেকেই ইহাকে সোমনাথের কপাট বলিয়া স্বীকার করেন না।

অঙ্গুরিবাগ হইতে কিয়দ্দূর দক্ষিণ দিকে গেলে, জাহাঙ্গীরি মহলে উপস্থিত হওয়া যায়। জাহাঙ্গীরি মহলের অধিকাংশ হিন্দু স্থাপত্যের আদর্শে নির্ম্মিত।

প্রত্যেক থামের উপরে হিন্দু ব্র্যাকেট রহিয়াছে, এবং ব্র্যাকেটের নীচে পদ্মপুষ্পের প্রতিকৃতি দুইটি বিভিন্নজাতীয় পক্ষীর প্রতিমূর্ত্তির উপর স্থাপিত রহিয়াছে। এই স্তম্ভশ্রেণীগুলি দেখিতে অতি সুন্দর। ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্রথমে একটি অঙ্গন এবং তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি বিস্তীর্ণ কক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই গৃহগুলি যে কিরূপ ভাবে ব্যবহৃত হইত, তাহা অবধারিত করা কঠিন। ইহার কিঞ্চিৎ দূরে আরও অনেকগুলি লাল পাথরের কক্ষ আছে; সেগুলি দেখিয়া বোধ হইল যে, জাহাঙ্গীর বেগমদিগের সহিত এই সকল কক্ষে বাস করিতেন।

এই সমস্ত দেখিয়া বেলা এগারটার সময় আমরা বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। বিকালে আগ্রা কলেজের অধ্যাপকগণ আমাদিগের সহিত দেখা করিয়া আপ্যায়িত করিলেন, এবং অবশেষে আমরা তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া রাত্রি ১২টার সময় আগ্রা ত্যাগ করিলাম।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

কবিতার ভবিষ্যৎ।

আজকাল সাহিত্যক্ষেত্রে সাহিত্যসেবকগণ কবিতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুই বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। একদল বলেন যে, সভ্যতার বৃদ্ধির সহিত কবিতার হ্রাস হইতেছে। দর্শনের কঠোরতম আঘাতে, বিজ্ঞানের ভীতিভয় ভীষণ ভ্রুকুটীতে, কবির কল্পনাসৃষ্ট দুহিতা ক্রমে অদৃশ্য হইতেছে। কিছু কাল পরে এই জীবন-সংগ্রামময় গদ্যপ্রবণ জগতে পূর্ব্বরচিত কবিতা সকল মিশরের বহুদূরবিস্তৃত বিশাল মরুভূমির বক্ষে বিস্ময়োৎপাদক সঙ্গীহীন পিরামিডের মত বোধ হইবে। মেকলে প্রভৃতিও এই মতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; তাঁহারা বলেন যে, কবিতার সহিত সভ্যতার এইরূপ অহিনকুল সম্বন্ধ। আর একদল বলেন যে, কবিতা চিরদিন যেমন আছে, চিরদিন তেমনই থাকিবে। এই দুই মতের কিঞ্চিৎ বিচার আবশ্যক।

মতামত।

কবিতা কি, তাহা বলিবার আবশ্যক দেখি না। তবে কবিতার কার্য্য কি? কবিতা মানব-হৃদয়ের নিভৃততম নিকেতন হইতে সুখসুপ্ত ভাব সকল জাগাইয়া তুলে। চিত্রকর নানা বর্ণে চিত্র সম্পন্ন করিয়া যাহা করেন, কবি ভাষায় তাহাই করেন। তবে সভ্যতার সহিত কবিতার এ বিবাদ কিরূপে সম্ভবে? লীলাময়ী প্রকৃতির কোমল পথে যে অসীম কবিতা নিমগ্ন, সভ্যতাস্রোত তাহা কি বিধৌত করিতে পারিয়াছে? প্রকৃতি কবিতাময়ী। যে দিন কবিতা হইতে প্রকৃতি ভিন্ন হইবে, সে দিন বিশাল

সভ্যতা ও কবিতা।

বিশ্বের বিজন পথে মানব কোথায় থাকিবে? যে দিন আদিম মানব মহা [illegible] বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে আপনার চারি দিকে চাহিয়াছিল, সে দিন তরুশাখায় বিহগগণ তাহার কর্ণে যে সুস্বরলহরী বর্ষণ করিয়াছিল, আজও তাহারা তাহাই করিতেছে, আজও বসন্তপবনস্পর্শে লতার ক্ষুদ্র হৃদয়ে কুসুম তেমনই বিকশিত হইতেছে; আজও সেই বহু পুরাতন চিরনূতন শিশুর ওষ্ঠাধরে পবিত্র হাস্য কুসুমরাশির মত ফুটিয়া উঠিতেছে; আজও জননীর স্নেহ তেমনই অপরিমেয়, আজও প্রেম তেমনই মোহময়, মধুর, মধুর হইতেও মধুরতর। তবে কোন দূরদর্শী বলিতে সাহস করিবেন যে, সভ্যতার উন্নতির সহিত কবিতার উৎস প্রবাহহীন হইয়া আসিতেছে?

আগষ্ট মাসের "গ্রেট থট্‌স" পত্রিকায়, মিষ্টার রিচার্ডলি গেলিয়েন, কবিতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে তিনিও শেষোক্ত মত ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা সেই প্রবন্ধ হইতে এক স্থান উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"আজ কাল একটা বিরক্তিজনক মিথ্যা মত প্রায়ই আলোচিত হয় যে, নাটকের মত কবিতার ভাণ্ডারও এখন শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। দেবশক্তির মত কবিতার যুগ এখন অতীত। যে যুগে কাউস্লিপ বা প্রিমরোজ ফুল বিকশিত হইত, সে যুগ এখন অতীত হইয়াছে, ইহা বলাও যেরূপ অসম্ভব, কবিতার যুগ অতীত হইয়াছে বলাও সেইরূপ অসম্ভব; কারণ, কুসুমের মত কবিতাও প্রকৃতির চিরস্থায়ী যৌবনের অংশ। যেরূপ কবিতা ইতিপূর্ব্বে রচিত হইয়াছে, এখনও সেইরূপ কবিতা রচিত হইতে পারে। যদি, কিছুকাল ধরিয়া সেরূপ কবিতা রচিত না হয়, তবেই যে নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, বুঝিতে হইবে,—এমন নহে। যদি কেহ বলেন যে, বর্ত্তমান সময়ে কোনও ভবিষ্যৎ মহাকবির আবির্ভাবের সূচনা দেখা যায় না, তবে এ কথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না যে, বর্ত্তমান সময়ে কবিতার সৃজনী এবং ধারণা, এই উভয় শক্তিই কবিদিগের মধ্যে অধিক পরিমাণে ব্যাপ্ত দেখিতে পাই। আর একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল, কোন্ মহাকবি প্রথম হইতেই মহাকবি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন? শেলী বা কিট্‌সের কথা ছাড়িয়া দিলেও, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোলরিজ, টেনিসন, ম্যাথু আর্নল্ড বা ব্রাউনিং, ইঁহারাও কি প্রথমে প্রতিভার উপযুক্ত সম্মান ও যশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? অবশ্য কতকগুলি পাঠক তাঁহাদিগকে সম্মান করিতে ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু সমসাময়িক সমালোচকগণ হীনপ্রতিভাশালী বলিয়া তাঁহাদিগকে ঘৃণা করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। যতদিন কোনও কবি আপনার ভাস্বর প্রতিভার উজ্জ্বল কিরণে সাহিত্যগগন আলোকিত করিতে না পারেন, ততদিন তিনি সামান্য কবি বলিয়াই গণ্য হয়েন। একটু সহৃদয়তা ও অনুসন্ধানপ্রবৃত্তি লইয়া দেখিলে দেখা যায় যে, এখনও অনেক উৎকৃষ্ট কবির প্রতিভা ধীরে ধীরে মুকুলিত হইয়া উঠিতেছে, এবং এখনও অনেক সহৃদয়তাবিহীন সমালোচক সুতীব্র সমালোচনা দ্বারা তাহাদিগকে মুকুলেই নিষ্পেষিত করিতে যত্নবান। (এইখানে লেখক অনেকগুলি উদীয়মান নবকবির নামের তালিকা প্রদান করিয়াছেন।) তাহার পর লেখক বলিতেছেন, যদি কখন সাহিত্য-কাননে অনেকগুলি সুরভি পুষ্পের আশা থাকে, তবে বর্ত্তমান সময়ের উপর সে আশা স্থাপন করিলে অন্যায় হইবে না। এতগুলি সুন্দর মুকুলের পর বসন্ত কিরূপ মধুময় হইবে—আশা করা যায়, তাহা পাঠক অনুমান করিয়া লইবেন। তবে অন্ধকার ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে, তাহা কেহ জানে না। যদি বর্ত্তমান নবকবিদিগের মধ্যে কেহই তেমন বড় কবি হইতে না পারেন, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? কঠোর হৃদয়ে কেবল তাঁহাদিগের দোষান্বেষণ না করিয়া, বোধ হয়, তাঁহাদিগের রচনার জন্য, তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ হওয়াই আমাদিগের কর্ত্তব্য।"

বর্ত্তমান সময়।

ষ্টিভেন্‌সনের প্রথম পুস্তক।

ষ্টিভেন্‌সন্।

মিষ্টার রবার্ট লুই ষ্টিভেন্‌সন্ বর্ত্তমান ইংরাজী লেখকদিগের মধ্যে একজন বিশেষ খ্যাতনামা ব্যক্তি। ইনি সাহিত্যক্ষেত্রে অনেক কার্য্য করিয়াছেন, কিন্তু বালকদিগের জন্য রচিত তাঁহার "ট্রেজার আইল্যাণ্ড" (Treasure Island) পুস্তক তাঁহাকে যেরূপ লোকপ্রিয় ও যশস্বী করিয়াছে, সাধারণতঃ কোনও একখানি পুস্তকের রচনা, গ্রন্থকারকে সেরূপ লোকপ্রিয় ও যশস্বী করিতে পারে না। আগষ্ট মাসের "আইড্‌লার" পত্রে তিনি উক্ত পুস্তকের উৎপত্তির বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন। বিবরণ কিঞ্চিৎ কৌতুকজনক; আমরা তাঁহার প্রবন্ধের সারোদ্ধার করিয়া দিলাম।

প্রথম পুস্তক।

লেখক বলিতেছেন যে, বাস্তবিক এই গ্রন্থ তাঁহার প্রথম গ্রন্থ নহে; কারণ, তিনি কেবল মাত্র উপন্যাস রচনা করেন না। কিন্তু এ কথাও তিনি অবগত আছেন যে, সাধারণ পাঠক-মণ্ডলী তাঁহাকে উপন্যাসলেখকই বলেন, এবং তাঁহার অন্যান্য রচনা কতকটা ঘৃণার সহিত দর্শন করেন। তাঁহার প্রথম পুস্তকের কথা লিখিতে হইলে তাঁহার প্রথম উপন্যাসের কথাই লিখিতে হয়—কারণ, সেই সাধারণ পাঠক-মণ্ডলীই সে বিবরণের পাঠক। উপন্যাসরচনা যে সহজসাধ্য নহে, তাহা লেখক স্বীকার করেন; আমরা তাঁহার প্রবন্ধের এক স্থান উদ্ধৃত করিলাম।

উপন্যাস রচনা ও নৈতিক সহিষ্ণুতা।

পরিশ্রম, শক্তি, অবসর ও কাগজ ইত্যাদি থাকিলে, সকলেই ভাল হউক আর মন্দ হউক, একটা ছোট গল্প লিখিতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া, সকলেই,—ভাল দূরে থাক,—একখানা মন্দ উপন্যাসও লিখিতে পারে না। উপন্যাসের দৈর্ঘ্যই তাহার কারণ। অভ্যস্ত উপন্যাসলেখক কিছু কাল ধরিয়া উপন্যাস রচনা করিবার বৃথা চেষ্টা করিতে পারেন—কিন্তু নবব্রতী তাহা পারেন না। অতীত সাফল্যের উত্তেজক সাহায্য না পাইলে, মানব বিফল সাহিত্যগত কর্ম্মে একটা নিরূপিত সময়ের অধিক ব্যয় করিতে পারে না—মানবস্বভাব তাহার বিরোধী। আশার দাঁড়াইবার স্থান চাই। নবব্রতী প্রবল প্রতিকূল পবনের সহিত সংগ্রাম করিয়া অগ্রসর হইতে সক্ষম নহেন। যে সময় প্রতিভা আপনি জ্বলিয়া উঠে, বাক্যের পর বাক্য সঙ্গত ভাবে আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই সময়ই নবব্রতীর রচনারম্ভের প্রকৃত সময়। গ্রন্থারম্ভের পর শেষ পর্য্যন্ত কি একটা অসহ আকুলতা! আর সেই দীর্ঘকাল ধরিয়া লেখককে প্রতিভাজ্যোতিঃ জাগাইয়া রাখিতে হইবে-- একই প্রকার রচনাপ্রণালীর অন্ধ অনুসরণে প্রবৃত্ত থাকিতে হইবে; আর সেই দীর্ঘকাল তাঁহার কল্পনাসৃষ্ট চরিত্র সকলকে প্রাণময় ও সঙ্গত রাখিতে হইবে। লেখক বলেন যে, সে সময় তিনি বড় বড় উপন্যাস মানবের সাধ্যাতীত অদ্ভুত কীর্ত্তি ভাবিয়া, ভক্তির চক্ষে দেখিতেন। কারণ, তাহাতে যথেষ্ট সাহস এবং নৈতিক সহিষ্ণুতার প্রয়োজন।

পুস্তকের উৎপত্তি।

ইতিপূর্ব্বে দশ বারো বার চেষ্টা করিয়াও গ্রন্থকার অকৃতকার্য্য ও কতকটা হতাশও হইয়াছিলেন। একদিন তিনি একটা খেলো রঙ্গের বাক্সের সাহায্যে কতকগুলা ছবি আঁকিয়া একটি বালকের জন্য চিত্রশালা প্রস্তুত করিতেছিলেন; তিনি একটি দ্বীপের মানচিত্র অঙ্কিত করিলেন—সেখানি তাঁহার অত্যন্ত ভাল লাগিল। সেই ক্ষুদ্র মানচিত্রে অঙ্কিত বন্দরগুলি তাঁহার কাছে সনেট অপেক্ষাও মিষ্ট বোধ হইল। অজ্ঞাতে এইখানে তাঁহার পুস্তকের উৎপত্তি হইল। এই উৎপত্তির বিবরণ খুব আশ্চর্য্য বটে। সেই মানচিত্রের দিকে চাহিয়া তাঁহার মনে হইল, যেন কল্পিত কাননমধ্যে তিনি ভবিষ্যৎ গ্রন্থের চরিত্র সকল প্রত্যক্ষ করিলেন—সেই ক্ষুদ্র স্থানে যেন তাম্রবর্ণবদন, তীক্ষ্ণধার-তরবারিহস্ত মানবগণ, রত্নান্বেষণ ও যুদ্ধ করিয়া ফিরিতে লাগিল। সম্মুখেই কাগজ ছিল,

তিনি পরিচ্ছেদের তালিকা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তখনই মনে হইল, হায়! কতবার এইরূপ তালিকা প্রস্তুত করাই সার হইয়াছে, কার্য্য আর অগ্রসর হয় নাই! বর্ত্তমান পুস্তকে সাফল্যের সম্ভাবনা দৃষ্ট হইল। গ্রন্থ বালকদিগের জন্য রচিত হইবে, কাজেই ইহাতে চরিত্রবিশ্লেষণ বা রচনাচাতুরীর আবশ্যক নাই, এবং গল্প বালকদিগের কেমন লাগিবে, তাহা পরীক্ষা করা সহজ ; কারণ, এই বালকটিকে শুনাইলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

ক্রমে ক্রমে পুস্তকের অনেকটা শেষ হইয়া গেল। সেই সময় তাঁহার বন্ধু ডাক্তার জ্যাপ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি চলিয়া যাইবার সময় পুস্তকের খসড়া লইয়া গেলেন ; কারণ, গল্পটি তাঁহার ভাল লাগিয়াছিল। তিনিও "ইয়ং ফোকস্" পত্রের জন্য নূতন লেখক জোগাড় করিবার জন্যই আসিয়াছিলেন।

প্রুফ আসিতে লাগিল, এমন সময়—সর্ব্বনাশ!—সহসা লেখকের রচনার উৎস শুষ্ক হইয়া গেল। তখন লেখকের বয়স একত্রিশ বৎসর, তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বেও এক-

পুস্তকসমাপ্তি।

খানি পুস্তক সমাপ্ত করিতে না পারায়, তাঁহার পিতা প্রকাশকের নিকট হইতে অর্থ দিয়া তাহা ফিরাইয়া লইয়াছিলেন—এই পুস্তকের দশা যদি সেইরূপ হয়, তাহা হইলেই কলঙ্ক ষোল আনা পূর্ণ হয়—গ্রন্থকার হতাশ হইয়া পড়িলেন। সেই সময় শীতযাপনের জন্য তিনি ডেভস যাত্রা করেন। সেখানে একদিন হতাশ গ্রন্থকার আবার যন্ত্রণাময় প্রুফ লইয়া লিখিবার চেষ্টা করিতে বসিলেন। দেখিলেন, প্রতিভা সদয়! নির্ঝরমুক্ত বারিধারার মত রচনা চলিতে লাগিল, প্রতি দিন এক এক পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হইতে লাগিল। তখনই রচিত অংশ পরিষ্কার করিয়া নকল করা হইয়া গেল, এবং সাহিত্য-জগতে ষ্টিভেন্‌সনের অমর কীর্ত্তি রচিত হইল।

গ্রন্থের নামকরণেও গোল পড়িয়াছিল। গ্রন্থকার ইহার "The Sea cook" নাম দিয়াছিলেন। শেষে এক বন্ধুর অনুরোধে তাহা পরিবর্ত্তিত করিয়া এই যোগ্যতর নামকরণ করেন।

শেষ।

তিনি বলেন যে, পো, ডিফো, আর্ভিং প্রভৃতির রচনা হইতে তিনি অবশ্য সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রধান সহায় ও গ্রন্থের উৎপত্তির প্রথম হেতু,—সেই ক্ষুদ্র মানচিত্র। বর্ত্তমান প্রবন্ধে লেখক অনেক স্থলে সেই মানচিত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। বিবরণ একটু আশ্চর্য্য বটে!

সমালোচনা।

কার্লাইল।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ইংলণ্ডের সাহিত্য-কাননে বসন্তপবনস্পর্শে কুসুমরাশির মত অনেকগুলি সাহিত্যসেবকের অসাধারণ প্রতিভা বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাদিগের যশঃ-

কার্লাইল।

সৌরভে ইংলণ্ডের সাহিত্যকানন এখনও সৌরভময়। কিন্তু মৃত্যুর শীতল স্পর্শে একে একে তাঁহাদিগের অনেককেই সেই অজ্ঞাত অসীম-রহস্যের দেশে লইয়া গিয়াছে, কার্লাইল তাঁহাদিগেরই অন্যতম। এই অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে কার্লাইলের প্রধান গ্রন্থ সকল সমাজ ও জাতির উপর কিরূপ প্রভাবসংস্থাপনে সফল হইয়াছে, তাহা বিচার করিবার সময় বোধ হয় উপস্থিত হইয়াছে। "ফোরাম" পত্রে বিখ্যাত লেখক মিষ্টার ফ্রেডরিক হ্যারিসন সেই বিচার করিয়াছেন ; তাহাতে তিনি কার্লাইলের গ্রন্থ সকলের বিভাগ করিয়াছেন, এবং তাহাদিগের স্থায়িত্বসম্বন্ধেও আপনার মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার প্রবন্ধের সারোদ্ধার করিয়া দিলাম।

গ্রন্থ সকলকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। একশ্রেণীস্থ গ্রন্থ সকল এরূপ বর্দ্ধনশীল স্থায়িত্বগুণসম্পন্ন যে, গণনাতীত কালের বিস্মৃতির বিনাশক বিষম প্রবাহও মানবহৃদয় হইতে তাঁহাদিগের প্রভাব বিধৌত করিতে পারে না। আর এক শ্রেণীর গ্রন্থ সকল কিছুকাল বিশেষ আগ্রহের সহিত পঠিত হয়, কিন্তু পরিশেষে একরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, এবং কেবল তাবার ঐতিহাসিকদিগের নিকট সেই সকল বহুকালের ধূলিমণ্ডিত পুস্তক মূল্যবান বলিয়া গণ্য হয়। কার্লাইলের গ্রন্থ সকলকে সহসা এতদুভয়ের কোনও শ্রেণীতে নিবিষ্ট করা আশঙ্কাজনক; কিন্তু সহজেই মনে হয় যে, তাঁহার গ্রন্থসকল শেষোক্ত শ্রেণীভুক্ত, প্রথমোক্ত নহে। যে সকল গ্রন্থের মধ্যে চির-নূতন চিন্তা, ফলপ্রসূ ভাব নিহিত থাকে, সেই সকল গ্রন্থই বহুকালস্থায়ী হয়—কার্লাইলের গ্রন্থে এই সকল তেমন নাই। কিন্তু অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে বিরচিত এই সকল মহাগ্রন্থ আজও সাধারণ পাঠকের নিকট জীবিত, এবং এখনও কিছু দিন সে সকল আদৃত হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু এখনই কিছু কিছু পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইতেছে; অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে লোকে ঐ সকল পুস্তক যেমন বিস্ময় ও আনন্দের সহিত পাঠ করিত, এখন আর তেমন করে না। বর্ত্তমান সময়ের পাঠকদিগের উপর কর্লাইলের গ্রন্থের আর তেমন অসীম প্রভাব দৃষ্ট হয় না।

গ্রন্থের স্থায়িত্ব।

প্রধান গ্রন্থ কি, এ বিচারের মীমাংসা সহজ বোধ হয় না। কারণ, লোকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন, কাজেই সকল গ্রন্থকারেরই সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ কি, তাহার মীমাংসা একরূপ অসম্ভব। তবে কতকগুলি প্রধান পুস্তক স্থির করা দুরূহ নহে। কঠোর দার্শনিকের সেই স্তূপাকার রচনার মধ্য হইতে পাঁচখানি গ্রন্থকে লেখক উচ্চস্থান দিয়াছেন। সে পাঁচখানি—"Sartor Resartus," "French Revolution," "Hero-worship," "Past and Present," "Cromwell." তিনি বলেন, "চারটিস্‌ম" প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ না করাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু কারণ নাই; কারণ ঐ সকল গ্রন্থ, রচনাকালে, অবতারের মহাবাক্যের মত সমাজের পক্ষে কল্যাণপ্রদ হইয়াছিল; কিন্তু তাহার পর এখন এই অর্দ্ধ শতাব্দীর অভিজ্ঞতার অণুবীক্ষণের নিম্নে সে সকল স্থাপন করিলে দেখিতে পাই যে, সে সকল অতিশয়োক্তিপূর্ণ ও ভ্রান্তিবহুল। সে সকল গ্রন্থে কার্য্যগত উপায় উদ্ভাবনের নিতান্ত অভাব অনুভূত হয়। তাঁহার রচনার মধ্যে "ক্রমওয়েল" অসাধারণ ক্ষমতার পরিচায়ক। এই মহাবীরের সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে ইংরাজগণের ভ্রান্ত ধারণা ছিল। দুই শতাব্দী ধরিয়া ক্রমওয়েলের নিন্দাবাদে সাহিত্য পূর্ণ, সে খরবাহী নিন্দাস্রোতে ইতিহাসপত্রবদ্ধ সত্য কোথায় ভাসিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই অসামান্য সাহিত্যসেবকের গ্রন্থপ্রকাশের পরেই স্রোত ফিরিয়া গেল—তখনই অপবাদের ঘনকৃষ্ণ কাদম্বিনীজাল বিদূরিত হইল, এবং ইংরাজগণ ক্রমওয়েলের মহত্ত্ব অনুভব করিতে শিখিয়া তাঁহার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইল।

প্রধান গ্রন্থ কি কি?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্থানে স্থানে কার্লাইল ভ্রান্তমত প্রচারিত করিয়াছেন। তাঁহার "ফরাসীবিপ্লব" গ্রন্থ আজও অত্যন্ত আদৃত, এবং বোধ হয় তাঁহার অন্য কোনও গ্রন্থই সাধারণ পাঠকগণ এত পাঠ করে না; কিন্তু ইতিহাসে যে সূক্ষ্মবিচার, উদার সহৃদয়তা, তীক্ষ্ণ অন্বেষণ এবং স্থির মতই প্রাণস্বরূপ হইয়া তাহাকে জীবিত রাখে, এই গ্রন্থে তাহার অনেক অভাব অনুভূত হয়। ঐতিহাসিক কাব্য হিসাবে ইহা একখানি অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহার বর্ণবৈচিত্র্য, চিত্রবৈচিত্র্য, আকুল আবেগ, প্রবল-প্রবাহ প্রায় অন্য পুস্তকে দৃষ্ট হয় না। কিন্তু এ গ্রন্থ মধ্যে যে সকল ভ্রান্তমত ও অন্যায় উপসংহার আছে, তাহার সম্যক আলোচনা করিতে হইলে বিপ্লবসাহিত্যে আর একখানি গ্রন্থ রচনা করিতে হয়।

তাঁহার গ্রন্থ সকলের মধ্যে "বর্ত্তমান এবং অতীতই" বর্ত্তমান মানব সমাজের চিন্তার উপর

বিশেষ প্রভাবসংস্থাপনে সক্ষম হইয়াছে; কার্লাইল একজন অকৃত্রিম এবং মহৎ সাহিত্যসেবক; তিনি মানুষ এবং জড়জগৎ সম্বন্ধে যাহা দেখিয়াছেন, এবং ভাবিয়াছেন, তাহাই গ্রন্থ মধ্যে নিহিত করিয়া ভবিষ্যৎ মানবজাতির জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। অসাধারণ প্রতিভা এবং বহুচিন্তার অধীশ্বর কোনও সাহিত্যসেবক আপনার রচনা দ্বারা যাহা করিতে পারেন, কার্লাইল তাহা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং বোধ হয় সফল হইয়াছেন। তিনি তাঁহার সমসাময়িক সাহিত্যসেবকদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন; সেই জন্য তিনি বহুকাল আদৃত এবং সম্মানিত হইবেন, এবং এখনও কিছুদিন পাঠকগণ আদরের সহিত তাঁহার গ্রন্থ সকল পাঠ করিবে। তিনি ইচ্ছা পূর্ব্বক আপনার রচনাপ্রণালী এরূপ করিয়াছিলেন যে, ইংরাজী যাহাদিগের মাতৃভাষা, অথবা যাহারা ইংরাজীকে মাতৃভাষার মত করিয়া শিক্ষা করে, তাহারা ভিন্ন আর কেহই তাঁহাকে বুঝিতে সমর্থ হইবে না—এবং সেই ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞদিগের মধ্যেও অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই তাঁহার রচনা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে সমর্থ হইবে। তাঁহার ভাষা তাঁহারই নিজস্ব সম্পত্তি, কাজেই হিউম, গিবন, স্কট, বায়রণ, ডিকেন্স এবং মেকলে, রাস্কিন বা স্পেনসারের ভাগ্যে যে যশোলাভ ঘটিয়াছে, তাঁহার পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। কিন্তু তাঁহার প্রতিভা চিরদিন উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্যে উজ্জ্বলভাবে বিদ্যমান থাকিবে, এবং যেখানেই ইংরাজী ভাষা কথিত বা শ্রুত হয়, সেখানেই এখনও বহুদিন ধরিয়া তাঁহার কতকগুলি উপাসক, তাঁহার গ্রন্থ সকল হইতে অমৃত আস্বাদন করিয়া, তাঁহাকে যশস্বী করিবে ও আপনারাও ধন্য হইবে।

সাহিত্যসেবক।

মেকলে।

মেকলের অসীম অসাধারণ গৌরব আজও ইংরাজী সাহিত্যক্ষেত্রে সমুজ্জ্বল। ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার প্রতিভা বাদ দিলে চলে না। তাঁহার অসীম পাণ্ডিত্য, রচনার পারিপাট্য, শব্দবিন্যাসের মাধুর্য্য পাঠকমাত্রকেই মুগ্ধ করে। তাঁহার ইতিহাস ও অমর প্রবন্ধগুলি কতদিন কালকে অবহেলা করিয়া, অক্ষুণ্ণ গৌরবে বর্ত্তমান রহিবে, তাহা স্থির করা দুরূহ—তাঁহার সুললিত কবিতা কতকাল বাল্যস্মৃতির সহিত বিজড়িত থাকিবে, তাহা বলা যায় না। সেপ্টেম্বর সংখ্যা "ফোরম" পত্রে মিষ্টার ফ্রেডরিক হ্যারিসন, সাহিত্যে মেকলের স্থান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইতিহাসসম্বন্ধীয় বিচারের সারাংশ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

মেকলে।

মেকলে খাঁটি 'জনবুল'। ঐতিহাসিকের পক্ষে যতদূর উদারহৃদয় আবশ্যক, বিজাতীয়দিগের সম্বন্ধে মেকলের তাহাতে কিছু কার্পণ্য দৃষ্ট হয়। তাঁহার প্রবন্ধ গুলিতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। লেখক কথাটা অন্য দিক দিয়া ধরিয়াছেন। বিজাতীয়দিগের সম্বন্ধে মেকলে যে কিছু কঠোর, তাহা তাঁহার অন্ধ উপাসক ছাড়া আর কেহ অস্বীকার করিবে না। লেখক বলেন যে, তিনি মেকলের প্রশংসা করেন, কিন্তু তাহা বলিয়া ঐতিহাসিক বা সাহিত্যশিল্পী হিসাবে মেকলেকে অত্যুচ্চ স্থান দিতে তিনি সম্মত নহেন। মেকলের মত সংবাদপত্রলেখক ও সমালোচক দুর্লভ। তাঁহার রচনাপারিপাট্যে পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ অনেক বিষয় সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হয়। পুস্তকরচনার পূর্ব্বে ছড়া ও গানরচয়িতাদিগের দ্বারা যেরূপ কার্য্য হইত, মেকলের রচনায় সেইরূপ কার্য্য হয়। আজকালকার সংবাদপত্রে যে রচনার ধারা ফিরিয়াছে এবং রচনা সকল সাধারণতঃ পরিষ্কার, সরল ও ধারাল হয়, মেকলের প্রভাব তাহার অন্যতম কারণ। তাঁহার মত সরলভাষী হইতে পারিলে লাভ আছে; কিন্তু ইতিহাস অর্থে তিনি যাহা বুঝিতেন, তাহা বোধ হয় ভ্রান্ত বিশ্বাস।

স্থান।

মেকলে ইতিহাসকে রোমান্সে পরিণত করিতে চাহিতেন, তাই তাঁহার ইতিহাস বিশ্বাস-

যোগ্য দলিলাদি হইতে সংগৃহীত ঐতিহাসিক উপন্যাস মাত্র। অবশ্য ইহার বিশেষ উপযোগিতা আছে, লোকে ইহা পাঠ করিতে ভালবাসে, এরূপ পুস্তক খুব আদৃত, এবং পাঠক-

ইতিহাস ও রোমান্স।

বিশেষের পক্ষে ইহার শিক্ষাও কম আবশ্যক নহে; কিন্তু ইহাকে প্রকৃত ইতিহাস বলা যায় না। ইহাতে মতের উদারতা বিসর্জ্জিত হয় এবং মানব সমাজের ক্রমসূত্রতা ছিন্ন হয়। ইহা সংক্ষিপ্ত সময়ের আংশিক চিত্রমাত্র, ইহাতে বাহ্যভাবই প্রকাশিত হয়। কেবল মাত্র অনাবশ্যক খুঁটিনাটি ও হাস্যজনক মানব চরিত্র বর্ণিত হয় বটে, কিন্তু ইহাতে কার্য্য সকলের গভীর উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয় না। ইতিহাস মানবজাতির সম্পূর্ণ বা আংশিক অভিব্যক্তির বর্ণনা; বিশ্বাসযোগ্য দলিলাদি হইতে সংগৃহীত ঐতিহাসিক উপন্যাসের দ্বারা এই উদ্দেশ্য সফল হয় না। মেকলে বলিয়াছেন যে, কবিতা ও দর্শনের মিশ্রণেই ইতিহাস উৎপন্ন হয়; কিন্তু তাঁহার ইতিহাসে তিনি কবিতার স্থানে শব্দবিন্যাস এবং দর্শনের স্থানে কিম্বদন্তী ব্যবহার করিয়াছেন।

বর্ণনা।

বর্ণনাতেই মেকলের বিশেষ ক্ষমতা প্রকাশিত এবং বর্ণনাতে অল্পসংখ্যক ঐতিহাসিক ও উপন্যাস লেখকই তাঁহার সমকক্ষ। অনেক স্থলে স্কট বা ভিক্টর হুগোও বর্ণনায় তাঁহার সমকক্ষ নহেন। এই বর্ণনাশক্তিই তাঁহাকে সাধারণ পাঠকগণের নিকট এত প্রিয় করিয়াছে। যদি অনেক সামান্য ঐতিহাসিক অপেক্ষা মেকলের রচনায় দার্শনিকতা অল্প হয়, তথাপি তাঁহার রচনানৈপুণ্য তাঁহাকে শ্রেষ্ঠতম ঐতিহাসিকদিগের সম্প্রদায়ে প্রতিষ্ঠিত করিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই অসামান্য বর্ণনাশক্তি সকল সময় মহৎ বিষয় বা চরিত্রবর্ণনায় ব্যয়িত হয় নাই। তাঁহার ইতিহাসের নায়ক তৃতীয় উইলিয়ম অপেক্ষা মনমাউথ বা দ্বিতীয় চার্লস্ অধিক উজ্জ্বল ভাবে পাঠকের স্মৃতিতে অঙ্কিত থাকে। তিনি অনেক সামান্য বা হীনচিত্র যেরূপে চিত্রিত করিয়াছেন, মহৎ বা জাতীয় গৌরবের চিত্রগুলি সেইরূপ ভাবে চিত্রিত করিলে, তাঁহার নিকট ইংলণ্ডের কৃতজ্ঞতার ঋণ আরও বাড়িয়া যাইত, সন্দেহ নাই।

ভ্রমণবৃত্তান্ত।

জাপানে ভারতবাসী।

জাপান প্রাচ্য ভূখণ্ডে প্রতীচ্য সভ্যতার ফল। এসিয়ার বিশালবক্ষ আজও জাপানকে আপনার বলিয়া মনে করে, কিন্তু বর্ত্তমান জাপান এই প্রাচ্য কর্দ্দম প্রতীচ্য ছাঁচে ঢালিয়া নির্ম্মিত।

জাপান।

বারি-বক্ষে ক্ষুদ্র দ্বীপ;—সেখানে অধিবাসীরা আপনাদিগের অসাধারণ সৌন্দর্য্যজ্ঞান এবং কতক অদ্ভুত ধারণার জন্য বিখ্যাত ছিল—তাই ভ্রমণকারীরা দুই চার দিন সেই সৌন্দর্য্যের মধ্যে আনন্দ উপভোগ করিয়া আসিতেন। কিন্তু ইতিমধ্যে জাপান আপনার মধ্যে আপনি বল সঞ্চয় করিয়াছিল। সেই বল চীনের সহিত যুদ্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। রক্ষণশীল চীন এতদিন প্রাচ্য ভূখণ্ডে জাতি হিসাবে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান ছিল—কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধে যেরূপ ফলের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে, তাহাতে জাপানের ভাগ্যে সেই সম্মানলাভ আশ্চর্য্য নহে।

শ্রীমন্ত সম্পৎরাও গাইকোয়াড় জাপানে গিয়াছিলেন। তিনি জাপান সম্বন্ধে "ইণ্ডিয়ান ম্যাগাজিন" পত্রে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। এক জন ভারতবাসী জাপান ভ্রমণ করিয়া কি কি মত ব্যক্ত করিয়াছেন ও জাপান তাঁহার কেমন লাগিয়াছে, তাহা দেখাইবার জন্য আমরা উক্ত প্রবন্ধের সারোদ্ধার করিয়া দিলাম।

অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে জাপানে সর্ব্ব বিষয়ে যেরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়—জাপানযাত্রীর মনে সহজেই এই চিন্তা উদিত হয় যে, জাপান ও চীনের মধ্যে কি প্রভেদ! এক জন কঠোরতর রক্ষণশীল, আরএক জন মহা পরিবর্ত্তনশীল। জাহাজ ইয়োকোহামায় আসিলে ভিন্ন ভিন্ন হোটেলের এজেন্টগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, ইহারা অত্যন্ত ভদ্র। প্রায় ভূমি পর্য্যন্ত মাথা নামাইয়া সেলাম করিয়া আপনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করে, এবং যাত্রী তাহার কথায় কর্ণপাত করিতে অস্বীকৃত হইলেও, সেইরূপ অভিবাদনের পর বিদায় লয়। যে যাত্রী তাহার সহিত যাইতে স্বীকৃত হয়েন, সে তাঁহার সমস্ত দ্রব্যাদির ভার লয়। তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া হোটেলে যাইতে পারেন। পথেই জাপানের নিজস্ব সম্পত্তি "জিনরিক্স" গাড়ীর সহিত পরিচয় হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাড়ী, দুই পাশে দুইটা বংশখণ্ড লাগান থাকে,—এবং সেই সমান্তরাল ভাবে স্থাপিত বংশদ্বয় কিছু দূরে অন্য এক খণ্ড বংশ দ্বারা আবদ্ধ হইয়া একটা চতুষ্কোণ ক্ষেত্র সৃষ্ট করে—সেই সম্মুখের বংশে শরীর বাধাইয়া মানব-বাহক গাড়ী ঠেলিয়া লইয়া যায়।

জাপানে।

জাপানে সকল দ্রব্যই একটু বিশেষ সৌন্দর্য্যসম্পন্ন এবং নয়নানন্দদায়ক। পুরুষ ও রমণীর বেশ প্রায় একরূপ। কেবল রমণীগণ পৃষ্ঠদেশে বস্ত্রমণ্ডিত এক প্রকার উপাধানের মত জিনিস বহন করে,এই বস্ত্রখণ্ড খুব মূল্যবান। দুইটি ফিতা দিয়া তাহা সেই সুন্দরীর শরীরে সাবধানে আবদ্ধ করা হয়। সুন্দর ও সুন্দরীর বেশ প্রায় একইরূপ, খুব ঢিলা রকমের। মোজার ব্যবহার খুবই প্রচলিত; জুতা অনেকটা খড়মের মত। কাঠ বা খড়ের নির্ম্মিত তলভাগ দুইটি বন্ধনী দিয়া পদের সহিত আবদ্ধ করা হয়। ইহার একটু বিশেষত্ব এই যে, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অন্য সকল অঙ্গুলি হইতে পৃথক রাখা যায়। জাপানীদিগের মস্তকাবরণের বড় স্থিরতা নাই,কেহ বা মস্তক অনাবৃত রাখে,কেহ বা ইংরাজী টুপি পরে,কেহ বা এক প্রকার জাপানী টুপি ব্যবহার করে। রমণীগণ কোনও প্রকার মস্তকাবরণ ব্যবহার করে না; তাহাদিগের নিবিড়কৃষ্ণ কেশজাল সহজেই পরিদৃষ্ট হয়, জাপানী রমণীরা কেশবিন্যাসে বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করে। জাপানীরা দীর্ঘকায় নহে; তাহাদিগের বর্ণ হরিদ্রাভ; তাহার উপর সুগঠিত নাসিকা সম্বন্ধে তাহাদের ত্রুটি স্বীকার করিতে হয়, গণ্ডস্থলের উন্নত অস্থিও মুখকে কতকটা শ্রীহীন করে, সন্দেহ নাই।

বেশভূষা।

ধূমপান জাপানে অত্যন্ত প্রচলিত—সেখানে রমণীগণও নিঃসঙ্কোচে ধূমপান করেন; তাহাতে শীলতার হানি হয় না। কারণ সেখানে তাহা রমণীর অল্পসহিষ্ণু স্নায়ুর পক্ষেও সহনীয়। পাইপগুলি খুব ছোট ছোট,—এই সকল পাইপ এবং পাইপাধার এমন সুন্দর যে, অলঙ্কাররূপে কোমরবন্ধের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ধূমপান।

যে সকল বন্দরে সন্ধিপত্রানুসারে সকল জাতীয়গণ আসিতে পারে, সেখান হইতে ২৫ মাইলের অধিক দেশাভ্যন্তরে গমন করিতে হইলেই, গভর্মেণ্টের নিকট পাস লইতে হয়। সেই পাসপোর্ট যে কেবল কর্ম্মচারীগণকেই দেখাইতে হয়, এমন নহে; যে গৃহে আশ্রয় লইতে হয়, সেই গৃহের গৃহস্বামীকেও দেখান আবশ্যক। ইয়োকোহামায় ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের জাহাজ সকল আসিয়া উপস্থিত হয়, কাজেই সেখানে কতকটা য়ুরোপীয় প্রভাব লক্ষিত হয়। লেখক যখন বন্দর হইতে গমন করেন, তখন রাস্তার দৃশ্য বড় সুন্দর দেখিয়াছিলেন—উপভোগ্য বস্তুর অভাব নাই। তখন সাগরশীকরসম্পৃক্ত সুশীতল সান্ধ্যসমীরণ ধীরে ধীরে বহিতেছিল—জাপানী কাগজ-নির্ম্মিত ল্যাম্পের স্নিগ্ধ আলোক নয়নের কি তৃপ্তিদায়ক। সেই বর্ণবৈচিত্র্য যেন কোনও মহোৎসব সূচিত করিতে-

ইয়োকোহামায়।

ছিল। জাপানীরা খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—প্রাণে তাহাদিগের অসীম আনন্দ। তাহাদিগের গৃহ আশ্চর্য্য পরিষ্কার। গৃহপ্রবেশের সময় তাহারা পাদুকা ত্যাগ করে। মুসলমানেরা নমাজের সময় যেমন করিয়া উপবেশন করে, তাহারা সাধারণতঃ সেইরূপ ভাবে উপবেশন করে। নিতান্ত দরিদ্র ভিন্ন সকলেরই নিজ নিজ স্নানাগার আছে—যাহাদিগের নাই, তাহারা বাধ্য হইয়া কোনও সাধারণ স্নানাগারের আশ্রয় লয়। ভূগর্ভস্থ আগ্নেয় পদার্থের প্রভাবে জাপানে অনেক উষ্ণ প্রস্রবণ উৎপন্ন হইয়াছে—সে সকলের গন্ধক প্রভৃতি মিশ্রিত জল স্বাস্থ্যের পক্ষে কল্যাণকর। জাপানে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদগম ও ভূমিকম্প প্রায়ই হইয়া থাকে।

নিকো হইতে ফিরিয়া ইয়োকোহামায় আসিয়া আমাদের ভ্রমণকারীকে একটু ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল এবং অনেক বিষয়ে ঠেকিয়া শিখিতে হইয়াছিল। নিকোয় তিনি যে হোটেলে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই হোটেলের কর্ত্তাকে ইয়োকোহামার একটা ভাল হোটেলের নাম করিতে বলেন। এই পর্য্যন্ত খবর লইয়া তিনি ইয়োকোহামায় উপনীত হইলেন। জিন্‌রিকস সেই হোটেলে উপনীত হইল, কিন্তু তাহা অতিথিতে পরিপূর্ণ—কাজেই হোটেলওয়ালার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি অন্য হোটেলের আশ্রয় লইলেন। তখন রাত্রি প্রায় ১১টা। জিন্‌রিকস্-ওয়ালাকে বিদায় দিয়া তিনি উপরে উঠিলেন। ইঙ্গিত করিয়া তাঁহাকে পাদুকা পরিত্যাগ করিতে বলা হইল, এবং চটি জুতা আনিয়া দেওয়া হইল। তাহার পর, গৃহপরিচারিকা তাঁহার কক্ষ দেখাইয়া দিল।—পরিচারিকার ভ্রূ কামান এবং দন্ত কৃষ্ণ বর্ণে রঞ্জিত—জাপানে বিবাহিতা রমণীগণ এইরূপ করিয়া থাকে। কিন্তু ঘরে প্রবেশ করিয়াই অবাক হইতে হয়—খাট, চেয়ার, বা মুখ প্রক্ষালনের সরঞ্জাম কিছুই নাই—ঘরটি পরিষ্কার, বড়গোছ; একখানা টুলের উপর একটা কেরোসিন তেলের ল্যাম্প জ্বলিতেছে, এবং এক কোণে একটা অগ্নিপাত্রে অগ্নি রক্ষিত—ধীরে ধীরে জ্বলিবে বলিয়া তাহা ভস্মাচ্ছাদিত; কিন্তু সেই ভস্মরাশি নানা চিত্রাঙ্কিত করিয়া অগ্নির উপর প্রক্ষিপ্ত;—দেখিতে বড় সুন্দর! পিকদানের প্রতিনিধিস্বরূপ এক খণ্ড বংশ টেবিলের উপর স্থাপিত। ঘরে ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত তিনটি চর্ম্মমণ্ডিত গোলাকার উপাধানও দেখা গেল। হর্ম্ম্যতল কোমল ম্যাটিং মণ্ডিত এবং প্রাচীরে বস্ত্র ঝুলাইবার সরঞ্জাম ছিল। তিনি তাহাকে বুঝাইতে চাহিলেন,—তিনি শয্যা চাহেন। সেও বুঝাইতে চাহে যে, সে তাঁহার পাসপোর্ট দেখিতে চাহে। কিন্তু কেহ কাহারও ভাষা বুঝিলেন না। পার্শ্বের কক্ষে একটি বালক ছিল, সে কিছু কিছু ইংরাজি বুঝিত; সে অভিধানের সাহায্যে তাঁহাকে কথাটা বুঝাইতে চেষ্টা করিল; কিন্তু ঠিক কথাটা বুঝাইতে পারিল না। পরিশেষে বহু কষ্টে কথাটা কিঞ্চিৎ বোধগম্য হইল—তিনি পাসপোর্ট খানি দিলেন, পরিচারিকা তাহা লইয়া চলিয়া গেল। সুখের বিষয়, হোটেলে একটা বৈদ্যুতিক ঘণ্টা ছিল; তাহার সুমধুর রবে পরিচারিকা আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং শয্যা রচনা করিয়া দিল। আলো সহিত টুলখানি এক কোণে রাখিয়া সে হর্ম্ম্যতলে উপর্য্যুপরি তিনটি লেপ পাতিল, এবং একটি বালিশ দিয়া একখানা পরিষ্কার চাদর পাতিল, বালিশের জন্য বোধ হয় তুলার পরিবর্ত্তে বিচালী ব্যবহৃত হয়, কারণ নড়িলে চড়িলে বড় শব্দ হয়! তাহার পর যদি আবশ্যক হয় বলিয়া শয্যাপ্রান্তে একটি লেপও রাখিয়া গেল। সবুজ একটা মশারি টাঙ্গান হইলে, রাত্রির ব্যবহারের জন্য একটা ঢিলা জাপানি পোষাক আনিয়া দিল। প্রভাতে শয্যাত্যাগের পর হাত মুখ ধুইবার জন্য তাঁহাকে নিম্ন তলে লইয়া যাওয়া হইল—তাহার পর তিনি স্নান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। একটি বালক পথ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে একটা সাধারণ স্নানাগারে লইয়া গেল। সেই অনভ্যস্ত জাপানী পোষাকে তাঁহাকে দেখিয়া যে পথে জাপানীরা হাস্য সংবরণে সমর্থ হয় নাই, তাহাতে কিছুই আশ্চর্য্য-

হোটেলে।

নাই। দ্বারদেশে উপযুক্ত অর্থ দিয়া তিনি প্রবেশ করিলেন; তখনও অধিক লোক আসে নাই, এক জন মাত্র স্নানে ব্যস্ত; কিন্তু একটু সঙ্কোচ অনুভব করিতে হইল; সেই স্নানাগারে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই স্নান করে, এবং মধ্যে যে আবরণ টুকু আছে, তাহা প্রায় কিছুই নহে। কাজেই অনভ্যস্ত কিছু সঙ্কোচ বোধ করে। ইয়ুরোপে বা ভারতবর্ষে ইহা নূতন—কিন্তু জাপানীরা ইহাতে অভ্যস্ত, কাজেই তাহাদিগের নিকট এ ব্যবস্থা সঙ্কোচজনক মনে হয় না।

লেখক জলের উষ্ণতা পরীক্ষার জন্য সাবধানে জলে হাত দিলেন, হাত প্রায় পুড়িয়া উঠিল, জল অত্যুষ্ণ; অপর ব্যক্তির সঙ্কেতানুসারে তিনি প্রাচীরে আঘাত করিলেন। আরও জল আসিল, কিন্তু কি হইবে, ইহা আরও উষ্ণ। কাজেই সেই ব্যক্তি কি করে, তাহা দেখিতে লাগিলেন; ততক্ষণ জল অপেক্ষাকৃত শীতল হইয়া আসিল। জাপানীরা প্রথমে গাত্রে অত্যুষ্ণ জল ছিটাইয়া দেয়, এবং গাত্রমার্জ্জন করিবার পর ঈষদুষ্ণ জল ব্যবহার করিয়া স্নান শেষ করে। জল অপেক্ষাকৃত শীতল হইলে, ভারতবাসীর কষ্টসহিষ্ণু দেহ তাহাতে নিমজ্জিত হইল। এক বিপদ যাইতে না যাইতে আর এক বিপদ উপস্থিত, আহার সম্পন্ন হইবে কিরূপে? কাঁটা চামচের পরিবর্ত্তে জাপানীরা অতি ছোট রকমের ছুঁচলো বাঁশের কাঠী ব্যবহার করে, সেগুলি কারুকার্য্যে সুশোভিত, সুন্দর; কিন্তু জাপানীরাই তাহা ব্যবহার করিতে পারে। শেষ হাতই ব্যবহার করিতে হইল, কারণ আর উপায় নাই।

টোকিয়ো জাপানের রাজধানী, ইয়কোহামা হইতে প্রায় ১৯ মাইল দূর। রেলে প্রায় এক ঘণ্টা ভ্রমণ করিলে টোকিয়োয় যাওয়া যায়। পথে একজন জাপানী নৌকর্ম্মচারীর সহিত লেখকের পরিচয় হয়। কথাবর্ত্তা অবশ্য ইংরাজীতেই হইয়াছিল। তিনি লেখককে কতকগুলি দ্রষ্টব্য স্থান দেখাইতে সম্মত হয়েন, এবং অন্যগুলি দেখাইবার সুবিধা অসুবিধার কথাও বুঝাইয়া দেন। ট্রেন আসিয়া টোকিয়োয় দাঁড়াইল; যাত্রীদিগের জুতা হইতে এমন শব্দ হইতেছিল। লেখক হোটেলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হোটেলে কতকটা য়ুরোপীয় ধরণে সজ্জিত, কিন্তু পরিচারকগণ আশ্চর্য্যরূপ নম্র ও বাধ্য। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর, লেখক জিন্‌রিক্‌স ভাড়া করিয়া সহরদর্শনে বাহির হইলেন। জাপানের সম্রাট মিকাডোর প্রাসাদ দেখিলেন, চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর এবং বাহিরে গড়কাটা, তাহার উপর সেতু আছে। তবে প্রাসাদের অভ্যন্তর-দর্শন ঘটিয়া উঠে নাই। কারণ তাহার জন্য আবার আলাহিদা পাশের বন্দোবস্ত। জাপানীরা সূর্য্যকে দেবতা জ্ঞান করে এবং সম্রাট সেই সম্মানিত সূর্য্যের বংশধর বলিয়া বিখ্যাত। জাপানী রাজবংশে গত ২০০০ বৎসরের মধ্যে ছেদ নাই। কাজেই বংশ খুব পুরাতন বলিতে হইবে। টোকিয়োয় অনেকগুলি মন্দির আছে—সেগুলির কাষ্ঠের উপর কমনীয় কারুকার্য্য এবং বিস্ময়কর বর্ণবৈচিত্র্য বাস্তবিকই অত্যন্ত সুন্দর। একটি মন্দিরে অতি পুরাতন বেশ এবং তরবারি সযত্নে সংরক্ষিত আছে। তরবারিগুলি এত বড় যে, মানবের ব্যবহারোপযোগী বলিয়া বিশ্বাস হয় না—তাহা দৈত্যেরই উপযুক্ত। ইহা ভিন্ন টোকিয়োর যাদুঘর, বিশ্ববিদ্যালয়, উদ্যান ও পশুশালা আছে।

টোকিও।

দেখিয়া মনে হয়, জাপানীরা অত্যন্ত নাট্যশালাপ্রিয়; কারণ তাহাদিগের নাট্যশালাগুলি দিবারাত্রি খোলা থাকে। প্রবেশের জন্য টিকিটের মূল্য সামান্য; কিন্তু সেখানে নাট্যশালায় বাহ্য দৃশ্যের বৈচিত্র্য নাই। এক জন অল্প-ইংরাজি-অভিজ্ঞ জাপানীকে লইয়া লেখক একটি নাট্যশালায় গমন করেন। ম্যাটিং করা উচ্চ মঞ্চে বসিতে হইল—পরে কিছু ভাড়া দিয়া দুইটি গদি আনাইয়া লওয়া হইল। নাট্যশালা তখন পরিপূর্ণ—তাঁহাদিগের আসন নাট্য মঞ্চের সম্মুখেই সংস্থাপিত, কাজেই দেখিবার অত্যন্ত সুবিধা ছিল। অভিনেতৃগণ দর্শকগণের সম্মুখ দিয়াই নাট্যশালার এক পার্শ্ব হইতে আগমন

নাট্যশালা।

করে—তাহাদিগের এই পথকে "কুহুমের পথ" বলা হয়। অবসরসময়ে তাহারা নানা প্রকার কথাবার্ত্তা কহে, এবং চৌর্য্যবৃত্তি, আনন্দ, ভীতি প্রভৃতি ভাবপ্রকাশক অঙ্গভঙ্গী প্রদর্শন করে। তিনি যে নাট্যাভিনয় দর্শন করেন, তাহা দস্যুবৃত্তিমূলক—দুই দল দস্যু পথে পরস্পরকে চিনিতে না পারিয়া অত্যন্ত চাতুরীর সহিত কার্য্যে মনোনিবেশ করিল, কিন্তু চাতুরীতে উভয় দলই অভ্যস্ত, বিলম্ব হইতে লাগিল এবং তাহারা ধৃত হইল। গল্পাংশ লেখক তাঁহার সহযাত্রী জাপানীর নিকট হইতে জানিয়া লয়েন, তবে তিনি বলেন যে, অভিনেতৃগণের অঙ্গভঙ্গী বেশ ভাবব্যঞ্জক। দৃশ্য খুব সামান্য, এক খানা বোর্ডের উভয় দিকে অঙ্কিত, এক জন লোক তাহা উল্টাইয়া দেয়। বাদ্য কিছুই নহে, রঙ্গমঞ্চের নিম্নে বসিয়া দুই জন লোক দুই খণ্ড কাষ্ঠ হইতে এক প্রকার উৎকট বাদ্য উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছিল মাত্র। নাট্যশালার অসহ্য গরম বলিয়া লেখক শীঘ্রই চলিয়া আসেন। পথিকদিগকে আকৃষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে এক স্থানে একটা পর্দ্দা তুলিয়া দেওয়া হয়—তাহারা দেখিতে পায়, কি নাটক অভিনীত হইতেছে, এবং তাহাদিগের কোনও বন্ধু বা পরিচিত সেখানে আছে কি না। তাহারা খুব চেঁচাইয়া ডাকাডাকি করিলেও অভিনেতৃগণ বিরক্ত হয় না। জাপানে রমণীরা অভিনয় করে না।

লেখক একবার বাজার দেখিতে গিয়াছিলেন, ভারতবর্ষীয় বাজারের মত সেখানে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ নাই—তবে বাজারের মধ্যে সব দোকানেই এক দ্রব্যের একই দাম, বাহিরে অবশ্য দরদস্তুরীর দুরন্ত উৎপাত আছে।

হিন্দুর পক্ষে বারাণসী যেমন পবিত্র তীর্থ, জাপানীদের পক্ষে নিকো সেইরূপ। টোকিয়ো হইতে সেখানে যাইতে প্রায় তিন ঘণ্টা লাগে। সেখানে যাইতে হইলে পাসপোর্ট আবশ্যক।

নিকো।

ষ্টেশনে টিকিট কিনিবার পূর্ব্বেই লেখককে তাহা দেখাইতে হইয়াছিল। লেখক গাড়ীর বন্দোবস্ত দেখিবার জন্য তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। গাড়ী এবং আরোহী উভয়ই অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। লণ্ডনের তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী কখনই এমন পরিষ্কার নহে। স্ত্রী পুরুষ একই কামরায় ভ্রমণ করে, বিদেশীয়কে দেখিয়া রমণীদিগের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, তাহারা জাপানী ভাষায় তাঁহাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কিন্তু হায়! তিনি ত জাপানী ভাষা জানেন না! কেহ কেহ নানা দ্রব্য দেখাইয়া তাহাদের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে লাগিল, এবং তাঁহার বিকৃত বিজাতীয় উচ্চারণে হাস্য সম্বরণ করিতে কষ্ট পাইতেছিল। রেলপথের দুই দিকের দৃশ্য বড় সুন্দর—দৃষ্টিকে একবার ছুটি দাও, কেবল সবুজের খেলা—শস্য ক্ষেত্র ও ঝোপ, উচ্চ প্রান্তরে সবুজের তরঙ্গ বহিতেছে, আর জলসেচনের জন্য সমস্ত ক্ষেত্রে খাল কাটা। ট্রেন ষ্টেশনে আসিলেই আহারীয় বিক্রেতারা আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহারা প্রধানতঃ ভাত ও মৎস্য আনে। এখানে বলিয়া রাখি, জাপানীরা বড় মৎস্যপ্রিয়।

নিকোয় ট্রেণ আসিয়া দাঁড়াইল—হোটেলের লোক ষ্টেশনেই ছিল, জিন্‌রিক্‌স ভাড়া করিয়া লেখক হোটেলের অভিমুখে চলিলেন। হোটেলটি নিতান্ত নিকটে নহে। প্রথমে একটি পর্ব্বতারোহণ করিতে হইল, পরে একটি কাষ্ঠের সেতু পার হইয়া খানিকটা বালুকাময় জমী, জিন্‌রিকস-ওয়ালার অতিরিক্ত পরিশ্রম আশঙ্কা করিয়া লেখক পদব্রজে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। হোটেলটি ছোট এবং তাহার গঠনপ্রণালী ও বিশেষ প্রশংসার্হ নহে। সম্মুখে একটি ছোট উদ্যান—একটু দূরে সবুজ বৃক্ষলতামণ্ডিত একটি গণ্ডশৈল এবং তাহারই পদতলে

গ্রাম।

একটি কলবাহিনী স্বচ্ছ সুন্দর স্রোতস্বতী। তখন সন্ধ্যা আগত প্রায়; সে দিন সেই ক্ষুদ্র নিকো—একখানি গ্রাম মাত্র, আর ভাল করিয়া দেখা হইয়া উঠিল না। আহারান্তে "পরিদর্শনপুস্তকে" নাম সহি করিবার সময় তিনি

পুস্তকে কয় জন সাম্রাজ্ঞীর নাম দেখিতে পাইয়াছিলেন। পর দিবস প্রভাতে নিকো প্রাম দেখিতে বাহির হয়েন, সেখানকার দৃশ্য মনোরম, মুগ্ধকর। জাপানীরা বলিয়া থাকে যে, "নিকো দেখিবার পূর্ব্বে চমৎকার কথা ব্যবহার করিও না"—তাহা সত্য বলিয়াই মনে হয়। একটি সুন্দর উপত্যকার শ্যামল শান্ত বিজন বক্ষে নিকো সংস্থাপিত—নিকট দিয়া একটি স্রোতস্বতী স্বচ্ছ বারিরাশি বহন করিয়া চলিয়াছে। এখানে আসিবার সময় যে নদীর একটি সেতু পার হইয়া আসিতে হয়, তাহারই পার্শ্বে আর একটি সেতু আছে, সেটি সম্রাটদিগের ব্যবহার্য্য। এই সেতু বহুকাল পূর্ব্বে নির্ম্মিত, দুই তীরে দুইখানি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপর ইহা সংস্থাপিত এবং লোহিতবর্ণে চিত্রিত;—সম্রাট ভিন্ন আর কেহ ইহার উপর দিয়া গতায়াত করিতে পারে না।

সকল দেশেই দেখা যায় যে, লোকে ধর্ম্মকর্ম্মে যত অর্থ ব্যয় করে, অন্য কোনও বিষয়েই তত ব্যয় করিতে সম্মত হয় না; তাই সর্ব্ব দেশেই দেবমন্দির সকল অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের আদর্শ। নিকোর ধর্ম্মমন্দিরনির্ম্মাণেও বহু অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে। এই সকল মন্দিরে জাপানী স্থপতি, চিত্রকর ও সূত্রধরের অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশিত হইয়াছে। সেখান হইতে ইয়োকোহামায় প্রত্যাগমন করিয়া, জাপানের সৌন্দর্য্যময় সুখস্মৃতি সঙ্গে লইয়া, আমাদের স্বদেশী ভ্রমণকারী স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

পচন।

এ নশ্বর মর জগতে সকল বস্তু নিতান্ত অস্থায়ী। মরণশীলতা প্রত্যেক দৃশ্য পদার্থের এক বিশেষ ও স্বাভাবিক ধর্ম্ম। জড়, উদ্ভিদ ও জন্তু রাজ্য সকলের উপরেই মহা মরণের একছত্র অখণ্ড প্রভুত্ব নির্ব্বিশেষে বিস্তারিত। জন্মিলেই মরণ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু কোনও জীব মরিলে পর, তাহার কি পরিবর্ত্তন হয়? আমরা অবশ্য এখানে দার্শনিকের আধ্যাত্মিক কূট প্রশ্নের অবতারণা করিতেছি না। অথবা স্বনামখ্যাত, রামপ্রসাদের "বল দেখি ভাই কি হয় মলে" এই জটিল প্রশ্নোত্তরের বিচার করিবার ইচ্ছাও করি নাই। মরিলে পর কি হয়—আমাদের এই প্রশ্নের সহিত আধ্যাত্মিক বা অধ্যাত্মরাজ্যের কোনও সম্পর্কই নাই। বরং সম্পর্ক যদি কিছু থাকে, তাহা নিতান্তই বিপরীত দিকের। আমরা নিতান্ত স্থূলদর্শী পৃথিবীর লোকের ন্যায় পৃথিবীর উপর বসিয়াই আমাদের এই স্থূল দেহ মৃত্যুর পর কি পরিবর্ত্তন লাভ করে, এবং কিরূপে সে পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, স্থূল জ্ঞান দ্বারা তাহারই আলোচনা করিব। কেবল আমাদের স্থূল দেহ নহে; অগণ্য পশু পক্ষীর বিশেষ বিশেষ প্রকারের দেহপিঞ্জর, অগণ্য উদ্ভিদ ও তরু লতা গুল্মের ধরাশায়ী কাণ্ড, শাখা প্রশাখা, পত্র ফুল ফল মরণাধীন হইবার পর, কিরূপে প্রকৃতির ভাণ্ডারে পুনরায় ফিরিয়া আসে (কেন না,

যদিও প্রত্যেক মৃত পদার্থ মরণশীল, অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীল, আদৌ মূল রূঢ় পদার্থ সকল অবিনাশী) তাহাই আমাদের আলোচ্য। সুতরাং প্রথম হইতেই পাঠকদিগকে বলিয়া রাখা ভাল যে, আমরা সেই অতীন্দ্রিয়, অদৃশ্য, বায়বীয় সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক রাজ্যের সহিত কোনও সম্পর্কই রাখিব না। বিশেষ, আমরা যে বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া, আমাদের প্রবন্ধশীর্ষস্থ প্রস্তাবের আলোচনা করিব, সে বিজ্ঞান নিতান্ত বিশুদ্ধ, ও সম্পূর্ণ ভাবেই জড়বিজ্ঞান। এক্ষণে জড়বিজ্ঞান, উদ্ভিদ ও জন্তুর মৃত্যুর পর উহাদের স্থূল জড়দেহ যে রূপান্তর লাভ করে, তাহার কিরূপ ব্যাখ্যা করেন, তাহাই বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক।

আমরা নিয়তই দেখি, পত্র, পুষ্প, বা ফল বৃক্ষশাখা হইতে ভূপতিত হইয়া, পচিয়া অল্পকাল মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়। সুপক্ব ফল দুদিনের পরে আপনিই পচিতে থাকে ; সময় থাকিতে উদরসাৎ না করিলে অচিরে মিষ্টতার পরিবর্ত্তে দুর্গন্ধ বিস্তার করিয়া রূপান্তরিত হইতে হইতে ঔদ্ভিদিক অস্তিত্বের অবসান করে। জন্তুশরীর মরিবার পর, অগ্নিসৎকার না করিলে, শীঘ্রই পচিয়া বিকৃত হয়, এবং অল্পদিনের মধ্যে তাহার জান্তব বিকাশের কোনও চিহ্নই থাকে না। রাশি রাশি তৃণ শষ্প শুষ্ক হইয়া কোথায় কিরূপে মৃত্তিকাসাৎ হইয়া যাইতেছে, আমরা অনেক সময়ে তাহার অনুসন্ধানই রাখি না। এ বিচিত্র বিস্ময়োদ্দীপক বিশ্বসংসারে পরিবর্ত্তন এক মহা নিয়ম। স্থানকালপাত্রনির্বি-শেষে পরিবর্ত্তন-চক্র নিঃশব্দে কিন্তু অব্যাহত বেগে অহর্নিশি ঘুরিতেছে। জীবন-স্রোতের বিরাম নাই। এক বৃক্ষ যাইতেছে, অন্য বৃক্ষ তাহার স্থান অধিকার করিতেছে। এক জীবের মৃত্যু হইলে তৎপরিবর্ত্তে অন্য জীবের উত্থান হই-তেছে। খরবাহী জীবন-স্রোত খরবেগে অগণিত কাল হইতে ভূপৃষ্ঠে বহিয়া যাইতেছে। জীবরাজ্য অর্থাৎ উদ্ভিদ ও জন্তুরাজ্য সেই জীবন-স্রোতে অনু-প্রাণিত হইয়া অনাদিকাল হইতে অসংখ্য অগণ্য প্রকারের জীবন-বিকাশ করিতেছে। কিন্তু যদি আমরা মনে রাখি যে, আমাদের এ ভূপৃষ্ঠ অসীম আয়-তনের নহে, ইহার উৎপাদিকা শক্তি অশেষ নহে, এবং ইহার ভাণ্ডারও অক্ষয় নয় ; অথচ এক অনন্ত জীবনপ্রবাহ অবিরাম গতিতে উদ্ভিদ ও জন্তু পরিবারের মধ্য দিয়া আজ কত বৎসর ধরিয়া ; ছুটিতেছে, আজ কত অগণ্য অসংখ্য উদ্ভিদ, অসংখ্য জন্তু জন্মিতেছে আজ কত কাল ধরিয়া ; তাহা হইলে একবার ভাবিতে হয় যে, অনন্ত অগণ্য জীব-প্রসূ হইয়াও এ ধরা কিরূপে এখনও অক্ষুণ্ণ শক্তিতে জীব-প্রসবিনী হইতেছে। আমরা জানি, খুব আওল জমীতেও

উপর্য্যুপরি কয়েকবার চাষ করিলে উহা অনুর্ব্বরা হয়,—এমন কি, কৃত্রিম উপায়ে সার না দিলে, সে জমি শস্যপ্রসবে নিতান্তই অক্ষম হইয়া পড়ে। অথচ আমাদের পৃথিবীকে শস্যশালিনী করিবার জন্য, অথবা নানা আরণ্য ফল মূল তৃণ, গুল্ম, তরুলতা দ্বারা পূর্ণ করিবার জন্য, কেহই অবিশ্রান্ত সার প্রদান করিতেছে না। পৃথিবীর এ সার কোথা হইতে আসে? অবশ্য আমাদের খাদ্যোপযোগী ফল মূল ও শস্যের তুলনায় আণ্য বৃক্ষলতা অশেষ পরিমাণে ভূপৃষ্ঠে জন্মে, যাহা হইতে আবার অনেক নিকৃষ্ট জীব স্বস্ব জীবন ধারণ করে। এ বিপুল অরণ্যানীর উৎপাদন করিবার জন্য কে কোথা হইতে ক্রমাগত পৃথিবীপৃষ্ঠকে সারযুক্ত করিতেছে? আর আমরা জানি, যে কতিপয় রূঢ় পদার্থ লইয়া পৃথিবীর জীবদেহ পরিগঠিত, তাহারা অমিত পরিমাণের বা অফুরন্ত নহে। যে অগণ্য অগণ্য বৎসর ধরিয়া ধরিত্রী জীব-প্রসবিনী হইয়া আসিতেছে, এবং যে অশেষ প্রকারের অসংখ্য জীব উৎপন্ন হইতেছে, নিশ্চয়ই কোনও কালে সেই সকল পরিমিত রূঢ় পদার্থ নিঃশেষিত হইয়া যাইত। কিন্তু আজও তাহা হয় নাই। কেবল তাহাই নহে; অক্ষুণ্ণভাবে ও অপ্রতিহত বেগে জীব-বিকাশ আজও তেমনি চলিতেছে, এবং আরো কত কাল চলিবে, কে নিশ্চয় বলিতে পারে? রূঢ় পদার্থনিচয়ের ঈদৃশ অফুরন্ত হইবারই বা কারণ কি? পাঠক! আসুন, বিজ্ঞান এ সম্বন্ধে কি বলেন, আমরা তাহাই দেখি।

Matter is indestructible. সুতরাং কোনও একটি জীবের (এ প্রবন্ধে 'জীব' শব্দ উদ্ভিদ ও জন্তু, উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হইল) মৃত্যু হইলে তাহার দেহনিহিত অসংখ্য রূঢ় পদার্থ নিশ্চয়ই কোনও রূপে বিমুক্ত হইয়া পড়ে। মৃতদেহ সমাহিতই কর, অথবা অগ্নিসাৎ কর, তন্নিহিত আদিম পদার্থগুলি, যাহাদের সমবায়ে ও রাসায়নিক সংযোগে উহা পরিগঠিত, তাহারা নিশ্চয়ই বিধ্বস্ত হইয়া যায় না। যে অবস্থার ভিতর দিয়া যাক্ না কেন, রূঢ় পদার্থনিচয় কেবল অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, কখনই বিনষ্ট হয় না। ইহারা অবিনাশী, অক্ষয় অমর বলিয়াই, এ পৃথিবীর মধ্যে, প্রকৃতির মধ্যে, এক অনন্ত জীবনপ্রবাহ বহিয়া যাইতেছে। "Perpeatulity of life," মৌলিক পদার্থনিচয়ের এই এক বিশেষ ধর্ম্মের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

মৃতদেহের চরম সৎকার নিয়ম জাতিভেদ ও দেশভেদে স্বতন্ত্র হইলেও, প্রকৃতির মধ্যে এক সার্ব্বভৌমিক নিয়ম প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে, মরিলেই জীবদেহ

ধীরে ধীরে পচিয়া নিঃশেষিত ও অস্তিত্বশূন্য হইবে। জীবন্তদেহ যেমন মৃত্যুর অধীন, সেইরূপ মৃতদেহ পচনের অধীন। জন্মিলেই মরণ যেমন প্রকৃতির এক অমোঘ নিয়ম, সেইরূপ মরিলেই পচন, ইহাও এক অনিবার্য্য নিয়ম। পচন দ্বারাই সমুদয় যৌগিক জান্তবদেহ রূঢ়পদার্থে পরিণত হইয়া প্রকৃতির অক্ষয় ভাণ্ডারকে পূর্ণ করে, এবং সেই জন্যই অনন্ত জীব-প্রবাহ ভূপৃষ্ঠে সম্ভবপর হইয়াছে।

কিন্তু পচনকার্য্য কিরূপে সমাহিত হয়? আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের চতুস্পার্শ্বস্থ নানাবিধ জন্তু ও উদ্ভিজ্জের পরিণাম সম্বন্ধে যেরূপ পরিদর্শন করি, তাহাতে সহজেই মনে করি যে, কোনও পদার্থের অন্যান্য বিশেষ ধর্ম্মের ন্যায় পচনশীলতাও তাহার একটি বিশেষ ধর্ম্ম। জীবন শেষ হইলে, জীবদেহ আপনিই পচিবে। কেন না, পচাই তাহার ধর্ম্ম। কিন্তু এ সংসারের অনেক প্রাকৃতিক তথ্য যেমন আমাদের সহজ প্রতীতির ঠিক বিপরীত, পচনসম্বন্ধে আমাদের সহজ ধারণাও সেইরূপ প্রকৃত তথ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। পচন কোনও পদার্থবিশেষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে। যদি একটা মৃতদেহকে, মরিবার অব্যবহিত পরেই এমন এক পাত্র মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখা যায়, যাহার মধ্য হইতে সমস্ত বায়ু নিষ্কাশিত করা হইয়াছে, এবং যাহাতে পুনরায় বায়ু প্রবেশেরও কোনও পথ নাই, সেইরূপ পাত্রের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া উক্ত মৃতদেহ অনন্তকাল অবিকৃত থাকিতে পারে, উহা কখনই পচিবে না। কিম্বা যদি উহাকে সম্পূর্ণরূপে বরফের মধ্যে সমাহিত করা হয়, তাহা হইলেও উহা বিকৃত হইবে না, পচিবে না। দূরদেশ হইতে মাংস, মৎস্য বা সুপক্ক ফল মূল পাঠাইবার সময় বরফ দ্বারা উত্তমরূপে আবৃত করিয়া পাঠাইলে যে উহারা পচে না, পাঠকেরা বোধ হয় তাহা বিলক্ষণ জানেন। সুতরাং যদি বিশেষ অবস্থার মধ্যে মৃত জীবদেহ না পচে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পচন জীবশরীরের স্বাভাবিক অথবা বিশেষ ও অনিবার্য্য ধর্ম্ম নহে। তবে, এ বিশাল প্রকৃতি যুড়িয়া অবিশ্রান্ত যে পচনকার্য্য চলিতেছে, তাহার কারণ কি? কিসের জন্য অথবা কাহা কর্ত্তৃক অনন্ত অগণ্য জীবশরীর পচিয়া পুনর্ব্বার মূল রূঢ় পদার্থে পরিণত হইতেছে?

উত্তর।—আণুবীক্ষণিক, অনন্তগুণে ক্ষুদ্র কতকগুলি উদ্ভিদজ্জাণুই সর্ব্ববিধ যৌগিক জীবদেহকে পচাইয়া রূঢ় পদার্থে পরিণত করিতেছে। চক্ষুর অগোচর কতকগুলি উদ্ভিজ্জাণু-বংশই, এই বিশাল প্রকৃতি ব্যাপিয়া যে এক মহা পচন-যজ্ঞ সাধিত হইতেছে, তাহার একমাত্র হোতা। অগণ্য, অমিত

অসংখ্য উদ্ভিজ্জাণু মৃত জীবশরীরে অধিষ্ঠান করিয়া নিঃশব্দে সেই মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিতেছে। পাঠক! নিশ্চয়ই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানব কখনই স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই যে, তাহার ন্যায় জ্ঞান-গরিমা, পদ-মর্য্যাদা ও ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন মনুষ্যের দিব্যকান্তি, সুদর্শন, অহমিকাধার দেহ, সেই উন্নত ও সংস্কৃত শোণিতপুষ্ট মেদ, মাংস অস্থি পঞ্জর, অতি সামান্যতম ও নগণ্য উদ্ভিজ্জাণুর পচন-মহাযজ্ঞের যজ্ঞ-ইন্ধন স্বরূপ ব্যবহৃত হইবে।

যে অগণ্য উদ্ভিজ্জাণু পচন-যজ্ঞের হোতা, তাহাদিগের সাধারণ বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা "ব্যাকটেরিয়া"। * ইহারা মৃত জৈবিক পদার্থ হইতে আপনাদের শরীরপোষণোপযোগী খাদ্যসংগ্রহ করিতে গিয়া, জটিল যৌগিক জীবদেহকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেয়। বিশ্লেষণকালে নানাবিধ রূঢ় পদার্থ এবং সরল যৌগিক পদার্থ বিমুক্ত হয়। উহাদের মধ্যে কতকগুলি খনিজ, আর কতকগুলি বায়বীয় পদার্থ থাকে। খনিজ পদার্থ পৃথিবীর মৃত্তিকার সহিত মিলিয়া যায়, এবং বায়বীয় পদার্থ বায়ুসহ মিলিয়া থাকে, কিম্বা কোন খনিজ পদার্থের সহিত মিশিয়া পৃথিবীর উপরেই থাকে। সুতরাং যে রূঢ় পদার্থ লইয়া যৌগিক জীব শরীর গঠিত হয়, শরীর পতিত হইলে, সেই রূঢ় পদার্থ সকল অক্ষুণ্ণভাবে পুনরায় পরিমুক্ত হইয়া পড়ে। এই জন্যই প্রকৃতির ভাণ্ডার অক্ষয়, এই জন্যই অগণ্য জীব উদ্ভিদ ও জন্তু জন্মিলেও মূল পদার্থের শেষ হয় না। ভূপৃষ্ঠ হইতে নানা খনিজ পদার্থ সার রূপে লইয়া এবং বায়ু হইতে নানা বায়বীয় পদার্থ লইয়া বৃক্ষশরীর, পত্র, ফুল, ফল পরিগঠিত ও পরিপুষ্ট হইল। বৃক্ষ মরিয়া গেলে উহারা সকলেই পচিয়া অর্থাৎ বিশ্লিষ্ট হইয়া, পৃথিবীকে খনিজ পদার্থ ফিরাইয়া দিল, বায়ুতে বায়বীয় পদার্থ প্রত্যর্পণ করিল। তাই পৃথিবী সারশূন্য হয় না, তাই পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তি, অগণ্য বৎসর ধরিয়া কত অগণ্য উদ্ভিদ প্রসব করিয়াও এক বিন্দু হ্রাস হয় না। তাই অবিচ্ছেদে, অব্যাহত ও অক্ষুণ্ণ ভাবে জীব-প্রবাহ চলিয়া যাইতেছে।

উদ্ভিজ্জাণু যে পচনের একমাত্র কারণ, ইহা আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে, বৈজ্ঞানিকেরা নানা মতবাদ প্রচারিত করিয়া পচন-সমস্যার মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিতেন। তন্মধ্যে যে যে মতবাদ উদ্ভিজ্জাণু-মতবাদের অব্যবহিত পূর্ব্বে

---

* পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ ব্যাক্‌টেরিয়া সম্বন্ধে জানিতে উৎসুক হন, তিনি অনুগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান মাসের "ভারতীতে" লেখকের উক্ত-শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইতে পারিবেন।—লেখক।

প্রচলিত ছিল, তাহা সুবিখ্যাত জার্মাণ পণ্ডিত লীবিগ ও বার্জেলিয়সের মতবাদ। বাস্তবিক লীবিগ বা বার্জেলিয়স্ সে মতবাদের প্রবর্ত্তক নহেন। উহা অনেক প্রাচীন কাল হইতেই চলিত ছিল। তবে তৎকালে পণ্ডিতবর লীবিগ উহা পুনর্জীবিত করেন। এই জন্য উহা লীবিগের মতবাদ বলিয়াই বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলে সুপরিচিত ছিল, এবং সর্ব্বত্র মানিত হইত। এই মতবাদানুসের বায়ুর অম্লজানই নাইট্রোজেন-সম্বলিত জৈবিক পদার্থের যৌগিকাণুর (molecules) বিশ্লেষণসাধনের প্রথম কারণ। পরে যৌগিকাণবিক শক্তি (molecular motions) ক্রমে ক্রমে এক যৌগিকাণু হইতে অপর যৌগিকাণুতে বিস্তারিত হইয়া, সমুদায় যৌগিক পদার্থকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, রূঢ় পদার্থে পরিণত করে। বার্জেলিয়সের মতবাদ লীবিগের মত হইতে একটু স্বতন্ত্র। বার্জেলিয়স বলিতেন, জীবশরীরে যে অ্যাল্‌বিউমেন্ বা নাইট্রোজেন্ সম্বলিত পদার্থ থাকে, তাহারই অন্তর্নিহিত এমন এক গূঢ় শক্তি আছে, যাহা দ্বারা আপনাআপনিই উক্ত জীব দেহ বিকৃত হইতে থাকে। তিনি এইরূপ শক্তিকে উক্ত পদার্থের catalyctic force অর্থাৎ বিনাশী শক্তি আখ্যা প্রদান করিতেন।

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন পচন সম্বন্ধে নানাপ্রকার পরীক্ষা করা হয়, তখন বৈজ্ঞানিকেরা দেখিয়াছিলেন যে, মৃত জীবদেহকে নির্বাত পাত্র মধ্যে স্থাপিত করিয়া অথবা বায়ু প্রবেশরহিত পাত্রমধ্যে পুরিয়া এবং যথেষ্ট পরিমাণে উত্তাপ প্রদান করিয়া রাখিলে, উহা কিছুতেই বিকৃত হয় না। কিন্তু উহাতে কোনও মতে পুনঃর্ব্বার বায়ু প্রবেশ করিতে দিলে, কিম্বা উক্ত মৃতদেহ অন্য পাত্রে স্থানান্তরিত করিলে, দেহ পচিতে আরম্ভ করে। ইহা হইতেই অনুমিত হইত যে, বায়ুর অক্‌সিজেন্‌ই মূল পদার্থের বিকৃতিকরণের একমাত্র কারণ।

সর্ব্বপ্রথমে সুবিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক পাষ্টর উদ্ভিজ্জাণু-মতবাদের অবতারণা করেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে নানাবিধ ফার্মেণ্টেশনের মধ্যে জৈবিক পদার্থের কার্য্য পরিদর্শন করিয়া, উদ্ভিজ্জাণুরাই নানা ফার্মেণ্টেশনের কারণ, ইহা নির্দ্দেশ করেন। মৃত উদ্ভিদ ও জন্তুদেহের পচনও একরূপ ফার্মেণ্টেশন। অন্য ফার্মেণ্টেশনের মূল নীতি ও যা, পচন-ফার্মেণ্টেশনের মূল নীতিও তাই। বিশেষ পার্থক্য এই যে, জন্তুশরীরের নানাবিধ জটিল যৌগিক পদার্থ মুক্ত হইবার কালে গন্ধক ও ফস্ফরস প্রভৃতি কতিপয় দুর্গন্ধময় যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। তাই পচা জন্তুশরীর হইতে একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ উঠে। পচন-ফার্মেণ্টেশন এই

বিশেষ প্রকারের দুর্গন্ধের জন্য অন্যবিধ কার্মেণ্টেশন হইতে সচরাচর পৃথক করা হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও মৃতজীবদেহ-পচন প্রকৃত পক্ষে এক প্রকার কার্মেণ্টেশন ব্যতীত আর কিছুই নহে।

দুই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকারের উদ্ভিজ্জাণু পৃথিবীর সমুদয় মৃত জৈবিক পদার্থের পচন-কার্য্য সম্পন্ন করে। এক প্রকার উদ্ভিজ্জাণু,—যাহারা অম্লজান ব্যতিরেকে জীবনধারণ করিতে পারে; অপর প্রকার,—যাহারা অম্লজানের সাহায্য ব্যতীত জীবনধারণ করিতে সক্ষম নহে। শেষোক্ত প্রকারের উদ্ভিজ্জাণুরা মৃত পদার্থের উপরিভাগে জন্মে, এবং প্রথমোক্ত প্রকারের উদ্ভিজ্জাণু অভ্যন্তরদেশে জন্মে। বলিতে গেলে, যেন দুই বিভিন্ন বংশের উদ্ভিজ্জাণু পচন-কার্য্য সমাধা করিবার জন্য আপনাদের মধ্যে কার্য্য বিভাগ করিয়া লইয়াছে। যে উদ্ভিজ্জাণু বংশ অম্লজন ব্যতিরেকে জীবনধারণ করিতে পারে, তাহা মৃত পদার্থের অভ্যন্তর-দেশ আক্রমণ করিয়া নানা জটিল যৌগিক পদার্থ হইতে সরল যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করিয়া দেয়। আর যে বংশ অম্লজান ব্যতীত জীবনধারণ করিতে পারে না, তাহা সরল যৌগিক পদার্থদিগকে ভাঙ্গিয়া রূঢ় পদার্থে পরিণত করে। পাঠকদিগের সকলেই বোধ হয় অবগত আছেন, আমাদের এই দেহ, যদিও শোণিত, মেদ, অস্থি, পেশী, মাংস, স্নায়ু, মস্তিষ্ক, শিরা প্রভৃতি নানারূপ জটিল পদার্থের সমবায়ে পরিগঠিত, কিন্তু মূলতঃ কেবল ছয়টি রূঢ় পদার্থের বিভিন্ন প্রকার সংযোগ ব্যতীত আর কিছুই নহে। সে ছয়টি রূঢ় পদার্থ এই— অঙ্গারক, যবক্ষারজান, অম্লজান, উদজান, গন্ধক ও ফস্ফরস্। উল্লিখিত দ্বিবিধ উদ্ভিজ্জাণুর সমবেত কার্য্য দ্বারা জীবদেহের কেবল ঐ ছয় প্রকার রূঢ় পদার্থে বিভক্ত হইয়া পড়ে।

এখানে একটি বিষয় বিশদ করা আবশ্যক। আমরা যত দূর দেখিলাম, তাহাতে অনেকের মনে হইতে পারে যে, অম্লজান-বাষ্প পচনকার্য্যের কোনও সহায়তাই করে না। বাস্তবিক তাহা নহে। তবে ইহা সত্য যে, অম্লজান সাক্ষাৎ ভাবে পচনকার্য্যের কোনও সাহায্যই করে না। কিন্তু পরোক্ষ ভাবে যথেষ্টই করিয়া থাকে। কারণ,—যে উদ্ভিজ্জাণুরা উপরিভাগে থাকিয়া সরল যৌগিক পদার্থদিগকে রূঢ় পদার্থে পরিণত করে, তাহারা অম্লজান ব্যতিরেকে আদৌ জীবনধারণ করিতে পারে না। সুতরাং তাহাদের জন্য অম্লজান নিতান্ত আবশ্যক। আদৌ যখন উক্ত উদ্ভিজ্জাণুদ্বয়ে কোনও যৌগিক পদার্থ হইতে অঙ্গারক, উদজান এবং যবক্ষারজন বিমুক্ত হয়, তখনি উহাদের সাহায্যে উক্ত বিমুক্ত বাষ্প

সকলের কেহ কেহ বায়ুর অম্লজান সংস্পর্শে অম্লাঙ্গারক বাষ্প, জলীয় বাষ্প কেহ বা য়্যামোনিয়া বাষ্প (য়্যামোনিয়ায় অম্লজান থাকে না) প্রভৃতি রূপে প্রস্তুত হয়। প্রকৃতির মধ্যে এরূপ সরল নানা যৌগিক পদার্থের যে অত্যন্ত আবশ্যকতা আছে, —তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই। সুতরাং অম্লজান বাষ্প পরোক্ষভাবে পচন-কার্য্যের যে বহুল সহায়তা করে, তাহা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে। তবে অম্লজান সাক্ষাৎভাবে পচনকার্য্যের কোনও সহায়তা করে না।

পচনতত্ত্ব আলোচনা করিতে করিতে আমরা দেখিতেছি যে, এ পৃথিবীতে একটি জীবের মৃত্যু হইলে, অনতিবিলম্বে সেই জীবদেহে সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অগণ্য নূতন জীব বা জীবাণুর আবির্ভাব হয়। ইহারা স্বকার্য্য সাধন করিয়া মরিয়া গেলে, ইহাদের দেহাবশেষ ধ্বংস করিবার জন্য আবার নূতন জীবাণু তাহার স্থল অধিকার করে। এইরূপে অনেক ধ্বংস হইয়া যাইবার পর যখন আর কোনরূপ জৈবিক পদার্থ না থাকে, তখন সম্পূর্ণরূপে সকল প্রকার জীবাণু তিরোহিত হয়। অবশ্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত অতি সামান্য পরিমাণও যবক্ষারজান সংযুক্ত জৈবিক পদার্থের অবশেষ থাকে, উদ্ভিজ্জাণুর শেষ হয় না। এইসকল উদ্ভিজ্জাণু বায়ুর সহিত অমিত পরিমাণে মিশিয়া আছে। জীবদেহের মৃত্যু হইলেই—আপনাদের আহারীয় সংগ্রহের জন্য তদুপরি পতিত হইয়া তন্মধ্যে অধিষ্ঠান করে ও ক্রমসঃ বংশ বৃদ্ধি করিতে থাকে। ইহারা অত্যধিক তাপ বা শৈত্যে মরিয়া যায়। সুপক্ক ফল, মাংস বা মৎস্য বরফের মধ্যে রাখিয়া দূরদেশে পাঠাইলেও যে পচে না, তাহার কারণ এই যে, বরফের শৈত্যের মধ্যে উক্ত উদ্ভিজ্জাইরা বাঁচিতে পারে না। সুতরাং জিনিষগুলিও নষ্ট হয় না। এই জন্যই তুষরাচ্ছন্নমেরুপ্রদেশের তুষারাভ্যন্তর হইতে অনেক প্রাচীন কালের জন্তুদেহও সম্পূর্ণ অবিকৃতাবস্থায় বর্ত্তমানে পাওয়া গিয়াছে। অত্যধিক উত্তাপের মধ্যে উক্ত উদ্ভিজ্জাণুরা বাঁচে না; সেই জন্যই বেশী উত্তাপের মধ্যেও জান্তব পদার্থ বিকৃত হয় না। আর আমরা প্রবন্ধের প্রারম্ভেই, যে বলিয়া আসিয়াছে যে, বায়ুশূন্য পাত্রমধ্যেও মৃতদেহ পচে না, তাহারও কারণ এই যে, পাত্রবায়ু শূন্য হওয়াতে, কোন উদ্ভিজ্জাণু-বীজ আর তাহার মধ্যে থাকে না। তাই উহা পচিতেও পারে না।

উপসংহার করিবার পূর্ব্বে পাঠক আসুন, আমরা একবার চিন্তা করি যে, যদি এই উদ্ভিজ্জণুপৃথিবীর মৃত জৈবিক পদার্থনিচয়কে পচাইয়া আদিম রূঢ় পদার্থে পরিণত না করিত, তাহা হইলে এই সুন্দর বিচিত্র পৃথিবীর কি

অবস্থা হইত! প্রথমতঃ, নানা উদ্ভিদ ও জন্তু জন্মিয়া এবং মরিয়া পৃথিবীর এমন এক অবস্থা ঘটাইতে পারিত, যখনমৌলিক পদার্থাভাবে জীববিকাশ অসম্ভব হইত। দ্বিতীয়ত, এই ধনধান্য ভরা, পরম রমণীয় পৃথিবী এক নির্বিশেষ শ্মশানভূমি হইয়া থাকিত। অগণ্য শুক বৃক্ষ, লতা, পত্র, ফুল, ফল, অগণ্য মৃত মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, পাশাপাশি পড়িয়া থাকিত। সম্পূর্ণ অবিকৃত অসংখ্য মৃত উদ্ভিদ ও জন্তুদেহ সমুদয় ভূপৃষ্ঠে ছাইয়া রাখিত। হয় ত তাহাদের জন্য এমন একবিন্দু স্থান থাকিত না, যেখানে একটি তৃণও জন্মিতে পারে। তৃতীয়তঃ, পৃথিবী সত্বর উৎপাদিকা-শক্তি-বিহীন হইয়া পড়িত। উপযুক্ত, সারেভাবে বৃক্ষ-লতা তৃণ জন্মিত না, ফল পুষ্প প্রসূত হইত না। সুতরাং জন্তু-জগৎ—উদ্ভিদ ব্যতিরেকে জীবনধারণ করিতেও সমর্থ হইত না। পৃথিবী জীবজন্তুশূন্য হইত। থাকিত কেবল এক ভীষণ দৃশ্য! এ পৃথিবীর পৃষ্ঠ ব্যাপিয়া শবের উপর শব, মৃতদেহের পার্শ্বে মৃতদেহ; মনুষ্য, পশু, তরু লতা উপর্য্যুপরি, পাশাপাশি, পর্ব্বতাকার স্তূপসদৃশ; শ্মশান অপেক্ষাও ভয়ানক মহা শ্মশান। কেবল ভূপৃষ্ঠ নহে; সাগর-সারিৎসিন্ধু, হ্রদ, নদনদী, সরোবর—সমুদয় জলাশয় জলজ অশেষ প্রকার উদ্ভিজ্জ ও জন্তুর সমাধিক্ষেত্রে পরিণত হইত। অশেষ প্রকারের জলজ জন্তু ও উদ্ভিদ মরিয়া জলরাশিকে পূর্ণ করিয়া ফলিত। হয় ত মহাসাগরবক্ষ—অগণ্যমৃত জীবদেহে সম্পূর্ণরূপেই পূর্ণ হইয়া যাইত।

শ্রীপতিচরণ রায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

নব্যভারত। ভাদ্র ও আশ্বিন। এই সংখ্যায় প্রথমে, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল, "রূপ সনাতন" নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। যাঁহারা বৈষ্ণব শাস্ত্রের সহিত সম্বন্ধ রাখেন, রূপ ও সনাতন তাঁহাদের অপরিচিত নহেন। এই দুই বৈষ্ণব ভ্রাতার বৈরাগ্যকাহিনী বঙ্গ-সমাজে সুপ্রসিদ্ধ। ইঁহাদের বৈরাগ্য ও ধর্ম্মবুদ্ধি বৈষ্ণব সমাজের গৌরবের বস্তু। রূপ ও সনাতনের সম্বন্ধে আবহমান কাল হইতে যে সকল উক্তি ও কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার বিরুদ্ধ মত প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক বলেন, "পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও রূপ সনাতন অর্থলোভে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ ও যবনাচার গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা অতি শোচনীয় ঘটনা। * * এমন এক দিন আসিল, যখন দুই ভ্রাতা আপনাদের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া ঘোর অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। * * দুই ভ্রাতা অবশেষে রাজপ্রসাদ হারাইয়াছিলেন। * * রূপ দণ্ডভয়ে গৌড় হইতে পলায়ন করিলেন, সনাতন কারারুদ্ধ হইলেন। * * আভাসে জানা যায়, (রাজা) রূপকে প্রজাপীড়ক অত্যাচারী দস্যু বলিয়া জানিতে পারেন—* * সনাতনের কি দোষ ছিল, তাহা স্পষ্ট জানা যায় না। এই পর্য্যন্ত লিখিত আছে, রূপ পলায়ন করিবার পর তিনি হঠাৎ পীড়ার ভান করিয়া রাজবাটীতে যাওয়া আসা বন্ধ করিলেন। হুসেন সাহ বৈদ্য পাঠাইয়া জানিলেন, পীড়ার কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। ইহাতে আভাসে সনাতন যে মিথ্যাবাদী ও কপটাচারী ছিলেন, তাহা জানা যায়। হুসেন সাহা * * তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। * * বৈষ্ণবেরা বিবেচনা করেন যে, কেবল বৈরাগ্যবশতই রূপ সনাতন রাজকার্য্য পরিত্যাগ করেন। ইহা প্রকৃত বিবেচনা হয় না। * * ভগ্নাঃ কৃষের্ভাগবতা ভবন্তি—রূপ সনাতন ইহারই উদাহরণ। জীবনের এই [illegible] দশায় তাঁহারা ভক্ত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন।" এই অভিনব বিরুদ্ধ মতবাদ পড়িয়া অনেকে বিচলিত হইয়াছেন, দেখা যাইতেছে। "জ্যোতি" নামক নবপ্রকাশিত মাসিকের সমালোচনায় তাহার প্রকাশ্য পরিচয়ও পাওয়া গিয়াছে। উমেশ বাবু প্রমাণপ্রয়োগসহকারে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, অন্য প্রতিবাদ না হইলে,—তাহা প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষে কোনও আপত্তি দেখা যায় না। উপসংহারে উমেশ বাবু বলিতেছেন, "ফলতঃ রূপসনাতনের জীবনে অনুকরণীয় কিছুই নাই। তাঁহারা উভয়েই জীবনযাত্রার পথহারা পথিক। উভয়েরই গতি সরল পথ ছাড়িয়া কুটিল ভাব ধারণ করিয়াছিল। ধর্ম্মবিরুদ্ধ অর্থ কামের সেবাই জীবনের সরল পন্থা; তাহার এক দিকে পাপের পঙ্ক, অন্য দিকে বৈরাগ্যের মরু। তাঁহাদের জীবনের এক ভাগ সেই পঙ্কে, অপর ভাগ সেই মরুতে যাপিত হয়। তবে যদিও তাঁহারা আমাদের অনুকরণের যোগ্য না হয়েন, তত্রাচ আমাদের শিক্ষার স্থান বটেন। লোভপরতন্ত্র হইয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে কি বিষময় ফল ফলে, মনুষ্য কিরূপে ইতোভ্রষ্টস্ততো নষ্ট হয়,

তাহা এই দুই ভ্রাতার জীবনে দেখা যায়।” “সুখী” কার্য্যকুমুমাঞ্জলি-রচয়িত্রীর একটি কবিতা। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরীর “বৌদ্ধ-সঙ্ঘ” একটি উপাদেয় প্রবন্ধ। লেখক এবার ‘ভিক্ষুণী সঙ্ঘের’ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়ের “কৃষিকার্য্যের উন্নতি”—দশম প্রস্তাব ও শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসুর “স্ত্রীশিক্ষা-বিবরণ”—তৃতীয় প্রস্তাব এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, এই সংখ্যায় “বেঙ্গল স্যানিটারী ড্রেনেজ বিলের” বিস্তৃত সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। প্রবন্ধটিতে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বাভাবিক দূরদর্শন, চিন্তাশীলতা, গবেষণা এবং বঙ্গীয় গ্রাম ও গ্রামবাসীগণের অবস্থার বিস্তৃত অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা এই প্রবন্ধের প্রতি বেঙ্গল গভর্মেণ্ট ও তাঁহার ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধির “বঙ্গের আদিকবি শ্রীচণ্ডীদাস ঠাকুর” প্রবন্ধের প্রথমাংশ এবার প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। “ফরিদপুরের দুর্ভিক্ষ” সম্পাদক লিখিয়াছেন। ফরিদপুরের দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজার জন্য নব্যভারত সম্পাদক যে অক্লান্ত অধ্যবসায়ে অনবরত পরিশ্রম করিতেছেন, সে জন্য তিনি আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু তাঁহার এই ছাব্বিশ-পৃষ্ঠা-ব্যাপী বিস্তৃত রিপোর্ট মাসিকের উপযুক্ত নহে। মাসিক পত্রের উপযোগী করিয়া রচনা করিলে, এতদ্দ্বারা অনেক অধিক কাজ হইতে পারিত। ফরিদপুরের দুর্ভিক্ষপীড়িত হতভাগ্যগণের দুর্দ্দশার কথায় চক্ষে জল আসে—সংক্ষেপে বলিতে পারিলে, এই প্রবন্ধ অনেক পাঠককে আকর্ষণ করিতে পারিত। যাহা হউক, সাধু উদ্দেশ্য ও সহৃদয়তার জন্য নব্যভারতের সম্পাদক মহাশয় আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

চিকিৎসাতত্ত্ববিজ্ঞান এবং সমীরণ। দ্বিতীয় খণ্ড; প্রথম সংখ্যা। প্রথমেই শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসুর লিখিত “আগমনী।” ইহাতে লেখক দুর্গার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের “জম্বু ও মণিচোরার সুড়ঙ্গ” একটি ভ্রমণবৃত্তান্ত। রচনার [illegible] কৌতুকাবহ,—লেখকের লিপিকৌশলের অভাব না থাকিলে প্রবন্ধটি আরও মনোরম হইত। “গৌরী” শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গুপ্তের একখানি উপন্যাস। যে পাঁচ পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পড়িয়া আমরা আনন্দিত ও আশান্বিত হইয়াছি আমরা সাগ্রহে ইহার শেষ প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম। “উদাসীন যোগীবেশে সাজারে আমার” একটি কবিতা। এইরূপ একটি কবিতা আমরা বাল্যকালে “প্রতিবিম্ব” নামক একখানি কাগজে পড়িয়াছিলাম, বোধ হইতেছে। মধ্যে মধ্যে বাঙ্গলা সাহিত্যে এইরূপ ব্যাপার ঘটে;—“প্রতিবিম্ব”ও নিকটে নাই,—তাই এই কবিতার লেখককে জিজ্ঞাসা করিতেছি,—ইহা কখনও “প্রতিবিম্ব” নামক কোনও মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল কি? সমীরণের আয়ুর্ব্বেদশাখায় সাধারণের উপযোগী করিয়া আবশ্যক বিষয়ের আলোচনা করিলে, বোধ করি, আরও ভাল হয়।

জন্মভূমি। আশ্বিন। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ পাইনের “দুই বন্ধু” গল্পটি এবার বেশ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রসিকলাল ঘোষের “কাটোওয়ার ইতিবৃত্ত” একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ।

শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত সেক্ষপীয়রের "টাইমন্ অব্ এথেন্সের" গল্পভাগ সঙ্কলন করিয়াছেন। ইহা একটি সুখপাঠ্য গল্প। "উদ্বোধন"। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র রক্ষিতের একটি গল্প,—বিশেষত্ব কিছু দেখিলাম না। শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণির "মায়ের আগমন" পুনরুত্থানকারী হিন্দুদের উপযোগী একটি আধ্যাত্মিক প্রবন্ধ—ইহাতে পাঠকগণ প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেখিতে পাইবেন। এবারকার জন্মভূমিতে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের বড় অভাব।

পুরোহিত। দ্বিতীয় ভাগ; তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা। শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের "কোম্পানীর জমীদারী" এবারকার পুরোহিতের একমাত্র উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি বেশ হইতেছে। এই সংখ্যায় "প্রদীপের" দুইটি ক্ষুদ্র সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। দুটির একটিতেও নিপুণতার পরিচয় পাওয়া গেল না। এই সমালোচনার শেষে সম্পাদক ফুটনোটে লিখিয়াছেন,—"অনেকের ধারণা, অক্ষয়কুমার বড়াল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুকারী। একথার কি মূল আছে না আছে, আমরা অবগত নহি। তবে রবীন্দ্রনাথের অস্ফুট দোষ ("অস্ফুট" দোষ ব্যাপারটা কি?—সম্পাদক) যত বেশী, অক্ষয়কুমারে তাহার কচিৎ লেশমাত্র আছে। তাঁহার অনেক কবিতাই, রবীন্দ্রনাথের কবিতা অপেক্ষা বহুলাংশে উৎকৃষ্ট, তাহা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। জন্মভূমিতে এ সম্বন্ধে যে সমালোচনা বাহির হইয়াছে, তাহার সহিত আমাদের প্রায় মতৈক্য আছে।" "সং"-স্বাক্ষরকারী মহাশয় সঙ্কোচের ধার ধারেন না,—তাই এই অদ্ভুত ফুটনোটটি অসঙ্কোচে পত্রস্থ করিয়াছেন। প্রদীপ-প্রণেতা এইটুকু পড়িয়া বলিবেন,—"ভগবান আমাকে এমন বন্ধুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ করুন।"

দাসী। অক্টোবর। "কোঁকড়া কালচুল" একটি গল্প। ভিক্টর হুগোর একটি ঔপন্যাসিক চরিত্রের বাঙ্গলা পরিণাম। বিষয় ভাল, কিন্তু লেখক ভাল করিয়া লিখিতে পারেন নাই। "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্রের বৈচিত্র্য" শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দোপাধ্যায়ের রচনা। "বিবিধ প্রসঙ্গ" বেশ হইয়াছে। এবারকার দাসীতে "কোরিয়ার" একটি ক্ষুদ্র বিবরণ আছে।

সখা ও সাথী। প্রথমেই শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর "বাবা বু[illegible]" ইতিশীর্ষক একটি কবিতা;—এই কবিতার সঙ্গে একখানি লিথো ছবি। ছবিখানি বেশ হইয়াছে। "সাজ গোজ" প্রবন্ধে নানা বর্ব্বর জাতির বেশভূষার বিবরণ ও চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের "রঙ্গনাথজীর মন্দির" একটি ছোট গল্প। গল্পটি ভাল হয় নাই। "গল্প নয়" একটি বাঘের গল্প,—সচিত্র। ছেলেদের বেশ লাগিবে। এবারকার সখা ও সাথী অনেকগুলি চিত্রে সুশোভিত হইয়াছে,—কিন্তু চিত্রের সংখ্যার দিকে অত দৃষ্টি না দিয়া উৎকর্ষের বিষয়ে অবহিত হইলে ভাল হয়। প্রবন্ধনির্ব্বাচনের ত্রুটী সংশোধিত না হইলে সাথীর উন্নতির আশা করা যাইতে পারে না। আশা করি, সম্পাদক মহাশয় এ বিষয়েও অবহিত হইবেন।

চৈতন্যের দেহত্যাগ।

(১)

নিশীথের শুভ্র মেঘাসনে
পূর্ণশশী শোভিছে গগনে ;
কিরণ-বসন-পরা
শোভে সুপ্ত বসুন্ধরা
বসন্তের কুসুম-শয়নে।

(২)

শব্দহীন, স্তব্ধ চারি ধার,—
চিত্রে যেন সমুদ্র অপার!
শুধু দূরে কদাচিৎ
কম্পিত হ'তেছে গীত
উচ্চকণ্ঠে নৈশ পাপিয়ার।

(৩)

গম্ভীর, গম্ভীর সব ঠাঁই ;
সৌন্দর্য্যের আদি অন্ত নাই ;—
নয়ন নিমেষহীন,
আত্মহারা, উদাসীন,
শূন্যমনে ফিরিছে নিমাই।

(৪)

গন্ধামোদে মুগ্ধ অতিশয়
স্বপ্নভরা শান্ত সে নিলয় ;—
যুগ-যুগান্তের কথা,
অযুত বিস্মৃত ব্যথা
উচ্ছসিয়া উঠে সমুদয়!

(৫)

কি নির্ঝর অন্তরে উথলে,—
গোরা শুধু ভাসে আঁখিজলে ;
হৃদয় বীণাতে তাঁর
কি সঙ্গীত অনিবার,—
মুখে 'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ' শুধু বলে।

(৬)

সমুখে বিশাল শোভে হ্রদ,
হেরে গোরা ভাবে গদগদ ;—
যেন কালিন্দীর নীর
অচল, স্তম্ভিত, স্থির ;
তাহে দিব্য নীল কোকনদ।

(৭)

তদুপরি স্থাপি' দু'চরণ
নাচে কালা বৃন্দাবন-ধন ;
অধরে মুরলী-খেলা,
গলে দোলে বনমালা,
কটিতটে পীত আবরণ।

(৮)

"হা কৃষ্ণ! কপট, সুচতুর!
দয়া তবে হ'ল কি নিঠুর!
এতদিন পরে, হায়,
এই সেই যমুনায়
দেখা আসি দিলে কি ঠাকুর?"

(৯)

প্রাণপদ্ম উঠিল বিকশি'
আজন্মের ঘুচিল তামসী ;—
যেন কোন্ মন্ত্র বলে
ঝাঁপিয়া পড়িলা জলে ;—
অস্ত গেলা নদিয়ার শশী।

প্রতিশোধ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ব্রাহ্মণ ঠাকুর বিদায় হইয়া গেলে বৈদ্যনাথের লোক নৌকায় আসিল। লোকটা বৈদ্যনাথের সেই গোয়েন্দা, সমস্ত রাত্রি এবং দিন চলিয়া আসিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে আর কখন তাহাকে সম্বাদ বহন করিয়া দূরান্তরে যাইতে হয় নাই। পথকষ্টে এবং সময়ে পৌঁছিতে না পারিলে কপালে কি আছে ভাবিয়া সে মনে মনে "কসম" লইয়াছিল, আর কখন এমন ঝকমারি করিবে না। সমস্ত পথ সে বৈদ্যনাথের মুখের কথাগুলি মুখস্থ করিতে করিতে আসিয়াছিল। অতএব বিশ্বনাথের সম্মুখে নীত হইবামাত্র গোয়েন্দা হানিফ সেখ পড়া পাখীর মত বলিয়া চলিল যে, অমুক দিন অমুক জায়গায় ডাকাইতি করার পর বৈদ্যনাথ বাবুর ভারী অসুখ করিয়াছে। সম্প্রতি দু এক দিন চলিতে ফিরিতে সে অসমর্থ। যদি ভাল থাকে, তিন দিন পরে আসিয়া দলপতির সঙ্গে দেখা করিবে। ইত্যাদি।

সহজেই বিশ্বনাথ বুঝিল লোকটা নির্জ্জলা মিছা বলিতেছে। প্রথমতঃ কিছু না বলিয়া সে তীক্ষ্ণ-কটাক্ষে সেখজীর আপাদ মস্তক দেখিয়া লইল। আত্ম-সম্বরণ করিয়া হাসিয়া বলিল, "সেখের পো, আইন আদালতে মিছে চলে, আমার যে কাজ, তাতে চলে না। আসল কথাটা কি বল শুনি। তোমার দোষ কি? ব্যাটা ভেমো গোয়ালা যা শিখিয়ে দিয়েছে, তাই তুমি বল্‌চো বই ত নয়। আঁটকুড়োর পুতের বিশ্বাস, বুদ্ধিতে সে একটা মুচ্ছুদ্দি, কিন্তু তার মত বোকা ভুভারতে নেই। কোন্ দিন কি বিপদে পড়ে, তাকে নিয়ে আমার এই ভাবনা। লোভিষ্টি ব্যাটা বুঝি কোন লোভে পড়েচে—তাই অসুখের ওছিলা? ঠিক্ ঠিক্ বল শুনি।"

হানিফ সেখ ঠিক্ ঠিক্ই বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সহসা বৈদ্যনাথের দীর্ঘ গুম্ফ এবং আরক্ত চক্ষু যুগল তাহার মনে পড়িয়া গেল। তার উপর বৈদ্যনাথ আসিবার সময় বলিয়াছিল, "খবরদার, আসল কথা সর্দ্দার টের না পায়," সে কথা হানিফ একবারও ভোলে নাই। সে দুইবার ঢোক গিলিয়া বলিল, "না হুজুর, মিছে কথা কেন হবে? ভারি ব্যামো, এবার রক্ষা পান কি না। আপুনি হজুর দুনিয়ার মালিক, নেমক খেয়ে কি মিছে বল্‌তে পারি খোদাবন্দ!"

"কই হায়রে" বলিয়া বিশ্বনাথ হাঁকিল। শান্ত সিংহ সহসা উত্যক্ত হইয়া যেমন গর্জ্জন করিয়া উঠে, এ তেমনি তীব্র ক্রোধব্যঞ্জক স্বর। শুনিয়া নৌকা সহিত আরোহীবর্গ কাঁপিয়া উঠিল। সন্ধ্যা তিমিরে নদীহৃদয় কম্পিত করিয়া সে পরুষ কণ্ঠ দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হইল। মাঝি মাল্লারা নৌকার ভিতর প্রবেশ করিতে না করিতে নদীতীরে শত সশস্ত্র দীর্ঘাকার পুরুষমূর্ত্তি যুগপৎ সারি দিয়া দাঁড়াইল। অকস্মাৎ ধরিত্রী যেন দ্বিধাবিভিন্ন হইয়া নিশাচর প্রেতগণকে দ্বার মুক্ত করিয়া দিলেন।

দলপতি বলিল, "এই মিথ্যাবাদিটেকে একবার কেউ সিধা করে আন্‌ত। পঞ্চাশ পয়জার গুণে মার্‌বি। তাতেও যদি সত্যি না বলে, ওর মাথাটা খড়ের জলে কেটে ফেলে দে।"

কিন্তু তাহার দরকার হইল না। হানিফ দলপতির বিকট কণ্ঠ শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিল, হুকুম শুনিয়া তাহার পা জড়াইয়া ধরিল। তার পর সকল কথা খুলিয়া বলিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

শুনিয়া বিশ্বনাথ মেঘাকে কাছে ডাকিলেন। দস্যুতায় মেঘা তাহার দক্ষিণ হস্ত, কিন্তু মুসলমান বলিয়া সে একটু তফাৎ তফাৎ থাকিত। দলপতির হুহুঙ্কারে আর সকলেরই আসন টলিয়াছিল—কেবল মেঘার টলে নাই। সে কাপড় মুড়ি দিয়া তখন মাঝির কাছে বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছিল।

বিশ্বনাথ বলিল, "মেঘু, বদে ব্যাটার আক্কেলের কথাগুলো শুন্‌লি ত? সামান্যি টাকায় যার এত লোভ, আমার মনে হয়, কিছুই তার অসাধ্যি নেই। আমার মাঝে মাঝে এমনও ভাবনা হয় যে ভোর বাঙ্গালা মুল্লুকের লোক কোম্পানির হুলিয়ায় ভুলে আমার অনিষ্ট করতে রাজি হবে না, কিন্তু ঐ গোয়ালাটা লোভ সামলাতে পারবে না। ধর্ম্মবাপ বলে সে আমায় রেয়াৎ করবে না।"

মেঘা অবিশ্বাসের হাসি হাসিল। বিশ্বনাথ আবার বলিল, "এখন্ হাঁস্‌চিস্ কিন্তু আমি বল্‌চি বদে থেকে আমার দলের এক দিন সর্ব্বনাশ হবে। মনোহরপুরের সেই অনাথা ব্রাহ্মণবিধবার টাকার ওপর ব্যাটার অনেক দিন থেকে নজর, কেবল আমার ভয়ে এত দিন পেরে ওঠেনি। এখন নাকি বিধবাটা মরে গেছে, আর তার মেয়ে টাকা কড়ি নিয়ে শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছে, লোভিষ্টিটে এ সুবিধে আর ছাড়্‌তে পারলে না। এত যার লোভ, তার কখন কোন ধর্ম্ম-

জ্ঞান নেই। কিন্তু আমি তার কন্দী খাটিতে দেব না মেধু। তোকে বলচি, বিশে যদি বাপের ছেলে হয়, বদে ব্যাটার এ কন্দী অবিশ্যি কেঁসে যাবে। আমি এখনই চল্লাম। তুই আমার রণ্‌পা * দুখানা এনে দে। বিশ কোশ রাস্তা বইত নয়। এখনও সন্ধ্যার আমল। দেড় প্রহর রাতে আমি পৌঁছে যাব।"

মেঘা বলিল, "যেতে দাও। তার পর কোন শাস্তি দিও। টাকাগুলো না হয় বামুনের মেয়েকে ফিরে দিও। কুড়ি কোশ তুমি দেড় পহরের ভেতর মারবে বটে, কিন্তু একলা গিয়ে যদিই কোন বিপদে পড়? তা ছাড়া আজ্‌কের উদ্যোগ সব পণ্ড হবে।"

বিশ্বনাথ হাসিল। "মেধু, তোরা যখন কেউ ছিলিনে, তখন প্রথম বয়সে এক দিন এক তরওয়ালে পাঁচ শ লোকের মোহড়া নিয়ে হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে ফিরে ছিলাম। তখন এত কল কৌশল জান্‌তাম না—লোকের বল, টাকার বল, নামের বল ছিল না। আর আজ্‌ একটা অনাথা বামুনের মেয়েকে একা বাঁচাতে গিয়ে বিপদে পড়ব? না মেধু, আমি যাবই যাব। আমি বেঁচে থাক্‌তে দলের লোকে এমন অধর্ম্ম করলে, মাকালী অপ্রসন্ন হবেন। আমি কোথায় চল্লাম, কাউকে বলিস্‌ নে। আমার রণ্‌পা জোড়া এনে দে। আজ্‌কের অন্য কাজ তুই কর্‌!"

মেঘা দলপতিকে ভাল করিয়া চিনিত। দেখিল, কথা বলিতে বলিতে বিশ্বনাথ বারম্বার দন্ততলে অধরোষ্ঠ স্থাপিত করিল। তাহার ললাটতটে চিন্তা-রেখা ফুটিয়া উঠিল, চক্ষুতে অসাধারণ জ্যোতি প্রকাশ পাইতেছিল। মেঘা আর কোন প্রতিবাদ করিল না।

তখন মেঘাকে কিছু দূর সঙ্গে লইয়া গিয়া, সময়োচিত উপদেশ দিয়া, সশস্ত্র বৈদ্যনাথ যুগল বংশখণ্ডে লাফাইয়া উঠিল, এবং দেখিতে দেখিতে অন্ধকারে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ।

এ দিকে প্রথম রাত্রিটা সরলার একরূপ নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল।

দ্বিতীয় দিন, মধ্যাহ্ণ উত্তীর্ণ হইয়াছে। স্নানাহারের জন্য মাঝি মাল্লারা গোবরডাঙ্গার হাটের নীচে নৌকা বাঁধিল। হাটের দিন নহে, তেমন গোল-মাল ছিল না। দুই চারি জন মাত্র দোকানী সেখানে সচরাচর বাস করে। জলখাবার কিনিবার জন্য বদন এক দোকানে গেল। মুদী ভগবান মদক তখন চসমাচক্ষে অবহিত মনে সুর করিয়া রামায়ণ পড়িতেছিল। অশোক বনে চেড়ীরা মা জানকীকে যে সব কষ্ট দিয়াছিল, ভগবান রামায়ণের সেই স্থানটা পড়িতেছিল, এবং পড়িতে পড়িতে ভাবভরে অশ্রুপাত করিতেছিল। তাহার গলায় তুলসীর ঘনবিন্যস্ত মালা, ললাটে এবং বক্ষে হরিনামের ছাপ।

* রণ্‌পা—ডাকাইতদের দ্রুত গমন জন্য লাঠি বিশেষ। লাঠির মধ্যদেশে পা রাখিবার স্থান থাকে।

বদন বাগ্দী দেখিল, দোকানী সব জিনিস রাখে, আর তার গলার সুরে পড়া শুনিতেও বেশ লাগিতেছিল। কিন্তু বড় তাড়াতাড়ি, সে হাঁকিল, "দু গণ্ডার মুড়ি মুড়কি দাও গো দোকানী মোশাই। তার পর পড়ো।"

ভগবান হাত নাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইল, একটু অপেক্ষা কর। কিন্তু বদনের ক্ষুধার জ্বালার উপর তাড়াতাড়ি ছিল। সে বলিল, "অনেক দূর যেতে হবে গো দোকানী মোশাই, তাতে মেয়ে ছেলের সওয়ারি নৌকো। একটু শীগ্‌গির অবদান কর।"

মদক চসমা খুলিয়া চক্ষু মুছিল। বদনের কাছে পয়সা লইল বটে, কিন্তু ডবল দামের জিনিস দিল। তার পর সুধাইল, "কোথায় যাবে, কোথা হইতে আসিতেছ?"

ডাকাতির ভয় বদনের মনে জাগিতেছিল। মুদীটের হরিনামের ছাপ আর রামায়ণ পাঠে তার উপর একটু ভক্তি হইয়াছিল বটে, কিন্তু প্রশ্ন শুনিয়া কিছু সন্দেহ হইল। বিশেষ বদন শুনিয়াছিল, অনেক ডাকাইত ছদ্মবেশে পথিকদের কাছে সম্বাদ সংগ্রহ করে। বদন ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দোকানীর দিকে চাহিল, এবং ইতস্ততঃ করিয়া উত্তর দিল।

বুঝিয়া ভগবান হাসিল। বলিল, "সন্দেহ হয়, উত্তর দিও না। কিন্তু সাবধান, ডাকাতের গোয়েন্দা তোমাদের পাছু নিয়েচে। পালাও, আর দেরি করো না।"

বদন ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া নৌকায় গেল, এবং মাঝি মাল্লা ও অনুচরদের খবর দিল। তাহাতে সেই সাত জন পুরুষের অতি অনুচ্চ কণ্ঠে যে পরামর্শ চলিতেছিল, সহজেই তাহা সরলার শ্রুতিপথে প্রবেশ করিতেছিল। বরং সেই সপ্ত-মন্ত্রীর মন্ত্রণা মধ্যে মতভেদের সম্ভাবনা উপস্থিত হইলে, সপ্তকণ্ঠের যুগপৎ ফুস্ ফুস্ রব যখন মিলিত হইতেছিল, তখন সরলা আশঙ্কা করিতেছিল, হাটের নীচে বুঝি হাট জমিয়া যায়।

সরলা বদনকে ডাকিয়া তিরস্কার করিল, কেন প্রথমে তাহাকে সম্বাদ না দিয়া সাতটা ভূতে হট্টগোল করিতেছে? তখন দিদি ঠাকুরাণীর আদেশ মতে বদন সম্বাদদাতাকে ডাকিতে গেল।

ভগবান বলিল, "বাপু, আমার দোকানে তুমি যদি একটু থাক, আমি তোমার নৌকায় যেতে পারি। আমার কেউ নেই, কেবল একটা মা-মরা ন' বছরের মেয়ে। তা সেটা কোথা খেলতে গিয়েচে। সে যদি এখন আসে, আমায় না দেখে কেঁদে গোল করবে। বলো তোর বাপ মরেনি।" হাসিয়া ভগবান সওয়ারি নৌকার উদ্দেশে ধাবিত হইল।

ভগবান মদকের সঙ্গে সরলার যে কথাবার্ত্তা হইল, এখানে তাহার কোন কথা আমরা বলিব না। তার পর সকলে তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া লইল বটে, কিন্তু আহার বড় কিছু হইল না। অবিলম্বে নৌকা গন্তব্য পথে ছুটিয়া চলিল।

ক্রমশঃ।

মুসলমানের জ্যোতিষ।

প্রথম প্রস্তাব।

সকলেই বোধ হয় জানেন যে, মুসলমানদের মধ্যেও জ্যোতিষ প্রচলিত আছে। তাঁহারা ইহাকে সচরাচর "নুজুম্" বলিয়া থাকেন। জ্যোতিষ বলিলে বঙ্গভাষায় যেমন astrology এবং astronomy উভয়ই বুঝায়, মুসলমানেরাও "নুজুম্" বলিলে সচরাচর সেইরূপ বুঝেন। নুজুম্ জ্যোতিষের প্রতিবাক্য বলা যাইতে পারে।

নুজুম্ একটি আর্‌বী শব্দ। ইহা নজ্‌ম্ শব্দের বহুবচন। নজ্‌ম্ অর্থে আর্‌বীতে নক্ষত্র। এই ত গেল নুজুমের প্রকৃত অর্থ।

সচরাচর নুজুম্ বলিলে উভয় প্রকার জ্যোতিষই বুঝায়। কিন্তু আর্‌বী পণ্ডিতেরা astronomyর জন্য প্রায়ই "হয়েৎ" শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন; সেই জন্য ক্রমে ক্রমে নুজুমের অর্থ কেবলমাত্র astrology এবং তৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বলা বাহুল্য, এ প্রবন্ধে নুজুম্ অথবা জ্যোতিষ কেবল astrology অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

মহম্মদের জন্মের বহুকাল পূর্ব্ব হইতে আরব প্রভৃতি দেশে নুজুম্ প্রচলিত ছিল।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, জ্যোতিষ মুসলমান ধর্ম্মের একেবারে বিরুদ্ধ। ইহা কত দূর সত্য, দেখা যাউক।

সকলেই জানেন যে, কোরাণ ও হদিস্ ইসলাম ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান পুস্তক। হদিস্ লইয়া মৌলবিদের মধ্যে বড়ই গোলমাল। সংক্ষেপে হদিসের অর্থ—ইংরাজি পুস্তক হইতে,—আর্‌বী অপেক্ষা সহজে, বুঝিতে পারা যায়;—

"Haji Khalifa defines the science of tradition (হদিস্) to be the means of discriminating knowledge of the sayings of the Prophet, together with his actions and circumstances and divides it into two parts,—(1) the science of the reporting of tradition—which treats of the conditions under which a tradition is considered as reaching back to the Prophet, and (2) the science of the understanding of tradition—which treats of the meaning of a particular tradition as ascertained by its language by reference to the fixed principles of Muslim law or by the analogy of known circumstances relating to the Prophet."—Vide Journal of the American Oriental Society vol. VII. page 61.

হদিসের মধ্যে;—

(১) সহি বুখারি, (২) সহি মুস্লিম্, (৩) সুনান্—ই—আবুদাউদ্ এবং (৪) সুনান্—ই—নসই, প্রধান গ্রন্থ।

আর এক খানি অতি প্রসিদ্ধ আর্‌বী পুস্তক আছে। ইহাতে ইতিহাস, হদিস্ প্রভৃতি অনেক বিষয় বিবৃত হইয়াছে। এই পুস্তকখানির নাম,—অত্ তবরি।

এখানি অতি বৃহৎ গ্রন্থ। বড় বড় ২০ ভাগে শেষ হইয়াছে। লেখকের নাম আবু জাফর মহম্মদ ইবন্-ই-জরির।

আমরা যাহা বলিলে নাম বুঝি, সে অর্থে অবশ্য এ সমস্তটা তাঁহার নাম নহে। তাঁহার নাম "মহম্মদ"। আবু জাফর অর্থে জাফরের পিতা; ইব্‌ন-ই-জরির অর্থে জরিরের পুত্র। সুতরাং সমস্ত নামটার মানে—"মহম্মদ,—যিনি জাফরের পিতা এবং জরিরের পুত্র।" এই প্রকারে আট ঘাট বাঁধিয়া নাম লিখিলে, লোকটি কে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে বিশেষ কষ্ট হয় না। মারজি এবং পার্শীদের মধ্যেও পিতার নামের সহিত নিজের নাম বলিবার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। যথা, হরি বালকৃষ্ণ, অর্থাৎ বালকৃষ্ণের পুত্র হরি; শাপুরজি ইদলজি, অর্থাৎ ইদল্‌জির পুত্র শাপুরজি।

প্রথম কথা, কি প্রকারে নুজুমের উৎপত্তি হইল? প্রসিদ্ধ গ্রন্থ অত্ তবরির ৩য় ভাগ ১৬৫ পৃষ্ঠার মতে, উমর বলিয়াছেন যে, তিনি ঈশার কাছে শুনিয়াছেন এবং ঈশাকে তাঁহার খুল্লতাত অবৈদুল্লা,—যিনি মহম্মদের জামাতা হজরত আলির পৌত্র ছিলেন,—বলিয়াছেন;—

"যখন ঈশ্বর হজরত্ আদমকে (Adam) স্বর্গ হইতে নামাইয়া আবু-কুবৈস্ পর্ব্বতের উপর উঠাইলেন, এবং তাঁহার দেখিবার জন্য পৃথিবী এত উচ্চ করিলেন যে, আদম সমস্ত দেখিতে পাইলেন, তখন ঈশ্বর আদমকে আদেশ করিলেন 'এ সমস্ত তোমারই জন্য।' আদম নিবেদন করিলেন, 'হে ঈশ্বর, কত বস্তু পৃথিবীতে আছে, আমি কেমন করিয়া জানিব।' তখন ঈশ্বর তাহার জন্য নক্ষত্র হইতে জানিবার উপায় ("নুজুম") স্থির করিলেন, এবং বলিয়া দিলেন যে, যদি অমুক অমুক দিনে, অমুক অমুক নক্ষত্র, তুমি এই এই রকম দেখ, তাহা হইলে এইরূপ জানিও, এবং যদি তুমি অন্যরূপ দেখ, তাহা হইলে অন্য প্রকার (ঘটনা) বুঝিবে।"

এইরূপে আদম "নুজুম" দ্বারা সমস্ত জানিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ক্রমে বার্দ্ধক্যবশতঃ, নক্ষত্র দেখিয়া হিসাব করিয়া দেখা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর বোধ হইতে লাগিল; তখন কৃপাময় ঈশ্বর তাঁহাকে একখানা দর্পণ পাঠাই-

লেন। আদম তাঁহার মৃত্যু সময় পর্য্যন্ত ঐ দর্পণ দ্বারা সমস্ত অজ্ঞাত ব্যাপারাদি (খবের্) জানিয়া লইতেন।

আদমের মৃত্যুর পরে "ফকৃতুন্" নামক শয়তান, দর্পণ খানি ভাঙ্গিয়া তাহার উপর জাবর্দ্ নামে নগর স্থাপন করিল। কিছুকাল পরে সুলেমান-বিন্‌দাউদ শয়তানের নিকট হইতে ভগ্ন খণ্ড গুলি আনাইয়া চর্ম্মের দ্বারা বাঁধিয়া কার্য্যোপযোগী করিয়া লইলেন। তিনি তদ্দ্বারা সমস্ত অজ্ঞাত বিষয় অবগত হইতে লাগিলেন।

সুলেমানের মৃত্যুর পরে, শয়তান পুনরায় ভগ্ন দর্পণ লইয়া গেল, কিন্তু তাহার একখণ্ড পড়িয়া রহিল। ইহা "বনি ইস্‌রাইল"এর (ইহুদি ও খৃষ্টান) অধিকারে রহিল। ক্রমে প্রসিদ্ধ পাদ্রি রাসুল্ জালুতের হস্তগত হইল। তিনি সরওয়ান্-ইবন্-ই-মহম্মদ নামক মুসলমান বাদসাহকে দিলেন।

ইনি এই দর্পণখণ্ড ঘসিয়া অপর একখানি দর্পণের উপর রাখিতেন। এইরূপে অজ্ঞাত ঘটনাদি অবগত হইতেন। তাঁহার দুর্ভাগ্যক্রমে, দর্পণ্ তাঁহাকে কেবল মন্দ সংবাদই দিত। তাঁহার রাজ্য ধ্বংস হইবে, তিনি ইহাই দেখিতে পাইতেন। সেই জন্য রাগ করিয়া দর্পণ খণ্ড ফেলিয়া দিলেন, এবং যিনি দিয়াছিলেন, তাঁহার শিরশ্ছেদন করিলেন।

তাঁহার একজন পরিচারিকা ঐ দর্পণ খণ্ড কুড়াইয়া যত্নে রাখিল।

বাদসাহ দর্পণে যাহা দেখিয়াছিলেন, ক্রমে তাহা ঘটিল; অর্থাৎ তাঁহার সর্ব্বনাশ হইল।

ইনি "বনি উমইয়া" বংশের শেষ বাদসাহ ছিলেন। ইঁহার পরে বনি অব্বাস্ বংশের রাজত্ব আরম্ভ হইল।

এই নূতন রাজবংশের দ্বিতীয় বাদসাহ মন্‌সুর্, পুনরায় দর্পণখণ্ড আনাইয়া পূর্ব্বমত ব্যবহার করিতে লাগিলেন। এ দর্পণের উপর তাঁহার এত বিশ্বাস ছিল যে, উহা দ্বারা তাঁহার শত্রু মহম্মদ বিন অবদুল্লার গতিবিধি জানিয়া, তাহাকে ধরিবার জন্য, নিজের দূরদেশীয় সুবাদারকে আদেশ দিতেন, এবং বলিয়া দিতেন যে, এখন সে অমুক স্থানে আছে।

এই নুজুমের মূল। ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, নুজুমের উৎপত্তি, ইস্‌লাম গ্রন্থ মতে, ঈশ্বরাদেশ হইতে।

মুসলমানি জ্যোতিষের ভিন্ন ভিন্ন ভাগের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। প্রধান পাঁচটি এই :—

(১) সেহর্, (২) কাহানত্, (৩) স্থুম্, (৪) রমল্, এবং (৫) জফর্।

সেহ্র্ অর্থে কেবল জ্যোতিষ বুঝায় না, বরং ভেল্‌কী, বশীকরণবিদ্যা ইত্যাদি বুঝায়। কোনও দ্রব্য হারাইয়া গেলেও সেহরের দ্বারা খুঁজিয়া লওয়া হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি "সেহরের" দ্বারা জানিয়া কহে, তাহাকে সাহির্ কহে।

কোরাণে সেহরের কথা আছে। "গোসর্গে" (সুরতুল্ বকর) ঈশ্বর বলিতেছেন :—

"শয়তানেরা কাফের, (অবিশ্বাসী) তাহারা মনুষ্যকে ভেল্কী শিক্ষা দেয়, এবং যাহা হারুত ও মারুত স্বর্গ হইতে পাইয়াছেন, অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে কলহ করাইবার মন্ত্র।"

কহানৎ অর্থে শয়তানের সাহায্যে ভূত ও ভবিষ্যতৎ বলা। সহিবুখারিতে আবুহুরেরা বলিয়াছেন :—

"যখন ঈশ্বর স্বর্গ হইতে কোন আদেশ করেন, তাঁহার নিকটবর্ত্তী দূত তাঁহার নিম্নের দূতকে বলেন, এবং তিনি পুনরায় তাঁহার নিম্নের দূতকে বলেন, এবং তিনি পুনরায় তাঁহার নিম্নের দূতকে বলেন। এইরূপে ঈশ্বরাদেশ পরিচালিত হয়। শয়তানরা বড়ই দুষ্ট। তাহারাও সংবাদ পাইবার জন্য গোয়েন্দা লাগাইয়া রাখে। এমন কি, ঠিক যেমন একের পর এক স্বর্গীয় দূত ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিবার জন্য আছেন, ইহারাও সেই প্রকারে একের পরে এক শয়তান বসাইয়া রাখে। যখন এক স্বর্গীয় দূত অন্য দূতকে ঈশ্বরাদেশ বলেন, তখন ইহারা চুরি করিয়া শুনিয়া, শয়তানপরম্পরায় সংবাদ প্রেরণ করে।"

শয়তান বশীভূত করিয়া তাহার সাহায্যে অজ্ঞাত ঘটনা বলার নাম "কহানত্"। এই জন্যই ইহার আর এক নাম "ইলম্-ই-সিফলি," অর্থাৎ "ভূতের বিদ্যা"। যে ব্যক্তি কহানৎ দ্বারা ভূত ও ভবিষ্যৎ বলে, তাহাকে "কাহিন্" কহে। কাহিন্ একটি সত্যের সহিত এক শত মিথ্যা মিশাইয়া লোককে বলিয়া থাকে।

শয়তানরা স্বর্গের সংবাদ চুরি করে বলিয়া ঈশ্বর তাহাদিগকে শাস্তি দিয়া থাকেন। কোরানে এক স্থানে ঈশ্বর বলিতেছেন :—

"যদিও আমি স্বর্গ উত্তমরূপে রক্ষা করি, তথাপি শয়তানেরা স্বর্গ হইতে সংবাদ চুরি করে, এবং আমি তাহাদের নক্ষত্র ছুঁড়িয়া আঘাত করি।"

ইহাই বোধ হয় ইসলাম ধর্ম্ম মতে "তারা খসার" ব্যাখ্যা। আমাদেরও বজ্রের অর্থ প্রায় এইরূপ।

বশীভূত শয়তানকে মুয়াকিল্ কহে। অনেকের বোধ হয় মনে আছে যে, প্রায় কুড়ি বৎসর হইল, কলিকাতায় হোসেন খাঁ নামক একজন ঐন্দ্রজালিক আসিয়াছিল, এবং অনেক রকম ভেল্কী দেখাইয়া পিশাচসিদ্ধ বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল।

নুজুম্ বলিলে সচরাচর সকল প্রকার জ্যোতিষই (astrology) বুঝায়। জ্যোতিষীকে মুনজ্জিম্ অথবা নুজুমী কহে।

কোরানে হারূত্ মারূতের বিষয় এবং শয়তানের স্বর্গ হইতে সংবাদ চুরির বর্ণনা ভিন্ন আর জ্যোতিষের কথা নাই। কয়েক স্থানে "নুজুম" শব্দ অবশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার অর্থ জ্যোতিষ নহে; কেবল নক্ষত্র অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

মহম্মদের সময়ে, অজ্ঞাত বিষয় জানিবার সকল প্রকার উপায়কেই "নুজুম" বলিত, অর্থাৎ নুজুম ও সেহ্‌র্ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যা ছিল না।

প্রসিদ্ধ আবুদাউদ ইবন-ই-মাজা ও মুস্‌নদ-ই-আহমদের মতে, মহম্মদের ভ্রাতুষ্পুত্র ইবন-ই অব্বাস্ বলিয়াছেন যে, তিনি মহম্মদের মুখে শুনিয়াছেন :—

"যিনি নুজুম হইতে এক বিদ্যা শিক্ষা করিলেন, তিনি সেহরের এক শাখা শিক্ষা করিলেন।"

উল্লিখিত হদিসে, প্রসিদ্ধ লেখক রজিন এই হদিসটি যোগ করিয়াছেন :—

"মুনজ্জিম্ হয় কাহিন, এবং কাহিনকে সাহির কহে, এবং সাহির হয় কাফের।"

এখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীন কালেও নুজুম বলিলে কহানৎ, সেহর প্রভৃতি সকল প্রকার জ্যোতিষই বুঝাইত। এখনও সচরাচর তাহাই বুঝায়; যদিও পণ্ডিতেরা নুজুম বলিলে, জ্যোতিষের এক অংশ মাত্র বুঝেন।

হদিসে নুজুমের বিরুদ্ধে আরও অনেক বচন আছে। বচনগুলি ক্রমে ক্রমে লেখা যাইতেছে।

মুসলমান পণ্ডিতগণের নুজুমের বিপক্ষে মত দিবার প্রধানতঃ দুইটি কারণ :—

১ম। ইসলাম ধর্ম্ম মতে কেবল একমাত্র ঈশ্বরই ভবিষ্যৎ (ঘয়েব) বলিতে পারেন, সুতরাং জ্যোতিষে বিশ্বাস করিলে কাফর হইতে হয়।

২য়। গণনা ঠিক হয় না।

এহিয়া উল্ উলুম্ নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে এইরূপ আছে। হজরত সুলেমান্ এক দিন অশ্ব ক্রয় করিতে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। অপরাহ্নের নমাজ পড়িতে মনে ছিল না। ইতিমধ্যে সূর্য্য অস্ত গেল। তাঁহার অত্যন্ত রাগ হইল। তিনি ঘোড়া গুলিকে মারিয়া ফেলিলেন। (ইনিই কি ইংরাজের Solomon the wise ?) শাস্ত্রমতে উপযুক্ত সময়ে নমাজ না পড়াতে পাছে পাপ হয়, এইজন্ত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন, যাহাতে আকাশ ফিরিয়া আইসে। মুসলমানের বিশ্বাস যে, পৃথিবী এক স্থানেই আছে, এবং আকাশ পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে, আকাশে সূর্য্য প্রভৃতি যেন গাঁথা আছে। ঈশ্বরের আদেশানুসারে, আকাশ, হজরত সুলেমানের নমাজ পড়িবার জন্য ফিরিয়া আসিল। সূর্য্যকে পাইয়া, সুলেমান নির্ব্বিঘ্নে নমাজ সমাপ্ত করিলেন।

আকাশ ফিরিয়া আসাতে নক্ষত্রাদিতে সব গোলমাল হইয়া গেল, সুতরাং নুজুম অর্থাৎ নক্ষত্রাদির গণনায় যে বিভ্রাট ঘটিবে, তাহা আর বিচিত্র কি ? হজরত সুলেমানের সময়ে এই বিভ্রাট ঘটে। মহম্মদ তাহার প্রায় এক সহস্র বৎসর পরে জন্ম গ্রহণ করেন। মহম্মদের জন্মের পূর্ব্বে নুজুমীরা বলিয়াছিলেন যে, পেগম্বর শীঘ্রই দেখা দিবেন। তাহাই হইল। কেবল যে গণকেরা যাহা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তাহাই হইল, এমন নহে ; বরং স্বয়ং মহম্মদ অনেক সময়ে বলিয়াছেন, "দৈববাণী হইয়াছিল যে পেগম্বর আসিতেছেন, আমিই সেই পেগম্বর।"

ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, সুলেমানের সময়ে আকাশবিভ্রাটে নুজুমের বিশেষ কোনও ক্ষতি হয় নাই ; এবং স্বয়ং মহম্মদ এ কথা প্রকারান্তরে মানিয়াছেন।

ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন যে, সুলেমানের সময়ের আকাশবিভ্রাটে গণনার যাহা ক্ষতি হইয়াছিল, পেগম্বরের জন্মোপলক্ষে, ঈশ্বর তাহা দোরস্ত করিয়াছেন, এবং সেই জন্য মহম্মদের আবির্ভাবগণনা ঠিক হইয়াছিল, এবং মহম্মদও তাহা সত্য বলিয়া মানিয়াছিলেন।

কিন্তু আর এক আকাশবিভ্রাট ঘটে ; ইহা মহম্মদের সময়ে। সেই জন্য নুজুম মিথ্যা হইয়া গিয়াছে।

এবারও বিভ্রাটের কারণ নমাজ। এক দিন মহম্মদ, তাঁহার জামাতা হজরত আলির ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া, নিদ্রা যাইতেছিলেন। আলি দেখিলেন

যে, অপরাহ্ণ নমাজের সময় অতিবাহিত হইয়া যায়; কিন্তু কি করেন, একে শ্বশুর, তাহে পেগম্বর, সুতরাং তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করাও মহাপাপ। তিনি উভয় সঙ্কটে পড়িলেন। নমাজভঙ্গও পাপ, মহম্মদের নিদ্রাভঙ্গও পাপ। হজরত আলি এই বিষম সমস্যার মীমাংসা করিতে পারিলেন না। হজরত সুলেমানের সময়ের বিভ্রাটেও সূর্য্যদেবের বোধ হয় আক্কেল্ হয় নাই; এবারও তিনি হজরত আলির নমাজের প্রতীক্ষা না করিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। হজরত আলি, পাপ হইল ভাবিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পেগম্বরের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি জামাতাকে প্রবোধ দিলেন, এবং আকাশকে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ করিলেন। সূর্য্যদেব তৎক্ষণাৎ ফিরিলেন, এবং হজরত আলি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে শ্বশুরকে ধন্যবাদ দিলেন, এবং প্রসন্নচিত্তে নমাজ পড়িলেন।

আরব্য, পারস্য প্রভৃতি মুসলমান দেশের সম্রাটেরা প্রায় সকলেই মুনজ্জিম কাছে রাখিতেন। রমল্ পাঁচ সহস্র বৎসর অপেক্ষাও অধিক পুরাতন। ইদ্‌রিস্ নামক নবি, যিনি আদম (Adam) এবং নুহের (Noah) মধ্যবর্ত্তী ছিলেন, ইহার আবিষ্কার করেন। ইহা জলপ্লাবনের (Deluge) পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হয়। রমল একটি আর্ব্বী শব্দ। ইহার অর্থ বালুকা। ইদরিস বালুকার উপর গণনা করিয়া ভূত ও ভবিষ্যৎ বলিতেন বলিয়া, এই শাস্ত্রের নাম রমল্ হইয়াছে। রমলের গণনা দাঁড়ি এবং বিন্দু দ্বারা হয়, যথা — ⸫ ⸬ ইত্যাদি।

যে ব্যক্তি রমল গণনা করে, তাহাকে রম্মাল্ কহে। ভারতবর্ষে রমল খুব প্রচলিত। প্রত্যেক নগরেই দুই চারি জন রম্মাল দেখিতে পাওয়া যায়।

জফর, আর্ব্বী অথবা অন্য কোনও ভাষার অক্ষর দ্বারা এক প্রকার গণনা। স্বয়ং মহম্মদের জামাতা হজরত আলি ইহার আবিষ্কার করেন। টুনিস্, এবং মক্কার পশ্চিমের সমস্ত মুসলমান দেশে জফর প্রচলিত আছে। ভারতবর্ষের শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যেও জফর বিশেষ প্রচলিত। জফরের প্রধান গ্রন্থকার মহি-উদ্-দিন্ ইবন্-ই-অরবি উন্দলুসির (স্পেনবাসী) নাম মুসলমান জ্যোতিষীমাত্রেই অবগত আছেন।

জ্যোতিষবিষয়ে দুই একটা শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে, কোরাণের মতে, যে নুজুমে বিশ্বাস করে, সে কাফের।

হদিসে জ্যোতিষের বিষয়ে অনেক কথা আছে। প্রধান গুটিকতক মত

এখানে দেওয়া যাইতেছে। ইহা হইতে সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, জ্যোতিষের অনুকূল ও প্রতিকূল, উভয় প্রকার মতই হদিসে পাওয়া যায়।

সহি মুসলিমের মতে, মহম্মদের শ্যালক মুয়াবিয়া বলিয়াছেন, "আমরা অজ্ঞতা-বশতঃ কাহিনের কাছে গিয়া থাকি।" পেগম্বর উত্তর করিলেন, "ওখানে যাইও না।" মুয়াবিয়া কহিলেন, "আমাদের মধ্যে কেহ কেহ দাঁড়ি ও বিন্দু দিয়া রমল করে।" মহম্মদ উত্তর করিলেন, "এক জন নবি ছিলেন (ইদ্রিস্) যিনি রমলের জন্য ঐ প্রকার দাঁড়ি টানিতেন; যে তাঁহার মত দাঁড়ি টানে, সে ঠিক বলে।"

এখানে দেখা যাইতেছে যে, মহম্মদ কহানত মন্দ বলিলেন, কিন্তু রমলের সমর্থন করিলেন।

কিন্তু সুনান্-ই-আবুদাউদ্ বলেন যে, কবিসা বলিয়াছেন যে, তিনি পেগম্বরের নিকট শুনিয়াছেন,—রমল পৌত্তলিকের কার্য্য।

সহি বুখারি ও সহি মুসলিমে আছে যে, মহম্মদ তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী আয়েশাকে বলিয়াছিলেন, কাহিনেরা অপদার্থ, যদি এক শতের মধ্যে একটা সত্য হইয়া পড়ে, উহা শয়তানের চুরি-করা সংবাদ।

সহি মুসলিমের মতে মহম্মদ বলিয়াছেন যে, যদি কেহ কোনও দ্রব্য হারাইলে "অর্রাফ" অর্থাৎ "জ্ঞানের" বাড়ি যায়, তাহা হইলে তাহার চল্লিশ দিনের নমাজ পণ্ড হয়। মুসলমান প্রতিদিন পাঁচবার নমাজ পড়ে, সুতরাং চল্লিশ দিনের নমাজ মাটি হওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে; অর্থাৎ দুই শত নমাজ জরিবানা।

সুনান্-ই-আবু দাউদ্ এবং মুস্নদ্-ই-আহমদের মতে, যে কাহিনের বাড়ী যায়, এবং বলে যে, কহানত সত্য, সে আর মুসলমান থাকে না, অর্থাৎ কাফের হইয়া যায়।

হদিসের মধ্যে যে গুলিকে ঈশ্বরাদেশ জ্ঞান করা হয়, তাহাকে বলে হদিস্-ই-কুদ্সি। সহি বুখারি এবং সহি মুসলিমে এই হদিস্-ই-কুদ্সিটি আছে;—

"ঈশ্বর বলেন যে, মনুষ্য দুই প্রকার;—ধার্ম্মিক এবং অধার্ম্মিক। যে বলে; ঈশ্বরেচ্ছায় বৃষ্টি হইল, সে ধার্ম্মিক; এবং যে বলে যে,—অমুক নক্ষত্র উদয় হইয়াছে বলিয়া বৃষ্টি হইল, সে (কাফের) অধার্ম্মিক।"

নসই বলেন,—মহম্মদ বলিয়াছেন যে, পৃথিবীতে এমন ভয়ানক কাফেরও

আছে যে, যদি পাঁচ বৎসর অনাবৃষ্টি হয়, তথাপি তাহারা সাধু হয় না। পাঁচ বৎসরের পরে বৃষ্টি হইলে বলিবে, যে, অমুক নক্ষত্রের দরুন বৃষ্টি হইল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে,—সেহর অর্থে ভেল্কী, বশীকরণবিদ্যা ইত্যাদি বুঝায়। ক্রমে ঐ সকল বিষয়ের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রী[illegible]মোহন মিত্র।

কলুঙ্গার যুদ্ধ।

(আরম্ভ)

গত কার্ত্তিকের সাহিত্যে 'নালাপানি' সম্বন্ধে দুই একটি সাধারণ কথা পাঠকগণের গোচর করিয়াছি, এবং সেই প্রবন্ধের উপসংহারে উল্লেখ করিয়াছি যে, গত শতাব্দীর প্রথমে এখানে এক ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, ভারতের ইতিহাস-প্রণেতৃগণ এই যুদ্ধ সম্বন্ধে কোনও কথার উল্লেখ করেন নাই; কিন্তু ঐতিহাসিকের উচ্চ সিংহাসনের প্রতি বর্ত্তমান লেখকের লোভ না থাকিলেও, এই প্রবন্ধে সেই যুদ্ধ ব্যাপারের একটি বিবরণ প্রকাশ করা, বোধ করি, বাহুল্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

কি কারণে ইংরেজদিগের সহিত গুর্‌খা জাতির বিবাদের সূত্রপাত হয়, তাহা এখানে সবিস্তারে বর্ণনা করা অনাবশ্যক; কারণ যাঁহাদের অবগতির জন্য এ প্রস্তাব লিখিত হইতেছে, তাঁহারা নেপালের ইতিহাস এবং নেপাল-যুদ্ধের বিবরণ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ নহেন। সংক্ষেপে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পূর্ণিয়া, ত্রিহুত, সারণ, গোরক্ষপুর এবং বেরিলী জেলার উত্তর সীমান্ত প্রদেশে, এবং শতদ্রু ও যমুনা নদীর মধ্যবর্ত্তী রক্ষণাধীন রাজ্যসমূহে, গুর্‌খাগণ প্রায় সর্ব্বদাই অত্যাচার করিত; এই সকল অত্যাচারনিবারণই গুর্‌খা যুদ্ধের উদ্দেশ্য; ইহাই মুখ্য কারণ, তবে গৌণ কারণও যে কিছুঃছিল না, এমন নহে।

অনেকেই কলিকাতা সহরে নেপালী গুর্‌খা দেখিয়াছেন। ইংরাজদিগের কয়েকটি গুর্‌খা রেজিমেণ্টও আছে। ইহারা বলিষ্ঠ, খর্ব্বাকার, স্থূলদেহ এবং অত্যন্ত কার্য্যকুশল; অসভ্য হইলেও ইহারা সত্য ও বীরত্বের সম্মান রক্ষা করিতে জানে। এমন বিশ্বস্ত বন্ধু, অথবা প্রবল শত্রু, অন্য জাতির মধ্যে কদাচ দেখা যায়। ইহারা তরবারি লইয়া যুদ্ধ করিতে ভালবাসে, কিন্তু "খুক্‌রী"

ইহাদের জাতীয় অস্ত্র ; থুকরীর গঠন ছোরার ন্যায় ; দেখিতে ক্ষুদ্র হইলেও থুকরীগুলি এমন তীক্ষ্ণধার, এবং থুকরীধারী এমন ক্ষিপ্রহস্ত যে, চক্ষুর নিমেষেই, এক আঘাতে তাহারা শত্রুশির দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলে। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্বে ধনুর্ব্বাণেরও প্রচলন ছিল।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ ও গুরখা জাতির মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইবার সময়ে, নেপালের সৈন্যসংখ্যা ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাজার ছিল ; সৈন্যগণ য়ুরোপীয় প্রথায় শিক্ষিত হইতেছিল, এবং তাহাদের নায়কগণও "কর্ণেল," "মেজর" "ক্যাপ্‌টেন্" প্রভৃতি নামে অভিহিত হইত।

গুরখা-যুদ্ধের অব্যবহিত কারণ অনেক পাঠকের অজ্ঞাত থাকিতে পারে, অতএব এ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মে, হঠাৎ একদল গুরখা সৈন্য ইংরেজদিগের ভুতোয়ালের থানা আক্রমণ করে, এই দলের অধিনায়কের নাম মানরাজ ফৌজদার। থানার ১৮ জন কনেষ্টবল হত এবং ছয় জন আহত হয়। থানার দারোগাকেও ফৌজদারের সম্মুখে নৃশংসরূপে নিহত করা হয়।

উদ্ধত এবং অশিক্ষিত গুরখা-সৈন্যগণের দ্বারা এরূপ হত্যাকাণ্ড হওয়া নূতন কিম্বা আশ্চর্য্য নহে। কোষে তরবারি বদ্ধ রাখিয়া ধীরভাবে ডাল-রুটীর শ্রাদ্ধ করা আমাদের চক্ষে অতি আরামজনক বলিয়া বিবেচিত হইলেও, এই যুদ্ধপ্রিয় জাতি এরূপ নির্ব্বিরোধ জীবন বহন করা অতি বিড়ম্বনাপূর্ণ বলিয়া মনে করে ; শুধু গুরখা বলিয়া নহে, পঞ্জাব রাজ্যের পতনের ইহাই প্রধান কারণ। যতদিন একচক্ষু, রাজনীতিকুশল পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহ জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি দুর্দ্দান্ত খালসা সৈন্যগণকে প্রশমিত রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আর কেহ তাহাদের উপযুক্ত নেতা ছিল না ; এ দিকে অবিরাম শান্তি উপভোগে তাহাদের যুদ্ধ-পিপাসা বৃদ্ধি পাইতেছিল—শতদ্রু পার হইয়া তাহারা ইংরেজের ধনধান্যপূর্ণ লোহিত সীমা আক্রমণ করিল। অবিলম্বে নেতৃহীন বিশাল খালসা-বাহিনী বায়ুপ্রবাহে তৃণের ন্যায় উড়িয়া গেল, পঞ্জাবের সৌধ-চূড়ায় বৃটিশ-পতাকা উড্ডীন হইল।

ইতিহাসে এক ব্যাপারই অনেক বার পুনরাবৃত্ত হয়। অন্ধকূপ-হত্যাকাণ্ড ভীষণ ও রোমাঞ্চকর বটে, মেকলে সাহেবও ক্লাইবের জীবনীতে তাহার সহিত কাহারও তুলনা হইতে পারে না বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু এই অন্ধকূপহত্যা অপেক্ষাও ভয়ানক ব্যাপার গুরখাদিগের দ্বারা সম্পন্ন হই-

য়াছে; নেপালরাজ পৃথ্বিনারায়ণের ভ্রাতা, স্বরূপ রতন এক বার কীর্ত্তিপুর নামক গ্রাম আক্রমণ করেন। গ্রামবাসীগণ বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক কিছু দিন আত্মরক্ষা করে; অবশেষে তাহারা স্বরূপ রতনের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত হয়; কিন্তু স্বরূপ রতনকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইল যে, তিনি তাহাদের জীবনের উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না। কিন্তু স্বরূপরতন অবশেষে প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন না; গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের প্রাণ-দণ্ডের বিধান হইল, এবং গ্রামবাসী বালক বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোক সকলেরই নাসিকা ও জিহ্বা কর্ত্তন করিবার আদেশ প্রদত্ত হইল। এই কর্ত্তিত জিহ্বা ও নাসিকা দ্বারা গ্রামের লোকসংখ্যা স্থির করা হইয়াছিল, এবং এই বীর-গৌরব চিরস্মরণীয় করিবার জন্য, গ্রামের পূর্ব্ব নামের পরিবর্ত্তন করিয়া, "নাসকাটাপুর" এই নাম প্রদত্ত হইল। ভুতোয়ালের থানা ধ্বংসের কাহিনী বা দারোগার হত্যাকাণ্ড, এই প্রকার পৈশাচিক ব্যাপারের সহিত তুলনায় অতি সামান্য।

ভুতোয়ালের থানা বিধ্বস্ত হইলে, ইংরেজগণ ইহার প্রতিবিধানে সহসা অগ্রসর না হওয়ায়, ইহারা আর একটি থানা আক্রমণ করিয়া, আরও অনেক-গুলি লোককে নিহত করিল। এ সময় ইংরাজগণ এই অত্যাচারের প্রতিশোধ দিতে উৎসুক হইলেও, বর্ষাকাল আসিয়া পড়ায় তাঁহারা কার্য্যতঃ কোন উপা-য়ই অবলম্বন করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, এ সমস্ত কথা উত্থাপন করিয়া, ভারতবর্ষের তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড ময়রা, নেপালরাজকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তদুত্তরে নেপালরাজ বৃটিশ-সিংহকে এমন উদ্ধত উত্তর প্রেরণ করিয়াছিলেন যে, ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করা হইল।

দানাপুর, বারাণসী, মিরট ও লুধিয়ানা হইতে চারি দল সৈন্য সজ্জিত হইল; মেজর জেনারল জিলেস্পাই মিরট হইতে সজ্জিত সৈন্য দলের অধিনায়ক হইলেন। প্রথমে এই দলে সর্ব্বসমেত ৩৫১৩ জন সৈন্য ও ১৮টি কামান ছিল, কিন্তু অবশেষে এই দলের আরও বলবৃদ্ধি হইয়াছিল।

স্থির হইল, জিলেস্পাই-এর সৈন্যশ্রেণী প্রথমে শিভালিক পর্ব্বত অতিক্রম পূর্ব্বক দেরাদুনে উপস্থিত হইবে, তাহার পর বিরোধীগণের বল ও অবস্থা অনু-সারে, হয় শ্রীনগরে অমরসিংহের থানার বিরুদ্ধে যাত্রা করিতে হইবে, নয় লুধিয়ানা হইতে জেনারেল অক্টরলোনী যে সেনাদল লইয়া অগ্রসর হইতে-ছিলেন, সেই দলের সহিত সম্মিলিত হইয়া নাহানে অমরসিংহের পুত্র রণজয় সিংহকে আক্রমণ করিতে হইবে।

এ দিকে রাজপ্রতিনিধি তদানীন্তন দিল্লীর রেসিডেন্ট মেটকাফ সাহেবকে গড়োয়ালের নির্ব্বাসিত রাজা সুদর্শন সার কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে অনুমতি করিলেন; তদনুসারে রেসিডেন্টের সহকারী ফ্রেসার সাহেব হরিদ্বার প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া দেরাদূনে তৃতীয় সৈন্যদলে (মিরটের দলে) যোগ দিলেন। এই দল সাহারানপুর হইতে বাহির হইয়া মোহনপাশের ভিতর দিয়া দেরাদূনে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে সময় পথ এতই কদর্য্য ছিল যে, খিরির সহৃদয় জমীদারগণ বিশেষ সাহায্য না করিলে বৃটীশ সৈন্যগণকে অনেক কষ্ট স্বীকার করিতে হইত। দেশীয় রাজন্যবর্গের সাহায্যে ইংরেজগণ এইরূপ অনেকবারই আশাতীত ফল লাভ করিয়াছেন, অনেক যুদ্ধে গবর্মেণ্ট জানিতে পারিয়াছেন, দেশীয় রাজগণ প্রাণপণে তাঁহাদের সাহায্য করেন, এবং সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহারা সকল অসুবিধা সহ্য করেন, কিন্তু কৃতজ্ঞ গবর্মেণ্ট এজন্য অনেক দিন হইতেই দেশীয়দিগকে রাজভক্তিহীন বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছেন।

যাহা হউক, অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া, ২৪শে অক্টোবর ইহারা দেরাদূনে উপস্থিত হইল। শীতকাল। প্রকৃতিদেবী তখন হিমালয়ের পাষাণ দেহে স্তরে স্তরে তুষাররাশি ঢালিয়া রাখিয়াছিলেন, প্রচণ্ড শীতে এবং প্রচুর খাদ্যদ্রব্যের অভাবে সৈন্যদলের বিশেষ কষ্ট হইতেছিল—কিন্তু এই কষ্ট সহ্য করিয়া থাকা ভিন্ন তাহাদের উপায় ছিল না। এই সময়ে রাজপুরের দক্ষিণ পূর্ব্বে,—দেরাদূনের ঠিক উত্তর পূর্ব্বে ৩॥০ মাইলের মধ্যে নালাপাণির পাহাড়ের উপর অমরসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র বলভদ্র সিংহ সামান্য একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছিল। তাহার সঙ্গে অধিক লোক ছিল না; এই দুর্গের প্রতি বৃটীশ সেনানায়কের দৃষ্টি পতিত হইল।

কিন্তু এই দুর্গ জয় করা সহজ নহে। দুর্গ যে অজেয় এবং দুর্ভেদ্য, তাহা নহে; কিন্তু এই দুর্গের সন্নিকটবর্ত্তী হওয়া—বিশেষতঃ সেই শীতকালে,—ভয়ানক, দুঃসাধ্য ব্যাপার। পাহাড় এমন সোজা যে, তাহার গাত্র বহিয়া অতি কষ্টে পথ করিয়া লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সে পথে এককালে অধিক লোক উঠিবার সম্ভাবনা নাই। ইহার উপর দুর্গপ্রান্ত হইতে নিম্নের সমতল ভূমি পর্য্যন্ত ভয়ানক জঙ্গল এবং কণ্টকের অরণ্য,—ইহারা দুর্গবাসীর প্রহরীর ন্যায় কার্য্য করিত। আমি যখন দেখিয়াছি, সে সময় সেখানে দুর্গম অরণ্য ছিল না, এবং পর্ব্বতে উঠিবার পথ ভাল না হইলেও দুরারোহ ছিল না। কিন্তু এখানে দেখি-

বার আর কিছুই নাই। এমন কি, দুর্গের ভগ্নাবশেষও আর দেখিতে পাওয়া যায় না, সেগুলি কালক্রমে পাহাড়ের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, এবং নিবিড় জঙ্গলে তাহা সমাচ্ছন্ন; তাহা দেখিয়া কে বলিতে পারে, এক দিন এই শৈল-শিখরে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল? যতই ক্ষুদ্র হউক, যে কয়টি স্বাধীনতা-প্রিয় মানব-প্রাণ এখানে আপনাদিগের হৃদয়-শোণিত নিঃসারিত করিয়াছিল, জগতের বীরত্বের ইতিহাসে তাহাদের নাম সন্নিবদ্ধ হইবার যোগ্য। কিন্তু সে কাহিনী এখন স্বপ্নপ্রায়,—গৌরবের সেই শ্মশান এখন অরণ্যে সমাচ্ছন্ন! হায়, মানব-গৌরব, দুই দিনেই তাহা এইরূপে অন্ধকারে বিলীন হইয়া যায়।

এই স্থানে দুর্গ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। দুর্গ বলিলে অনেকের মনে কলিকাতার কিম্বা দিল্লী ও আগ্রার দুর্ভেদ্য, সুকৌশলনির্ম্মিত, সমুন্নত দুর্গশ্রেণীর কথা উদিত হইবে। নালাপাণি, বা ইতিহাসে যাহাকে কলুঙ্গা বলে, সে স্থানে যে দুর্গ স্থাপিত ছিল, তাহাকে এ হিসাবে "দুর্গ" আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে না। দুর্গ বলিলে পাঠকের মানস-পটে যে যে চিত্র ফুটিয়া উঠে—নালাপাণিতে তাহার কিছুই ছিল না। হিমালয়ের অগণ্য প্রস্তরখণ্ড চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, চতুর্দ্দিকে প্রকাণ্ড শালবৃক্ষসমূহ যুগাতীত কাল হইতে অটলভাবে সমুন্নত মস্তকে অবস্থিত রহিয়াছে। এই প্রস্তরখণ্ড এবং এই শালবৃক্ষশ্রেণী, এই উভয় উপাদানে এই দুর্গ নির্ম্মিত। শালবৃক্ষের বেষ্টনী—আর তাহার পার্শ্বে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড দ্বারা প্রকাণ্ড প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছে। এই প্রাচীরপরিবেষ্টিত স্থানের মধ্যে বীর বলভদ্র সিংহ ইংরাজের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন।

২৪শে অক্টোবর জিলেস্পাইর সৈন্যদল দেরাদুনে পৌঁছে; তিনি সে সময় স্বয়ং উপস্থিত হইতে পারেন নাই, সৈন্য পরিচালনের ভার কর্ণেল মৌলি সাহেবের উপর প্রদত্ত হইয়াছিল। শীত ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছিল, এবং খাদ্যদ্রব্যও বিশেষ সহজপ্রাপ্য ছিল না—সুতরাং শীতে সৈন্যগণকে অবসন্ন না করিয়া, প্রথম উদ্যমেই তিনি যুদ্ধ ব্যাপার শেষ করিবেন, স্থির করিলেন;—বিশেষতঃ, একটি অসভ্য, পার্ব্বত্য-পল্লীর ভূস্বামীকে পরাস্ত করিবার জন্য এতখানি আয়োজন, সেই সৈনিক পুরুষের নিকট কিঞ্চিৎ বাহুল্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল। অতএব সেই রাত্রেই কর্ণেল সাহেব বলভদ্রের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন, এবং তাহার সঙ্গে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিলেন যে, যদি পরদিন প্রত্যূষে

সে আত্মসমর্পণ না করে, তাহা হইলে তাহার মঙ্গল নাই, তোপমুখে তাহার আরণ্যদুর্গ উড়াইয়া দেওয়া হইবে। কর্ণেল মৌলি পর্ব্বতের নিম্নদেশ হইতেই এই দুর্গ দেখিয়া মনে করিয়াছিলেন, সামান্য ভয়প্রদর্শনমাত্রেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

কিন্তু সেই অসভ্য দুর্গস্বামী অটল ছিল, স্বাধীনতার অমৃতময় রসে তাহার বীরজীবন পুষ্ট হইয়াছে, মৃত্যুভয়ে সে ভীত হইল না; ইংরেজ-বীরের সদর্প ভ্রূভঙ্গি উপেক্ষা করিল। নিয়মিত সময়ে দূত প্রত্যাগমন করিয়া সবিনয়ে নিবেদন করিল, বলভদ্র সিং ঘোর অবজ্ঞাভরে পত্রখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে এবং বলিয়া দিয়াছে, ইচ্ছা হইলে ইংরাজ-সেনাপতি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন, সে জন্য সে ভীত বা পশ্চাৎপদ নহে। সেই সামান্য দুর্গের সামান্য অধিস্বামী বৃটিশ-সিংহকে এমন কথা বলিবে, ইহা কাহারও মনে হয় নাই; বিশেষতঃ,দেরাদুনেই যে গুরখাদিগের সহিত ইংরেজ সৈন্যের যুদ্ধ বাধিতে পারে, জিলেস্পাইর এ কথা একবারও মনে হয় নাই, সেই জন্য তিনি ধীরে ধীরে পশ্চাতে আসিতেছিলেন।

বলভদ্র সিংহের অবজ্ঞাপূর্ণ উত্তর পাইয়া কর্ণেল মৌলি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন; জিলেস্পাইএর অপেক্ষা না করিয়া পরদিন প্রভাতেই তিনি সমস্ত পথ ঘাট স্বচক্ষে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিলেন, এবং তাহার পর হস্তীপৃষ্ঠে কয়েকটি ক্ষুদ্রায়তন কামান রাখিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলেন, এবং "ফায়ার" করিতে অনুমতি দিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন. দুই চারি বার কামান গর্জ্জন শুনিয়াই পার্ব্বত্য মূষিকগণ ইংরাজের অমোঘ শক্তি বুঝিতে পারিবে, এবং পার্ব্বত্য বিবরে প্রবেশ করিবে, প্রকৃত যুদ্ধ বিগ্রহের আবশ্যক হইবে না। পূর্ব্ব হইতেই কর্ণেল সাহেবের এ ধারণা ছিল; কিন্তু দুর্গবাসীগণ ভয়ের অতি সামান্য চিহ্নও প্রকাশ করিল না। গম্ভীর তোপধ্বনি নিস্তব্ধ গিরি-উপত্যকায় পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনিত হইয়া শূন্যে মিশাইয়া গেল, দুই একটি বৃক্ষপত্র কম্পিত হইল, তরুশাখাসীন পক্ষিকুল এই অনভ্যস্ত শব্দে ভীত হইয়া উচ্চতর প্রদেশের অরণ্য মধ্যে আশ্রয় লইল। একখানি প্রস্তরখণ্ডও স্বস্থানচ্যুত হইল না, কামান-নিক্ষিপ্ত গোলা দুর্গপ্রান্তস্থ শালব্যূহের সামান্য অংশও ভেদ করিতে পারিল না। কর্ণেল সাহেব এ সংবাদ তৎক্ষণাৎ সাহরানপুরে জিলেস্পাই সাহেবের নিকট প্রেরণ করিলেন; পর দিন ২৬শে অক্টোবর প্রাতঃকালে জিলেস্পাই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন।

জিলেস্পাই সাহেব একবার চতুর্দ্দিক দেখিয়া আসিলেন; অনন্তর দুর্গ-আক্রমণের বন্দোবস্ত হইল। এই বন্দোবস্তে আরও দুই তিন দিন কাটিয়া গেল। নালাপাণি দুর্গের সম্মুখে প্রায় পাঁচশত গজ দূরে একটা সমভূমির উপর কামান-শ্রেণী সজ্জিত করা হইল, এবং সৈন্যদল চারি ভাগে বিভক্ত হইল; কর্ণেল কার্পেণ্টার, কাপ্তেন ফাষ্ট, মেজর কেলি এবং কাপ্তেন ক্যাম্বেল্—এই চারিজন সেনানায়কের অধীনে চতুর্দ্দিকে সৈন্য সন্নিবিষ্ট হইল; এই চারি দলে সৈন্যসংখ্যা আট শত; এতদ্ভিন্ন মেজর লড্‌লর অধীনে ৯৩৫ জন "রিজার্ভ" রহিল। স্থির হইল, এই চারি দল সৈন্য চারি দিক হইতে একই সময়ে নালাপাণি আক্রমণ করিবে, তাহা হইলে শত্রুপক্ষ কোন দিক রক্ষা করিবে বুঝিতে না পারিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িবে।

কিন্তু নিজের বুদ্ধি দ্বারা অন্যের বুদ্ধি আয়ত্ত করিতে যাওয়া, বিশেষতঃ আয়ত্ত করিয়াছি, এই সিদ্ধান্তে "লঙ্কাভাগ" করা সর্ব্বত্র নিরাপদ নহে। উপস্থিত ব্যাপারেও তাহাই হইয়াছিল; কিঞ্চিৎ বিবেচনার সহিত অনুধাবন করিলে জিলেস্পাই সাহেব বুঝিতে পারিতেন, এই কয় দিনের যুদ্ধায়োজনের মধ্যেও বলভদ্র সিংহ যে নির্ভীক ও সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, তাহার নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে, এবং দুর্গ আক্রমণ তিনি যেরূপ সহজ মনে করিয়াছিলেন, ইহা সেরূপ সহজ নহে; পথ দুরারোহ, কণ্টকারণ্যে সমাকীর্ণ; তাহার উপর দুই এক স্থানে প্রস্তরশ্রেণী এরূপ সুকৌশলে সজ্জিত ছিল যে, তাহার উপর দিয়া অগ্রসর হইতে কিছুমাত্র সন্দেহ হয় না, কিন্তু পদসঞ্চারমাত্রেই তাহা গড়াইতে গড়াইতে বহু নিম্নে পতিত হয়। সৈন্যদলের সুশিক্ষিত পদচালনা, অসীম সাহস ও বল, এবং অব্যর্থ অস্ত্রকৌশল কোনও ক্রমেই সে পতন হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে না। উদ্ধত বীর জিলেস্পাই হয় ত এত কথা বিবেচনার অবসর পান নাই; পাইলে সহসা চারিদিক হইতে দুর্গ আক্রমণ করিয়া মুহূর্ত্তে তাহা জয় করিবার আশা তাঁহার নিকট অসম্ভব বোধ হইত, হয় ত এই ভ্রমের জন্য অকালে তাঁহাকে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইত না।

এদিকে বলভদ্র সিংহের দুর্গ এমন সুকৌশলে নির্ম্মিত যে, সিঁড়ি ব্যতীত ভিতরে প্রবেশ করিবার উপায় ছিল না; চারি দিকে দুর্ভেদ্য পর্ব্বত যেন তাহার পাষাণ দেহ বৃদ্ধি করিয়া এই কয়টি স্বাধীনতাপ্রিয় মানবকে অক্ষয় কবচের ন্যায় রক্ষা করিতেছিল। এক দিকে একটি ক্ষুদ্র দ্বার ছিল বটে, কিন্তু সেই দিক সর্ব্বাপেক্ষা দুরারোহ; গগনস্পর্শী বিরাট শৈলশৃঙ্গ সে দিকে সরলভাবে

উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান; মনুষ্যনির্ম্মিত অগ্নেয়াস্ত্র তাহা বিদীর্ণ করিতে সক্ষম নহে, মনুষ্যের দুর্দ্দম স্পৃহা এবং দাম্ভিক বল দর্প তাহাতে আহত হইয়া চূর্ণ হইয়া যায়।

জিলেস্পাই সাহেব কতকগুলি সৈন্য লইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন, এবং কামান ছুড়িতে আদেশ করিলেন। কামানে ক্রমাগত অগ্নি উদ্গীরণ হইতে লাগিল; জ্বলন্ত, অগ্নিময় গোলকসমূহ মুহুর্মুহু বলভদ্র সিংহের দুর্গপ্রান্তে আসিয়া পড়িতে লাগিল, কিন্তু সেই প্রকাণ্ড বৃক্ষশ্রেণী এবং তাহার গাত্রস্থিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরের একখানিও স্থানচ্যুত কিম্বা ভিন্ন হইল না, দুই এক খানির কোনও কোনও অংশ ভাঙ্গিল মাত্র।

কামান ব্যর্থ দেখিয়া জিলেস্পাই সাহেব একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন, এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই আক্রমণ করিবার জন্য সঙ্কেত তোপধ্বনি করিলেন; কিন্তু দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ দল, হয় সেই সঙ্কেতধ্বনি শুনিতে পায় নাই, নয় নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে সেই শব্দ শুনিয়া তাহারা সঙ্কেতধ্বনি বলিয়া বুঝিতে পারে নাই, সুতরাং তাহারা অগ্রসর হইল না। কেবল কর্ণেল কার্পেণ্টারের সৈন্যদল ও রিজার্ভ ফৌজ বেলা নয়টার সময় অগ্রসর হইল। এতক্ষণ ইংরাজ সৈন্য যে স্থান হইতে গোলা বর্ষণ করিতেছিল, সে স্থান এত দুর্গম বা দুরারোহ ছিল না; কিন্তু এইবার তাহাদের অধিকতর ভয়ানক পথে অগ্রসর হইতে হইল। জিলেস্পাই এবার কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারিলেন যে, এই কার্য্য তিনি পূর্ব্বে যত সহজ মনে করিয়াছিলেন, ইহা তত সহজ নহে, আজ যুদ্ধ জয় করিতে অনেক সাহসী বীরের প্রাণ উৎসর্গ করিতে হইবে; তাহাও উত্তম, বলভদ্রের পার্ব্বত্য অধিকার আজ হস্তগত করিতেই হইবে, তাহার দুর্গে বৃটীশকেতন উড়াইতে না পারিলে বৃটীশ নামের গৌরব বিনষ্ট হইবে,—সাহস ও উৎসাহের সহিত জিলেস্পাই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে উৎসাহিত সৈন্যগণ সমস্ত কষ্ট তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া বীর দর্পে অগ্রসর হইতে লাগিল।

কিন্তু বিপদের উপর বিপদ, কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতে দুর্গ হইতে বৃষ্টিধারার ন্যায় অবিশ্রান্ত গুলি বর্ষণ হইতে লাগিল, এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব বিপদে সৈন্যগণ মুহূর্ত্তের জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল, কিন্তু পশ্চাৎপদ হইল না। যিনি তাহাদের অধিনায়ক,—ভয় কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেন না, সৈন্যগণও সেইরূপে শিক্ষিত হইয়াছিল, মুহূর্ত্তের জন্য তাহারা

নিশ্চল হইল বটে, কিন্তু পশ্চাৎগত [illegible] সেনাপতি নিষ্কাশিত অসি হস্তে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি আসিয়া পড়িতে লাগিল, দলে দলে ইংরাজ সৈন্য হত ও আহত হইতে লাগিল; কিন্তু হতাবশিষ্ট দল হটিল না, সমান বীরদর্পে দুর্গপ্রাকারের নিকটবর্ত্তী হইল।

সিঁড়ি ভিন্ন দুর্গে উঠিবার উপায় নাই। সঙ্গের সিঁড়ি তখনও পশ্চাতে। অল্প ক্ষণ পরে লেপ্টেনাণ্ট এলিস সিঁড়ি লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন, এবং সিঁড়ি বাহিয়া তিনিই সর্ব্বাগ্রে উপরে উঠিলেন। কিন্তু উপরে উঠিয়া তাঁহাকে আর দুর্গের ভিতরে অগ্রসর হইতে হইল না; বিপক্ষের বন্দুকের গুলি তাঁহার ললাটদেশ বিদ্ধ করিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার প্রাণহীন দেহ দুর্গমূলে পতিত হইল। যাহারা দুর্গপ্রাচীরের সমীপবর্ত্তী হইয়াছিল, তাহারা একটু হটিয়া আসিল।

কিন্তু জিলেস্পাই সাহেব "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" এই মূলমন্ত্র হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক এই যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন, লেফ্‌টেনাণ্ট এলিসের মৃত দেহ তখনও তাঁহার সম্মুখে, দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে বটে, কিন্তু হৃদয়শোণিত তখনও শীতল হয় নাই; সেই চিরনিদ্রিত বীরের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেন, তাঁহার আত্মার সদগতির জন্য একবার প্রার্থনা করিলেন, তাহার পর আহত সিংহের ন্যায় আবার অগ্রসর হইলেন। প্রতিহিংসার যে অগ্নি তাঁহার হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, এই ক্ষুদ্র গিরি-দুর্গকে দগ্ধ না করিয়া যেন তাহা নির্ব্বাপিত হইবে না।

জিলেস্পাই দুর্গের অতি নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, দুর্গ হইতে অধিকতর বেগে গুলি বর্ষিত হইতে লাগিল; সাহসী সৈন্যগণের অগ্রসর হইতে আপত্তি নাই, কিন্তু আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। দণ্ডায়মান হইয়া বীরের ন্যায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিলে যদি কার্য্যোদ্ধার হইত, তাহা হইলে তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিত। কিন্তু প্রাণ দান করিয়াও সর্ব্বদা কৃতকার্য্য হওয়া যায় না; মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত ইংরাজ সেনা ক্ষীণ হইতে লাগিল, হত ও আহত সৈনিকের স্তূপে সে স্থান পরিপূর্ণ হইয়া গেল, জয়লক্ষ্মী আজ ইংরাজের প্রতি অপ্রসন্ন।

কিন্তু জিলেস্পাই আজ দুর্জ্জয় পণ করিয়া যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছেন। ক্রমাগত সৈন্যধ্বংস হইতে দেখিয়াও তিনি নিরাশ হইলেন না, আজ তিনি জয় অথবা

মৃত্যু, এই উভয় কার্য্যের অন্যতরটির জন্ত কৃতসংকল্প। তিনি পুনর্ব্বার তর-বারী হস্তে হতাবশিষ্ট সৈন্তগণকে উৎসাহিত করিয়া সকলের অগ্রে চলিতে লাগিলেন; সহসা একটি জলন্ত গোলা আসিয়া তাঁহার বক্ষে পতিত হইল, তৎক্ষণাৎ তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। রিজার্ভ দলের অধিকাংশ সৈন্তই জীবন বিসর্জ্জন করিল; ইংরাজ সৈন্ত সম্পূর্ণ পরাস্ত হইয়া দেরাদূনে প্রত্যা-গমন করিল। অসহিষ্ণু জিলেস্পাই তাঁহার অবিবেচনার প্রতিফল পাইলেন; বহুসংখ্যক নির্ভীক বীর অকারণে তাহাদের হৃদয়শোণিতে এই পাষাণময় গিরিতল অভিষিক্ত করিল।

সে দিনের মত যুদ্ধ বন্ধ হইল। কর্ণেল মৌলি "সিনিয়ার অফিসার", সুতরাং তিনিই সৈন্তাধ্যক্ষের পদে অভিষিক্ত হইলেন; কিন্তু তিনি বুঝিলেন, এই মুষ্টিমেয় সৈন্ত লইয়া পুনর্ব্বার এই দুর্গজয়ে অগ্রসর হওয়া বাতুলতা মাত্র। অতএব দলপুষ্টি না করিয়া আর এ কাজে হস্তক্ষেপ করা তিনি কর্ত্তব্য বোধ করিলেন না। Battering train এবং আরও অধিকসংখ্যক সৈন্তের জন্ত তিনি দেরা হইতে দিল্লীতে পত্র লিখিলেন, এবং তাহাদের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন; এই ভাবে এক মাস কাটিয়া গেল। এ দিকে বলভদ্র সিংহ বুঝিয়াছিলেন, সিংহ প্রতিশোধকামনায় সুযোগের অপেক্ষা করিতেছে; তিনিও দুর্গের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করিতে ও রসদ সংগ্রহে মনোযোগী হইলেন।

শ্রীজলধর সেন।

৺ কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

গত মার্চ্চ মাসের "ন্যাশনাল মেগাজিনে" * কৃষ্ণকমল গোস্বামী মহাশয়ের গীতি সম্বন্ধে আমার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। গোস্বামী মহাশয়ের নাম না জানেন, পূর্ব্ব বঙ্গে এমন লোক বিরল; কিন্তু কলিকাতা অঞ্চলে যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহাদের সংখ্যা বোধ হয় নখাগ্রে গণনা করা যায়।

কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গ তাঁহাকে চিনে। এ দেশে এমন শিশু নাই, যাহারা মাতৃ-

* "Love songs in Bengal";—*National Magazine, March, 1894.*

বঙ্গপালের মত মনে রাইউন্মাদিনী কি স্বপ্নবিলাসের দুই একটি দিব্য গীতি শ্রবণ করে নাই। সেই সুর সঙ্গীত যেন অশ্রুপূর্ণ; গাইতে গাইতে গায়কের চক্ষু জলে ভরিয়া আসে, শুনিতে শুনিতে শ্রোতার চক্ষে অশ্রু বহে। কলিকাতা অঞ্চলে যখন গোবিন্দ অধিকারী অনুরাগের লীলা দেখাইয়া শ্রোতৃগণকে মুগ্ধ রাখিয়াছিলেন, সেই সময়ে গোস্বামী মহাশয় প্রেমের বন্যায় পূর্ববঙ্গ ভাসাইতেছিলেন। গোবিন্দ অধিকারীর শব্দচাতুর্য্য, গোস্বামী মহাশয়ের উক্তিমাধুর্য্যের নিকট সম্পূর্ণ পরাজিত। যাঁহারা প্রেমিক, তাঁহাদিগের নিকট বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পরে, কৃষ্ণকমলের ন্যায় মধুবর্ষী পদকর্ত্তা আর দ্বিতীয় নাই।

কৃষ্ণকমল গোস্বামী বৈষ্ণববংশে জাত; বাড়ী নদীয়া জেলা, কৃষ্ণগঞ্জ থানার অধীন, ভাজনঘাট গ্রাম; কিন্তু পূর্ববঙ্গই তাঁহার কার্য্যভূমি ছিল; পূর্ববঙ্গেই তাঁহার অপূর্ব্ব স্বপ্নময় "স্বপ্নবিলাস", প্রেমের অমৃত-উৎস "দিব্যোন্মাদ" (রাই উন্মাদিনী) ও প্রেম-লীলা-বৈচিত্র্যপূর্ণ "বিচিত্রবিলাস," প্রেমের এই ত্রিধারার সঞ্চার হইয়াছিল। আজ ৮।১০ বৎসর হইল, তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি গোস্বামী মহাশয়ের নামে ভক্তগণের চক্ষু সলিলার্দ্র হয়। তাঁহার জীবন ও মরণ সম্বন্ধে কত অপূর্ব্ব কাহিনীই এ দেশে প্রচারিত আছে। আজও পূর্ব্ববঙ্গ কৃষ্ণকমলময়।

স্বপ্নবিলাস তাঁহার কবিত্বের প্রথম কীর্ত্তি, কিন্তু শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি নহে। কবি, প্রচলিত রুচি অনুসারে অনুপ্রাস যোজনা করিতে একটু ব্যস্ত ছিলেন। শব্দের মসৃণতা ও পরিপাট্যে বিশেষ লক্ষ্য থাকাতে, স্বপ্নবিলাস ভাবের হিসাবে কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

শব্দের দিকে দৃষ্টি রাখিলে প্রকৃত কবির প্রতিভা বাধা পায়। তাই স্বপ্নবিলাস সম্পূর্ণ বিকশিত কাব্য হয় নাই; ইহা একটি অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত কাব্যপ্রসূন। যে ভাব অতি মনোজ্ঞ ভাবে চিত্ত অধিকার করিতেছে, "স্বপ্নবিলাসে" তাহার সূচনা;—স্থলে স্থলে চিত্রগুলি র‍্যাফেল কি মাইকেল এঞ্জিলোর অঙ্কনযোগ্য হইয়াছে, কিন্তু সেই চিত্রগুলি এক পৃষ্ঠায় যেরূপ অঙ্কিত হইয়াছে, পর পৃষ্ঠায় তাহা রক্ষিত হয় নাই। যেন কি বিকশিত হইতে গিয়া অবিকশিত অবস্থাতেই লীন হইয়া যাইতেছে, বেহাগের মত কি এক অপূর্ব্ব রাগিণী গীত হইতেছিল, কি কারণে তাহা নীরব হইয়া গিয়াছে। অনুপ্রাসের দিকেই কবির দৃষ্টি, তাঁহার প্রতিভা-বিকাশের অন্তরায় হইয়াছিল।

তথাপি স্বপ্নবিলাস আমাদের আদরের বস্তু। ন্যাভিগ্রো ও ইনপেন্‌বুলিয়েলে। যেরূপ প্যারাডাইস-লষ্টের সূচনা, ভিনাস-এডোনিস যেরূপ রোমিও-জুলিয়েটের সূচনা, স্বপ্নবিলাস কাব্য তেমনি রাই-উন্মাদিনীর সূচনা; কিন্তু শুধু ভাবী কাব্যের সূচনা বলিয়াই স্বপ্নবিলাসের আদর নহে। স্থানে স্থানে ইহার ভাব অতি মনোজ্ঞ। রাধা তমাল দেখিয়া কৃষ্ণ ভ্রম করিলেন; স্ফুরিত কদম্বের ন্যায় তদ্দর্শনে তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল, গদ্‌গদ কণ্ঠে সখীদিগকে ডাকিয়া গাইলেন,—

ওই দেখ চরণে চরণ থুয়ে
ও যে ভুবনমোহন বেশে দাঁড়াইয়ে।
আমার যে অঙ্গ হ'ল ভারি
আমি যে আর চলতে নারি।

বিদ্যাপতির যে গানটি রাম বসু ভাঙ্গিয়া গড়িয়াছেন—সেই তমালের ডালে বাঁধিয়া রাখিবার কথা,—সখীগণ যেন মৃতদেহ না পুড়াইয়া ফেলে, কি যমুনাজলে বিসর্জ্জন না করে। কৃষ্ণকমলও স্বপ্নবিলাসে সেই গানটি বীণায় পুনরায় নিজ সুর বাঁধিয়া আলাপচারি করিয়াছেন। কিন্তু কৃষ্ণকমল শুধু অনুকরণকারী নহেন, প্রাচীন ভাবটি তিনি হাতে লইয়া নূতন করিয়া গড়িয়াছেন; তাহা এইরূপঃ—

"দেহ দাহন কোর না দহন দাহে
ভাসাও না কেহ যমুনাপ্রবাহে,
—সখীরে আমার শ্যাম-বিরহে পোড়া তনু,
———আমার শ্রীকৃষ্ণবিলাসের দেহ,
সব সহচরী, বাহু দুটি ধরি বাঁধিও তমাল-ডালে।
যদি এই বৃন্দাবন স্মরণ করি আসে গো আমার পরাণ হরি,
বঁধুর শ্রীঅঙ্গ-সমীর পরশে শরীর জুড়াইব সেই কালে,
বঁধু আসিয়ে সই, যদি শুধায় রাই কই?
তোরা দেখাস্ ওই, তোমার রাধা বাঁধা তমালে ওই,
হ'ল প্রেমময়ীর প্রেমের সহমরণ।"—স্বপ্নবিলাস।

ইহা গেল পুরাতন ভাব, কিন্তু

"মৃত তনু দেখিলে নয়নে আমার প্রাণবল্লভ গো,
পাছে সতীপতি শিবের মত হয়ে বঁধু উনমত্ত,
বহিয়ে বা ফিরে বনে বনে, তাই মনে ভাবি গো,
যে অঙ্গে চন্দনার্পণে, কত ভয় বাসি মনে
সে অঙ্গে ভার সহিবে কেমনে!"—স্বপ্নবিলাস।

এইটুকু নূতন। এই টুকু অতি অপূর্ব্ব, বিরহে রাধার প্রাণ যাইতেছে,

তথাপি কণ্ঠরে সে [illegible] নহে। নিঃস্বার্থ ভালবাসায় অবিশ্বাস আসিতে পারে না। যখন তুমি ভালবাসিয়া ভালবাসার বস্তুকে নির্দিষ্ট স্বার্থের সীমাবন্ধনীর মধ্যে বিহার করিতে আদেশ কর, তখন তোমার আত্মসুখ খুঁজিয়া বেড়াও মাত্র। লালসার ভালবাসায় সুখ নাই, লালসা হইতে হিংসা দ্বেষ ও অবিশ্বাসের সৃষ্টি, প্রকৃত ভালবাসা পৃথিবীর সার সামগ্রী, তাহা কষ্টের কারণ হইতে পারে না। রাধার মরণেও সুখ। রাধা অবিশ্বাস-বাণ-বিদ্ধ হইয়া মরিতেছে না; সে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে একবারও নিরাশ হয় নাই। বরং নিজে মরিলে বঁধু পাগল হইবেন,—মৃতের ভারে কোমলাঙ্গে ব্যথা হইবে, রাধার মরণকালে সেই ভাবনা।

স্বপ্নবিলাসের গানগুলি অনুপ্রাস-দোষে দুষ্ট হইলেও ভাবে সুন্দর, আমরা আর একটি গান উদ্ধৃত করিতেছি।

"আহা মরি! সহচরি কেন এ কিশোরীর
সুশর্ব্বরী প্রভাত হল,
ছিলেম নিদ্রাবেশে, দেখলেম স্বপ্নাবেশে
বঁধু অভাগিনীর বাসে এসেছিল।
হাসি হাসি আসি বসিয়া শিয়রে,
'উঠহে প্রেয়সি' বলে উচ্চৈঃস্বরে,
বঁধু যুগল করে, ধরি মম করে,
যেন সুধাকরে সুধা বরিষণ করে,
নিদ্রা কেন হ'ল ভঙ্গ, করি আমার সুখভঙ্গ,
ভঙ্গ হ'ল সখা সঙ্গ, সে ত্রিভঙ্গ কোথায় গেল?"

কৃষ্ণকমলের অপূর্ব্ব প্রেম অনুপ্রাসের বাধায় বাধ্য রহিল না। রাই-উন্মাদিনীতে ভাব ভাষার নিগড় ছিঁড়িয়াছে, এখানে কবির প্রতিভা মুক্ত, রচনা সরস। ভাষায় কৃত্রিম ভূষণ নাই, কিন্তু নগ্ন সৌন্দর্য্যের আধিক্য।

শুনিয়াছি, গোস্বামী মহাশয় স্বীয় আরাধ্য দেবতা হইতে রাই-উন্মাদিনী পালা দান পাইয়াছিলেন। এই কাব্যের সরসতায় মুগ্ধ হইয়া তাহাই বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়।

রাই-উন্মাদিনীতে অনুপ্রাস কিছু আছে,—কিন্তু তাহা স্বাভাবিক; কবির শ্রুতি যখন মধুর রসের কথায় সম্পূর্ণ অভ্যস্ত, তখন অনুপ্রাস স্বভাবে উদয় হয়; এ অনুপ্রাস চেষ্টা-সিদ্ধ নহে। রাধিকা মেঘদর্শনে মুগ্ধা, কৃষ্ণভ্রমে বলিতেছেন,—

ওহে তিলেক দাঁড়াও, দাঁড়াও হে,
অমন কোরে যাওয়া উচিত নয়।

দাঁড়াও হে দুখিনীর বঁধু তিলেক দাঁড়াও।
যে যার শরণ লয়, নিঠুর বঁধু, বঁধু, তারে কি বধিতে হয়?
এথা থাকৃতে যদি মন না থাকে,
তবে যেইও সেথাকে——
যদি মনে মন রত, না হয় মনের মত,
কাঁদলে প্রেম আর কত বেড়ে থাকে।
তাতে যদি তোদের জীবন না থাকে
না থাকে না থাকে, কপালে যা থাকে তাই হবে।
বঁধু যথা যে না থাকে,
তথা তাকে আর কোথা কে—ধোরে বেঁধে কবে রেখে থাকে।"

আমি চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ খানি ভাল করিয়া পড়িয়াছি। রাই-উন্মাদিনীর আশ্চর্য্য মূর্চ্ছাময় প্রেমের ভ্রান্তিময় স্বপ্নবৃত্তান্ত পড়িতে পড়িতে মনে হইল, যেন কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যচরিতামৃতের শেষ খণ্ডে যাঁহাকে আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, যে ছবির ইঙ্গিত মাত্রে রেখাঙ্কন করিয়া গিয়াছেন, রাই-উন্মাদিনীতে সেই চিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে। চটক পর্ব্বত দেখিয়া চৈতন্যের গোবর্দ্ধনভ্রান্তি, কুসুমবন দেখিয়া বৃন্দাবনভ্রান্তি, কৃষ্ণভ্রমে "জলদ নেহারি নয়নে ঝরু লোর"—সেই চৈতন্য-জীবন এক দিব্য ভ্রান্তির ছায়া। রাই-উন্মাদিনীর রাধিকাও তাই। মেঘদর্শনে তাঁহার করুণাত্মক বিলাপ পাঠ করুন, পরিত্যক্ত বৃন্দাবনপল্লী ও নিধুবন দেখিয়া রাধিকা স্বীয় প্রাণের অত্যুচ্ছ্বাসে জড়কে জীবন দিতেছেন, তাঁহার বিলাপাত্মক গীতিধারায় পাষাণ দ্রব হইতেছে, মলয়ে নিশ্বাস বহিতেছে। এই উদার সহানুভূতি-পরায়ণ জড় জগতে দণ্ডায়মানা, প্রেমে আত্মবিহ্বলা, উন্মাদিনী রাধিকাকে দর্শন করুন। আমি ইংরাজি সংস্কৃত কোনও গ্রন্থে এরূপ প্রেমের বিমুগ্ধ ছবি আর দেখি নাই। এই সাহসিক উক্তির জন্য সাহিত্যজগতে আমার দণ্ড হইলেও, নিজের মত অকাতরে ঘোষণা করিব।

যেমন রাধিকা, তেমনই চন্দ্রা। ঈর্ষাপরায়ণা চন্দ্রা শ্রীমতী রাধিকাকে ভাল করিয়া দেখে নাই। কিন্তু কৃষ্ণবিরহে যখন সমবেত সখীবৃন্দের মধ্যে রাধিকা মূর্চ্ছিতা, তখন চন্দ্রা আসিয়া একবার সেই দুঃখপূর্ণ ছবি দেখিল; দেখিয়া বলিল,—

"হায় একি বিপদ হেরি বিপিনে,
এ সব কনক পুতলি, পড়িয়াছে ঢলি,
বিপিনবিহারী শ্রীহরি বিনে।

সরোবরে যেন কমলিনী
মহাকাশে যেন ইন্দু প্রকাশ”—ইত্যাদি।

চন্দ্রা ইহার পূর্ব্বে রাধিকাকে ভাল করিয়া দেখে নাই—উন্মাদ তাই বলিল,

“আহা এতই রূপের রূপসী—
আমি নয়ন ভরে দেখি নাই নয়ন ভাবে,
ধনীর মিলন দশায় এতই রূপ,
না জানি ছিল ধনীর সুখের দশায় কত রূপ ;—
যখন বঁধুর বামে দাঁড়াইত, আবার হেসে হেসে কথা কৈত,
শ্যাম-গরবিনী গরব কৈরে গো,
তখন এই না মুখে মুখের কতই জানি শোভা হৈত।
তা নৈলে এমন হবে বা কেন গো—
বঁধু থেকে আমার গো বক্ষঃস্থলে
অমনি কেঁদে উঠত রাধা বলে।
হায় গো অতুল রাতুল কিবা চরণ দুখানি,
—চরণ-কমল হোতে সুকোমল গো কমলিনীর—
আল্‌তা পরাতো বঁধু কতই বাখানি।
—এ কোমল চরণে যখন চলিত হাঁটিয়ে
—ধনী বঁধুর দরশন লাগি গো অনুরাগে,
হেন বাঞ্ছা হতো তখন পাতিয়ে দেই হিয়ে।

রাধিকা যখন কৃষ্ণপ্রেমে মুগ্ধা, চন্দ্রা মনশ্চক্ষে তখনকারই চিত্র কল্পনা করিতেছে। অন্য সময়ে রাধিকাকে সুন্দরী বলে নাই। রাধিকা সুন্দরী ;— কিন্তু জুলিয়েট, এণ্ড্রামেকী, ডিডো, কে সুন্দরী নহে ? এ উদ্যানে ত সুন্দরের ছড়াছড়ি। পথে হাটে সুন্দরী। কিন্তু রাধিকার মত সুন্দরী কে ? কৃষ্ণ-প্রেমে রাধিকা সুন্দরী, তাই তাঁহার সৌন্দর্য্য স্মরণ করিয়া চন্দ্রা পাগলিনী, আর কত শত বৈষ্ণব কবি সেই সৌন্দর্য্যের একটি লহরী মাত্র বর্ণনা করিতে চেষ্টিত। এ সৌন্দর্য্য নিত্য, অবিনাশী। চন্দ্রা বাহিরের রূপ পূজা করিতেছে না, গুণীই গুণ চিনে, চন্দ্রাও রাধিকার মত রূপসী হইতে চেষ্টিতা, তাই সেই রূপ তাহার চক্ষে এত লাগিয়াছিল।

আর মৃতপ্রায় রাধিকা—শ্যামকুণ্ডের পার্শ্বে শায়িতা, অর্দ্ধাঙ্গ জলে নিমজ্জিত ; সহচরীগণ “রাই মোল, রাই মোল” বলিয়া কাঁদিতেছে। এ রাধিকার কৃষ্ণের প্রতি কত প্রেম, সমালোচনার তুলাদণ্ডে তাহার ওজন হয় না, চন্দ্রা দাসখৎ দেখাইয়া কৃষ্ণকে বাঁধিয়া আনিবে বলিতেছে, রাধিকা সভয়ে চন্দ্রার কাছে গিয়া একটা প্রাণের কথা বলিয়া আসিল,—

বেঁধ না তার কোমল করে, ভৎর্সনা কোর না তারে ;
মনে যেন নাহি পায় দুখ।
যখন তারে মন্দ কবে, চন্দ্র মুখ মলিন হবে,
তাই ভেবে ফাটে মোর বুক।

মনে করিও না, কৃষ্ণকমলকে আমি তাঁহার প্রাপ্যের অতিরিক্ত দিতেছি, অথবা সহসা যশঃকীর্ত্তন করিয়া তাঁহার শ্মশানের শান্তিভঙ্গ করিতেছি। বিচিত্রবিলাসের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন, "বোধ হয় ইহাতে (স্বপ্নবিলাস ও রাই-উন্মাদিনী দ্বারা) সাধারণেরই প্রীতি সাধিত হইয়াছিল নতুবা প্রায় বিংশতি সহস্র পুস্তক স্বল্প দিনের মধ্যে নিঃশেষিত হইবার সম্ভাবনা কি?" বৃত্রসংহার কাব্যের লেখকই হউন, আর পলাশীর যুদ্ধের লেখকই হউন, কৃষ্ণ-কমলের যশঃসৌভাগ্যে ইঁহারা সকলেই ঈর্ষ্যান্বিত হইতে পারেন। রাই-উন্মাদিনীর গান বেশি উদ্ধৃত করিলাম না। যাঁহারা এই পুস্তক পড়িতে ইচ্ছুক, তাঁহারা চেষ্টা করিয়া পুস্তক সংগ্রহ করিবেন। যে কয়েক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা প্রায় নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে ; আমি অতিশয় যত্ন করিয়াও পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয়ের জন্য একখানা সংগ্রহ করিতে পারিলাম না।

বিরহিণী রাধিকা কানন দেখিয়া যে বিলাপগীতি গাইয়াছেন, তাহাও অতি চমৎকার। বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

বলা উচিত যে, এই সমস্ত গানই রাগ রাগিণীতে গীত হইয়া থাকে। কৃষ্ণ-কমল একজন অসামান্য সংগীতবিদ্যা-বিশারদ গায়ক ছিলেন।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

প্রতিশোধ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বেলা চারি দণ্ড থাকিতে সরলার নৌকা পরিহারের ঘাটে আসিয়া লাগিল। গ্রাম সেখান হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ মাত্র। নদীতীর হইতে মৃণ্ময় গৃহগুলির মাঝে একটি ইষ্টকালয়ের চীলের ঘর এবং দুইটি শিবমন্দিরের উন্নত চূড়া দেখা যাইতেছিল। গ্রামপ্রান্তে দীঘির উচ্চ পাড়ে নিবিড় বটগাছের বিস্তৃত শাখা প্রশাখা, এবং ঘন তালগাছের সারি।

দেরি মাত্র না করিয়া সরলা গ্রামাভিমুখে চলিল। অক্রুরদের সঙ্গে পূর্ব্বেই পরামর্শ স্থির হইয়াছিল, ঘাটে নৌকার চিহ্ন মাত্র রাখা হইবে না। ইহাতে মাঝি মাল্লাদেরও লাভ; কাজেই তাহারা সম্মত হইয়াছিল, "ছই" খুলিয়া নৌকাখানি ঘাট হইতে দূরে জলমগ্ন করিয়া রাখিবে। শ্রবণশক্তির অপ্রাখর্য্য গুণে আকাশের মা ইহার কিছুই জানিতে পারে নাই। গুণে, কেন না আগে হইতে শুনিতে বুঝিতে পারিলে বুড়ী পথে নিশ্চয়ই গণ্ডগোল বাধাইত।

অতএব জিনিস পত্র বাঁধিয়া ছাঁদিয়া সরলাকে প্রস্তুত হইতে দেখিয়া বুড়ী জঠরজ্বালা ভুলিয়া গেল। সমস্ত পথ সে "সলিকে" বুঝাইতে বুঝাইতে আসিতেছিল যে, মুড়িমুড়কি খেয়ে দিন কাটানর দিন কাল তাহার গিয়াছে। তাহার বয়সে সময়ে দুটো ভাত নহিলে "মহাপ্রাণী" কদিন টিকিবে? তা সে ভাত শাক ভাতই হোক্, কি নুন ভাতই হোক! অসহ্য হইলে সরলা একবার কেবল বলিয়াছিল—"আম্মি বুড়ি, বুড়ো হয়ে তুই একেবারে বায়াত্তরে গিয়েছিস্—ছি! পুরুষগুলো শুনে ভাব্‌বে, সব মেয়ে বুঝি তোরই মতন পেটুক!"

ঘাটে নৌকা লাগিলে বুড়ী নাতিনীকে লইয়া একটু রঙ্গ রসে প্রবৃত্ত হইল। সে ভাবিয়াছিল, এই তাহাদের গন্তব্য স্থান—খবর পাইলে নাতজামাই পালকী বেহারা সঙ্গে নিজে আসিয়া উপস্থিত হইবে। বুড়ী বলিল, "সলি, তোর পালকীর সঙ্গে আমি ত ভাই! ছুটে যেতে পারব না। আমার হয়ে নাতজামাই না হয় যাবে। কিন্তু বর পেয়ে আম্মি বুড়ীকে ভুলে থাকিস্‌নে যেন। এক মুঠো ভাতের যোগাড় করে রাখিস্!"

কিন্তু বুড়ীর আশা ভরসার মূল সহসা শুকাইয়া উঠিল। তাহার পুনঃপুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও বদন নাতজামাইকে খবর দিতে গেল না। সরলা দ্রুতপদে এবং হাঁটিয়া শ্বশুরবাড়ী চলিল দেখিয়া সে তাহার আঁচল চাপিয়া ধরিল। দুঃখিত হইয়া বলিল—"এমন অলক্ষণ করো না। ভাদ্দর মাসে বেরিয়েচো, তার ওপর এমন বেহায়ার মতন গেলে লোকনিন্দার সীমা থাক্‌বে না। চিরকালের জন্যে নাতজামাইয়ের বিষনয়নে পড়্‌বে!" কিছুতে বুড়ী ছাড়ে না দেখিয়া সরলা বুড়ীর কাণে কাণে অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বরে বলিল, "ডাকাত পাছু নিয়েচে, দেরি করিস্‌নে!"

বুড়ী তখন আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিল। দুই চারি পা চলিতে না চলিতে সে সভয়ে একবার চারিদিক দেখিয়া লইতেছিল এবং দূরে কোন কিছু দৃষ্টিগোচর হইলেই বলিতেছিল—"ঐ গো, শেষে মানুষুরের হাতে প্রাণ গেল!"

নৌকার ব্যবস্থা করিতে মাঝি মাল্লা এবং পাইকদেরও যে সময় গেল, তাহার মধ্যেই আন্নি বুড়ী সরলাকে লইয়া গ্রামে পৌছিল। সেখানে গিয়া কি করিতে হইবে না হইবে, পথে সরলা বুড়ীকে শিখাইতে শিখাইতে গিয়াছিল। ভগবান মদক বলিয়া দিয়াছিল, "মা, পরিহারের বিক্রম সিংহের আশ্রয় নিও, কোন ভয় থাকিবে না।" কিন্তু কিছুতে বুড়ী সে নাম মনে রাখিতে পারিতেছিল না।

গ্রামে প্রবেশ করিতে না করিতে এক দল স্ত্রীলোকের সঙ্গে সরলাদের দেখা হইল। আকালের মা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—"বলি, মা ঠাকুরুণরা আপনারা বল্‌তে পার, 'এই গাঁয়ে কে' সিংহী বাবু আছে? তার নামটিও যেন বাঘ, বাঘ, বুড়ো মানুষ ছাই মনে থাকে না!"

অনেক গুলি যুবতী উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। সরলা অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"বাবু বিক্রম সিং তাঁর নাম।" সে মুখশ্রী এবং সুকণ্ঠে একটা মোহিনী ছিল। বুড়ীর কথা শুনিয়া যিনি হাস্য করেন নাই, তিনি বলিলেন, "চল মা, আমাদের বাড়ী চল!" সরলা দেখিল, তিনি বিধবা, কক্ষে পূর্ণ পিত্তল কুম্ভ। কে এক জন বলিয়া দিল, "ইহারই বাপের নাম বিক্রম সিং।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

কন্যার মুখে শরণাগতা ব্রাহ্মণকন্যার বিপদের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ বিক্রম সিং ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। চাকরী করিতে আসিয়া তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা বাঙ্গলা দেশে বাস করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বাঙ্গলার আর্দ্র বায়ু এবং মৃত্তিকায় আজিও এই রাজপুতবংশকে তেমন কাবু করিতে পারে নাই। বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ নিজের গোলাবাড়ী হইতে পুত্রদের ডাকিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু খবর আসিল, দুই প্রহরের পর শীকারে গিয়া এখনও তাহারা ফিরিয়া আসে নাই। শুনিয়া বিক্রম সিং হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, বহুৎ রোজ সে হাম্ ভি শীকার নেহি খেলা, আজ্ রাতকো মালুম হোগা, বুড্ঢা বিক্রম সিং একেলে আভি কেতনা শীকার খেল্‌নে শক্‌তা হায়।"

কন্যা মীরা বলিল, "বাবুজি, শীকার খেল্‌তে গিয়ে মাঝে মাঝে তারা রাত্রে আসে না। যদিই আসে, সেও অনেক রাত্রে। তাদের কাছে লোক পাঠাও। যদিই ডাকাত আসে।" মীরা হিন্দী বেশ বুঝিতেন বটে, কিন্তু ভাল বলিতে পারিতেন না। বাঙ্গলা তাঁর মাতৃভাষা হইয়া গিয়াছিল।

বিক্রম হাসিয়া উঠিলেন। সরলাকে কাছে ডাকাইয়া নিজে সকল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। বুঝিলেন, পশ্চাদ্গামী ডাকাতেরা বিশ্বনাথের দলের লোক। ইহাতে তিনি কিছু বিস্মিত হইলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন, "ডাকাত-গুলো বিশে বাগদীর দলেরই বটে; কিন্তু আমার সন্দেহ হয়, দলপতি এর কিছু জানে না। তাকে আমি যতদূর জানি, সে এক জন প্রকৃত বীরপুরুষ। অনাথ স্ত্রীলোককে কাপুরুষের মত আক্রমণ করবার লোক সে নয়।" তখন বিক্রম নিজের সঙ্গে প্রথম বয়সে বিশ্বনাথের যে ভাবে এক দিন সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল, তাহার গল্প করিলেন। এইরূপ :—

তাহেরপুরের মল্লিক বাবুদের বাড়ী বিক্রম সিং তখন জমাদার। বিশ্বনাথ এক দিন চিঠি লিখিয়া পাঠাইল, বাবুরা তাহার নিকট তিন দিনের মধ্যে দুই হাজার টাকা না পাঠাইলে স্বয়ং আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিবে। আমলা মুৎসুদ্দিরা বাবুদের পরামর্শ দিলেন, টাকাটা দেওয়াই শ্রেয়ঃ, নহিলে বিশ্বনাথ সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইবে। বিক্রম সিং ইহা সহিতে পারিল না। বাবু-দিগকে জানাইল, বিশে ডাকাতের কাছে টাকা পাঠাইবার আগে তাহাকে চাকরী হইতে জবাব দেওয়া হোক্। শেষে বাবুরা তাহার কথায় টাকা পাঠা-ইতে নিরস্ত হইলেন। দুই দিনের ভিতর বিক্রম ডাকাইত তাড়াইবার যথোপ-যুক্ত ব্যবস্থা করিল। তিন দিনের দিন সন্ধ্যার সময় খবর আসিল, বিশ্বনাথ ভৈরব নদীর অপর তীরে সদলবলে ছাউনি করিয়াছে।

নিঃশব্দে বিনা অস্ত্র সম্বলে বিক্রম সিং নদী পার হইয়া ডাকাইত-শিবিরে দর্শন দিল। দুই জন খেলোয়াড় বিশ্বনাথের ছাউনি সম্মুখে "ঘাটি" রক্ষা করি-তেছিল—চন্দ্রালোকে তাহাদের ঘূর্ণ্যমাণ অসিফলক জ্বলিতেছিল। বিক্রম তাহাদের কথার উত্তর দেয় না দেখিয়া, তাহারা তাহাকে সর্দ্দারের কাছে ধরিয়া লইয়া গেল।

বিশ্বনাথ চক্ষু ভরিয়া বিক্রমের দীর্ঘমূর্ত্তি দেখিতে লাগিল। বলিল, "দেখার জিনিস বটে। কি চাও তুমি?"

বিক্রম বলিল, "আমি বাবুদের নিমক খাই। কি সাহসে তুমি তাঁহা-দিগকে চিঠি লিখিয়াছিলে? কি সাহসে এখানে আসিয়া ছাউনি করেছ? আমি নিরস্ত্র, সাধ্য থাকে আমার সঙ্গে আগে লড়, তার পর মনিববাড়ী-মুখো হইও।"

বিশ্বনাথের প্রশংসমান চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, "হাঁ, তুমি বীর বটে।

এ বাঙ্গলা দেশে এমন কথা আজ পর্য্যন্ত কেউ বিশেকে বলে নি। কিন্তু শুধু কথায় হবে না। একটু কাজে দেখাও দেখি। আকাশে ঐ টিটি পাখী ডাক্‌চে। এই নাও ধেনুক আর বাঁটুল। তীর চাও ত, তাও দিতে পারি। পাখীটেকে পেড়ে আন ত দেখি।”

বাস্তবিক তখন স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকতলে, বিশ্বনাথের শিবিরের মাথার উপর টিট্টিভ পক্ষী ডাকিয়া যাইতেছিল। এই পাখীর ডাকটা তেমন শুভসূচক নহে বলিয়া একটু আগে বিশ্বনাথ তাহাকে একবার লক্ষ্য করিয়াছিল, কিন্তু কিছু করিতে পারে নাই। বিক্রম সিং ধনুক এবং বাঁটুল লইল—বলিল, ঐ পাখী-গুলো অনেক দূরে দূরে উড়ে বটে, কিন্তু তীরের বোধ হয় দরকার হবে না।” এই সময়ে পাখীটা আবার ছাউনি শীর্ষে ঘুরিয়া আসিল। নিমিষে বিক্রম উহার বক্ষ লক্ষ্য করিয়া শরাসনে টঙ্কার দিল। মৃত পক্ষী বিশ্বনাথের পদতলে আসিয়া পড়িল। সেই হইতে আর কখনও বিশ্বনাথ তাহেরপুর অঞ্চলে কোনও উদ্যম করে নাই।

এই কথার পর বিক্রম কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “বেটী, আজ আমার সুপ্রভাত, তাই ব্রাহ্মণকন্যার পদধূলি আমার বাড়ীতে পড়েচে। তুই যথাসাধ্য ওঁর সৎকার কর্। ওঁর লোক জনকে সিধা পাঠিয়ে দে। কোন ভাবনা করিস্ নে। চাকরদের বলে দিস্, আমার সানা * আর তরওয়ালখানা ঠিক্ করে রাখে। যদিই শীকার খেল্‌তে হয়।”

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মীরা রাজপুত্‌নী। বাপের বড় আদরের মেয়ে—কেন না, সে আজন্ম দুঃখিনী। সূতিকাগৃহে জননী সদ্যঃপ্রসূতা কন্যাকে স্বামী-হস্তে সমর্পণ করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেলেন। তার পর অনেক কষ্টে মানুষ করিয়া পিতা দ্বাদশ বর্ষে সুপাত্রে তাহার পরিণয় বিধান করিলেন বটে, কিন্তু অদৃষ্টে সহিল না। ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিতে না করিতে মীরা বিধবা হইল। বিক্রম সিং পূর্ব্বে চাকরী করিতেন। এই সর্ব্বনাশের পর তাহা ত্যাগ করিয়া গৃহে আসিয়া বসিলেন।

বিক্রম তৎপূর্ব্বেই পুনরায় বিবাহ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার

---

* সানা—বর্ম্ম বিশেষ। উহার সঙ্গে নানা অস্ত্র সংযুক্ত থাকে। শুনিতে পাই, বিষ্ণুপুর অঞ্চলে আজও পাওয়া যায়।

একটি পুত্র সন্তান হইল। তার পর আট বৎসরের মধ্যে চারি পুত্র উপহার দিয়া দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণীও তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। বিমাতার জীবিতকালে মীরা ভাইগুলিকে সস্নেহে লালন পালন করিত। তাঁহার অবর্ত্তমানে, তাহাদের সকল ভার তাহার উপর পড়িল।

কন্যার কল্যাণে বিক্রম প্রৌঢ় বয়সে সন্তানপালনের ক্লেশ ও উদ্বেগ হইতে অনেক পরিমাণে পরিত্রাণ পাইলেন বটে, কিন্তু চারিটি ছেলের ভবিষ্যতের দিকে তখন হইতে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তাঁহার পৈতৃক জমীদারী অতি সামান্য—পরিহার এবং তাহার সন্নিহিত মল্লিকপুর নামে গ্রাম। দুই খানি গ্রামের বার্ষিক আয় হাজার টাকার বেশী নহে। কিন্তু বিস্তর জমী অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়াছিল। কর্ত্তারা সকলেই পুরাতন মনিব সরকারে চাকরী করিতেন, নিজ জোতগুলি পর্য্যন্ত ভাগে দেওয়া হইত। কর্ম্মত্যাগের কিছু কাল পরে, ধনবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, বিক্রম স্বয়ং খাসে চাস সুরু করিলেন। কয় বৎসরের ভিতর পতিত জমী আবাদ হইয়া গেল।

যে গোলাবাড়ীতে তাঁহার ছেলেরা সচরাচর থাকিত, তাহা বিক্রম সিংহের নিজের কৃত। বিস্তর শস্য সেখানে সঞ্চিত হইয়াছিল। ইদানীং বিক্রম বিস্তৃত ভাবে মহাজনীও করিতেন। পীতাম্বর, দিগম্বর এবং যোগাম্বর, এ সকলের তত্ত্বাবধারণ করিত। কনিষ্ঠ পুত্র স্বয়ম্বর এখনও বালক। সে গ্রামের পাঠশালায় পড়িত, সন্ধ্যার পর বাপের কাছে "ভজন" শিখিত।

মীরা বলিত, "বাবুজী, পীতু, দিগুর বিয়ে আর না দিলে চলে না, যোগুর বিয়ে না হয় দু বছর পরে দিও। পাড়ার বাড়ী বাড়ী বউদের দেখে আমার সাধ হয়, আমার ভাইদের বউ এলে সাধ আহ্লাদ করি।" বুড়া হাসিত। "বেটী, বাঙ্গলা মুল্লুকে থেকে থেকে তোরও মেজাজ্ বাঙ্গালীর মতন হয়েচে। এখন লেড়কাগুলোর বিয়ে দিয়ে শেষে ওদের আথের খাব। আরও পাঁচ দশ বছর যেতে দে বেটী।" ইহাতেও মীরা জেদ করিলে, পিতা সাশ্রুনয়নে বলিতেন, "মা, বাবুদের কথা শুনে বার বছর বয়সে তোর সাদি দিলাম। কি তাতে ভাল হলো বল্? আমার মনে হয়, কেন তোকে অত কম বয়সে বিয়ে দিয়ে চিরদুঃখিনী করেছি।"

বড় আদরের মেয়ে বলিয়া মীরা অতিশয় পিতৃভক্ত হইলেও দু এক বিষয়ে তাঁহার অবাধ্য হইতে বাধ্য হইত। বিক্রম ছেলেদের খবর দিয়া আনাইবার প্রস্তাব হাসিয়া উড়াইলেন বটে, কিন্তু মীরা তাহাতে কান দিল না। সে

বুঝিল, ডাকাইতরা সত্য সত্য আসিলে, বৃদ্ধের ভূতপূর্ব্ব বাহুবলগৌরবে কুলাইয়া উঠিবে না। অতএব মীরা ভাইদের ডাকিতে লোক পাঠাইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

গৃহস্থালীর সকল কাজ সারিয়া মীরা সরলার কাছে আসিয়া বসিল। বিক্রম সিংহের তখন অর্দ্ধ রাত্রি এবং সরলার আয়ি বুড়ি তাহার নিকটে শুইয়া নাসিকাগর্জ্জনে বৃহৎ অট্টালিকার নিশীথ-নীরবতা ভঙ্গ করিতেছিল।

সরলা তখনও শয়ন করে নাই। মীরার অপেক্ষায় বসিয়া বসিয়া শেষে আপনার পরিণাম চিন্তা করিতেছিল। আগে যে সব কথা আদৌ মনে হয় নাই, তখন তাহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া তাহার বোধ হইতেছিল। সে ভাবিতেছিল, ডাকাইতের হাত থেকে যদিই রক্ষা পাই, তার পর কপালে কি আছে, কে জানে? স্বামী-গৃহে যাইবার আগে একবার তাঁহার কাছে খবর পাঠাইয়া অনুমতি চাহিলে বুঝি ভাল হইত। শ্বশুরালয় কিরূপ, সপত্নীরা কে কেমন লোক, কে কে সেখানে বাস করেন, এ সকলের কোনও সম্বাদ সরলা কখন রাখে নাই। যদি গিয়া দেখে,—স্বামী প্রবাসে গিয়াছেন, এবং সপত্নীরা কণ্টক ভাবিয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যান করে, তখন কোথায় দাঁড়াইবে? আর, স্বামী গৃহে থাকিলেই যে সহসা তাহাকে আশ্রয় দিবেন, তাই বা কে বলিল? এর আগে এ সব নিরাশার কথা ঘুণাক্ষরেও সরলার মনে উদয় হয় নাই; কেন না, পথে বাহির হইবার পূর্ব্বে সে জানিত না, সত্য সত্যই মানুষের সংসারটা শ্বাপদজন্তুসঙ্কুল ঘোর অরণ্যের মত।

এই ভাবনার তন্ময়তাবশতঃ সরলা মীরাকে প্রথমে দেখিতে পায় নাই। মীরা হাসিয়া বলিল, "বোন্, এখনও তুমি শোও নাই! ভাবনা কি, তোমার শ্বশুরবাড়ী এখান থেকে বেশী দূর নয়। কালই সোয়ামীর কাছে পাঠিয়ে দেব।"

সরলা লজ্জিত হইল। অপ্রতিভের হাসি হাসিয়া বলিল, "তা নয় দিদি, আমি ভাবচি কি যে, আমি এসে আজ বুঝি তোমার খাটুনি আরও বেড়েচে! রোজ সংসারের এত কাজ তুমি কি করে কর? ধন্যি তুমি দিদি।"

মীরা হাসিল। "বোন্, কাজই আমার সব। তুমি শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছ, সুবচুনী করুন, অনেকগুলি ছেলে পুলে হোক্, সোণার সংসার পাতিয়ে তুমি সারা দিন কাজে কর্ম্মে নাইতে খেতে অবসর না পাও। আমি ভাই কাজকেই বিয়ে করেছি—সোয়ামী কেমন ছিলেন, মনেও পড়ে না। আশীর্ব্বাদ কর, কাজ

কর্‌তে কর্‌তেই যেন মরি। যেন বাপ ভাইদের সাম্‌নে পুড়তে পুড়তে ছাই হ'য়ে যাই।"

মীরার সেই হাসিটুকুর ভিতর একটা করুণার-আর্দ্র ভাব ছিল; সে হাসি এবং কথা সুরসংযুক্ত কবিতার মত শ্রোতার প্রাণ আকুল করিয়া যেন বলিতে-ছিল—এ নারী জন্মের কোনও সাধ আমার পুরিল না।

চোকের জল মুছিয়া সরলা বলিল, "দিদি, মারও আমার বেশী বয়েস হয় নি, তোমার চেয়ে তিনি কিছু বড় ছিলেন। তিনি বল্‌তেন, 'পুড়লো মেয়ে উড়ল ছাই, তবে মেয়ের গুণ গাই।' তোমরা বিপদ কাটিয়ে উঠ্‌লে, তবু তোমা-দের এখনও ভাবনা। আমি ত সমুদ্দুরে ভাস্‌চি, মা দুর্গার মনে কি আছে, কে জানে।"

মীরা সস্নেহে বালিকার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, "সরলা, আপনাকে যে রক্ষা কর্‌তে জানে না, স্বয়ং ভগবানও তাকে রক্ষা করেন না। এ মেয়ে-জন্মের প্রধান ভূষণ লজ্জা আর কলঙ্কের ভয়। যার তা আছে, তার কোনও ভয় নেই। বিধবা মীরার কথা কটি মনে রেখো বোন। আজ বিশ বছর এই মন্তর জপ করে কাটাচ্চি।"

এই সময়ে সহসা গ্রামপ্রান্তে বিকট চীৎকার শুনা গেল। সরলা ত্রস্ত হইয়া উঠিল। মীরা স্থির ভাবে বলিল, "এ ডাকাতের কুল্‌কুলি *। ডাকাত এসে পড়ল, কিন্তু ভাইদের এখনও দেখা নেই। বুড়ো বাপকে বাঁচান আজ ভার হবে।"

এই বলিয়া মীরা গৃহান্তর হইতে দুই খানি শাণিত তরবারি লইয়া আসিল। সরলা বলিল,—"তুমি এ হাতিয়ার নিয়ে কি করবে দিদি? ভাইরে এলেও যা হোক্‌।"

সে বিপদের মূহূর্ত্তেও মীরা পূর্ব্ববৎ হাসিল। "তখুনি তোমায় বলেচি বোন, নিজের রক্ষার ভার নিজের হাতে। আমরা রাজপুত্রের মেয়ে। তুমি কি শোন নি, ম্লেচ্ছদের হাত থেকে চিতোরে সতীরা কি করে উদ্ধার হত?"

সরলা আসন্ন বিপদভয়ে এবং ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হইয়াছিল। গদ্গদ কণ্ঠে বলিল, "হিন্দুর মেয়ে সবাই মর্‌তে জানে দিদি। তোমার কথায় আমার পাঁচ হাত বুক হলো।"

---

* কুল্‌কুলি—ডাকাইতেরা গ্রামে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ "হারে রে রে" ইত্যাকার বিকট চীৎকার করে, তারই নাম।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

পরিহারের রাজপুত্র বাবুদের বাড়ীতে কখনও ডাকাইতি হয় নাই বটে, কিন্তু তখনকার দিনে হইবার কোনও আটক ছিল না। মীরা বুঝিয়াছিল, এতদিন দলপতি খাতির করিয়া আসিলেও, তাহার দলস্থ লুব্ধেরা সরলার পলায়ন ওছিলায় আজিকার রাত্রে সম্ভবতঃ পিতার ধন গৌরব বংশ পরীক্ষা করিতে ছাড়িবে না। অতএব মীরার আদেশে পাইক দু জন সশস্ত্র এবং সজাগ রহিল। বাহিরের ছাদের উপরে তাহারা লোষ্ট্ররাশি স্তূপীকৃত করিয়া রাখিল। বন্দুক সব শীকারে চলিয়া গিয়াছিল। যে দুইটা জীর্ণ মরিচা-পড়া অস্ত্রাগারে পাওয়া গেল, তাহা তাহারা সাফ্ ও প্রস্তুত করিয়া রাখিল।

কুল্‌কুলির কোলাহল উঠিতে না উঠিতে বৃদ্ধ বিক্রম সিংহের নিদ্রাভঙ্গ হইল। ভৃত্যেরা তাঁহার বর্ম্ম এবং অস্ত্রাদি যথাস্থানে ঠিক্ করিয়া রাখিয়াছিল, সজ্জিত হইতে দেরি মাত্র হইল না। অতএব মীরা পিতার শয়নকক্ষে আসিবার পূর্ব্বেই তিনি সদর দ্বারে উপস্থিত হইলেন। পাইকেরা তখন ভাল করিয়া দ্বাররক্ষার উপায় বিধান করিতেছিল।

দেখিয়া বিক্রম সিংহ চটিয়া আগুণ হইলেন। বলিলেন, "তোরা কি মনে করিস্, আমি জেনানার মত দরওয়াজা বন্ধ করে আত্মরক্ষা করব? খুলে দে। তোরা দু জনে ছুটে গিয়ে দুধার থেকে দেখে আয়, শালে ডাকু লোক কোনও রাইয়তের ওপর জুলুম কর্‌চে কি না।"

কিন্তু পাইকেরা বাহির হইতে না হইতে ডাকাতের দল তীব্রবেগে সম্মুখে আসিয়া পড়িল। চক্ষের নিমেষে সুশিক্ষিত সেনাবৎ তাহারা দলপতির নির্দ্দিষ্ট আপন আপন স্থান অধিকার করিল। ঘাটি-রক্ষকদ্বয় দ্বারসম্মুখবর্ত্তী সমস্ত স্থানটুকু চকিতে পরিক্রমণ করিয়া আসিতেছিল। মেঘকক্ষে সৌদামিনীবৎ তাহাদের হস্তধৃত তীক্ষ্ণধার অসিফলক সর্ব্বত্র চমকিতেছিল। সে অস্ত্রসঞ্চালননিপুণতা দেখিতে দেখিতে বিক্রম সিংহ উল্লসিত হইলেন। স্থান কাল পাত্র বিস্মৃত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"বাহবা খেলোয়াড়!"

যে চারি জন ডাকাইত দরওয়াজার মধ্যে প্রবেশের জন্য ছিল, বৈদ্যনাথ তাহাদের সর্ব্বাগ্রে। সে বিশ্বনাথের মুখে অনেকবার বিক্রম সিংহের প্রশংসা শুনিয়াছিল। উন্মুক্ত প্রবেশদ্বারপথে বর্ম্মাবৃত বৃদ্ধকে দেখিয়া বৈদ্যনাথ প্রমাদ গণিতেছিল। সহসা অগ্রসর হইতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। সে ভাবিয়া চিন্তিয়া বিকৃতকণ্ঠে বিক্রমকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"আমরা আপনকার বাড়ীতে

ডাকাইতি করতে আসি নি। একটা মেয়ে মানুষ টাকা কড়ি নিয়ে পালিয়ে এসে আপনকার বাড়ীতে লুকিয়ে আছে। তাকে বাড়ী থেকে বার্ করে দিন্। আমরা তাকে পেলেই চলে যাব।"

বিক্রম সিংহ হাসিলেন। সে হাস্য ঘৃণায় বিদ্রূপে পরিপূর্ণ। বলিলেন, "আমি ভেবেছিলাম তোরা বিশ্বনাথের লোক। সেটা ভুল। বীরের দলে বীর থাকে। তোরা নীচ মালস্নুরে মাত্র। একটা স্ত্রীলোক এসে তোদের ভয়ে আমার আশ্রয় নিয়েচে। তোরা ভেবেছিস্, লুটতরাজের ভয়ে বুড়ো বিক্রম সিং আশ্রিতকে তোদের হাতে ছেড়ে দেবে। ধিক্! বিক্রম সিংহের বংশে ছোট একটা মেয়ে অবশেষ থাক্‌তে তা হবে না। আর যদি মরদ বাচ্ছা হোস্, একে একে আমার সঙ্গে লড়্।"

তথন বিক্রম সিংহ সেই সঞ্চালিত অসির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ঘাটির মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ঘাটিরক্ষকদ্বয় মুহূর্ত্তের জন্য অস্ত্র ক্রীড়া বন্ধ করিল। কিন্তু বৈদ্যনাথের তীব্র তিরস্কারে আবার পূর্ব্ববৎ তাহারা খেলিয়া ফিরিতে লাগিল।

এই অবকাশে বৈদ্যনাথের ইঙ্গিতে দুই জন ডাকাইত দ্বারমুখে ছুটিয়া প্রবেশ করিল। কিন্তু পলকে প্রতিহত হইয়া পিছু হটিয়া আসিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

মীরা পিতার প্রত্যেক গতি লক্ষ্য করিয়া মহা উদ্বিগ্ন হইতেছিল। বিপদে নির্ভীকতা বশতঃ অনেক সময় তিনি চারি দিক না সামলাইয়া কাজ করিয়া থাকেন, তাহা সে বিলক্ষণ জানিত। বিক্রম সিং মুক্তদ্বাররক্ষার কোনও উপায় বিধান না করিয়া সহসা পথে অবতীর্ণ হওয়ায় মীরা প্রমাদ গণিল, এবং অবিলম্বে নিজে পাইক দুজনকে পার্শ্বে রাখিয়া অসি হস্তে দ্বাররোধ করিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকারে পাইকদ্বয়কে দেখা যাইতেছিল না, কিন্তু শাণিতঅসিধারিণী, মুক্তকেশা, গৌরাঙ্গিনী মীরা, দেবীমূর্ত্তিবৎ প্রত্যক্ষ হইতেছিল। দেখিয়া বেগগামী ডাকাইত দুইটার গতিরোধ হইল। তাহারা বিস্মিত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতে পাইকদের হস্তনিক্ষিপ্ত সড়কীদ্বয় যুগপৎ তাহাদের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দিল। উভয়েই বেগে পিছু হটিয়া আসিল। একজন গুরুতর আহত হইয়াছিল, সে ঘাটির পথে পড়িয়া গেল।

বৈদ্যনাথ দলের লোককে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হুসিয়ার, মাছি

লেগেছে।"* বিক্রম সিংহের দিকে ফিরিয়া ক্রোধকম্পিত স্বরে বলিল, "ভেবেছিলাম তুমি বড় বীর, কিন্তু বাড়ীর ভেতর লোক লুকিয়ে রেখে সবাই অমন বীরত্ব কর্‌তে পারে। আজ আমি তোমার বাড়ী ডাকাতি কর্‌তে আসিনি, তাই বেশী লোক সঙ্গে নেই। আচ্ছা, আজ্ এই পর্য্যন্ত। আর এক দিন দেখা যাবে।" বিক্রমও ডাকাইতটার পতনের কারণ বুঝিতে পারেন নাই, তিনি ধ্রুব জানিতেন, তাঁহার বিনা আদেশে বাটীর কেহ অস্ত্র নিক্ষেপ্ করিবে না। অতএব বৈদ্যনাথের মত তিনিও বিত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া দ্বারপথে প্রবেশ করিলেন। সম্মুখে ধৃতাস্ত্র আলুলায়িতকুন্তলা কন্যামূর্ত্তি,—অন্ধকারে ভৃত্যদ্বয়কে দেখা যাইতেছিল না। বৃদ্ধ বিক্রম হাসিয়া উঠিলেন। পশ্চাতে ফিরিয়া বৈদ্যনাথকে ডাকিয়া বলিলেন, "এই তোরা জওয়ান? একটা বালিকার অস্ত্রের সাম্‌নে দাঁড়াতে পার্‌লি নে?" মীরা পিতাকে দেখিবামাত্র ছুটিয়া অন্দর পথে পলাইল। বৈদ্যনাথ অনতিপরে বিক্রম সিংহের পাছে পাছে আসিয়াছিল,—সে ইহা দেখিতে পাইল।

তখন সেই দরওয়াজার নীচে বিষম দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। বৈদ্যনাথ ঘাটিরক্ষকদের ডাকিয়া বলিল, "তোরা খুব হুঁসিয়ার থাক্, আর সব্বাইকে ভেতরে পাঠিয়ে দে।" ছয় জন তখন বেগে আসিয়া চারি দিক হইতে বিক্রম সিংকে আক্রমণ করিল। পাইক দুই জন প্রভুকে রক্ষা করিতে গেল বটে, কিন্তু আহত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইল। তখন তাহারা অন্দর পথে পলায়ন করিল।

একাকী বিক্রম সিং সেই বৃষতুল্য বলবান ছয় জন জওয়ানের সঙ্গে লড়িতে লাগিলেন। তাঁহার অদ্ভুত অস্ত্রচালনার কৌশলে প্রায় প্রতিক্ষেপে শত্রুরা আহত হইলেও, দুই দণ্ডের অবিশ্রান্ত সংগ্রামের পর বুঝা গেল, ক্রমে তিনি শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছেন। ডাকাইতদের মশালে বাটী আলোকাকীর্ণ হইয়াছিল,—মীরা এবং সরলা অন্দরের দ্বারপথে থাকিয়া সকলই দেখিতেছিল। পিতার সে সঙ্কটাবস্থা বুঝিতে পারিয়া মীরা সঙ্গিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "বোন্, মরিবার সময় উপস্থিত। লজ্জা কিসের? বাবুজীকে দেখে লজ্জায় পালিয়ে গেলাম, তাই এ বিপদ ঘটল। আর লজ্জার সময় নেই। আমি বাবুজীকে বাঁচাবার চেষ্টা দেখব। তুমি যেন ডাকাতের হাতে না পড়,—আশীর্ব্বাদ করি, মর্‌তে পারবে।"

---

* মাছি লেগেছে—ডাকাইতদের সঙ্কেতবাক্য। ইহাতে বুঝায়, আমরা আর নিরাপদ নহি, লোক জন আমাদের অনুসরণ করিতেছে।

ততক্ষণে বিক্রম সিং অতিরিক্ত শ্রম জন্ত অবসন্ন হইতেছিলেন,—মীরা পশ্চাতে আসিতে না আসিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। তখন কন্যা সকল ভুলিয়া পিতার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল।

সরলার এক হস্তে তরবারি, অন্য হস্তে ক্ষুদ্র বেতের পেটরায় নিজের সর্ব্বস্ব। সেই পেটরা ডাকাতদের সম্মুখে রাখিয়া সরলা বলিল,—"আমার যা কিছু আছে, সব তোমরা নাও। কিন্তু আমায় ছুঁয়ো না। যিনি আজ আশ্রয় দিয়ে বাপের কাজ করেছেন, তাঁর একটু সেবা করতে দাও। তোমাদের যদি মা বোন থাকে, তা মনে কর। আমায় ছুঁয়ো না।"

এই মুহূর্ত্তে দূরে অশ্বপদধ্বনিবৎ কিসের শব্দ শোনা গেল। ডাকাইতেরা সভয়ে শুনিল, রণপায় কেহ অতি দ্রুত ধাবিত হইতেছে। ক্রমশঃ।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

মহারাষ্ট্র সাহিত্য।

ফড়নবীসের "আত্মচরিত"।

"বল্লালো নাম মন্ত্রী শমদমবিমলো নীতিমান্ দীনপালো
'নানা' নাম্না প্রসিদ্ধো জগতি জনহিতঃ সত্যবাগ্‌দাতৃবর্য্যঃ।
কারাগারাহিতারী রণবিজিতরিপুর্ব্রাতলব্ধাতিমানান্
বীরান্ সম্মানয়ন্ সন্ ক্ষিতিবলয়মলং লীলয়াপালয়ৎ সঃ॥"—শিবকাব্যম্।

পাশ্চাত্য দেশে অনেক বড় বড় লোক "আত্ম-জীবন-চরিত" (Autobiography) লিখিয়া গিয়াছেন। কাহারও কাহারও বা স্বলিখিত "দৈনিক বিবরণ" (Diary) হইতে তাঁহাদের জীবনী রচিত হইয়াছে। এই জীবনীগুলিও কিয়দংশে তাঁহাদের "স্বচরিত কথন" রূপে পরিগণিত হইতে পারে। প্রাচীন কালেও পাশ্চাত্য দেশসমূহে "আত্মচরিত" লিখিবার প্রথা ছিল, দেখা যায়। আমাদের দেশে পূর্ব্বকালে এ প্রথা প্রচলিত ছিল না, এ কথা বলা বাহুল্যমাত্র। এই কারণে আমাদের দেশের মহৎ ব্যক্তিগণের জীবনী ও চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিবার উপায় নাই। দিল্লীর মোগল বাদশাহগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাদের "আত্মচরিত" লিখিয়া গিয়াছেন। এতদ্দেশীয়গণের মধ্যে কেহ এ বিষয়ে তাঁহাদের অনুকরণ করিয়াছিলেন কি না, তাহা সবিশেষ অবগত নহি। আহ্লাদের বিষয়, সুপ্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্ররাজ-মন্ত্রী "নানা ফড়নবীসে"র একটি স্বহস্তলিখিত "আত্মচরিত" প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহা মোগল বাদসাহগণের অনুকরণের ফল কি না, তাহা নিশ্চিত রূপে নির্দ্ধারণ করা যায় না। যাহা হউক, অদ্য আমরা মহারাষ্ট্র-সাহিত্যের এই অমূল্য রত্ন, বঙ্গীয় পাঠকবর্গকে উপহার প্রদান করিব, সংকল্প করিয়াছি।

মহারাষ্ট্র-চূড়ামণি নানা ফড়নবীসের আত্মচরিতের বঙ্গানুবাদ প্রদান করিবার পূর্ব্বে, তাঁহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে নানা ফড়নবীসের জন্ম হয়। তাঁহার প্রকৃত

নাম,—"বালাজী (বল্লাল) জনার্দ্দন ভানু"। কিরূপে তাঁহার বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের প্রথমাংশ অতিবাহিত হয়, তাহা পাঠকগণ তাঁহার আত্মচরিত হইতে জানিতে পারিবেন। পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয় ও তিনি মহারাষ্ট্র রাজ্যের ফড়নবীসের ("ডিপুটী হিসাব-তদারককর্ত্তা"র) পদে নিযুক্ত হয়েন। তিনি পরিশেষে স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধিবলে পেশওয়েগণের প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নানা ফড়্‌নবীসের পরিচয় দিতে হইলে, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ২৫ বৎসরের মহারাষ্ট্র রাজনৈতিক জগতের সমগ্র ইতিহাস বর্ণনা করিতে হয়। এই ২৫ বৎসর কাল তিনি অসাধারণ দক্ষতার সহিত মহারাষ্ট্র রাজ্যের মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন। ষষ্ঠ পেশওয়া 'মাধব রাও নারায়ণের' বাল্য দশায় তিনি একাকী স্বীয় অদ্ভুত বুদ্ধিকৌশলে সুবিস্তৃত পেশওয়ে রাজ্য যেরূপে পালন ও রক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তাঁহার তীক্ষ্ণ বিচারক্ষমতা, নব নব কৌশলোদ্ভাবিনী শক্তি, তাঁহার সুবিস্তৃত প্রভাব ও কার্য্যসাধনোদ্দেশে আবিষ্কৃত উপায়সমষ্টি দেখিয়া তৎকালে সমগ্র ভারত চমকিত হইয়াছিল (Grant Duff)। তিনি তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, দূরদর্শিতা, চরিত্রের দৃঢ়তা ও বুদ্ধিকৌশলে, স্বার্থলুব্ধ উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ও সমস্ত নরপতিগণের পরস্পর বিবাদে ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভগ্নপ্রায়, মহারাষ্ট্র রাজ্যকে সর্ব্বপ্রকার বিপদ হইতে উদ্ধৃত করিয়া উন্নতির পথে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। (Asiatic Annual Register)। এই সকল কারণে তাঁহার সমকালীন ইয়ুরোপীয় নীতিজ্ঞগণ তাঁহাকে "মহারাষ্ট্রীয় ম্যাকিবেল" (The Mahratha Machiovel) নামে * অভিহিত করিতেন (Grant Duff)।

খৃষ্টীয় ১৮০০ অব্দে নানা ফড়্‌নবীসের মৃত্যু হয়। গ্রাণ্ট ডফ বলেন, "He died on the 13th March. "And with him" Says Colonel Palmer, "has deported all the wisdom and moderation of the Maratha Government." Nana Furnavees was cirtainly a great Statesman. * * * He is entitled to the high praise of having acted with the feelings and sincerity of a patriot. He honourably advised Baju Rao to such measures as he believed advantagious, unmindful of any consequences. In private-life he was a man of strict veracity, humane, frugal and charitable. His whole time was regulated with the strictest orders and the business personaly transacted by him almost exceeds credibility." ভাবার্থ এই যে,—নানা ফড়্‌নবীস যথার্থই এক জন সুবিজ্ঞ রাজনৈতিক ছিলেন। এই স্বদেশ-প্রেমিক মহাত্মা নিঃস্বার্থভাবে স্বদেশের সেবা করিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় সত্যনিষ্ঠ, দয়ালু, মিতব্যয়ী ও দানশীল ছিলেন। তাঁহার সমস্ত কার্য্যের সময় নিরূপিত ছিল। তিনি সমস্ত দিনে একাকী এত কাজ করিতেন যে, তাহা বলিলে কাহারও সহজে তাহাতে বিশ্বাসও হইবে না। কর্ণেল পামার বলেন, নানার পরলোকপ্রাপ্তির সহিত মহারাষ্ট্র রাজ্যের দূরদর্শিতা ও সাম্যনীতি অন্তর্হিত হইয়াছে।" (This, when রাম শাস্ত্রী was ন্যায়াধীশ and নানা ফড়্‌নবীস minister and regent, was confessedly the period when Maratha Government was in highest perfection)"—Elphinstone's Report. অর্থাৎ, নানা ফড়্‌নবীসের মন্ত্রিত্বাধীনে মহারাষ্ট্র রাজ্য

* ম্যাকিবেল ইটালীর এক জন বিখ্যাত মন্ত্রী ও কূটনীতিজ্ঞ। ইহাঁকে ইটালীর চাণক্য বলিতে পারা যায়। খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীতে ইনি প্রাদুর্ভূত হয়েন।

উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। "The death of Balajee Pundit, (নানা ফড়্নবীস) whose upright principles and honourable views and whose zeal for the welfare and prosperity both of the dominions of his own immidiate superiors and of other powers were so justly celibrated, occasions extreme greif and concern." ইহা লার্ড ওয়েলেস্‌লীর মত।

এই "পুণ্যশ্লোক" মহাপুরুষের স্বহস্তলিখিত "আত্মচরিত" কাব্যেতিহাস-সংগ্রহ-সম্পাদকের বহু চেষ্টায় ও যত্নে সংগৃহীত হইয়া, সর্ব্বপ্রথম কাব্যেতিহাস-সংগ্রহ পত্রে প্রকাশিত হয়। এই আত্মচরিত অনূ্যন শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। এই আত্মচরিতে নানা ফড়নবীস স্বীয় চরিত্রের দোষসমূহও যেরূপ সরলভাবে ও অসঙ্কুচিত চিত্তে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মহত্ত্ববিষয়ে আর সংশয় থাকে না। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও নির্ভর, এবং বেদান্ত শাস্ত্রে তাঁহার জ্ঞান কিরূপ ছিল, এই আত্মচরিতে তাহারও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে, এই আত্মচরিত তিনি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। যাহা হউক, আমরা ইহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদান করিলাম। শত বৎসর পূর্ব্বে রচনাপ্রণালী ও মনোভাব ব্যক্ত করিবার প্রথা কিরূপ ছিল, তাহা দেখাইবার জন্য, আমরা যতদূর সম্ভব, ইহার অবিকল অনুবাদ করিতে চেষ্টা করিয়াছি; এবং মূলে ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দগুলি অধিকাংশ স্থলেই অবিকৃত রাখিয়াছি। সুতরাং অনুবাদের ভাষা যে সর্ব্বত্র মনোরম হইয়াছে, এ কথা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি না। তথাপি মূলের ভাব পরিস্ফুট করিবার জন্য পাদটীকা সন্নিবেশিত ও অনুবাদমধ্যে স্থানে স্থানে মূলাতিরিক্ত শব্দ বন্ধনীর মধ্যে ব্যবহার করিয়াছি। অশ্লীল-শব্দপূর্ণ বাক্যাবলীর ভাবানুবাদ মাত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে "ইতিহাস সমালোচন" শীর্ষক প্রবন্ধের উপসংহারে মহারাষ্ট্রীয় বখর প্রভৃতি গদ্যময় ঐতিহাসিক গ্রন্থের ভাষা ও রচনাপ্রণালীর যে সকল দোষের উল্লেখ করা হইয়াছে, এই আত্মচরিতের ভাষাও অধিকাংশ স্থলে সেই সকল দোষযুক্ত। এতদ্ব্যতীত নাম-সর্ব্বনামের মধ্যে লিঙ্গবিপর্য্যাস, শব্দবিশেষের পুনরুক্তি, ক্রিয়াপদযোজনায় অমনোযোগিতা প্রভৃতি দোষও স্থানে স্থানে লক্ষিত হয়। বলা বাহুল্য, মূল রচনায় বিরাম চিহ্নাদি ও পরিচ্ছেদ বিভাগ না থাকায়, স্থলবিশেষে অর্থবোধের কিঞ্চিৎ অসুবিধা ঘটে।

প্রথম প্যারাগ্রাফদ্বয় অতি জটিল বৈদান্তিক কথায় পরিপূর্ণ। ভাষা এরূপ ব্যাকরণদুষ্ট যে, সর্ব্বত্র অর্থোদ্ধার করিতে পারি নাই। তথাপি যথাসাধ্য অবিকল অনুবাদ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। প্রথম দুইটি প্যারা ভূমিকাস্বরূপ। তৃতীয় প্যারা হইতেই প্রকৃত "আত্মচরিত-কথন" আরম্ভ হইয়াছে। উহা পাঠকদিগের নিকট সুখপাঠ্য ও মনোরম বোধ হইতে পারে।

নানার আত্মচরিতকথন।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন।

ভূমিকা,—আত্মার স্বরূপ।

শ্রীসাম্বসদাশিবায় নমঃ। সেই সাম্বসদাশিব কিরূপ? না, সত্বস্বরূপ অর্থাৎ চিৎস্বরূপ প্রকাশ, অবস্থাত্রয় সাক্ষী; যাঁহাকে জাগ্রৎকালে 'বিশ্ব', স্বপ্নকালে 'তৈজস' ও সুষুপ্তিকালে 'প্রাজ্ঞ' বলে। যিনি একই আত্মা, উপাধিভেদে নানারূপে ভাসমান। পা নাই, কিন্তু চলিতে পারেন; হাত নাই, কিন্তু গ্রহণ করেন; কান নাই, কিন্তু শুনিতে পান। (তিনি যে) সর্ব্বান্তর্য্যামী (ও) ব্যাপক, ইহার প্রমাণ কি? আত্মা যে আছেন, তাহার প্রমাণ কি? উত্তর,—দূরে কোনও ইঙ্গিতজ্ঞ

বসিয়া থাকে ; তাহার (অপরের মনোভাব ?) ইহার (ইঙ্গিতজ্ঞের) আত্মায় প্রতিবিম্বিত হইয়া সেই কথা (মনোভাব ?) সে (ইঙ্গিতজ্ঞ) গ্রহণ করে (বুঝিতে পারে)। (আত্মার ; ব্যাপকতা ব্যতীত ইহা কিরূপে ঘটিতে পারে ?

এইরূপ আত্মা আপনাতেই তাহাকে (আপনাকে) বিস্মৃত হইয়া আনন্দ স্বরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুঃখের মধ্যস্থিত সুখ ভোগ করিবার ইচ্ছা করেন। ইহাই সেই আত্মার মায়া। (আত্মাকেই) সত্য বলিতে পারা যায় না ; অসত্য বলিতে পারা যায় না। যিনি অনির্ব্বচনীয়স্বরূপা, সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী, তাঁহা হইতে অহঙ্কার (মহত্তত্ত্ব), (ও) আকাশ, বায়ু, তেজঃ, উদক, পৃথ্বী এই পঞ্চ মহাভূত (সমুৎপন্ন)। মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ অন্তঃকরণ ; তদবচ্ছিন্ন যে চৈতন্য তিনিই জীব। অপঞ্চীকৃত পঞ্চ-মহাভূত কর্তৃক তদংশরূপে লিঙ্গশরীর দ্বারা জীবের সুখদুঃখাদি প্রাপ্তি (ঘটে)। "ভোগায়তনং শরীরং ;" ভোগের স্থান শরীর। সেই শরীর নিন্দ্য স্থান ও অতি ঘৃণিত, অস্পৃষ্ট পদার্থ হইতে উৎপন্ন ও বর্দ্ধিত হয়। (তার পর) গর্ভাশয়েই যদি (সেই জীব) বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে সব ফুরাইল, কিন্তু যদি বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে গর্ভমধ্যে নানা প্রকার কৃমিকীটাদির উপদ্রব ও জঠরস্থ অগ্নির দাহ প্রভৃতি যন্ত্রণাভোগ করিতে হয় ; যথা-সময়ে ক্ষুধা তৃষ্ণারও নিবৃত্তি হয় না। এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া (অবশেষে) প্রসব বায়ুর দ্বারা বহুকষ্টে জন্ম হইলে জাতাশৌচ প্রাপ্ত হয়। তার পর রোগাদিযন্ত্রণা স্বয়ংই মূকের ন্যায় সহ্য করিতে হয়। ষড় ভাব বিকার,—অস্তি, জায়তে; বর্দ্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে, নশ্যতি।

জীবোৎপত্তি প্রকরণ।

এই ষড়ভাববৎ বিকারযুক্ত দেহী আমি বাল্যকালে অজ্ঞানাচ্ছন্ন ছিলাম। * কিন্তু পূর্ব্ব (জন্মের) সংস্কারবশতঃ দেব-পূজার প্রতি আমার অত্যন্ত অনুরাগ (ছিল) : এই জন্য মাতা প্রহারও করিয়াছিলেন। কিন্তু সংস্কার দৃঢ় (এই নিমিত্ত দেবপূজায় অনুরাগ কিছুতেই হ্রাস হইল না)। † বিদ্যাশিক্ষার জন্য পিতা মাতা তাড়না করিতেন, তজ্জন্য বাল্যকালে অজ্ঞানতাবশতঃ মনে অতিশয় (বিষাদ জন্মিয়া) তাঁহাদেরও অনিষ্ট চিন্তা করিতাম।

বাল্য স্বভাব।

দশম বর্ষ বয়সে (আমার) বিবাহ হয়। ‡ নানাপ্রকার বিপদে পতিত হইলেও (ভগবান্) রক্ষা করিলেন। পরে, ১১।১২ বৎসর বয়ঃক্রমের পর, মনে ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য উদিত হইতে লাগিল। এই কারণে ও কিঞ্চিৎ অসৎ সংসর্গে পড়িয়া অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয় চরিতার্থকরণে প্রবৃত্ত হইলাম। মধ্যে (১৪ বৎসর বয়সের সময়) একবার ঘোড়ার উপর হইতে পড়িয়া গিয়াছিলাম। অবস্থা অতিশয় সঙ্কটা-

চরিত্র-দোষ ও পিতৃবিয়োগ।

---

* নানা ফড়্‌নবীস (প্রকৃত নাম বালাজী জনার্দ্দন ভানু) ১৬৬৩ শকাব্দের (১৭৪১ খৃঃ) মাঘী কৃষ্ণচতুর্থী শুক্রবার রাত্রি (১১ দণ্ড ১০ পল) কালে জন্মগ্রহণ করেন।

† কথকতা ও সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া ৫।৬ বৎসর বয়ঃক্রম কালেই মৃন্ময়ী দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ ও তৎপূজনাদিতেই নানা ফড়নবীস অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। এই কারণে বিদ্যাশিক্ষায় তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল না।

‡ তাঁহার স্ত্রীর নাম যশোদা বাই। ১৭০৬ শকাব্দে (১৭৮৪ খৃঃ) আশ্বিন মাসের শুক্ল-পক্ষীয় প্রতিপদ দিবসে নানা ফড়নবীসের এক পুত্র জন্মে। কিন্তু সে শৈশবেই কালগ্রাসে পতিত হয়। এতৎব্যতীত নানার দুইটি কন্যাও হইয়াছিল; তাহারাও অল্প বয়সেই মারা পড়ে। নানা সর্ব্বশুদ্ধ নয়টি বিবাহ করিয়াছিলেন।

পন্ন হইয়াছিল ; দুই দিন সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থায় ছিলাম। এইরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হইতেও গোবিন্দের (ভগবানের) কৃপায় আরোগ্য লাভ করিলাম। পরে ১৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে পিতার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে।* ঈশ্বর (আমার দ্বারা) তাঁহার ঊর্দ্ধদৈহিক (কার্য্যাদি) সম্পন্ন করাইলেন। তাহাতে এক বার পাপদৃষ্টি হইয়াছিল। এটি আমার অপরাধ হইয়াছে। বৃথা পাশব-বৃত্তির চরিতার্থতায় পাপ (সঞ্চয়) ও শরীর নাশ হয়, ইহা বুঝিতে লাগিলাম। তখন (পাপচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া (করিতে ?) দৃঢ়সংকল্প করিলাম। কিন্তু তথাপি রিপুর প্রবলতা হেতু পাপচিন্তা মনে উদিত হইত।

(পিতার মৃত্যুর অল্পকাল) পরে পরম্পরাগত সেবাধর্ম্ম পালন করা কর্ত্তব্য † বিবেচনায়, ও শ্রীমন্ত (পেশওয়ে বালাজী বাজীরাও) আমায় পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন বলিয়া (তাঁহার সমভিব্যাহারে) কর্ণাটক প্রদেশে শ্রীরঙ্গপট্টন পর্য্যন্ত গমন করিলাম ‡। পূর্ব্বকৃত অত্যাচারের জন্ত এ সময় আমার স্বাস্থ্যভঙ্গের পূর্ব্বলক্ষণ দৃষ্ট হইতে লাগিল। গৃহে ফিরিয়া আসিলে পর উহা বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু পাপচিন্তা নিঃশেষরূপে দূর হয় না। তখন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম, 'পিতামহ (বালাজী মহাদেব ভানু) সাত্ত্বিক, ধর্ম্মশীল, সত্যবাদী ও দেব ব্রাহ্মণে দৃঢ় ভক্তিযুক্ত ছিলেন ; গর্হিত কার্য্য কখনও করিতেন না। তবে আমার মন কিঞ্চিৎ পাপ-

ইন্দ্রিয়দমন-চেষ্টা।

পথে কেন ধাবিত হয় ?' মনে পড়িল, মাতামহপক্ষীয়গণ অতিশয় ব্যভিচারী ছিলেন। ইহা (আমার এই পাপ বাসনা) সেই সংস্কারের ফল। চিত্তকে স্থির করিতে চেষ্টা করি, তথাপি উহা স্থির হয় না। অতএব সংস্কারই বলবত্তর। পরে "অতিরুদ্র" করিবার জন্ত "টোকেঁ" নামক গ্রামে গমন করিলাম §। তথায় নিয়মিত রূপে দেবতার্চ্চনা করিতে লাগিলাম। কিন্তু শরীর অসুস্থ, তজ্জন্ত চিত্তে এরূপ বৈরাগ্য জন্মিয়াছিল যে, পরস্ত্রীর বিষয় চিন্তাও করিতাম না,—দর্শন ত দূরের কথা!

---

* পিতার নাম জনার্দ্দন বল্লাল ভানু। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে শূলরোগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

† নানা ফড়নবীসের পিতা ও পিতামহ উভয়েই পেশওয়াগণের অধীনে মহারাষ্ট্ররাজ্যের ফড়নবীসের কার্য্য করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর অল্পদিন পরেই, খৃঃ ১৭৫৬ অব্দের অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষীয় অষ্টমী সোমবারে, তিনি ফড়নবীসের পদ প্রাপ্ত হন।

‡ পেশওয়া ও তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ সচরাচর 'শ্রীমন্ত' নামে অভিহিত হইতেন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে অগ্রহায়ণ মাসে শ্রীমন্ত বালাজী বাজীরাও কর্ণাটকের বিরুদ্ধে যে অভিযান করেন, নানা ফড়নবীস সেই অভিযানে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন।

§ নানার জীবন চরিত-লেখক বলেন যে, সর্ব্বদা ঈশ্বরোপাসনায় চিত্ত নিমগ্ন থাকিলে, পাপচিন্তা মন হইতে বিদূরিত হইতে পারে, এই আশায়, নানা ফড়নবীস পুণা পরিত্যাগ করিয়া গোদাবরীতীরস্থিত "কায়গাঁও টোকেঁ" নামক তীর্থক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক তথায় দেব-সমীপে "অতিরুদ্র" পুরশ্চরণ (অর্থাৎ রুদ্রাধ্যায় নামক বেদাংশ যথানিয়মে ১৪৬৪১ বার আবৃত্তিকরণ) করিলেন। মেজর ম্যাক্‌ডোনল্ড্ স্বপ্রণীত "নানা ফড়নবীসের জীবনী" গ্রন্থে বলেন,—এই সময়ে নানা ফড়নবীসের এক পুত্র জন্মিয়া অল্প দিনের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পুত্রশোকজনিত বিষাদ দূরীভূত করিবার জন্ত 'নানা' অতিরুদ্র করিয়াছিলেন। কিন্তু মেজর ম্যাক্‌ডোনল্ডের এই উক্তির পোষকে কোনও প্রমাণ এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। বরং একটি বখরে লিখিত আছে যে, ১৭০৬ শকাব্দের আশ্বিন মাসে নানার পুত্র হয়। অর্থাৎ, ম্যাক্‌ডোনল্ড্ যে সময়ের কথা বলিতেছেন, তাহার ২৫ বৎসর পরে নানা ফড়নবীসের পুত্র জন্মে।

ভাউ সাহেবের সহিত হিন্দুস্থানে (আর্য্যাবর্ত্তে) গমন করিয়া স্বর্গঙ্গা ত্রিপথ (গা... ভাগিরথীর (জলে) স্নান (ও) "ত্রিস্থলী যাত্রা" (অর্থাৎ কাশী, প্রয়াগ ও গয়া এই তীর্থে অনুষ্ঠেয় কার্য্যাদি সম্পন্ন) করিলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইবে, এই ভা... মাতা ও স্ত্রী সহ (তাঁহার সঙ্গে) গমন করিলাম *। সে সময় অতিশয় বৈরাগ্য (ছিল)। কারণ, শরীর কিঞ্চিৎ অসুস্থ। এজন্য চিত্ত এতদূর বৈরাগ্য... হইয়াছিল যে, (সর্ব্বদা) কেবল ভগবানের পূজা ও ধ্যান করিতাম। শীতোষ্ণাদিজনি... কষ্ট ছিল; কিন্তু মনে (অশান্তি?) ছিল না। জননীর প্রতি ভক্তিযুক্ত হইতে লাগিলা... পরে মহাগঙ্গা নর্ম্মদায় স্নান করিয়া একাগ্রচিত্তে (ভগবানের) ধ্যান করিলাম। সেই দি... হইতে উত্তরোত্তর (মন) বৈরাগ্যযুক্ত ও অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইতে লাগিল।

হিন্দুস্থানে গমন।

ভাউ (সাহেব) আমায় বিশেষ স্নেহ করিতেন। [হিন্দুস্থানের জলবায়ু সহ্য না হওয়ায় (আমার)] অতিশয় আমাশয়ের পীড়া হইল; উঠিবার শক্তি নাই; অতিসারের আধিক্য ও শরীর গ্লানিযুক্ত (হইল)। সে সময় (সৈন্যগণ) কুচ (করিয়া অগ্রসর) হইলেও শ্রীমন্ত [(ভাউ সাহেব) আমার জন্য] মোকাম (অবস্থান) করিতেন। সে সময়ে ঈশ্বর (আমায়) আরোগ্য করিলেন। পরে 'দরমজিল'† (অগ্রসর হইয়া) চর্ম্মণ্বতীতীরে গমন করিলাম। সেখানে গ্রহণ সংঘটিত হয়। প্রত্যহ স্নান দানাদি করিয়া আত্মাকে পবিত্র করত ধ্যান করিয়া কালাতিপাত করিতাম।

অসুস্থতা।

পরে সূর্য্যতনয়া যমুনার তীরবর্ত্তী গো-ঘাটের ‡ নিকট গমন করিলাম। সেখানে স্নান আহ্নিকাদি সমাপন করিয়া, দুই দিন পরে মুক্তিপুর মথুরাক্ষেত্রে গমন করিলাম। তথায় ক্ষৌর-প্রায়শ্চিত্ত-শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিয়া, যেখানে ভগবান্ পূর্ণব্রহ্ম রাধাকৃষ্ণ বিবিধ লীলা করিয়াছিলেন, সেই বৃন্দাবনে গমন করিলাম। তথায় কালিয়া-দহে (কালীয়-দহে) কদম্ব-বৃক্ষ, যাহার উপর বসিয়া ভগবান (গোপীগণের) বস্ত্রহরণ করিয়াছিলেন, তাহার শাখাসমূহ অদ্যাপি যমুনাতে প্রবেশ করিয়াছে। তাহার তলায় গিয়া স্নান ও তর্পণ করতঃ গোপীচন্দনের তিলক ও তুলসীর মালা ধারণ করিয়া ভগবানের ধ্যান করিতে করিতে বৃন্দাবনে ভগবানের অটলবিহারী, কুঞ্জবিহারী, বাঁকাবিহারী, রাধাকিশোর ও গোবিন্দজী প্রভৃতি মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। তন্মধ্যে কুঞ্জবিহারী মধ্যাহ্নকালে দোলায় নিদ্রিত (থাকিতেন), দ্বার বন্ধ (থাকিত) দোলার রজ্জু বাহির হইতে (লোকেরা) টানিত। সেই রজ্জু স্বহস্তে আকর্ষণ করিয়া ভগবানের আন্দোলন-লীলা অর্থাৎ (ভগবানকে) আন্দোলিত করিলাম। তথা হইতে 'শৃঙ্গার বট'—যেখানে ভগবান্ রাধাকে শৃঙ্গার (ভূষিত) করিয়াছিলেন, তথায় গিয়া বটবৃক্ষ দর্শন করিয়া, পরে 'বংশীবট'—অর্থাৎ যেখানে ভগবান্ মুরলী বাদন করিয়াছিলেন, সেখানে গিয়া বটের দর্শন করিলাম। তথা হইতে 'সেবাবন'

বৃন্দাবনবর্ণন।

---

* খৃঃ ১৭৬০ অব্দে পেশওয়ে বালাজী বাজীরাওএর ভ্রাতা সদা শিবরাও ভাউ (সংক্ষেপে ভাউ সাহেব) যখন আহম্মদশাহ আব্দালীর বিরুদ্ধে সসৈন্যে পাণিপথ অভিমুখে যাত্রা করেন, সেই সময় (অর্থাৎ চৈত্রমাসে) নানা ফড়নবীস গঙ্গাস্নান ও তীর্থদর্শন মানসে তাঁহার সহিত হিন্দুস্থানে গমন করিয়াছিলেন।

† "দর" অর্থে প্রতি; "মঞ্জিল"—এক দিনে যত ক্রোশ পথ পদব্রজে অতিক্রম কর যায়, তাহাকে "মঞ্জিল" বলে।

‡ প্রবাদ এইরূপ যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গরু চরাইয়া আনিয়া তাহাদিগকে এই ঘাটে জলপান করাইতেন।

(৩) কুঞ্জবন প্রভৃতি স্থান (দেখিতে গমন করিলাম)। সেই কুঞ্জ এরূপ যে, দেখিলে মনে হয়,— যেন ভগবান্ (এখনও সেখানে) লীলা করিতেছেন। (সেখানকার)

কুঞ্জ-বর্ণন।

সকল বৃক্ষগুলিই ছত্রাকার, খর্ব্ব, ভূমিস্থ (ভূমিস্পর্শী ?) পল্লব(-যুক্ত) ; কণ্টক বৃক্ষেও কিন্তু কণ্টক নাই। ইহা (কুঞ্জবন) দর্শনে আনন্দময় হইয়া, ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহার 'পদারবিন্দসম্বন্ধীয় রেণুরজঃকণা' মস্তকে ধারণ করিবার জন্য প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন, সেই বালরূপী ভগবান্ যে যমুনাতীরে বালুকা মধ্যে লীলা করিয়াছিলেন, সেই স্থলে, গমনপূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গ লুণ্ঠিত করিয়া তত্রস্থ বালুকা মস্তকে গ্রহণ করিলাম। সেখান হইতে "জ্ঞানগুদড়ী" নামক স্থানে গমন করিলাম। (দেখিলাম) বড় বড় সাধু, মোহান্ত ও বৈরাগী সন্ধ্যাকালের (শেষ) ছয় ঘটিকা দিবসের সময় তথায় আগমন করতঃ উপবেশন পূর্ব্বক 'ভগবৎপরায়ণ' হইয়া পুরাণ শ্রবণ করিতেছেন ; (কেহ কেহ) ভগবৎ কথা ও নামগান করিতেছেন। তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া চারি দণ্ড (কিয়ৎকাল) চিত্তে অতিশয় শান্তি জন্মিল। অনন্তর ধীরসমীর কালিন্দীতীরে গমনপূর্ব্বক সায়ংকালীন

বৃন্দাবনে মানসিক অবস্থা।

আহ্নিকাদি সমাপন করিয়া একাগ্রচিত্তে ভগবান্ সাম্ব সদাশিবের ধ্যান করতঃ (বাসায়) আগমন করিলাম। এইরূপে তিন দিবস অতিবাহিত হইল। বহু জন্মের পুণ্য যে, এরূপ বৃন্দাবন দেখিতে পাইলাম। সেই হেতু ভগবানের মূর্ত্তি ও ভগবদ্ভক্তগণের দর্শনে নেত্র পবিত্র হইল। পদব্রজে ভ্রমণ হেতু পাদদ্বয়ের সার্থকতা হইল। হস্তের দ্বারা নমস্কার করায় হস্ত পবিত্র হইল। মুখে "নাম স্মরণ" (হরিনাম গান) করায় মুখ পবিত্র হইল। কর্ণদ্বয় ভগবৎকথা শ্রবণ করিয়া পবিত্রতা লাভ করিল। স্নানের দ্বারা সর্ব্বশরীর পবিত্র হইল।

সাধু দর্শন।

বৃন্দাবনে বৈরাগীগণ একাগ্রচিত্তে ধ্যানস্থ হইয়া কুঞ্জতলে স্থানে স্থানে বসিয়া আছেন ; কেহ পর্ণ ভক্ষণ করিয়া, কেহ জলপ্রাশন মাত্র করিয়া, কেহ দুগ্ধ সেবন করিয়া, কেহ বা যে কেহ সিদ্ধান্ন প্রদান করুক, তাহাই ভক্ষণ করিয়া, জীবন ধারণ করিতেছেন। এইরূপ মহাপুরুষগণের দর্শন করিয়া সৎসঙ্গের মাহাত্ম্যে কিঞ্চিৎ আনন্দলাভ করিলাম।

মন্ত্র গ্রহণ।

তন্মধ্যে জনৈক বৈরাগী কৃপা করিয়া ভগবৎনামের একটি মন্ত্র বলিয়া দিলেন ; (এবং বলিলেন) যে, ইহা নিয়মিতরূপে জপ করিও। স্বয়ং ভগবানই উহা বলিয়া দিলেন, এরূপ মানিয়া, সকলকে যথাশক্তি দান করিয়া সন্তোষ লাভ করিলাম।

পরে দিল্লীতে গমন করিলাম। সেখানে শ্রীমন্তের (ভাউ সাহেবের) আদেশ ক্রমে পৃথ্বীপতির * দর্শন গ্রহণ করিলাম। তিনি (আমার সহিত) "অত্যন্ত কৃপাযুক্ত ভাষণ" করিয়া "আশীর্ব্বাদ" (?) দিয়া স্বকীয় পরিচ্ছদ প্রদান করিলেন ; তাহা গ্রহণ করিলাম।

দিল্লী গমন।

(পৃথ্বীপতির) এই কৃপাকে ভগবানের কৃপার অন্তর্বর্ত্তী জানিয়া (মনে) কিঞ্চিৎ সন্তোষ জন্মিল। অনন্তর শ্রীমন্তের লস্করে (ছাউনীতে) শ্রীমন্তের সমীপে আসিলাম। উপবিষ্ট ছিলাম, এমন সময় ভূমিকম্প হইল। 'পরন্ত' (তখন মনে মনে ভগবানের ধ্যান) স্মরণ করিলাম। যাহাতে পাপ নাই,—এরূপ চিত্র প্রভৃতি পদার্থও দিল্লীতে গ্রহণ (ক্রয়) করিলাম (এবং সে গুলি) দেখিলাম।"

পরে উত্তর দিকের যবন (আহম্মদ শাহ আব্দালী) শত্রুতা করিয়া পৌনে লক্ষ (৭৫ সহস্র) সৈন্য সহ যমুনার অপর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু যমুনা ভরপুর চলিতেছিল

আহম্মদ শাহ।

বলিয়া (কিছু দিনের জন্য) উভয় পক্ষেই স্তব্ধতা ছিল। পরে শ্রীমন্ত শৌর্য্যসহকারে "কুঞ্জরপুরা" অধিকার করিলেন। আমিও যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলাম। ঈশ্বর (আমার) রক্ষা করিলেন। ইতিমধ্যে (১৭৬০ অঃ ২৫ অক্টোবর)

---

* পৃথ্বীপতি—মির্জ্জা জওয়ান্ বক্ত বাদশাহ। ভাউ সাহেব দিল্লী জয় করিয়া ইঁহাকে দিল্লীর সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন।

যবন [যমুনার] এ পারে আসিল। শ্রীমন্ত সৈন্য সহ তাহার সম্মুখীন হইলেন। (উভয় দলের সাক্ষাৎ হইল।

আমি ত তখন ছেলে মানুষ, শ্রীমন্তের বুদ্ধিতে মহান্ বুদ্ধি [?]। কিন্তু তথাপি তদ্দ্বারা ভাবী কার্য্যে বিপর্য্যয় ঘটিল। "বলবন্তরাও" আমার মাতুল ও "নানা পুরন্দরে" প্রভৃতি আত্মীয়গণ [এ সময়ে] অনাত্মীয় হইলেন। "শাহানওয়াজ খানী" ও 'ভবানীশঙ্কর' প্রভৃতি যাঁহারা অনাত্মীয় ছিলেন, তাঁহারা আত্মীয় হইলেন। তাঁহাদের কথায় (শ্রীমন্তের) দৃঢ় বিশ্বাস। এই জন্য আমাদের (মহারাষ্ট্রীয়) যুদ্ধরীতি পরিত্যাগ করিয়া যবনগণের রীতি অবলম্বন করিলেন। (মধ্যে মধ্যে) উভয় পক্ষে যুদ্ধ ঘটিল। শত্রুগণের গোলাসমূহ প্রত্যহ আমাদের বস্ত্রকুটীরের নিকট দিয়া যাইত; (তদ্দর্শনে) জননী ও সহধর্ম্মিণী, "(পরিণামে) আমাদের কি গতি হইবে?" ভাবিয়া ভয়-ভীত হইতেন। সেই সেই সময়ে আমি জননীকে মিনতি করিয়া বলিতাম, "আমি মিনতি করিয়া বলিতেছি যে, (এ সময়ে) একমাত্র ঈশ্বরের প্রতি (আপনার) লক্ষ্য থাকুক্।"

পরাজয়ের কারণ।

জননীর সান্ত্বনা।

আমার মাতুল যুদ্ধে ছিলেন ; তিনি পতিত হইলেন। সেই দিনই সমস্ত (শত্রুপক্ষীয় ?) সৈন্য বিনষ্ট হইত ; কিন্তু রাত্রি হইল বলিয়া রহিল। সেই দুই মাসে অনেক মনুষ্য ও পশু মরিল। অন্নের মহার্ঘতা ; দুর্গন্ধ ও একই স্থলে। এই রূপ কষ্ট দেখিলাম। পরে মাতুলের স্ত্রী পতির সহগমন করিলেন। জননীর অতিশয় কষ্ট হইল। যাহা ঘটিবার, তাহা অবশ্যই ঘটিবে ; তদ্বিষয়ে সন্দেহ করাই অনুচিত। ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

অতঃপর, পরদিবস প্রাতে শেষ মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইবে, এজন্য পূর্ব্ব দিবসে এই-রূপ পরামর্শ হইল যে, "যদি আমাদের পরাজয় হয়, তাহা হইলে যেন শ্রীমন্তের ও আমাদের রমণীগণ শত্রুহস্তে পতিত না হয়েন, এজন্য স্বয়ংই (তাঁহাদিগের) প্রাণনাশ করাইতে হয়।" "নিজে ত আর বাঁচিতেছি না"—এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া, শ্রীমন্ত ইহারও (অর্থাৎ রমণীগণ যাহাতে শত্রুহস্তে পতিত না হয়, তাহার) বন্দোবস্ত করিলেন।

রমণীগণের রক্ষা।

"পরদিবস, (সৈন্যগণ) সজ্জিত হইলে, প্রাতে দুই ঘটিকার সময় যুদ্ধের গোলা গুলি (চলিতে) আরম্ভ হইল। শ্রীমন্ত অতিশয় বুদ্ধিমান্, ধৈর্য্যবান্, শূর ও কৃতকর্ম্মা ; দোষের মধ্যে কেবল কিছু বেশী অহংকার। কিন্তু সৈন্যসজ্জাদির খুব বন্দো-বস্ত করিয়াছিলেন। পরিশেষে, নিশানের নিকটস্থিত বন্দোবস্ত এক পাশে পড়িয়া থাকিয়া, মুখ্য স্থানেই শত্রুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি কিঞ্চিৎ ঈশ্বর স্মরণ করিয়া শ্রীমন্তের নিকটেই ছিলাম। ইতিমধ্যে বিশ্বাসরাওর (বুকে) এক গুলি লাগিল, (তিনি) পতিত হইলেন। তাঁহাকে হস্তিপৃষ্ঠে (হাওদার মধ্যে) স্থাপন করিয়া শ্রীমন্ত দাঁড়াইয়াই রহিলেন। এমন সময়, পাঠান পদাতিগণ (সবেগে আমাদের সৈন্য মধ্যে) প্রবেশ করিল। (উভয় পক্ষে) কাটাকাটি হইতে লাগিল। (তখন) বাম ভাগের রণ-বাদ্যকরগণের অধিপতি ও বড় বড় সর্দ্দারগণ পূর্ব্বেই পলায়ন করি-লেন। হোলকর, শিন্দে (সিন্দিয়া) প্রভৃতি দক্ষিণ পার্শ্বের বীর-বৃন্দও নিশান সহ (যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া) বাহির হইলেন। দুই তিন শত পদাতি মাত্রই অবশিষ্ট রহিল। শ্রীমন্তকেও আর দেখিতে পাই না। তখন ঈশ্বর বুদ্ধি দিলেন (যুদ্ধক্ষেত্র হইতে) প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। ইতিপূর্ব্বে যুদ্ধক্ষেত্রে "বাপুজীপন্ত" রণস্থল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তখন তাঁহাকে উত্তর দিয়াছিলাম যে, "এরূপ সময়ে শ্রীমন্তকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া যুক্তিযুক্ত নহে।" কিন্তু পরে এরূপ ঘটিল (অর্থাৎ) শ্রীমন্তকে ফেলিয়া পলায়ন

যুদ্ধারম্ভ।

ছত্রভঙ্গ।

নানার কৃতজ্ঞ বুদ্ধি।

করিতে হইল। লক্ষ সৈন্য; তন্মধ্যে বড় বড় সর্দ্দার সেখানে উপস্থিত থাকিলেও সে সময়ে কেহই শ্রীমন্তের আত্মীয় হইল না। বহুদিবস তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত। (শ্রীমন্ত সকলকে) পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। যতদিন সুদিন ছিল, ততদিন "শ্রীমন্তের কেশে ধাক্কা লাগিলে আমরা প্রাণ দিব" সকলেরই এইরূপ প্রতিজ্ঞা (ছিল)। কিন্তু দৈবঘটনাক্রমে যখন বিপরীত কাল আসিল, তখন কে আর সাথী হয়? সকলেই সুখের সাথী। শ্রীমন্তের অনুগ্রহে সকলেরই ভাগ্যে সমাদরসহকৃত ভোজন, বস্ত্রালঙ্কার ও জাইগীরপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে। কিন্তু যাঁহার এইরূপ অতুল সম্পত্তি, চরমকালে তাঁহার দেহের কোনও সন্ধানই কেহ পাইল না। (ইহা অপেক্ষা অধিক পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে?)

অনুতাপ।

"সকলেই ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। আমি সন্ধ্যাকালে, দুই ঘটিকা দিবস অবশেষ থাকিতে, অশ্বারোহণে পাণিপত গ্রামে আগমন করিলাম। সে দেশের পথ ঘাট আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। পরমেশ্বরের কৃপায় পথপ্রদর্শনের জন্য "রামাজী পন্ত" সেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন,—"অশ্ব ও বস্ত্রাদি দূরে ফেলিয়া দাও।" তাঁহার উপদেশ-অনুসারে সমস্ত ফেলিয়া দিয়া কৌপীনমাত্র পরিধান করিয়া বসিয়া রহিলাম। রাত্রি সমাগতা হইলে পর (সেখান হইতে) চলিলাম। এক ক্রোশের মধ্যে ৩।৪ বার টুপীওয়ালাগণ (পশ্চাদ্ধাবনকারী পাঠানগণ) আসিয়া গায়ে হাত দিয়া (আমাদের কাছে কি আছে না আছে) পরীক্ষা করিয়া দেখিল। (তাহারা) প্রতিবার আমাদের সঙ্গের দশ বিশ জনকে কাটিয়া ফেলিত। তার মধ্যে আমি বাঁচিয়া গেলাম। ইহা ঈশ্বরের কৃপা। পরন্তু 'বাপুজী পন্ত' ও 'রামাজী পন্ত'ও বাঁচিয়া যাইতে লাগিলেন। এইরূপে গমন করিতে করিতে দশ বার ক্রোশ পশ্চিমে গেলাম। ইতিমধ্যে (আবার) শত্রুগণ আসিয়া রামাজী পন্ত ও বাপুজী পন্ত প্রভৃতিকে অতিশয় আহত করিল। তাঁহারা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। আমি একাকী বাঁচিলাম ও তৃণক্ষেত্র মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ঈশ্বর তৃণের দ্বারা আমায় রক্ষা করিলেন। ঈশ্বর শত্রুগণকে মোহাবৃত করিলেন। তাহারা সকলের প্রাণনাশ করিল, কিন্তু আমি নিকটে থাকা সত্ত্বেও আমাকে বিনাশ করিল না, এবং তৃণগুলি দীর্ঘ (না?) থাকা সত্ত্বেও (আমাকে) তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে দিল। তাহারা চলিয়া গেলে, পুনরায় চলিতে লাগিলাম। দুই ক্রোশ যাইতে না যাইতে, পশ্চাতে অপর এক দল (শত্রু সৈন্য) দৃষ্ট হইল। তখন পুনর্ব্বার তৃণের মধ্যে গিয়া (লুকাইয়া) বসিলাম। ইতিমধ্যে তাহারা নিকটে আসিয়া আমাকে টানিয়া বাহির করিতে লাগিল। সে সময়, ঈশ্বর তাহাদিগেরই মধ্যস্থিত এক জন বৃদ্ধের মনে প্রবেশ করিলেন। সে বলিল,—"আর কি জন্য ইহাকে মারিতেছ?" তাহা শুনিয়া সকলে চলিয়া গেল।

পলায়ন।

দুর্গতি।

ঈশ্বরের দয়া।

প্রাণ-সংকট।

পাণিপতে অবস্থানকালে, আমার শক্তি অতিশয় ক্ষীণ ও আমবিকারাদি বিকারযুক্ত ছিল। শরীর দুর্ব্বল, অন্নে অরুচি; কখনও রৌদ্র দেখি নাই, পদব্রজে ভ্রমণের অভ্যাসও ছিল না। এরূপ অবস্থায় দয়াসমুদ্র সাম্ব সদাশিবের কৃপায় অন্ন জল ব্যতিরেকে ১৬।১৭ ক্রোশ চলিয়া আসিলাম। তৃতীয় প্রহরের সময় ক্ষুধা বোধ হইল। (পথে) কতকগুলি কুলের পাতা দেখিতে পাইলাম; চাখিয়া দেখিলাম, মুখে দিতে পারিলাম না। সেইরূপ অবস্থাতেই সন্ধ্যাকালে এক গ্রামের নিকটে গিয়া উপনীত হইলাম। এমন সময় এক জন বৈরাগী "পীঠ" আনিয়া দিলেন। তাহার

পথকষ্ট।

"ভাকর" (মোটা রুটি) করিয়া খাইলাম। উহা অমৃতের মত মিষ্ট বোধ হইল। তার পর ঘুমাইলাম।

"প্রাতঃকালে 'গঙ্গাসহস্রনাম' পাঠ ও ঈশ্বর স্মরণ করিতে করিতে পথ চলিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে এক গ্রামের মধ্যে গমন করিলাম। সেখানে এক জন 'সাওকার' (বণিক) ছিল। সে আমাকে স্বগৃহে লইয়া গেল। (সেখানে) চাবুক সওয়ারগণের (অশ্ব-শিক্ষকগণের) অন্যতম যশোবন্তরাওএর সহিত সাক্ষাৎ হইল। এক জন ব্রাহ্মণ ছিল, তাঁহার দ্বারা পাক নিষ্পত্তি করাইয়া ভোজন করিলাম। ইতিমধ্যে

বণিক প্রতারক।

জনরব উঠিল যে, শত্রুপক্ষীয় অশ্বারোহীগণ গ্রামে আগমন করিয়াছে। তৎশ্রবণে সাওকার বলিল, "আমি আপনাকে একটি গাড়ী করিয়া দিয়া 'জয়নগরে' পৌঁছাইয়া দিতেছি।" (তদনুসারে) গাড়ীতে বসিয়া যাইতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর গিয়া মনে সন্দেহ জন্মিল যে, "এ লোকটা (সাওকার) আমাকে ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে।" চিত্তে এইরূপ সংশয় উদিত হওয়ায় গাড়ী পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজেই গমন করিতে লাগিলাম। সঙ্গে দুই তিন জন ব্রাহ্মণ ও দুই জন মারাঠা (১২) ছিল। এই প্রকারে দশ বার ক্রোশ গমন করিলাম। এইরূপে সাত দিবস পদব্রজে চলিয়াছিলাম। ঈশ্বর প্রত্যহ ভোজনসামগ্রী যুটাইয়া দিতেন। তাহাতেই সহযাত্রীগণ সহ নির্ব্বিঘ্নে ভোজনাদি ব্যাপার সুসম্পন্ন করিয়া, "রেওড়ী" মোকাম পর্য্যন্ত আসিয়া পঁহুছিলাম। সেই সময়ে, আমাদের লস্করের পলাতকগণ সেই পথে গমন করিতেছিল। সেই গ্রামে "বালোরাও" (বালোরাও?) উপাধিধারী চারি ভ্রাতা বাস করিতেন। তাঁহারা (লস্করের পলাতকগণের মুখে) আমার নাম শুনিয়া (তাহাদিগকে) জিজ্ঞাসা করিতেন যে, "তিনি নানা ফড়নবীস কেমন লোক? তাঁহার চেহারা কেমন?" (এইরূপে) তাঁহারা আমার চিহ্ন লক্ষণাদি সমস্ত জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইলেন। "(নানা ফড়নবীস) পশ্চাতে আসিতে

বালেরাও।

ছেন," শুনিয়া প্রত্যহ আমার জন্য মার্গপ্রতীক্ষা করিতেন। আমরা যখন আসিলাম, তখন তাঁহারা "রেওড়ী" গ্রামের বহির্ভাগেই আমাকে চিনিলেন। এবং আমার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমার প্রতিজ্ঞা, কিছুতেই নাম বলিব না। কিন্তু তাঁহারা বলপূর্ব্বক আমাকে "নানা ফড়নবীস" বলিয়া সাবস্ত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কথা বার্ত্তায় কোনওরূপ অসরলতা দৃষ্ট হইল না। আমাদিগের সুবিধা করিয়া দেওয়া ও উপকার করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য, দেখা গেল। তখন (স্বীয়) নামধাম বলিলাম। তাঁহারা আমার সহযাত্রীগণ সহ আমাকে স্বগৃহে লইয়া গিয়া উত্তম প্রকারে ভোজনাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। ভোজন সমাপন করিলে পর, (আমাদিগকে) বস্ত্রাদি প্রদান করিলেন।

অনন্তর, রামজী দাস জোশী নামক এক জন মাতব্বর লোক (অর্থাৎ বড়লোক) রেওড়িতে থাকিতেন; তিনি সংবাদ পাইয়া আমাদিগকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন। সাত দিন আহার্য্য ও বস্ত্রাদি প্রদান করিলেন। তার পর, আমাদের ইচ্ছা, "দীগ ভরতপুরে" যাইবার। কিন্তু তিনি বলি-

রামজীদাসের আতিথ্য।

লেন, "ভাল সঙ্গ দেখিয়া, গাড়ী করিয়া (আপনাদিগকে তথায়) পৌঁছাইয়া দিব।" তৎপরে একটি বিবাহের বরযাত্র বাহির হইল। (রামজীদাস জোশী) সেই সঙ্গে গাড়ী করিয়া দিয়া আমাদিগকে বিদায় করিলেন। (এবং পথে খাবার জন্য "পেঢ়া" প্রভৃতি সুমিষ্ট খাদ্য আমাদের সঙ্গে দিলেন। আমরা বাহির হইলাম। পথিমধ্যে "কৃষ্ণং ভট বৈদ্য") কৃষ্ণ ভট্ট বৈদ্য (আসিয়া মিলিত হইলেন। তিনি

স্ত্রীর সন্ধান।

বলিলেন, "বিরোজী বারাওকর আপনার স্ত্রীকে বহুযত্নসহকারে লইয়া আসিয়াছেন

তিনি 'ভিগনী'তে নারোপন্ত ঘোখলের (নারায়ণপন্ত গোখলে) বাটীতে আছেন।" সেখানে সেই ভদ্রলোকটি (নারোপন্ত) বস্ত্র পাত্রাদি সমস্ত সামগ্রীর বন্দোবস্ত করিলেন। (পরে) আমরা তথায় গেলে পর, (তিনি) আমাদিগকে পায়সান্ন ভোজন করাইলেন। তখন (মনে) আনন্দ হইল। পরে স্ত্রীর জন্য অপর একটি গাড়ী করিয়া তথা হইতে (সস্ত্রীক) যাত্রা করিলাম।

মিলন।

ক্রমে দীগ্‌ভরতপুরে আসিয়া পৌঁছিলাম। 'পুরুষোত্তম মহাদেব' (?) পাণিপত হইতে (ফিরিয়া) আসিয়াছিলেন। তিনি সেখানে (ভরতপুরে) 'ওয়ানবলের' (Wanwaley) গুমস্তার বাসায় ছিলেন। আমাদের আগমনসংবাদ পাইবামাত্র তিনি (আমাদিগকে) স্বীয় বাসায় লইয়া গেলেন। তথায় স্ত্রী সহ ন্যূনাধিক এক মাস ছিলাম। (সেখানে অবস্থানকালে) খুব ক্ষুধা হইত। তিনি (পুরুষোত্তম মহাদেব) বস্ত্রাদি সামগ্রী ও খাদ্য দ্রব্যাদির বেশ ভাল বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। সেখানে থাকিয়া জননীর অনেক অনুসন্ধান করিলাম। পরন্তু, ঘরের এক জন চাকর (তাঁহার) সঙ্গে ছিল, সে বলিল যে, "তিনি ঘোড়ার উপর হইতে পড়িয়া যাওয়ায় অত্যন্ত আঘাত লাগিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।" অনুসন্ধান করিয়া ইহাই জানিতে পারিলাম।

জননীর সংবাদ।

পরে, চণ্ডলপুর (ধোলপুর) হইয়া 'গোওয়াল্হেরী'তে (গোওয়ালিয়রে) যেখানে (ভাউ সাহেবের স্ত্রী) পার্ব্বতী বাই, নানা পুরন্দরে, ও মল্লারজী হোলকর (মল্লার রাও হোলকর) প্রভৃতি সকলে, ঘোড়া, পালকী ও সমস্ত সৈন্য সামন্ত সহ পলাইয়া আসিয়াছিলেন, সেই স্থানে আসিলাম। মনে বড় ইচ্ছা ছিল, শ্রীকাশীতে গিয়া সেখানেই সদা সর্ব্বকাল বাস করিব। প্রপঞ্চের বিষয়মাত্রই যে দুঃখের কারণ, ইহা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিলাম। পরন্তু দেহ-প্রারব্ধ বলবান্। গোওয়াল্হেরীতে আসিলে, সকলেই (কাশী যাইতে) নিষেধ করিতে লাগিলেন। "একবার দেশে ফিরিয়া যাইতে হয়; জননীর শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিতে হয়। কাশী গেলে পর এ সব আর কিরূপে ঘটিবে? পাণিপতগমনের পরিণাম ত এই হইল; এখন কাশীতে গিয়া আবার কি ঘটে, বলা যায় না।" ইত্যাকার চিন্তা মনে উদিত হওয়ায়, অবশিষ্ট সৈন্যসামন্তগণের সঙ্গে দেশে (ফিরিয়া) আসিতে লাগিলাম।

গোওয়ালিয়রে আগমন।

কাশীবাসের সঙ্কল্প।

শ্রীমন্ত নানা সাহেব (বালাজী বাজীরাও) পাণিপতের সংবাদ শ্রবণ করিয়া, গুরুজীর নিকট পুনঃপুনঃ আমার স্মরণ করিতেন। "তাহার (নানা ফড়নবীসের) শরীর দুর্ব্বল; কিরূপে তাহার নির্ব্বাহ হইবে?" ইহাই তাঁহার ভাবনা। কিন্তু ঈশ্বরকৃপায় ও তাঁহার (শ্রীমন্তের) আশীর্ব্বাদে মহা সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইলাম। পরে, বর্হাণপুরে শ্রীমন্ত নানা সাহেবের দর্শন হইল। দেখিলাম, তাঁহার শরীর অতিশয় ক্ষীণ হইয়াছে। মেজাজ অতিশয় খিট্‌খিটে হইয়াছে। ক্ষণে ক্ষণে অনেকেই (তাঁহার নিকট) অপমানিত হইতেন। কিন্তু আমার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া সস্নেহে আমার সহিত সম্ভাষণ ও কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সমস্ত বলিলাম। তিন চারি দিন (তাঁহার) সঙ্গে থাকিলাম।

পেশওয়ের স্নেহ।

(এই সময়ে) শ্রীমন্ত গোপিকা বাঈ ও নারায়ণ রাওর বসন্ত রোগ হইল; এজন্য (গোপিকা বাঈ) তৎসহ (নারায়ণরাওর সহিত) নর্ম্মদাতীরে (গিয়া) থাকিলেন। পরস্পর উভয়ের মধ্যে (শ্রীমন্ত নানা সাহেব ও গোপিকা বাঈর মধ্যে?) মনোমালিন্যও জন্মিয়াছে জানিতে পারিলাম। যাহা ঘটা উচিত নহে, কালবৈপরীত্যবশতঃ তাহাও ঘটিল। অনন্তর, 'শ্রীমন্তের এরূপ কোপন

টোকে যাত্রা।

স্বভাব, তাঁহার নিকটে থাকিলে কখন কি ঘটিতে কি ঘটে,' ইহা ভাবিয়া, শ্রীমন্তের নিকট "টোকেঁ" গ্রামে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। "যাও" বলিয়া অনুমতি দিলেন।

শ্রীমন্তের অনুগ্রহ। টোকেঁ গ্রামে গিয়া থাকিতে লাগিলাম। কিছু দিন পরে শ্রীমন্তও সেখানে আসিলেন। পুনরায় তাঁহার দর্শন করিলাম। তাঁহার প্রকৃতি অতিশয় খিট্‌খিটে থাকা সত্ত্বেও, তাঁহার নিকট একটি শালগ্রাম শিলা চাহিলাম। তিনি বহু কৃপা করিয়া আদেশ করিলেন যে, "ক্ষেত্র (?) হইতে যেটি ইচ্ছা হয়, সেইটি লও।" আমি সীতারামচন্দ্রের মূর্ত্তি গ্রহণ করিলাম।

সেখানে অবস্থানকালে এক দিবস "প্রদোষ" (শিবব্রত বিশেষ) আসিল। সেদিন শ্রীমন্ত বড় রাও সাহেবের (অর্থাৎ ৺বাজীরাও বল্লাল পেশওয়ের) (বার্ষিক) শ্রাদ্ধোপলক্ষে (শ্রীমন্ত

শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ। নানা সাহেব) আমায় ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। আমি নিবেদন জানাইলাম যে, "অদ্য আমার প্রদোষব্রত।" তথাপি "[আপনি ভোজন করিতে] আসিবেন" এইরূপ আদেশ হইল। পরে শ্রীমন্ত যখন দেবদর্শনের জন্য

আপত্তি। (মন্দিরে?) যাইতেছিলেন, তখন গুরুজীর দ্বারা জিজ্ঞাসা করাইলাম। তখনও আদেশ হইল যে, "অদ্য রাও সাহেবের শ্রাদ্ধ হইবে; এ নিমিত্ত অবশ্য ভোজন করিতে আসিবেন।" শ্রীমন্তের আদেশ অনুসারে গমন করিলাম।

নিমন্ত্রণ-রক্ষা। শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণগণের ভোজনাদি পরিসমাপ্ত হইলে, স্বয়ং শ্রীমন্ত ভোজন করিতে বসিলেন। একপার্শ্বে শ্রীমন্ত মাধব রাও ও অপর পার্শ্বে আমাকে বসাইলেন। দ্বিতীয়া পত্নীর (রাধাবাঈর) হস্তে পরিবেশন করাইলেন। পরিবেশনের প্রথা তাঁহাকে শিখাইলেন। প্রত্যুত জননীর দ্বারা সন্তানকে পরিবেশন করাইলেন।

অনন্তর, শ্রীমন্তের নিকট নিবেদন করিলাম যে, কিছুদিন গঙ্গাতীরে (গোদাবরী তীরে) বাস করিয়া চিত্তকে স্থির করিতে মানস করিয়াছি।" এই প্রার্থনা মতে (আমার) কিছুদিন গঙ্গাতীরে থাকিবার আদেশ হইল।

শ্রীমন্ত কুচ করিয়া পুণায় গমন করিলেন। তখনও তাঁহার শরীর ক্ষীণই ছিল; "শ্রীমন্তের অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী; এ কারণে শীঘ্র আসিবেন;" (সহসা) এই মর্ম্মের কয়েকটি পত্র

শ্রীমন্তের অন্তিমকাল। আসিল। 'তাঁহারই অন্নে শরীর প্রতিপালিত, অতএব এ সময়ে তাঁহার নিকটে থাকা উচিত', এই ভাবিয়া পুণায় আসিতে লাগিলাম। পথিমধ্যে "পারণের" নামক স্থানের নিকট আসিয়া সংবাদ পাইলাম যে, শ্রীমন্ত কৈলাসবাস করিয়াছেন। শ্রীমন্ত দাদা সাহেবের কয়েকটি পত্র আসিল যে, "অবশ্য আসিবেন।" তদনুসারে পুণায় আসিলাম। শ্রীমন্ত (নানা সাহেব) 'দেব-দেবেশ্বর' সন্নিধে কৈলাসবাসী হইলেন শুনিয়া মনে কষ্ট হইল।

পরে, দাদাও (দাদাসাহেবও) আমার প্রতি কৃপা ও স্নেহ প্রকাশ করিলেন। অনন্তর, (দাদাসাহেব) শ্রীমন্ত রাজশ্রী মাধবরাও সাহেবকে "পেশওয়াইর বস্ত্র" দেওয়াইবার

সেতারায় গমন। জন্য সাতয়ায় (সেতারায়) লইয়া গেলেন। (সেখানে গিয়া), "রাজদ্বারে (ফড়্‌নবীসের) বস্ত্র (পরিচ্ছদ) লইবার জন্য আমাদের সঙ্গে চলুন;" বলিয়া (দাদাসাহেব) অনেক অনুরোধ করিলেন। আমি মিনতি করিয়া বলিলাম যে, "আমাদের যাইবার আবশ্যকতা কি? আপনি আমাদের প্রভু।" এইরূপ বলিয়া আমি আর সাতারায় রাজদরবারে গেলাম না।

ইহার পর শ্রীমন্ত (মাধবরাও) সাতারাধিপতির অনুমতি লইয়া পুণায় আসিবার জন্য

যাত্রা করিলেন। আমি সঙ্গেই ছিলাম। পথে যাইতে যাইতে দেখিলাম, এক জন "গারদী" (শিক্ষিত পদাতিসৈনিক) সকলের সমক্ষে, বলপূর্ব্বক ধান্যক্ষেত্রস্থিত কোনও এক কুণবী-(কৃষক)-জাতীয়া রমণীর দেহের উপর গিয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ জনৈক অশ্বারোহী সৈনিক এক বল্লমের আঘাতে তাহার প্রাণবধ করিল। তখন কামুকের দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করিলাম। অতঃপর শ্রীমন্ত (মাধবরাও) নীরা নদী উত্তীর্ণ হইয়া অপর পারে গমন করিলেন। আমরা আগামী কল্য নদী পার হইবার মানসে, সেদিন "পিম্পরোল" নামক গ্রামে থাকিয়া গেলাম। (পরদিন) নদীতে বান্ পড়িয়া (নদীর জল অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়া) ছিল বলিয়া (আমরা) নৌকায় আরোহণ করিলাম। নৌকা, মধ্যধারার সমীপবর্ত্তী হইবামাত্র, প্রবল স্রোতে পতিত হইল। তখন মাঝিরা বলিল, "আর আমাদের উপায় নাই।" সম্মুখে অনতিদূরে একটি শৈল দেখা গেল। তাহাতে আঘাত লাগিলে নৌকা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে এবং আমাদিগেরও জীবনের শেষ হইবে, ভাবিয়া, ঈশ্বর-স্মরণ করিতে লাগিলাম। এমন সময়, দু'জন লোক নদীগর্ভে লাফাইয়া পড়িয়া নৌকা টানিয়া বাহির করিল। ক্ষীরাব্ধি-শয়ন মহাবিষ্ণু (এ যাত্রা এইরূপে) রক্ষা করিলেন। পরে, পুণায় আসিলাম। সে সময়, শ্রীমন্ত (মাধব রাও) অনুগ্রহ করিয়া, কাজকর্ম্মে মনোযোগ প্রদান করিতে আদেশ করিলেন।"

কামুকের দুর্দ্দশা।

নদীগর্ভে প্রাণসঙ্কট।

নানা ফড়নবীসের আত্ম-চরিত-কথন এইখানেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

প্রাকৃত সৃষ্টি।

এক কাল ছিল, যখন কিছুই ছিল না; যাহা কিছু দেখা যায়, যাহা অনুভবগোচর বা অনুমানগম্য, তাহার কিছুই ছিল না; কেবল ছিলেন এক জন, যিনি অনুভবগোচর বা অনুমানগম্য নহেন; অন্ততঃ মানবজাতির অধিকাংশের পক্ষে নহেন; তিনি ইচ্ছা করিলেন, সৃষ্টি হউক, অমনি সব হইল; যাহা কিছু দেখা যায় বা দেখা যাইবে, বা দেখা যাইবার সম্ভব, সবই অকস্মাৎ আবির্ভূত হইল। এইরূপ একটা সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার বর্ণনা আছে; তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচনা বা বর্ণনার বিষয়ীভূত নহে। সুস্থ মনুষ্যের আলোচ্য বটে কি না—সে কথা স্বতন্ত্র।

প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, ইত্যাদি ইত্যাদি; ক্রমে আকাশ, আকাশাৎ বায়ু এইরূপ, অথবা এই জাতীয় অপরবিধ সৃষ্টিপ্রণালীর বর্ণনা আছে, যাহা উন্নত মনুষ্যত্বের পরিণত চিন্তার ফল, যাহাকে দার্শনিক সৃষ্টি অভিধান দেওয়া যায়,—তাহা স্থানান্তরে আলোচিত হইয়াছে। এখানে পুনরুল্লেখের আবশ্যকতা নাই।

প্রাকৃত সৃষ্টি এই প্রবন্ধের আলোচ্য। সৃষ্টি শব্দের অপপ্রয়োগ হইতেছে কি না, ঠিক বলা যায় না। যে ঘটনা কবে আরম্ভ হইয়াছে জানি না, কবে শেষ হইবে তাহার ঠিকানা নাই, যাহা চলিতেছে; মনুষ্যদৃষ্টি অতীত অতিক্রম করিয়া যতদূরে পৌছিতে পারে বা পৌছিতে সাহস করে, এবং সুদূর অতীতের তামসী কুজ্ঝটিকার অভ্যন্তর দিয়া না দেখিয়াও দেখে বা দেখিয়াও দেখে না, সেই অবধি আজি পর্য্যন্ত যে ঘটনা বোধ করি সমান ভাবে চলিতেছে; সেই ঘটনাকে সৃষ্টি বলিলে যদি বিশেষ ভাবাগত অপরাধ না হয়, তবে সৃষ্টি বলিতে পারা যায়। আমি এইরূপে আমার সম্মুখে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডরূপ একটা মহা ব্যাপার দেখিতে পাইতেছি। আমার আত্মপ্রসারণের সহিত, কি কারণে জানি না, ইহার পরিসর ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছে, ইহার পরিধি ক্রমে সরিয়া যাইতেছে। ইহার পরিসরের সীমা কোথায় নির্দ্ধারণ করিতে পারি না, ইহার জটিলতারও অন্ত কোথায় তাহাও নিরূপিত হয় না। তথাপি এই দুর্ভেদ্য জটিলতার গ্রন্থি কতক উন্মোচন করিয়া শৃঙ্খলের পরম্পরা সূত্র কতক আবিষ্কার করিতে না পারিলে জীবনযাত্রা চলে না। তাই যেরূপে হউক, একটা শৃঙ্খলার আবিষ্কার করিতে মন স্বতই ধায়। এই শৃঙ্খলা আবিষ্কারের নিমিত্ত, এই গ্রন্থি উন্মোচনের নিমিত্ত, মনুষ্য জাতির অবলম্বিত প্রকৃষ্ট পদ্ধতির নাম বৈজ্ঞানিক রীতি। মনুষ্যমাত্রই কতক না কতক পরিমাণে এই বৈজ্ঞানিক রীতি অবলম্বন করিয়া চলিতেছে। তাই জীবনযাত্রা চলিতেছে; এবং মোটের উপর জীবনযাত্রার সফলতা ধরিয়া অবলম্বিত রীতির বৈজ্ঞানিকতা পরিমিত হইতে পারে।

যাহাই হউক, মানুষের মন এই শৃঙ্খলা আবিষ্কার করিতে চায়, এবং শৃঙ্খলার পরম্পরা ও সূত্র ধরিয়া অতীত কালের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে এক স্থানে গিয়া পরাহত হইতে বাধ্য হয়। সেইখানে জগতের আদি কল্পনা করে ও তৎপর হইতে সৃষ্টি ব্যাখ্যান করিতে চায়। সেই আদিতে কেমন ছিল, তার পর কেমন হইল, তার পর কেমন হইল, এইরূপে চলিয়া এখন যেরূপ আছে, তাহাতে পৌছিতে চেষ্টা করে। এই চেষ্টা পূর্ব্বেও হইয়াছিল, এখনও হইতেছে, ও পরেও হইবে। চেষ্টার বৈজ্ঞানিকতার ক্রম আছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা এখনকার দৃষ্টিতে প্রকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক রীতির সহিত ঠিক সঙ্গত হয় না। আবার এখন যে চেষ্টা হইতেছে, তাহা আর কিছু দিন পরে হয় ত বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিকতার অনুমোদিত হইবে না। তা নাই হউক, মনুষ্যের এই

চেষ্টা স্বাভাবিক, সঙ্গত ও স্বাস্থ্যের পরিচায়ক, এবং ইহার আলোচনা-তেও লাভ আছে।

ফলে বহুদিন হইতে আজি পর্য্যন্ত প্রাকৃত সৃষ্টির বহুবিধ বিবরণ মানুষের বিজ্ঞানেতিহাসে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। সেই আদিতে কি ছিল? সেই আদি, অর্থাৎ যে আদির পূর্ব্বে আমাদের দৃষ্টি চলে না, যেখানে পৌছিয়া আমাদের যুক্তিপ্রণালী পরাহত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়। কেহ বলিয়াছেন, তখন ছিল জল আর জল। কেহ বলিয়াছেন, আকাশ আর আকাশ; কেহ বলিয়াছেন, আগুন আর আগুন। জল হইতে বা আগুন হইতে বা আকাশ হইতে এইরূপে, এইরূপে, এইরূপে, অধুনা প্রতীয়মান জগৎ বিকশিত হইয়াছে, ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আধুনিকেরা কি বলেন, একটু আলোচনা করা যাইতে পারে। আদিতে কি ছিল? যতদূর অনুমান হয়, জলও নহে, আগুনও নহে, বোধ হয় বায়ু আর বায়ু; হইতে পারে, তৎপূর্ব্বে ছিল আকাশ আর আকাশ। আজ কাল আধুনিকেরা বায়ু লইয়াই আরম্ভ করেন।

আধুনিকদের প্রথম ইমানুয়েল্ ক্যাণ্ট। লুক্রিশিয়স্ বা দিমক্রিটসের কথা আনিবার দরকার নাই; কেন না, এক হিসাবে তাঁহারা আধুনিক বলিয়া গণ্য হয়েন না। ইমানুয়েল্ ক্যাণ্ট এই হিসাবে আধুনিক। ক্যাণ্ট নিউটনের পরবর্ত্তী। এবং নিউটন জগৎ শৃঙ্খলের জটিলতম গ্রন্থির উন্মোচক।

ক্যাণ্ট বলিলেন, আদিতে সূর্য্য ছিল না, পৃথিবী ছিল না, গ্রহ উপগ্রহ ছিল না। সমগ্র জড় বিস্তৃত দেশ ব্যাপিয়া বায়ুর আকারে অবস্থিত ছিল। বায়ুর আকারে, তবে সে বায়ু আমাদের বায়ুর মতও নহে; ইহার অপেক্ষা সহস্রগুণে লঘু। আবার সে বায়ুতে সোণা ছিল, লোহা ছিল, রূপা ছিল, ইত্যাদি। জড় পরমাণুর মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ ছিল, তাই বায়ু ক্রমে স্থানে স্থানে জমাট বাঁধিয়া ছোট বড় পিণ্ডে পরিণত হইয়া সূর্য্য গ্রহ উপগ্রহাদিতে পরিণত হইয়াছে।

ক্যাণ্টের পর উইলিয়ম হর্শেল। হর্শেল বহুসংখ্যক নীহারিকার আবিষ্কর্ত্তা। ছায়াপথ সহজ চোখে কোয়াসার মত দেখাইতে পারে, কিন্তু যন্ত্রযোগে অতি-দূরস্থ সংখ্যাতীত নক্ষত্রের সমষ্টি বলিয়াই ধরা পড়ে। কিন্তু নীহারিকা নীহারিকা মাত্র; ধুঁয়া অথবা কোয়াসার মত, উৎকৃষ্ট যন্ত্রের কাছেও তাহার কুজ্ঝটিকাত্ব লোপ পায় না; নক্ষত্রপুঞ্জ বলিয়া বোধ হয় না। হর্শেল বলিলেন, ঐ জগৎ নির্ম্মাণের মশলা এখনও কিছু কিছু স্থানে স্থানে বর্ত্তমান আছে। ঐ কুজ্ঝটিকার মত যে বায়বীয় পদার্থ ঈষদ্দীপ্ত অবস্থায় দেখা যায়, উহাই এক-

কালে সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া ছিল। কালে জমাট বাঁধিয়া সূর্য্য নক্ষত্র গ্রহ উপগ্রহাদির নির্ম্মাণ ঘটিয়াছে? কোনও স্থানে ভাল জমাট বাঁধিয়াছে, কোনও থানে বা বাঁধিতেছে, কোনও থানে বা বাঁধে নাই; বিস্তীর্ণ নভঃপ্রদেশ অনুসন্ধান করিলে সকল অবস্থারই পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রায় সমকালে লাপলাস্। লাপলাস্ বলিলেন, আদিকালে সেই বায়ুরাশি বিশাল আবর্ত্তের মত একটা কেন্দ্রের চারি দিকে ঘুরিত। মাধ্যাকর্ষণে আবর্ত্ত ক্রমে ঘনীভূত হইতে লাগিল; তাহার পরিধি পরিসর ক্রমে কমিতে লাগিল। আবর্ত্তের পরিসর কমিলে আবর্ত্তনের বেগ ক্রমে বাড়ে, এই একটা নিয়ম সচরাচর দেখা যায়। আবর্ত্তনশীল বায়ুময় পিণ্ডের মেরুদেশ ক্রমে চাপিয়া যায়, ও মধ্যদেশ অর্থাৎ নিরক্ষদেশ ক্রমে স্ফীত হইয়া শেষ পর্য্যন্ত অঙ্গুরীর আকারে ছাড়িয়া আসে। সেই অঙ্গুরী আবার কালক্রমে ছিন্ন ভিন্ন ঘনীভূত ও পরে একত্রিত হইয়া গ্রহের সৃষ্টি করিয়া মধ্যবর্ত্তী আবর্ত্তনশীল সূর্য্যের চারি দিকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। এইরূপে মধ্যস্থ সূর্য্য ক্রমে ঘনীভূত ও স্বল্পায়তন হইতে থাকে, আর তাহা হইতে একটা একটা অঙ্গুরী ছাড়িয়া এক একটা গ্রহের সৃষ্টি করে। সূর্য্য বা নক্ষত্র হইতে যে পদ্ধতিতে গ্রহের উৎপত্তি হয়, গ্রহ হইতে সেই পদ্ধতিতে ক্রমে উপগ্রহের সৃষ্টি হয়।

এই সেই লাপলাসের উদ্ভাবিত বিখ্যাত নীহারিকাবাদ; ইংরাজিতে নেবুলার থিওরি। এই সৃষ্টি-ব্যাখ্যার ভিতরে যতটুকু কবিত্বরস আছে, কেহ কেহ বলেন, সে পরিমাণে যুক্তিরস নাই। তথাপি এই সৃষ্টিব্যাখ্যার একটা অপূর্ব্ব মোহকর আকর্ষণ আছে; যেখানে সম্পূর্ণ আঁধার ছিল, সেখানে ইহার সাহায্যে আলো পাওয়া গিয়াছে। সৌর জগতের অন্তর্বর্ত্তী গ্রহমাত্রই পশ্চিম হইতে পূর্ব্বমুখে ঘুরে কেন? সকলেরই ভ্রমণপথ প্রায় এক সমতলক্ষেত্রে অবস্থিত কেন? প্রায় সকলেই একই মুখে নিজ নিজ ধ্রুবরেখার উপরে আবর্ত্তন করে কেন? গ্রহগণের মধ্যে যে গুলি বড়, মোটের উপর তাহাদের উপগ্রহের সংখ্যা অধিক, মোটের উপর তাহারা এখনও অপেক্ষাকৃত উত্তপ্ত রহিয়াছে, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা আছে, যাহা পূর্ব্বে প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হইত। লাপ্লাসের সৃষ্টিব্যাখ্যা স্বীকার করিলে সেই সকল প্রহেলিকার সমস্যা কতকটা মীমাংসিত হয়। আবার শনৈশ্চরের অঙ্গুরী, মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝে এত গুলি [illegible] ক্ষুদ্র গ্রহের অবস্থান, এ সকলেরও কতকটা সঙ্গত তাৎপর্য্য পাওয়া যায়।

তথাপি যখন বড় হর্শেলের পুত্র ছোট হর্শেল, প্রচণ্ডশক্তিশালী যন্ত্রপ্রয়োগে পিতার আবিষ্কৃত অনেকগুলি নীহারিকাকে নক্ষত্রপুঞ্জমাত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন, তখন এই মোহকর সৃষ্টিবিবরণের প্রতি পণ্ডিতগণের আস্থা কমিয়া গেল। স্বনামখ্যাত দার্শনিক কম্‌ট্‌, গণিতপ্রয়োগে নীহারিকা হইতে সৌরজগতের সমুদয় খুঁটিনাটী উৎপত্তির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া গণিতবিৎগণের তীব্র ব্যঙ্গ ও উপহাসের ভাগী হইলেন। সাব্যস্ত হইল, নীহারিকা বায়বীয় পদার্থ নহে, দূরস্থ নক্ষত্রপুঞ্জ মাত্র। কুজ্ঝটিকার মত দেখায়, কেবল দূরে অবস্থান প্রযুক্ত। উহারা জগৎ নির্ম্মাণের মশলা নহে; সুপরিণত সুগঠিত পূর্ণাবয়ব বহুসংখ্য জগতের সমবায় মাত্র।

এই রূপ অবস্থা, এমন সময়ে কির্কফের আবিষ্কৃত আলোক বিশ্লেষণ প্রণালী বৈজ্ঞানিকের হস্তে নূতন, অচিন্তিতপূর্ব্ব, প্রচণ্ড শক্তি আনিয়া দিল। জ্ঞানের ইতিহাসে সেই এক দিন।

বস্তুতই সেই এক দিন। নিউটন শুভ্র সূর্য্যালোকের ভিতর হইতে রক্ত নীল পীত নানা বর্ণের রশ্মি বাহির করিয়াছিলেন। * কির্কফের আদেশে সেই রক্ত নীল পীত বিবিধ বর্ণের বিচিত্র রশ্মিগুলি কথা কহিতে লাগিল। কে কোথা থাকে, কে কোথা হইতে আসে, কির্কফের আদেশে দ্বিধাহীন চিত্তে, অকপট ভাবে মন্ত্রমুগ্ধের মত বলিয়া ফেলিতে লাগিল। কির্কফের প্রচণ্ড উইল্ ফোর্স্ ছিল, সন্দেহ নাই।

ফলে সেই দিন হইতে রক্ত নীল পীত রশ্মিগুলি আপন আপন কাহিনী বিবৃত করিতে লাগিল। কেহ বলিল, আমি থাকি নুনে; কেহ বলিল, আমি থাকি চূণে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

যে যেখান হইতে আসিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে আরও কত খবর ছিল। ঐ নক্ষত্রটা এই বেগে দূরে যাইতেছে, ঐ নক্ষত্রটা এই বেগে কাছে আসিতেছে, ঐ নক্ষত্রটা এই কারণে জ্বলিয়া উঠিল, ঐখানে অগ্নিকাণ্ড ঘটিল, ঐখানে দুইটায় ধাক্কা লাগিল, সূর্য্যমণ্ডলের ঐখানে ঝড় বহিতেছে, ইত্যাদি কত কথাই বলিতে লাগিল।

---

* নিউটনের পূর্ব্বেও শুভ্র সূর্য্যালোক বিশ্লিষ্ট হইয়া রক্তপীতাদি বর্ণের বিকাশ করিত। তবে নিউটন সেই বিশ্লেষণ ঘটনায় যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার পূর্ব্বে কেহ দেখে নাই। নিউটন একবার দৃষ্টিপাত করিলেই প্রকৃতিদেবী তাঁহার গূঢ় রহস্যগুলি আপনা হইতে বলিয়া ফেলিতেন। এ একরকম হিপ্‌নটিজম বা বশীকরণবিদ্যা।

প্রকাশ পাইল, সূর্য্য কতকটা জমাট বাঁধিয়াছে, তবে উহার মণ্ডলকে আবরণ করিয়া এখনও বায়ু রহিয়াছে। আর সে বায়ুতে তামা লোহা দস্তা পর্য্যন্ত বর্ত্তমান। যে সকল বস্তু সূর্য্যে আছে, তাহার সবই পৃথিবীতে রহিয়াছে; হইতে পারে, এত বড় প্রকাণ্ড সূর্য্যে এমন দুই চারিটা পদার্থ আছে, যাহা পৃথিবীতে মিলিবার সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু সূর্য্যমণ্ডলে পার্থিব উপকরণই বর্ত্তমান, পার্থিব মশলাতে সূর্য্য মণ্ডল নির্ম্মিত। সূর্য্য একটা প্রকাণ্ড তপ্ত ভয়াবহ পৃথিবী। নক্ষত্র গুলাও তাই। সেই সব উপকরণেই নির্ম্মিত। কোনটায় কোন পদার্থ বেশী আছে, কোনটায় হয় ত কম আছে, এই মাত্র; কোনটা একটু বেশী গরম, কোনটা একটু কম গরম, এই পর্য্যন্ত। আর নীহারিকা কি? নীহারিকা বস্তুতঃই নীহারিকামাত্র, তাহাতেও পার্থিব উপকরণই বিদ্যমান; কিন্তু এখনও জমে নাই, এখনও লোহা সীসা দস্তা তামা যাহা কিছু সেখানে আছে, সবই বায়ুর আকারে। কালে জমিয়া যাইবে। কোনটা জমিতেছে, কোনটা নক্ষত্রে প্রায় পরিণত হইয়াছে, কোনটা বা হইবার উপক্রম করিতেছে, ইত্যাদি।

আজ হেল্‌ম্‌হোল্‌ট্‌জ্ নাই; কিন্তু তখন হেল্‌ম্‌হোল্‌ট্‌জ্ উগ্র প্রতিভার তীব্র আলোকবর্ত্তিকা হস্তে অজ্ঞানের তিমির রাজ্যে অগ্রসর হইতেছিলেন। হেল্‌ম্‌হোল্‌ট্‌জ্ বলিলেন, সূর্য্যের এই তেজ আইসে কোথা হইতে। বৎসর বৎসর রাশি রাশি তেজের অপচয় হইতেছে, অথচ ভাণ্ডারের যেন ক্ষয় নাই। সামান্য একটা আগুন বজায় রাখিতে কাঠ বা কয়লা চায়, তেল চায়; একটা স্ফুলিঙ্গ উৎপাদনের জন্য বেগে চকমকি ঠুকিতে হয়। সূর্য্যের এই তাপ ভাণ্ডার সঞ্চয় হইতেছে কোথা হইতে? কাঠ, কয়লা, গন্ধক, উদজান? সমস্ত সূর্য্যমণ্ডলটা ঐ সব দাহ্য পদার্থে নির্ম্মিত হইলেও এত কাল ধরিয়া এত অপব্যয় সহিত না। সংঘাত? সমস্ত গ্রহ উপগ্রহের সংঘাতেও এত তাপ জন্মে না। হেল্‌ম্‌হোল্‌ট্‌জ্ এ সব হিসাবে বড়ই নিপুণ ছিলেন। * এক মন ওজনের একটা উল্কাপিণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের প্রান্তদেশ হইতে উপনীত হইয়া সূর্য্যমণ্ডলকে অকস্মাৎ একটা ধাক্কা দিলে দিবাকরের ক্রোধাগ্নি এক ডিগ্রির কত ভগ্নাংশ উদ্দীপিত হইবে, এবং তাহার এই আকস্মিক চাঞ্চল্য টুকু অপনীত হইতেই বা এক সেকেণ্ডের লক্ষভাগের কত ভগ্নাংশ সময় অতীত হইবে, তাহা অকা-

---

* বলা বাহুল্য, তৎশিষ্যবর্গের প্রসাদে আজ কাল অর্ব্বাচীন নাবালকেও এইরূপ হিসাব গুলা এক নিশ্বাসে সম্পন্ন করিয়া ফেলে।

তরে ও অটলগাম্ভীর্য্যের সহিত হিসাব করা, হেল্ম্‌হোল্‌টজের অভ্যাস ছিল। তবে সূর্য্যের তাপ জন্মে কিসে? এক মাত্র উপায় আছে। সূর্য্যদেব আপনার বিপুল কলেবর ক্রমশঃ সঙ্কুচিত করিতেছেন; সঙ্কুচিত করিতেছেন ও গরম হইতেছেন। তবে দেবতার কোপ অনেক সময়ে শুভ ফল আনয়ন করে। তিনি গরম হইতেছেন; আর সুদূরে আমাদের এই ক্ষুদ্র ভূমণ্ডলে জল পড়িতেছে, বায়ু বহিতেছে, উমেশ ছুরিতে হাত কাটিয়া ফেলিতেছে, ও প্রবন্ধ-লেখকের আক্রমণ নিরীহ পাঠকের উপর হঠবিক্রমে আপতিত হইবার অপেক্ষা করিতেছে!

ফলে সূর্য্য ক্রমেই কলেবর সঙ্কোচ করিতেছেন; ক্রমেই জমিতেছেন; অদ্যাপি মোটের উপর পৃথিবীর তুলনায় একটু হাল্‌কা আছেন। কিন্তু সঙ্কোচনের একটা সীমা আছে। কুবেরের ভাণ্ডারেরও বোধ করি ক্ষয় আছে; সূর্য্যদেবের তাপের ভাণ্ডারও কালক্রমে নিঃশেষিত হইবে। কত দিনে হইবে, তাহারও মোটামুটি হিসাব দেওয়া যাইতে পারে। তবে সে ভবিষ্যতের আশঙ্কায় লেখকের বা পাঠকের কোনও চিন্তা নাই। তৎপূর্ব্বে বহুল পাঠকবংশ বিলুপ্ত হইবে, এবং বহুলতর প্রবন্ধ প্রকটিত হইবে।

সৃষ্টিঘটনা লইয়া কথা। এমন কাল ছিল, সূর্য্যের কলেবর আরও বিশাল ছিল। সম্ভবতঃ, সমগ্র সৌরজগৎটা অথবা আরও বিস্তৃততর প্রদেশ ব্যাপিয়া ছিল। সূর্য্যে এখন যে সোণা রূপা লোহা বর্ত্তমান আছে বা ভবিষ্যতে যে মাণিক মুক্তার উদ্ভব হইতে পারে, তাহা এক কালে বায়ুর আকারে যথা তথা বিন্যস্ত হইয়া বোধ করি বিশাল বাতাবর্ত্তে বিশাল জগৎ ব্যাপিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। লাপলাসেরও ত এই অনুমান।

সূর্য্য সম্বন্ধে যাহা, অন্যান্য নক্ষত্রগণ সম্বন্ধেও তাহাই। তাহারাও ত ছোট বড় সূর্য্য। সুতরাং আদিতে এখন ব্রহ্মাণ্ডের পরিধি যতদূর দেখা যাইতেছে, সেই পরিধির অভ্যন্তরে সমগ্র প্রদেশটাই নীহারিকাব্যাপ্ত বা বায়ুব্যাপ্ত ছিল।

নীহারিকা হইতে জগতের উৎপত্তিঘটনা স্থূলতঃ এইরূপ। ইহার উপর আর দুই চারিটা কথা আছে। সম্প্রতি এই কথাগুলা উঠিয়াছে।

প্রতি রাত্রেই আমরা সহজ চোখে দুই চারিটা, যন্ত্রযোগে দু শ পাঁচ শটা নক্ষত্রপাত দেখিতে পাই। বস্তুতঃ উহা নক্ষত্রপাত নহে। নক্ষত্রপাত পৃথিবীর পক্ষে বড় বিভ্রাটব্যাপার, পৃথিবীর অদৃষ্টে তাহার সম্ভাবনাও বিরল। বরং নক্ষত্রবিশেষে পৃথিবীপাত ঘটিতে পারে, পৃথিবীতে নক্ষত্রপাত ঘটিবার

কল্পনা করিতে পারি না। যাহা পৃথিবীতে পড়ে, তাহা নক্ষত্র নহে, তাহা উল্কাপিণ্ড; ক্ষুদ্র পদার্থ, দুই দশ রতি হইতে দু দশ মোণ পর্য্যন্ত। সৃষ্টি-ছাড়া পদার্থে নির্ম্মিত নহে; মোটামুটি লোহা আর মাটি। কখন কাহারও মাথায় পড়িয়াছে কি না, ইতিহাসে সচরাচর দেখা যায় না; তবে লোকের নিকটে পড়িয়াছে ও সংগৃহীত হইয়াছে। আমাদেরই মিউজিয়মে অনেকগুলি উল্কাপিণ্ড পতনের ও সংগ্রহের দিন তারিখ সমেত সংগৃহীত আছে। বেশীর ভাগই এত ছোট যে, ভূবায়ুতে বেগে প্রবেশ করিয়া বায়ুর আঘাতে তপ্ত হইয়া জ্বলিয়া যায়। ভূমি পর্য্যন্ত পঁহুছে না; অথবা চূর্ণ হইয়া বায়ুতে বহুকাল ধরিয়া ভাসিতে থাকে। কালে অধঃপতিত ও সাগরতলস্থ পর্য্যন্ত হইতে পারে। শুনা যায়, মহাসাগরের গর্ভ হইতেও এই রূপ উল্কাচূর্ণ সংগৃহীত হইয়াছে।

ফলতঃ, সমগ্র নভঃপ্রদেশে এইরূপ ছোট বড় উল্কাপিণ্ড ছড়ান আছে; পৃথিবী চলিতে চলিতে তাহার কতকগুলি ক্রমে আত্মসাৎ করিতেছে। শূন্য দেশের স্থানে স্থানে এইরূপ উল্কাপিণ্ডের পাল কোটি কোটি কোটি একত্রে দল বাঁধিয়া পঙ্গপালের মত বিস্তৃত দেশ ছাইয়া চলিয়াছে। পৃথিবীর সহিত কখন কখন এইরূপ এক একটা উল্কাদলের দেখা সাক্ষাৎ হয়; তখন আর কেবল উল্কাপাত ঘটে না; তখন উল্কাবৃষ্টি ঘটে। যেমন জলবৃষ্টি বা শিলাবৃষ্টি, অথবা কবিগণের পুষ্পবৃষ্টি, সেইরূপ উল্কাবৃষ্টি; দেখিতে অগ্নিবৃষ্টির মত। বাঙ্গলা ১২৯২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের উল্কাবৃষ্টি অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে। এইরূপ উল্কাবৃষ্টি—লক্ষ লক্ষ লক্ষ উল্কাপিণ্ডের পৃথিবীতে পতন—জ্বলিতে জ্বলিতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত ভূবায়ুতে প্রবেশ।

ইহার মধ্যে আর একটি রহস্যের কথা আছে। মাঝে মাঝে ভীমপুচ্ছ উড়াইয়া ধূমকেতু আসিয়া দেখা দেয়। কয়েকটি ধূমকেতুর ভ্রমণপথ নির্দ্দিষ্ট উল্কাদলের ভ্রমণপথের সহিত অভিন্ন। এমন কি, ১২৯২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি পৃথিবী একটি পরিচিত ধূমকেতুর রাস্তা পার হইয়া যাইতেছিল; কিন্তু ধূমকেতুর সহিত সাক্ষাৎ না হইয়া একদল উল্কার সহিত সাক্ষাৎ হয়। লকিয়ার সাহেব দেখাইয়াছেন, ধূমকেতু যে আলো দেয়, মিউজিয়মের সংগৃহীত উল্কাপিণ্ড জ্বালাইয়াও ঠিক্ সেই আলো বাহির করিতে পারা যায়; এবং কির্কফের পর হইতে আলো কখন মিছা কথা কহে না। সুতরাং, সম্ভবতঃ ধূমকেতু উল্কাপিণ্ডের সমষ্টিমাত্র।

ফরাসীস্ পণ্ডিত ফে সাহেব প্রথমে কথাটা পাকাপাকি করিয়া তুলেন।

আদিকালে গ্রহ নক্ষত্র সমস্ত বায়ুর আকারে জগৎ ব্যাপিয়া ছিল এমন কি কথা আছে?

তখন জগৎ এই সকল উল্কাপিণ্ডে আকীর্ণ ছিল। বায়ুকণা ও উল্কাপিণ্ডে তফাত কি? বায়ুকণা কিছু ছোট, উল্কাপিণ্ড কিছু বড়। এখন যেমন স্থানে স্থানে উল্কাপিণ্ড দল বাঁধিয়া আছে, আর তদ্ভিন্ন সর্ব্বত্রই সমুদ্রে জলচরের মত বায়ুতে ধূলিকণার মত ছড়াইয়া আছে; তখনও উল্কাপিণ্ড সেইরূপ শূন্য-প্রদেশে ছড়াইয়া ছিল। কালে তাহারা একত্রিত হইয়া সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদির সৃষ্টি করিয়াছে।

জর্জ ডারুইন্ দেখাইয়াছেন, সংখ্যাতীত বায়বীয় পদার্থের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু সকল একত্রে ছুটাছুটী করিলে যে সকল ব্যাপার দেখা যায়, সংখ্যাতীত উল্কা-পিণ্ড একত্রে ছুটাছুটী করিলেও সেইরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে। গণনায় উভয় হইতে একরকমই ফল পাওয়া যায়। সুতরাং নীহারিকা বা বায়বীয় পদার্থ হইতে জগতের উৎপত্তি যেমন বুঝান চলে, কোটি কোটি কোটি উল্কার সমবায় হইতেও উহা সেইরূপ বুঝান যাইতে পারে। যুগল নক্ষত্রও স্থানে স্থানে দেখা যায়, দুইটি সূর্য্য পরস্পরকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, উল্কাপিণ্ডের সমবায় হইতে তাহাদেরও উৎপত্তি বেশ বুঝান চলে।

লকইয়ারের হাতে উভয় মতের কতকটা সমন্বয় হইয়াছে। উল্কাপিণ্ড আকাশে ছড়াইয়া আছে; স্থানে স্থানে দল বাঁধিয়া রহিয়া ঘুরিতেছে; গ্রহগণ যেমন সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে, তাহারাও সেইরূপ অনেকে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করি-তেছে; ধূমকেতু এইরূপ উল্কাপিণ্ডের দল; পরস্পর সংঘাতে ধূম বাষ্প বায়ু পর্য্যন্ত উদ্গীরণ করে। সৌরজগতের ভিতর কতকগুলি ধূমকেতু রহিয়াছে; তাহারা সূর্য্যকে ঘুরে। অনেকে সৌরজগতের বাহির হইতে, হয় ত অন্য নক্ষত্রজগৎ হইতে আসিয়া দেখা দেয়, এবং আমাদের সূর্য্যকে একবার ঘুরিয়া চিরদিনের জন্য চলিয়া যায়। কেহ কেহ বাহির হইতে আমাদের সৌরজগতে প্রবেশ করে, কিন্তু তাহার পর আর বাহিরে যায় না; ইহারই অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। লেবেরিয়ারের অনুমান মত ইংরাজি ১২৬ সালে এইরূপ একটা উল্কা-পাল বাহির হইতে সৌরজগতে প্রবেশ করিয়াছিল; তখন উরেনস্ বা ইন্দ্র গ্রহ তাহার পথের নিকট ছিল। উরেনসের আকর্ষণে তাহার পথ ঘুরিয়া যায়। তদবধি আমাদের সহিত তাহার স্থায়ী আত্মীয়তা জন্মিয়াছে। সেই অবধি প্রতি তেত্রিশ বৎসরে সেই উল্কাপাল সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে। তেত্রিশ বৎসর

অন্তর নবেম্বরের মাঝামাঝি পৃথিবীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটে, তখন পৃ-
থীতে উল্কাবর্ষণ ঘটিয়া থাকে। পৃথিবী এইরূপে উল্কাখণ্ড ক্রমেই আত্মস্থ
করিয়া পুষ্টিলাভ করিতেছে। উল্কাপুঞ্জের পরস্পর সংঘর্ষ ও সমবায় হইতে
পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে যদি ধরা যায়, তাহা হইলে সেই সংঘর্ষ অদ্যা-
চলিতেছে। পৃথিবীর নির্ম্মাণ এখনও সমাপ্ত হয় নাই। পৃথিবীর ন্যায় অন্যা
গ্রহেও এইরূপ চলিতেছে। সূর্য্যমণ্ডল ও বুধ গ্রহের মধ্যে শূন্য ব্যাপিয়া এইরূপ
অসংখ্য উল্কাপিণ্ডের অবস্থিতি রহিয়াছে, প্রমাণ পাওয়া যায়। পৃথিবীতে যাহা
সামান্যভাবে ঘটিতেছে, সূর্য্যে তাহা প্রচণ্ডভাবে ঘটিতেছে। সূর্য্যের উত্তাপের
কিয়দংশ এই সংঘর্ষ হইতে উদ্ভূত সন্দেহ নাই। সময়ে সময়ে এক একটা নক্ষত্র
জ্বলিয়া উঠে, দেখা যায়। এই সেদিনই ১২৯৮ সালের মাঘ মাসে উত্তর নভঃ-
প্রদেশে অরিগা নামক নক্ষত্রপুঞ্জের অভিমুখে একটা নক্ষত্র হঠাৎ কিছু দিনের
জন্য জ্বলিয়া আবার নিভিয়া গিয়াছে। ইহাও হয় ত দুইটা নক্ষত্রের প্রতিঘাতে,
অথবা দুইটি উল্কাপুঞ্জের সংঘর্ষে। ঠিক কারণনির্দ্দেশ দুরূহ। তবে চারি দিক
দেখিয়া বিবেচনা ও অনুমান করিতে হয়। যাহাদিগকে নীহারিকা বলা যায়,
তাহাতে বায়বীয় পদার্থ বিদ্যমান আছে সত্য; তাহাদের আলোকেই সে কথা
বলিয়া দেয়। কিন্তু তাহারাও বিস্তৃতদেশব্যাপী উল্কাসমষ্টি, কতকটা বড় বড়
ধূমকেতুর মত। পিণ্ডগুলা পরস্পর ঠোকাঠুকি করিতেছে, ভাঙ্গিতেছে, ছুটি-
তেছে, চূর্ণীভূত ও বাষ্পীভূত হইতেছে। কালে জমাট বাঁধিতেছে। জমাট
বাঁধিয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ নক্ষত্র গ্রহ উপগ্রহ নির্ম্মাণ করিতেছে। সমুদয় জ্যোতিষ্কের
আকার অবয়ব আলোক বর্ণ পর্য্যালোচনা করিয়া তাহাদের বয়স অনুসারে
শ্রেণী বিভাগ করা যায়। উল্কাপিণ্ড সকলেরই মশলা। সেই উপাদান হইতে
সকলেই নির্ম্মিত হইয়াছে। কেহ এখনও ভ্রূণ, কেহ শিশু, কেহ যুবা, কেহ
প্রৌঢ়, কেহ বৃদ্ধ। কেহ এখনও দীপ্তিলাভ করে নাই, কেহ দীপ্তিবিকাশ আরম্ভ
করিয়াছে। কেহ পূর্ণ গৌরবে ভাস্বর, কেহ নির্ব্বাণোন্মুখ, কেহ নির্ব্বাপিত
বয়স হিসাবে লকিয়ারের প্রণীত জ্যোতিষ্কগণের শ্রেণীবিভাগ কতকটা এইরূপ

১ম। সংখ্যাতীত উল্কাপিণ্ডের দল, কোটি কোটি কোটি ক্রোশ ব্যাপি-
অবস্থিত। মশলার স্তূপ। জগতের ভ্রূণ। কঠিন শীতল দীপ্তিহীন পিণ্ডে
পরস্পরের সংঘর্ষে দীপ্তিময় বায়ু বাষ্প প্রভৃতির উদ্গম। নাম নীহারিকা
আকারের স্থিরতা নাই, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবয়বের নির্দ্দেশ নাই; দূর হইতে
কুয়াসার মত, অবয়বহীন মেঘখণ্ডের মত দেখায়।

২য়। কতকটা জমাট বাঁধিয়াছে; সংঘর্ষ, ঠোকাঠুকি চলিতেছে; ফলে উষ্ণতা বাড়িতেছে। শিশু জগৎ। আকারে নক্ষত্রের মত; আরক্ত বর্ণ।

৩য়। জমিয়া ঘনীভূত হইয়া তপ্ত উষ্ণ জ্যোতির্ম্ময় তরল বিশাল পিণ্ডে পরিণত; অভ্যন্তরে তরল পিণ্ড, উপরে শীতলতর বাষ্পের আবরণ; সঙ্কোচনশীল, কিন্তু সঙ্কোচনে উষ্ণতা বর্দ্ধমান। সঙ্কোচনে ঘনীভবনে তাপ জন্মিতেছে ও বাড়িতেছে, ও তাপ বিকীরণ করিতেছে, বিলাইতেছে। আয় অধিক ব্যয় কম; মোটের উপর ক্রমশঃ উষ্ণ হইতে উষ্ণতর হইতেছে। দেখিতে কতকটা আমাদের সূর্য্যের মত। জগতের কিশোর বয়স; নূতন স্ফূর্ত্তি চাঞ্চল্য তারল্য।

৪র্থ। উষ্ণতার চরম পরিণতি; অভ্যন্তরের জলন্ত তপ্ত পিণ্ডের আলোক শীতলতর আবরণ বায়ুস্তর ভেদ করিয়া ফুটিয়া আসিতেছে। দীপ্তির পরাকাষ্ঠা, মাহাত্ম্যে অতুল। জগতের পূর্ণ যৌবন।

৫ম। যৌবন প্রৌঢ়ত্বে পরিণত। সঙ্কোচন চলিতেছে; কিন্তু ব্যয় আর কুলায় না। উষ্ণতার ক্রমিক হ্রাস। দেখিতে প্রায় তৃতীয় শ্রেণীর মত, তবে সেখানে গৌরব বর্দ্ধমান, এখানে গৌরব হ্রাসের মুখে। আমাদের সূর্য্য সম্ভবতঃ এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

৬ষ্ঠ। নির্ব্বাণোন্মুখ, ঘনীভূত, কঠিন, শীতল; দীপ্তি দেয় কি দেয় না। বার্দ্ধক্য উপস্থিত, নির্ব্বাণোন্মুখ, সুতরাং দূরবীক্ষণে দেখা যায় বা যায় না।

৭ম। নির্ব্বাপিত, মৃত, শীতল, দীপ্তিহীন, আঁধার বিশাল কঠিন জীবনহীন জড়পিণ্ডে পরিণত। দূরবীক্ষণে দেখা যায় না। গণিতের সূক্ষ্মতর দৃষ্টিতে ধরা দেয়।

চন্দ্র, পৃথিবী, মঙ্গল প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিণ্ড, যাহারা এককালে সম্ভবতঃ বৃহত্তর সূর্য্যের অঙ্গীভূত ছিল, তাহার ক্ষুদ্রতার নিমিত্ত বহুকাল হইল এই শেষোক্ত অবস্থায় উপনীত হইয়াছে।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

মীরকাশেম।*

বাঙ্গলার মুসলমান অধিকারের শেষ অধ্যায়ের একটি উজ্জ্বল চরিত্র সেই মীরকাশেম। মীরকাশেম বাঙ্গলার শেষ নবাব। দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ মুরশীদ কুলী স্বীয় প্রতিভাবলে যে বংশের প্রতিষ্ঠা করেন, মীরকাশেম সেই বংশের মসনদে বাঙ্গলার শেষ মুসলমান ভূপতি। আলিবর্দ্দির উত্তরাধিকারী সেরাজউদ্দৌলা না হইয়া যদি মীরকাশেম হইতেন, তাহা হইলে পলাশী-কাণ্ডের কি প্রকার পরিণাম ঘটিত, তাহা কেবলমাত্র কল্পনার সাহায্যে অনুমান করা যাইতে পারে না। পলাশীর ব্যাপার আদৌ সংঘটিত হইত কি না, এ বিষয়েও সন্দেহ উপস্থিত হয়।

মুরশীদ কুলীখাঁর অদম্য উৎসাহ, কর্ত্তব্যে দৃঢ়তা, কার্য্যক্ষেত্রে একাগ্রতা, আলিবর্দ্দির তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, পরিণামদর্শিতা ও কার্য্যক্ষমতা, মীরকাশেমের উপাদানে যথেষ্টরূপে সংরক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু সেরাজউদ্দৌলার হঠকারিতা ও ক্রোধপ্রবৃত্তি যদি তাহাতে না মিশিত, তাহা হইলে বাঙ্গলায় ইংরাজ-শাসন মীরকাশেমের আমলে সম্পূর্ণ রূপে বদ্ধমূল হইতে পারিত না; হয় ত যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহাও আদৌ ঘটিত না।

মীরজাফর আলস্যের আদর্শচিত্র, কিন্তু মীরকাশেমে কার্য্যশক্তির পূর্ণ বিকাশ। মীরজাফরে যাহা জড়তা, মীরকাশেমে তাহা উদ্যমশীলতা। মীরজাফরে যাহা নীরব রাজশক্তি, মীরকাশেমে তাহা পূর্ণবিকশিত কূটনীতি; মীরজাফরে যাহা তৃপ্তি, মীরকাশেমে তাহা অতৃপ্তি; মীরজাফরে যাহা শান্তিপ্রিয়তা ও বিলাসিতা, মীরকাশেমে তাহা উত্তেজনা ও উদ্যমশীলতা। মীরজাফরকে বিধাতা মাথায় মুকুট পরিয়া গোলামী করিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু মীরকাশেম, মসনদে বসিয়া স্বাধীন রাজবুদ্ধিতে সেই মকুট পরিবার সম্যক্ উপযুক্ত হইলেও, নিজের বুদ্ধির দোষে উচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন।

---

* যে সমস্ত পুস্তকের উপর নির্ভর করিয়া বর্ত্তমান প্রস্তাব লিখিত হইতেছে, সকল স্থলে তন্মধ্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হইবে, এই ভয়ে, কেবল গ্রন্থগুলির নামই দেওয়া হইল;—1. Stewart's Bengal. 2. Vansitart's Memoirs. 3. Presididential Armies of India.—Rivett Carnac. 4. History of Bengal Army—Broom. 5. Report of the select committe, after the battle of Plassy.—Vol. II. 6. Auber's Analysis of the E.I. Company. 7. Administration of E.I. Company.—Kaye. 8. Old days of John Company 2 Vols. 9. Decisive Battles of India.—Malleson. 10. Glieg's Memoirs of W. Hastings. 11. Aitchison's Treaties and Sanands.

পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরাজ জাতি বণিকত্ব হইতে বাঙ্গালীর চক্ষে একটু অধিকতর উচ্চ আদর্শে উপনীত হইলেন। অনেকের বিশ্বাস ছিল, নবাব সেরাজ-উদ্দৌলার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নবাব নাই, তাঁহার সেনাবলের কাছে অপরের সেনা-বল বহ্নিমুখে পতঙ্গবৎ। কিন্তু পলাশীর রণাভিনয়ের পর, পলাশীবীর ক্লাইবের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজজাতি, বাঙ্গলার সকল শ্রেণীর মনেই বিভীষিকার উৎপাদন করিয়া দিয়াছিলেন।

যদি ক্লাইব না থাকিতেন, কিম্বা থাকিয়াও যদি তিনি পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটানিয়ার উজ্জ্বল গৌরবে কলঙ্কলেপন করিতেন, যদি সেরাজউদ্দৌলা তরল-মতি না হইয়া মীরকাশেমের ন্যায় দৃঢ়চেতা ও সুক্ষ্মদর্শী হইতেন, মীরজাফর না হইয়া যদি মীরকাশেম সেরাজের সেনাপতি হইতেন, তাহা হইলে ইতিহাস-তত্ত্বজ্ঞ পাঠক অনুমান করুন দেখি, বর্ত্তমান ঘটনাস্রোত কত দূর পিছাইয়া গিয়া দাঁড়াইত।

যাহা হউক, মীরজাফর বাঙ্গলার মসনদে বসিলেন। বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রভুদ্রোহিতার শোণিতময় মূল্যে তিনি বাঙ্গলার সিংহাসন কিনিলেন। যাহার নিমক খাইয়া তিনি মীরজাফর আলি খাঁ হইয়াছিলেন, সেই সেরাজ যখন পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বে গোপনে শিবিরমধ্যে তাঁহার পদতলে স্বীয় উষ্ণীষ রক্ষা করিয়া সহায়তার জন্য অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন, তখন তিনি সেই তরল-মতি তরুণবয়স্ক নবাবকে আশা দিয়াও, পরে সম্পূর্ণরূপে তাহার বিপরীত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তদ্বিনিময়ে তিনি যাহা লাভ করিলেন, তাহা মখমলমণ্ডিত, হেমবিজড়িত সুকোমল সিংহাসন নহে; তাহার চারি দিকে পরাধীনতার সুতীক্ষ্ণ কণ্টক। তিনি নবাব হইলেন বটে, বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা তিন তিনটা সুবা তাঁহার পদতলস্থ হইল বটে, মুরশীদাবাদের রাজ-কোষের দ্যুতিময় মণি মাণিক্য ও রাজসংসারের বিলাস তাঁহার সেবায় লাগিল বটে, কিন্তু যতই নির্ব্বোধ হউন না কেন, তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, বাঙ্গ-লার নবাবী তাঁহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র।

ইংরাজ তখন দেশের প্রকৃত রাজা। ক্লাইব সাহেবের হাতে রাজ্যের রাজ-শক্তি মীরজাফর কলের পুতুলের ন্যায়, অসাড় মানুষের ন্যায়; কতকগুলা নবা-বীর বাহ্যে চিহ্ন লইয়া খেলাধূলাতেই ব্যস্ত রহিলেন। তিনি খাজনা আদায় করেন, তাঁহার নিযুক্ত কর্ম্মচারীগণ প্রজার শোণিত শোষণ করেন, কিন্তু তাহার সমগ্রাংশ তাঁহার হয় না,—তাহার অধিকাংশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সিন্ধুকে

যায়। মীরজাফর যেখানে আপনাকে নবাব ভাবিয়া একটু স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে যান, ক্লাইবের শক্তি সেইখানে তাহাতে বাধা দেয়। মীরজাফর এই-রূপে বিড়ম্বিত হইয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন।

কিন্তু যদিও বিধাতা তাঁহাকে সম্পূর্ণ মানুষ করিয়া সৃজন করেন নাই—তথাপি তিনি মানুষ ত বটেন;—মনুষ্যত্বের যে ক্ষুদ্র অংশটুকু লইয়া তিনি নবাবী করিতেছিলেন, তাহাই তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল, ইংরাজের এত পরাধীন হইয়া কাজ করিলে, দেশের লোকের চক্ষে তাঁহার এত উচ্চ পদ, কেবল দাসত্বা-ভিনয় বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। তাই অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি বাঙ্গলা হইতে ইংরাজশক্তির উচ্ছেদ করিবার জন্য এক দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হই-লেন। ইহার ফল "বিদেরার" ক্ষুদ্র যুদ্ধ। সাধারণ ইতিহাসে এ কথা বড় একটা প্রকাশিত হয় নাই; কিন্তু "বিদেরার" পরাজয়ের পর, ইতিপূর্ব্বে মীরজাফরের যে অল্প মাত্র স্বাধীনতা ছিল, ইংরাজ তাহাও কাড়িয়া লইলেন।

ক্লাইব ও ফোর্ড, বিদেরার যুদ্ধে মীরজাফরের সংকল্প সমূলে নষ্ট করিলে, তিনি অদৃষ্টের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। ইহার কিছু দিন পরে ক্লাইব সাহেব বাঙ্গলা ছাড়িয়া বিলাতে গেলেন। স্বনামখ্যাত অন্ধকূপের হলওয়েল্ সাহেব দিন কতক গবর্ণরী করিলেন। তাঁহার গবর্ণরী করিবার সময় এমন একটি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে বাঙ্গলায় ইংরাজ ও নবাবের যুগ্ম শাসন ক্ষণকালের জন্য ভীষণরূপে আলোড়িত হইয়া উঠিল।

দিল্লীর সম্রাটগণ আরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর হইতেই নামমাত্র সম্রাট হইয়া সিংহাসনে বসিতেছিলেন, কিন্তু শাহ আলম, পিতার মৃত্যুর পর, একটু যেন জীবনী শক্তি প্রাপ্ত হইলেন। শাহজাদা শাহ আলমঃএক দল সৈন্য লইয়া, বাঙ্গালা ও বিহারের কয়েক স্থল দিল্লীর শাসনাধীনে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পূর্ণিয়া ও ত্রিহুত প্রভৃতি স্থানের নবাবেরা তাঁহার রক্তপতাকার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। বাদসাহের দলে অনেক লোক জুটিল; শেষে এক দল বর্গী আসিয়া তাহার আরও পুষ্টি করিল। ক্লাইব তখন কলিকাতায় ছিলেন না, কিন্তু কলিয়ার্ড ও নক্স ছিলেন—তাঁহারা বাদসাহ সৈন্যকে দুই এক স্থলে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়াছিলেন। ১৭৬০ সালের শীতকালে যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়, বর্ষার পূর্ব্বে তাহার শেষ হইয়া মিটমাট হইয়া গেল।

মীরজাফরের পুত্র মীরণ বজ্রাঘাতে ইহলীলা সম্বরণ না করিলে, হয় ত এরূপ মিটমাট না হইয়া, বাদসাহপক্ষই জয় লাভ করিতেন। অন্যান্য প্রাদে-

শিক শাসনকর্ত্তারা, বাঙ্গালার নবাবের অধীনস্থ হইলেও, মীরজাফরকে ইংরাজের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলি ভাবিয়া, মনে মনে তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহারা যখন শাহজাদার পক্ষ অবলম্বন করিলেন, তখন মীরণও গোপনে ইংরাজের —এমন কি নবাবেরও—বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। যিনি সেই যুদ্ধক্ষেত্রে বাঙ্গলার নবাবের প্রধান সেনাপতি, বাদসাহের সহিত তাঁহার চিঠিপত্র চলিতে লাগিল। তিনিও ত মীরজাফরের পুত্র বটেন! বিশ্বাসঘাতকতার পথে নবাবী করিবার সখটা তাঁহারও না হইবে কেন? কিন্তু ইংরাজ ইহাতে বিভ্রাট দেখিলেন। বিধাতা ইংরাজের পক্ষে অনুকূল;—তাই যেন ২রা জুলাই তারিখে, কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বে, শিবিরমধ্যেই মীরণ বজ্রাহত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। সেরাজউদ্দৌলার নৃশংস হত্যার ফল সেই নিশীথ নীরব যুদ্ধক্ষেত্রেই ফলিল। মীরজাফরের ন্যায় অসার ব্যক্তির অস্তিত্ব ইংরাজেরা ভুলিয়া গেলেন। মীরণের মৃত্যুর তিন সপ্তাহ পরে, হলওয়েলের উত্তরাধিকারী হইয়া ভান্‌সিটার্ট কলিকাতায় আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, ক্লাইব যাহা করিয়া গিয়াছেন—তাহা বজায় রাখিবার পক্ষে অনেক ব্যাঘাত ঘটিতেছে। এখনও কতকগুলি বাধা বিপত্তি এমনভাবে ধূমায়িত হইতেছে যে, পরে তাহা হইতে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইতে পারে।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া চারি দিক দেখিয়া তীক্ষ্ণবুদ্ধি ভান্সিটার্ট কর্ণেল কালিয়দ সাহেবকে আনাইলেন। একদিন সেইখানে তাঁহাদের "মন্ত্রণা-সভা" বসিল। হলওয়েল্-প্রমুখ, কালিয়দ প্রস্তাব করিলেন, "মীরজাফরকে মসনদ হইতে নামাইয়া বাদসাহের অধীনে সামান্য সুবাদারি দেওয়া হউক। ইংরাজ, বাদসাহের সহিত পরামর্শক্রমে বাঙ্গলা ও বিহারের দেওয়ানী তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করুন। তাঁহারা রাজ্যের প্রধান রাজস্বসংগ্রাহক হউন, মীরজাফরের নিকট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যাহা পাওনা আছে, তাহার পরিবর্ত্তে নবাব তাঁহাদিগকে কতকগুলি বিভাগ ছাড়িয়া দিন, এবং নবাবের যে সমস্ত অসার সৈন্য আছে, তাহাদের বিদায় করিয়া দিয়া, রাজ্যের রাজকোষ যাহাতে অনর্থক শূন্য না হয়, তাহার চেষ্টা হউক।" বলা বাহুল্য, এই কথা লইয়া সেই কৌন্সিলে মতভেদ উপস্থিত হইল। এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে অনেকে সম্মতি দিলেন না। যখন ইংরাজ কৌন্সিল এই প্রকার কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় পড়িল, তখন দৈব মধ্যস্থতা করিয়া, ঘটনা-স্রোত আর এক দিকে ফিরাইয়া দিল। সংবাদ আসিল, নবাবের নিকট হইতে দূত আসিয়াছে। ইংরাজ

গবর্ণর নবাব-প্রতিনিধিকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়া মন্ত্রণাগৃহে আনিলেন। এই দূত আর কেহই নহেন, স্বয়ং মীরকাশেম।

মীর মহম্মদ কাশেম আলি খাঁ, বা সকলের পরিচিত মীরকাশেম, নবাব মীরজাফরের জামাতা। মীরণের মৃত্যুর পর তিনিই সকলের লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছেন। ক্রমাগত ভোগবিলাসে ও নিরাশার মর্ম্মদাহে, ষষ্টি বৎসর অতিক্রম করিয়াই মীরজাফর বার্দ্ধক্যে পড়িয়াছেন। সেই বার্দ্ধক্যে যৌবনের উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির অপরিণামদর্শিতার অনেক জাগ্রত ফল ফলিয়াছে। তখন জীবনই তাঁহার পক্ষে ভার—রাজ্য ত ছার কথা। তাঁহার একমাত্র ভরসা, তাঁহার ঔরসজাত ত্রয়োদশবর্ষীয় বালক নজুম। মীরকাশেম তাঁহার জামাতা, কিন্তু তিনি সিংহাসনের কেহই নহেন। মীরজাফর যাহাই ভাবুন না কেন, দেশের বড় লোকে—আমীর ওমরাহগণ ও প্রজাসাধারণ, মীরকাশেমের দিকে সাগ্রহে দৃষ্টিপাত করিতেছে।

১৭৬০ খৃঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে, মীরকাশেম কলিকাতায় আসেন। ভান্সিটার্ট সাহেব তখন নূতন গবর্ণর হইয়া আসিয়াছেন। ভান্সিটার্ট সাহেবের গবর্ণরী প্রাপ্তিতে আনন্দপ্রকাশ করিবার জন্যই যে তিনি অত কষ্টস্বীকার করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, ইহা কিছু বিশ্বাসযোগ্য নহে। তাঁহার অন্তরে এক প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য জাগিতেছিল। বলিতে পারি না, কলিকাতা কৌন্সিলে তাঁহার কোনও প্রতিনিধি ছিল কি না। কেন না, ঠিক উপযুক্ত সময়েই তিনি কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া যান।

ইংরাজের সেই দিন মন্ত্রণাসভা বসে। ভান্সিটার্ট সাহেব মীরকাশেমকে পূর্ব্ব হইতেই চিনিতেন। তিনি তাঁহাকে সেই মন্ত্রণাসভায় উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। সভায় যে সমস্ত বিষয়ের কর্ত্তব্য স্থির হইল, তন্মধ্যে মীরজাফরের কথাই অধিক। মীরকাশেম উপযুক্ত অবসর পাইয়া মীরজাফরের শাসনসম্বন্ধে অনেক কথা তুলিলেন। তিনি বুঝিলেন, কলিকাতা-কৌন্সিলের সভ্যগণ সম্পূর্ণরূপে কেনা বেচার জিনিস। তিনি সময় বুঝিয়া উপযুক্ত দর হাঁকিলেন। ২৭এ সেপ্টেম্বর, তাঁহার সহিত কলিকাতা-কৌন্সিলের এক গুপ্ত সন্ধি-পত্র লেখাপড়া হইয়া গেল। তাহার ধারাগুলির মধ্যে ইহাও অন্তর,—"মীরকাশেম নবাব হইয়া ইংরাজদের বাহুরূপে থাকিবেন; ইংরাজের শত্রু তাঁহার শত্রু হইবে। মীরজাফর, বহুমূল্য সম্পত্তি জাইগীর স্বরূপ পাইয়া তাহার উপস্বত্ব হইতে জীবিকানির্ব্বাহ করিবেন। মীরকাশেম আবশ্যক হইলে

তাঁহার রাজ্যরক্ষণার্থে ইংরাজের নিকট সৈন্য সম্বন্ধে সাহায্য পাইবেন। সৈন্য-রক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য মীরকাশেম কোম্পানীকে বর্দ্ধমান, চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুর, এই তিন পরগণার উপস্বত্ব দিবেন। কোম্পানীর তখন কিছু চুণের প্রয়োজন; মীরকাশেম, শিলেট হইতে তাঁহাদের চুণ আনয়নের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। মীরজাফর যে সমস্ত মণিমুক্তাদি ইংরাজ কোম্পানীর নিকট বন্ধক রাখিয়াছিলেন, মীরকাশেম উপযুক্ত মূল্য দিয়া সে সমুদায় খালাস করিবেন। মোগল বাদসাহের সম্বন্ধে কোনও কার্য্য করিতে হইলে, মীরকাশেম, কোম্পানীর কৌন্সিলের সহিত মন্ত্রণা করিয়া তৎসম্বন্ধে সমস্ত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করিবেন।" সন্ধিপত্রের এই সকল কথাই প্রকাশ্যরূপে লিপিবদ্ধ ও স্বাক্ষরিত হইল। *

দ্বাবিংশতি লক্ষ মুদ্রা মূল্যে বাঙ্গলার সিংহাসন ক্রয় করিয়া, মীরকাশেম অক্টোবর মাসের প্রথম দিবসে মুরশীদাবাদ যাত্রা করেন। দুই দিন অপেক্ষা করিয়া ভান্সিটার্ট সাহেবও মুরশীদাবাদে মীরজাফরকে কৌন্সিলের মন্তব্যের কথা বলিবার জন্য কলিকাতা ত্যাগ করেন। মীরকাশেম দ্রুতগামী বজরায় গিয়াছিলেন, তাহাতে আবার তিন দিন আগে; সুতরাং তিনি আগে গিয়া মুরশীদাবাদে পৌছিলেন।

ভান্সিটার্টকে সহসা মুরশীদাবাদে দেখিয়া মীরজাফরের চমক ভাঙ্গিল।

---

* এতদ্ব্যতীত গোপনে আর একটি কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। এ কথা সাধারণের চক্ষে অপ্রকাশিত রহিল। কোম্পানীর কৌন্সিলের সভ্যগণের সহিত মীরকাশেমের একটা দেনা পাওনার বন্দোবস্ত হইয়া গেল। সন্ধিপত্রোক্ত সূত্রগুলি ইহারই পরিণামফল। মীরকাশেম মসনদে বসিয়া,—

ভান্সিটার্ট সাহেবকে		... ...	৫,০০০০০	পাঁচ লক্ষ।
হলওয়েল	"	... ...	২,৭০০০০	দুই লক্ষ সত্তর হাজার।
সমার	"	... ...	২,৫০০০০	আড়াই লক্ষ।
মাক্ গোয়ার	"	... ...	২,৫০০০০	ঐ
কর্ণেল কলিয়ার্ড	"	... ...	২,০০০০০	দুই লক্ষ।
কলিং স্মিথ	"	... ...	১,৩৪০০০	এক লক্ষ চৌত্রিশ হাজার।
কাপ্তেন ইয়র্ক	"	... ...	১,৩৪০০০	ঐ
		মোট	১৭৩৮০০০	সতের লক্ষ আটত্রিশ হাজার।

প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। এতদ্ব্যতীত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে আরও পাঁচ লক্ষ টাকা কর্জ্জ দিতে হইয়াছিল। কলিকাতা কৌন্সিলের কলিয়ার্ড সাহেবই বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। তিনি প্রথমে অর্থলোভে মীরকাশেমের সহায়তা করিতে সম্পূর্ণ অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। তার পর কলিয়ার্ড বিলাতে চলিয়া যান; সেখানে Vansitart সাহেব তাঁহাকে ঐ টাকাটা দেন।

১৫ই, ১৬ই, ১৭ই, তিন দিন ধরিয়া ইংরাজ গবর্ণর তাঁহার সহিত মতিঝিলে * সাক্ষাৎ করিলেন। কথাবার্ত্তার ভঙ্গীতে মীরজাফর বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার বিপদ উপস্থিত। তিনি যথোচিত কাতরতা ও বিনয়ের সহিত ভান্সিটার্টের নিকট সিংহাসন প্রার্থনা করিলেন। ভান্সিটার্টও নবাবের কাতরতা ও শোচনীয় ভাব দেখিয়া এত দূর বিগলিত হইয়া উঠিলেন যে, নবাবকে রাজ্যচ্যুত করা তাঁহার অসম্ভব বোধ হইল।

মীরকাশেম ভান্সিটার্টের সহিত আর একবার গোপনে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "আপনি যদি পূর্ব্বোল্লিখিত স্বত্ব মত কার্য্য না করেন, তাহা হইলে আমি সন্ধিপত্রোক্ত কড়ার গুলির পালনে সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছা চালনা করিব। নবাব যে আমাকে মন্ত্রিত্ব দিতে চাহিতেছেন, তাহা কেবল স্তোকবাক্য মাত্র। আমি যতদূর অগ্রসর হইবার, তাহা হইয়াছি। প্রত্যাবর্ত্তন এখন আমার পক্ষে অসাধ্য। ইচ্ছা হয়, আপনি মীরজাফরকে মস্‌নদে রাখিতে পারেন। কিন্তু তাহা হইলে আমি আজই মুরশীদাবাদ ত্যাগ করিয়া ইহা অপেক্ষা আরও নিরাপদ স্থানে প্রচ্ছন্ন ভাবে বাস করিব।

ভান্সিটার্ট সাহেব দেখিলেন, মীরজাফরকে বজায় রাখিতে গেলে, তাঁহার নিজের স্বার্থ-সাধনের পথে একটা ভয়ানক অন্তরায় উপস্থিত হয়। তদ্ব্যতীত, যে কোম্পানীর তিনি নিমক-ভোজী, সে কোম্পানীও অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়েন। ইংরাজ-শাসনের প্রথম আমলে যে সকল ইংরাজ এ দেশে আসিতেন, তাঁহারা মনুষ্যহৃদয়ের সৎপ্রবৃত্তিগুলিকে ইংলিশ চ্যানেলের সীমার বাহিরে ফেলিয়া দিয়া, "স্বার্থপরতা" ও "আত্মসুখ" নামক দুইটি নূতন বস্তু সঙ্গে লইয়া আসিতেন। তাঁহারা অর্থের জন্য যে সমস্ত দুঃসাহসিক ও পৈশাচিক কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, ইতিহাস চিরদিন তাঁহাদের সেই কলঙ্ককাহিনী ঘোষণ করিবে। ভান্সিটার্টও অবশ্য এই প্রবৃত্তির বহির্ভূত ছিলেন না। তিনি ভাবিলেন, "মীরজাফর" ও "মীরকাশেমে", আমার ও কোম্পানীর কিছু আসে যায় না। যেই হউক না কেন, "কামদুঘ" হইলেই হইল। শোষণ পীড়ন অত্যাচার অবিচার অভিশাপ যাহাই হউক না কেন, যেখানে "অর্থ" সম্বন্ধে কিছু বিবেচনা আছে, আমাদের সেই দিকেই টলিতে হইবে।" অবশেষে তীক্ষ্ণবুদ্ধি মীরকাশেমেরই জয় হইল। ভান্সিটার্ট দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়া মীরজাফরকে বলিলেন,

---

* মুরশীদাবাদের একটি প্রাসাদ।

"আপনি কাশেম আলি খাঁকে সিংহাসন ছাড়িয়া দিন। সহজে না দেন, আমরা বলপ্রয়োগে বাধ্য হইব।"

নবাবের সৈন্যদলে ইংরাজ গোলন্দাজ ছিল। নবাব তাঁহাদের মাহিনা দিতেন। ইংরাজের হুকুমে সেই ইংরাজ সেনা মীরকাশেমের হস্তগত হইল। তিনি গোলন্দাজ ও কতকগুলি সিপাহী লইয়া মতিঝিল বেষ্টন করিলেন। মীরজাফরকে বিবেচনার জন্ত ভান্সিটার্ট ২৪ ঘণ্টা মাত্র সময় দিয়াছিলেন। ১৮ই কাটিল, ১৯এ আসিল, তথনও বৃদ্ধ নবাব কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন, উনিশের প্রভাতরশ্মির সহিত মীরকাশেমের ও ইংরাজের মিশ্র সেনা তাঁহার প্রাসাদ বাহিরে অস্ত্রের ঝণঝণা তুলিয়াছে, তখন ভাবিলেন, তাঁহার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহার মনে অতীত তিন বৎসরের চিন্তা, বর্ষার মেঘের স্থায় একে একে ঘন ঘন উদিত হইতে লাগিল। সেই দিন,—যে দিন তিনি সেরাজউদ্দৌলার প্রধান সেনাপতি ছিলেন, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা সেই অকৃতাপরাধ অল্পবয়স্ক নবাবকে পলাশীর শিবিরে অভয় প্রদান করিয়াও, পরে সামান্ত সিংহাসনের লোভে বিশ্বাসঘাতকতার সহিত ইংরাজের সহায়তা করিয়াছিলেন, সে দিন ঠিক এইরূপ ঘটিয়াছিল। সে দিনও তিনি এমনি করিয়া ইংরাজ ও দেশীয় সেনা লইয়া, এই মতিঝিলের পার্শ্বে এমনি ভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন। ইংরাজ সেনার উজ্জ্বল অস্ত্রও লোহিত বর্ণ কোর্ত্তা, ঠিক এই প্রকারে মতিঝিলের গবাক্ষ পথ দিয়া দেখা গিয়াছিল।

আজ তাঁহার পক্ষে সেই দিন। সেরাজ সেই স্মরণীয় দিনে প্রভাতে প্রফুল্লমুখে যখন যুদ্ধযাত্রায় মতিঝিল হইতে বাহির হইয়া পলাশী অভিমুখে ধাবিত হন, পরে সন্ধ্যার পর এই মতিঝিলের পার্শ্ব দিয়া গোপনে তস্করের ন্যায় ছদ্মবেশে পলায়ন করেন, তখন তাঁহার মনে যে ভাব উদিত হইয়াছিল, আজ মীরজাফর তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। কাল সন্ধ্যার সময় তিনি তিন তিনটা সুবার মালিক ছিলেন ; বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার সমস্ত প্রজার অধীশ্বর ছিলেন ; এই বৈজয়ন্তীতুল্য মুরশীদাবাদের রাজকক্ষের একমাত্র অধীশ্বর ছিলেন। কিন্তু আজ তিনি পথের ভিখারী, ইংরাজের করতলস্থ। যে ইংরাজ একদিন তাঁহার মুখাপেক্ষী হইয়া কত উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করিয়াছিল, আজ তাহারাই তাঁহার মনে কত উৎকণ্ঠা জন্মাইয়া দিতেছে। তিনি সেই যুবক নবাবের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া যেরূপে তাঁহার শোচনীয় মৃত্যু

ঘটাইয়া সিংহাসন হইতে তাঁহাকে কবরে টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন, আজ কি মীরকাশেম তাঁহার নিজের সেরূপ অবস্থা করিতে পারেন না! যে জাতিদ্রোহী, স্বজাতিদ্রোহী, আত্মীয়দ্রোহী, স্বদেশদ্রোহী, তাহার পরিণাম আর কি হইবে? কোথায় সেই তাঁহার প্রিয়তম পুত্র মীরণ, যাহার জন্য তিনি এই সোনার সিংহাসন শত সহস্র শোণিত বিন্দুর উপর স্থাপন করিয়াছিলেন? কোথায় তাঁহার সেই বিলাস ও ভোগ, যাহার জন্য তিনি নিরীহকে নৃশংস ভাবে বিজাতীয়ের বলিমুখে অর্পণ করিয়াছিলেন? কোথায় তাঁহার সেই বন্ধুত্বাকাঙ্ক্ষী ইংরাজ, যাহাদের জন্য তিনি নরকের দ্বার নিজহস্তে খুলিয়া নির্ভয়ে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন? অনুশোচনা, অনুতাপ, আত্মগ্লানি, অপমান, বিষাদ, নিরাশা, উন্মাদবিকার,—মীরজাফরকে একবারে মতিঝিলের দ্যুতিময় সুগন্ধিবাসিত স্বর্ণকক্ষ হইতে নরকের নিম্নতর স্তরে নিমজ্জিত করিয়া দিল।

মীরজাফর যখন দেখিলেন, আর কোন উপায়ই নাই, তখন অগত্যা সাহেবের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ইচ্ছার বিরুদ্ধে, প্রাণের ভয়ে, নিরাশার উত্তেজনায়, আশঙ্কায়, ভগ্নমনোরথ হইয়া, তিনি তাঁহার ক্রীড়াক্ষেত্র মুরশীদাবাদ হইতে একেবারে সরিবার সংকল্প করিলেন।

মুরশীদাবাদে থাকিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না দুইটি কারণে। প্রথম কারণ, যে সুখভোগ করিয়া দরিদ্র হয়, তাহার পক্ষে দুঃখ নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠে। বিশেষতঃ, সেই ক্ষেত্রে—যেখানে সে একবার সুখে কাটাইয়াছে, সেখানে দুঃখের সহিত যাপন করিতে তাহার হৃদয়ে অত্যন্ত যাতনা উপস্থিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, মুরশীদাবাদে থাকিলে অতীত অনুশোচনায় কেবল যে মনস্তাপ বৃদ্ধি হইবে, এরূপ নয়, তাঁহার অদৃষ্টেও যে সেরাজউদ্দৌলার ন্যায় পরিণাম নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে? তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া কলিকাতায় আসাই স্থির করিলেন। যে সুখের বাসা তিনি নিজের হাতে গড়িয়াছিলেন, আজ নিজ হস্তে তাহা ভাঙ্গিয়া, চিরকালের জন্য মুরশীদাবাদ ত্যাগ করিলেন। বলা বাহুল্য, ইংরাজসেনা তাঁহার সেই হেয় জীবনের রক্ষার জন্য সঙ্গীন খুলিয়া তাঁহাকে কলিকাতা পর্য্যন্ত আনিয়াছিল। * ক্রমশঃ।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

---

* কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা ইতিপূর্ব্বে তাঁহার জন্য কলিকাতায় দুইটি বাড়ী স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। কলিকাতায় চিৎপুর রোডের উপর ঐ দুইটি বাড়ী শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে দেখা যাইত।

সহযোগী সাহিত্য।

রাজনীতি।

চীন ও জাপান।

চীন ও জাপানের যুদ্ধে য়ুরোপের কিছু চিন্তার বিষয় অবশ্যই আছে। কারণ জনরব, রুস-ভল্লুক নাকি কোরিয়ার প্রতি কিছু লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, আবার কোনও রুসিয়ান সংবাদপত্রও মধ্যে একটা স্বার্থপূর্ণ প্রস্তাবও নাকি তুলিয়াছিলেন। যাহা হউক, এখনও পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের সহানুভূতি চীনের সহিত; "রিভিউ অফ রিভিউস্" সম্পাদক তাহা স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। তবে "উদীয়মান রবির দেশ" জাপানের ইংলণ্ডে কতকগুলি বন্ধু আছেন; সার এডুইন আর্ণোল্ড তাঁহাদিগের অন্যতম। তিনি "নিউ রিভিউ" পত্রের মারফৎ ইংলণ্ডের সাধারণ মতের বিচারালয়ে জাপানের হইয়া আরজী পেশ্ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার প্রবন্ধের মর্ম্ম দিতেছি।

জাপানের দোষ নাই।

তিনি বলিতেছেন,—এত দিন পরে যুদ্ধারম্ভ হইয়াছে; এই যুদ্ধ কোনও রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন সূচিত করিতেছে না এবং যুদ্ধারম্ভের সময় জাপান তাহার সেনাবল ও নৌবল সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধের উপযোগী বলিয়াও মনে করে নাই। তবে জাপান সংগ্রামসাগরে সন্তরণপর না হইলে, বিশৃঙ্খল অবস্থায় কোরিয়া প্রথমে চীনের ও তৎপরে ষড়যন্ত্রপরায়ণ রুসিয়ার হস্তগত হইত। জাপানের দোষ কি? জাতীয় ভাবে ধরিতে গেলে ভূগোল জাপান ও কোরিয়ার অদৃষ্ট অবিচ্ছিন্নভাবে একত্র বন্ধন করিয়াছে। স্বত্ব হিসাবে ধরিতে গেলে কোরিয়ায় যে জাপানের অধিকার অন্ততঃ চীনের সমান, তাহার রাজনৈতিক প্রমাণ যথেষ্ট আছে; নৈতিক হিসাবে ধরিতে গেলে জাপানই কোরিয়ায় শৃঙ্খলাস্থাপনের ও ন্যায়রক্ষার চেষ্টা পাইয়াছে। এই অবস্থায় ইংলণ্ড যাহা করিতেন, জাপানও তাহাই করিয়াছে। জাপান সভ্যতার পৃষ্ঠপোষক; সে সভ্যতা রক্ষারই চেষ্টা করিয়াছে।

লেখক কবিজনোচিত কল্পনাবলে বলিতেছেন যে, চীন ও রুসিয়াই এখন সভ্যতার বিপদ। ইংরাজের রুসাতঙ্ক নূতন নহে। তবে চীনাতঙ্ক আবার মজ্জাগত হইয়া না যায়।

চীন হইতে আশঙ্কা আছে।

তাহার পর তিনি বলিতেছেন, যে কণফুচ নীতিশিক্ষকদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্নীতিপরায়ণ, তাঁহারই বিধানে চীন সমাজ পরিচালিত। তিনি ঘোর সুযোগান্বেষী। এই কঠোর চাইনীস হইতে আশঙ্কা আছে। কনফুচের ধর্ম্মমতের দুই একটি বিধানের বলে, চাইনীসরা আজও বিদেশ গমন করে না, এবং দূর দেশ হইতে চাইনীসের মৃতদেহ তাহার স্বদেশে আনয়ন করা তাহার আত্মীয়দিগের কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই বিধানের ভিন্ন অর্থ করা দুরূহ নহে। সেইরূপ ভিন্ন অর্থ করা হইলেই বন্যার জলের মত সভ্য জগতে চাইনীসরা ছড়াইয়া পড়িবে। এবং সেই পরিশ্রমশীল, বীর, সাহসী, মিতব্যয়ী জাতি তখন সভ্য জগতে ব্যবসায় বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়া লইবে।

আবার কালে প্রশান্ত মহাসাগর বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্য সম্বন্ধে বিশেষ আবশ্যক

হইয়া পড়িবে। তখন প্রশান্ত মহাসাগরের ইংলণ্ড জাপানের সহিত বন্ধুত্বস্থাপন সকল জাতির প্রার্থনীয় হইয়া দাঁড়াইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

"নটিকাস্"।

প্রসিদ্ধ নৌব[illegible]সমালোচক "নটিকাস্," উক্ত পত্রিকায় চীন ও জাপানের নৌবলের তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, বাস্তবিক ধরিতে গেলে কোরিয়ার নৌবলের অস্তিত্বই নাই। বিশ্বাসযোগ্য অধ্যক্ষগণ কর্তৃক শৃঙ্খলার সহিত চালিত হইলে চীনের নৌবল জাপানের নৌবলের সহিত সমান হইতে পারে। জাপানের নৌবল যথাসম্ভব পরাক্রমশীল; তিনি একজন জার্ম্মানের কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন—অষ্ট্রেলিয়ায় ও আমেরিকায় ইংরাজ জাতির ভবিষ্যৎ যেরূপ, এসিয়ায় জাপানের ভবিষ্যৎও সেইরূপ হইবে। তিনি বলিতেছেন যে, যদি অন্য কোনও দেশ মধ্যবর্ত্তী না হয়েন, তবে জাপানের নৌবল শীঘ্রই চীনের নৌবলকে পরাভূত ও দূরীভূত করিতে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই।

হেনরি নরম্যান।

সুলেখক মিষ্টার হেনরি নরম্যান প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মহাদেশ সম্বন্ধে যত জানেন, অল্প সংবাদপত্রলেখকই তত অবগত আছেন। তিনিও এ সম্বন্ধে "কনটেম্পোরারী রিভিউ" পত্রে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন; তিনি জাপানের পাকা পৃষ্ঠপোষক। তিনি প্রবন্ধের উপসংহারে বলিতেছেন যে, জাপান ভ্রমপ্রমাদ সত্ত্বেও আলোক ও সভ্যতার পৃষ্ঠপোষক; জাপানের রাজনীতি সভ্যদেশোচিত য়ুরোপীয় ছাঁচে গড়া; তাহার আইনাদিও যথাসম্ভব উত্তম; জাপানে ন্যায়বিচার হয়; জাপানে অপরাধীর শাস্তি দয়ালুজনোচিত এবং জাপানের সমাজ ও বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় সংস্কার ইংলণ্ডের সম্পত্তি। ও দিকে চীন অন্ধকার এবং বর্ব্বরতার পৃষ্ঠপোষক; হাস্যোদ্দীপক কুসংস্কার চীনের বিজ্ঞান; তাহার আইন বর্ব্বরোচিত; সেখানে অপরাধীর শাস্তি ভীষণ; পাপ তাহার রাজনীতি এবং সে অচলস্থির। বর্ব্বরতার সহায় ভিন্ন কে চীনের উন্নতি কামনা করে?

রক্ষণশীল চীন আজও এই পরিবর্ত্তনের তরঙ্গাঘাত উপেক্ষা করিয়া, স্থিরোন্নত শৈলের মত প্রাচীন সভ্যতার শান্ত বক্ষে দণ্ডায়মান; বোধ হয় কেবল চীনই এই প্রবল পরিবর্ত্তনপ্রবাহকে আপনার আচার ও ব্যবহারের সুগঠিত প্রাচীর অতিক্রম করিতে দেয় নাই। কোন্ সভ্যতা অধিক মঙ্গলপ্রদ, সে সম্বন্ধে সকলের মত এক নহে। তবে শান্তি যে সংগ্রাম অপেক্ষা প্রার্থনীয়, তাহা বোধ হয় রক্তান্বেষী পিশাচ ভিন্ন আর সকলেই স্বীকার করিবেন; সেই শান্তিই এখন প্রার্থনীয়।

ভ্রমণবৃত্তান্ত।

কোরিয়া।

কোরিয়া।

চীন ও জাপানের মধ্যে পড়িয়া কোরিয়া প্রাচ্য মহাদেশে মহা অশান্তির সূচনা করিয়াছে। বহুদিন শান্তির নিস্তব্ধতার মধ্যে সংগ্রামের সংহারসূচক ভেরীনিনাদ শ্রুত হয় নাই, কিন্তু সহসা সেই শান্তির ছায়াস্নিগ্ধ পথে সংগ্রামের দগ্ধকারী কিরণ নিপতিত হইয়াছে। পশুর ন্যায় মানবগণ পরস্পরকে সংহার করিয়া নররক্তে জননী ধরণীর স্নেহময় বক্ষে আপনাদিগের হিংস্র প্রবৃত্তির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছে। "ফর্টনাইটলী রিভিউ" পত্রে মিষ্টার স্যাভেজ ল্যাণ্ডর তাঁহার কোরিয়ায় ভ্রমণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই প্রবন্ধ হইতে আমরা কোরিয়াদেশের বিবরণের সারোদ্ধার করিয়া দিলাম।

কোরিয়ানগণ স্বভাবতঃ অলস ও স্ফূর্ত্তিহীন ; কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা কোনমতেই বোকা নহে। লেখক কোরিয়ায় এমন অনেক লোক দেখিয়াছেন, তাহারা যে কোনও সভ্য দেশে বুদ্ধিমান বলিয়া গণ্য হইতে পারে। একবার ইচ্ছা করিলে তাহারা যে সকল জিনিসের কথা কখনও শ্রবণ করে নাই, তাহাও সহজে বুঝিতে ও শিখিতে পারে। তাহারা সহজেই ভাষা শিক্ষা করিতে পারে। চীনা বা জাপানীদিগের অপেক্ষা তাহারা বিজাতীয় ভাষা অনেক ভাল উচ্চারণ করিতে পারে।

অধিবাসীগণ।

কোরিয়ার রমণীদিগের ব্যবহার মুগ্ধকর, এবং তাঁহাদের অনেকে রূপলাবণ্যসম্পন্না সুন্দরী। তবে সেই সকল সুন্দরীসন্দর্শন সহজে সকলের ভাগ্যে ঘটে না ; কারণ তাঁহারা অন্তঃপুরবাসিনী এবং রাস্তায় বাহির হইতে হইলে শ্বেত বা সবুজ ঘোমটায় বদন আবৃত করিয়া বাহির হয়েন। তাঁহাদিগের বেশ ভূষার একটু বিশেষরূপ বর্ণনা আবশ্যক। তাঁহারা খুব ঢিলা পায়জামা ব্যবহার করেন ; মোজাও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মোজা পাজামার বাঁধা হয়। উপরে একটি সার্ট—কোমরের উপরে তাহা বাঁধা থাকে—তাহার উপর একটা শ্বেত, লোহিত বা সবুজ জ্যাকেট ; কিন্তু তাহা এতই খাটো যে, তাহাতে বক্ষঃস্থলের উভয় পার্শ্বই অনাবৃত থাকে। ইহাই আশ্চর্য্য, কারণ কোরিয়ায় বেশ শীত পড়ে।

রমণী।

সিয়োল (কিঙ্কিতাও) কোরিয়ার রাজধানী। সমস্ত কোরিয়ার মধ্যে কেবল সেখানেই বিস্তৃত রাস্তা দৃষ্ট হয়। যে রাস্তা সহরের মধ্য দিয়া রাজার প্রাসাদে গিয়াছে, সেটি অপরিমিত চওড়া। সেটি এতই চওড়া যে, সেই রাস্তার মধ্যে দুই সারি খোড়ো ঘরে দোকান বসে; কাজেই একটি রাস্তা তিনটি রাস্তায় পরিণত হয়। রাজা যে দিন নগরের বাহিরে পূর্ব্বপুরুষদিগের সমাধি দর্শন করিতে বা চীনের রাজদূতের সহিত দেখা করিতে প্রাসাদ হইতে বাহির হয়েন, সে দিন সেই সমস্ত ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। প্রাসাদটি সুন্দর—সেখানে একটি হ্রদমধ্যে স্থাপিত গৃহে গ্রীষ্মকালে রাজা বিশ্রামকাল যাপন করেন। রাজা যেদিন প্রাসাদের বাহিরে গমন করেন, সে দিন সাজসজ্জার আর অন্ত থাকে না। পথপার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সৈনিকগণ দণ্ডায়মান হয়।

রাজধানী।

বর্ম্মপরিহিত বর্শাধারী সৈন্যদিগকে দেখিলে মনে হয়, যেন দর্শক কোনও অতীত যুগের স্বপ্ন দেখিতেছেন—সৈন্যদিগের মস্তকে বৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ টুপি—তাহা হইতে লোহিতবর্ণ থোপা স্কন্ধের উপর আসিয়া পড়িয়াছে—আবার বর্ষাকালে সেই টুপির সহিত ছাতা বাঁধিয়া দেওয়া হয়। অশ্বারূঢ় সৈন্যগণ আজও সেই প্রাচীন পরিচ্ছদ পরিধান করে ; পদাতিকগণ দেশীয় ও য়ুরোপীয় মিলাইয়া একরূপ বেশ পরিধান করে, তাহা বেশ হাস্যোদ্দীপক। পদাতিকগণ সকল প্রকার বন্দুকই ব্যবহার করে—অতিপ্রাচীন হইতে হাল-ফেসানের সকল প্রকার বন্দুকই তাহাদের ব্যবহার্য্য। সহরের মধ্যস্থলে একটি পর্ব্বত ; তাহার উপরে একটি সাঙ্কেতিক গৃহ আছে—সেখান হইতে আলোক জ্বালিয়া ঐরূপ অন্যান্য স্থানে সংবাদ প্রেরিত হয়। এই সহজ উপায়ে অল্প সময়ের মধ্যেই টেলিগ্রাফের মত রাজ্যের সকল অংশে সংবাদ প্রেরিত হয়। তবে ইহাতে এই অসুবিধা যে, রাত্রিকাল ভিন্ন অন্য কোনও সময়ে সংবাদ প্রেরণের সুবিধা নাই।

সৈন্য।

সিয়োল, চিমালপো বন্দর হইতে প্রায় ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। জাপানীরা ইহাকে জিন্‌সেন ও চীনারা জিওচেয়াঙ্‌ বলে। চিমালপোকে কোরিয়ার বন্দর বলা সঙ্গত কি না সন্দেহ, কারণ ইহা কোরিয়াও অবস্থিত বটে ; কিন্তু সেখানকার অধিবাসীরা অধিকাংশই জাপানী ও চাইনীস্‌। শস্যের ব্যবসায় ঐ দুই দেশবাসীদিগের হস্তে এবং তুলা প্রভৃতির আমদানি আমেরিকান ও জর্ম্মানের দ্বারা সম্পন্ন হয়।

চিমাল পো।

ডাকঘরের তার জাপান ও টেলিগ্রাফের তার চীন বিভাগ করিয়া লইয়াছে। কোরিয়ার সমস্ত সহর প্রাচীরে বেষ্টিত। সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত সহরের দ্বার মুক্ত থাকে।

কোরিয়া লইয়া জাপান ও চীনের মধ্যে যে যুদ্ধ বাধিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে দূর হইলেই য়ুরোপ ও এসিয়ার মঙ্গল।

বিবিধ।

নেপোলিয়ন ও প্রেম।

আগষ্ট মাসের ফরাসী সাময়িক সাহিত্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ "Revue de Paris" পত্রে প্রকাশিত নেপোলিয়নের প্রেম সম্বন্ধে সংস্কার। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে যখন নেপোলিয়ন ইহা লিখিয়াছিলেন, তখন তিনি লেফটেনাণ্ট মাত্র। প্রসিদ্ধ মিষ্টার মেসন বলেন যে, এই প্রবন্ধ জাল নহে এবং যাঁহার সহিত কথোপকথনছলে এই মত ব্যক্ত হইয়াছিল, তিনি সে সময় নেপোলিয়নের একজন প্রিয় বন্ধু ছিলেন। কথোপকথন এইরূপ হইয়াছিল :—

বন্ধু। প্রেম কি?

নেপোলিয়ন। আমি প্রেমের সংজ্ঞা চাহিতেছি না। আমি আপনি একবার প্রেমে পড়িয়াছিলাম; এবং সে সময়ের স্মৃতি আজও আমার হৃদয়ে সমুজ্জ্বল; কাজেই আমি, প্রেমের সংজ্ঞা চাহি না; এরূপ সংজ্ঞা, অর্থ পরিষ্কার না করিয়া বরং জটিল করে। আমি মানবহৃদয়ে প্রেমপ্রবৃত্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করি না। কিন্তু আমার বোধ হয়, প্রেম-প্রবৃত্তি মানবজাতির পক্ষে ক্ষতিকর, এবং ব্যক্তিগত সুখের বিনাশক। প্রেম কেবল মন্দে পূর্ণ এবং মানবহৃদয় হইতে এই প্রবৃত্তি দূরীভূত করিলে মঙ্গলময় বিধাতা মানব জাতির প্রভূত উপকার করিবেন।

বন্ধু। প্রেম ভিন্ন আমার পক্ষে জগৎ ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে।

নেপোলিয়ন। অমন ক্রোধপূর্ণ নয়নে আমার দিকে চাহিয়ো না। তুমি সত্য করিয়া বল দেখি, এই কোমল প্রবৃত্তির দাস হইয়া অবধি তুমি লোকের সহিত মিশিতে চাহ না কেন? তুমি তোমার কার্য্য, স্বজন এবং বন্ধুদিগকে অবহেলা করিতেছ কেন? তুমি সারা দিন একাকী ভ্রমণ কর আর তোমার প্রণয়িনীর সহিত সাক্ষাতের সময়ের জন্য অস্থির ভাবে অপেক্ষা কর। যদি এখন সহসা তোমাকে তোমার স্বদেশরক্ষার্থ যাইতে আদেশ করা হয়, তবে তুমি কি করিবে? তুমি এখন কোনও কর্ম্মের নও। অন্যের ব্যবহার যাহার উপর সম্পূর্ণভাবে প্রভাব সংস্থাপন করিয়াছে, অন্যের জীবন আর কি তাহার হস্তে সমর্পণ করা যায়? যাহার আপনার কোনও স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই, কোনও রাজনৈতিক গোপনীয় সংবাদ কি তাহাকে বলা সম্ভব? যে প্রবৃত্তি মানবকে এমন পরিবর্ত্তিত করিতে পারে, আমি সে প্রবৃত্তিকে ঘৃণা করি। একটি দৃষ্টি, একবার করস্পর্শ, একটি চুম্বন—তাহার সহিত তুলনায় তোমার স্বদেশ, তোমার বন্ধুবর্গ কিছুই নহে? এখন তোমার বয়স কুড়ি বৎসর, তুমি হয় তোমার কার্য্য পরিত্যাগ কর, নয় উপযুক্ত দেশবাসীর মত কার্য্য কর। যদি তুমি শেষোক্ত পথ অবলম্বন কর, তবে তোমাকে দেশের জন্য সকল কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইতে হইবে। তোমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে, কাজের লোক হইতে হইবে, এবং দেশের আবশ্যক হইলে অন্যান্য কার্য্যও করিতে হইবে। তাহা হইলে তোমার পুরস্কার কত প্রভূত হইবে। সময় তোমার জন্য স্থির হইবে, কারণ তোমার বার্দ্ধক্য তোমার স্বজাতীয়দিগের কৃতজ্ঞতা ও ভক্তিতে বেষ্টিত রহিবে। কিন্তু এখন তুমি রমণীর দাস মাত্র।

বন্ধু। তুমি কখন প্রেমে পড় নাই।

নেপোলিয়ন। আমি তোমার জন্য দুঃখিত। কি? তুমি কি সত্য সত্যই বিশ্বাস কর যে,

প্রেম ধর্ম্মপথে লইয়া যায় ? প্রেমপ্রবৃত্তিই ত ধর্ম্মপথে প্রতিপদে বিষম বিঘ্ন। সত্য করিয়া বল দেখি, তোমার হৃদয়ে প্রেমসঞ্চারের পর হইতে তুমি কি প্রেমের আনন্দ ভিন্ন অন্য আনন্দের কথা ভাবিয়াছ ? প্রেম তোমাকে ভাল বা মন্দ যে দিকে লইবে, তুমি সেই দিকে যাইবে; কারণ প্রেম ও তুমি এখন এক। যত দিন তোমার মনের ভাব এইরূপ থাকিবে, তত দিন তুমি কেবল প্রেম কর্তৃক চালিত হইবে। কিন্তু এ কথা তুমি অবশ্যই স্বীকার করিবে যে, রাজ্যের জন্য কার্য্য করা প্রত্যেক দেশবাসীর কর্ত্তব্য।

ইহাঁর পর নেপোলিয়ানের প্রেমসম্বন্ধে সংস্কার এইরূপ কঠোর ছিল কি না সন্দেহ। তাঁহার বন্ধুর মত আমাদেরও বলিতে ইচ্ছা করে যে, তিনি কখন প্রকৃত প্রেমের আস্বাদ প্রাপ্ত হয়েন নাই। প্রকৃত প্রেম নিতান্ত সুলভ নহে—সত্যই "পীরিতি সাধন বড়ই কঠিন।" প্রেমই মর জগতে অমর জগতের আস্বাদন। যদি সেই প্রেমের উপর তাঁহার সিংহাসন স্থাপিত হইত। তাহা হইলে হয় ত আমরা নেপোলিয়নকে আর এক রকম দেখিতে পাইতাম।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

সাধনা। চতুর্থ বর্ষ ; প্রথম সংখ্যা ; অগ্রহায়ণ। এই সংখ্যা হইতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "সাধনার" সম্পাদকতা গ্রহণ করিয়াছেন। সম্পাদক পরিবর্ত্তনের জন্য, "সাধনায়" বিশেষ কোনও বৈলক্ষণ্য হইয়াছে, এমন বোধ হইল না। তবে দেখা যাইতেছে,—নূতন সম্পাদক সমালোচনার বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন। এই সংখ্যায় দুইটি সমালোচনা প্রবন্ধ ব্যতীত একটি স্বতন্ত্র "গ্রন্থসমালোচনা" আছে। বর্ত্তমান সম্পাদক, সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাপন্ন শক্তিশালী সুকবি ; তাঁহার সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণশক্তি, সৌন্দর্য্যদৃষ্টি, ব্যক্তিগত বিশেষত্ব, সাহিত্যে অনুরাগ ও বঙ্গ সাহিত্যে প্রভূত প্রতিষ্ঠা, আছে। তিনি যদি কর্ত্তব্যবোধে নিরপেক্ষ ও নির্ভীক ভাবে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন, এবং অবাধে ও অসঙ্কোচে সেই ব্রত পালন করেন, তাহা হইলে, বঙ্গ-সাহিত্যের একটি বিশেষ অভাব দূর হয়। তাঁহার সকল সমালোচনা সাধারণের মতানুগত ও প্রীতিপ্রদ হইবে, এমন আশা করা সঙ্গত নহে। কিন্তু রবীন্দ্র বাবুর ন্যায় এক জন ক্ষমতাশালী লেখকের লেখনী সমালোচনায় নিযুক্ত থাকিলে যে প্রভূত উপকারের আশা আছে, তাহা বোধ করি কেহ অস্বীকার করিবেন না। নূতন সম্পাদক, লেখকগণের নাম অপ্রকাশিত রাখিয়াছেন। এবারকার "সাধনার" সর্ব্বপ্রথমে একটি কবিতা,—"সাধনা"। কবিতাটির ভাষা ও ভঙ্গী দেখিয়া সকলেই লেখককে চিনিতে পারিবেন,—অতএব এ আত্মগোপনপ্রথা অনাবশ্যক মনে করি। কবিতাটি ভাল হয় নাই ;—লেখক যেন পুনর্ব্বার তাঁহার শৈশব-সঙ্গীত স্মরণ করিয়াছেন। মোটের উপর, কবিতাটি পড়িয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। "প্রায়শ্চিত্ত" একটি ক্ষুদ্র গল্প। এই গল্পের প্রথমাংশ যেরূপ মনোহর, উপসংহার সেরূপ হয় নাই। তথাপি, গল্পটি মিষ্ট ও পাঠযোগ্য হইয়াছে। "পঞ্জিকার ভ্রম" একটি জ্যোতিষ-বিষয়ক প্রবন্ধ। "সুবিচারের অধিকার" একটি সাময়িক প্রবন্ধ। আশা করি, প্রত্যেক বাঙ্গালী পাঠক প্রবন্ধটি পাঠ করিবেন। কেন না, লেখক এই প্রবন্ধে যে বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, প্রত্যেক ভারতবাসীর তাহা ভাবিয়া দেখিবার সময় হইয়াছে। "বোম্বায়ের রাজপথ" প্রবন্ধে লেখক বেশ একখানি ছবি আঁকিয়াছেন। "কাব্যের তাৎপর্য্য" প্রবন্ধে, সাহিত্যবিষয়ক আলোচনা, বিতর্ক আছে। "কেরাণী" একটি হাস্যরসপূর্ণ সুমিষ্ট কবিতা।

এ ধরণের রচনা, এ দেশে নূতন। মানুষ দিনরাত বড় বড় ভাব ও চিন্তার বোঝা বহিয়া বেড়াইতে পারে না। মাঝে মাঝে, মনের বিশ্রাম এবং অনায়াস প্রসাদও আবশ্যক। "কেরাণী"র মুখ্য উদ্দেশ্য কিঞ্চিৎ সুমিষ্ট ও সুপথ্য হাস্যরসের অবতারণা; "কেরাণীর" কবি,—সে বিষয়ে সফল হইয়াছেন। আমরা "কেরাণীর" কাহিনী পড়িতে পড়িতে হাসিয়া বাঁচিয়াছি,—বাঙ্গলা মাসিক পড়িতে বসিয়া বহুদিন এমন সৌভাগ্য উপভোগ করা হয় নাই। "কেরাণীর" লেখক সাহিত্য-সেবীদের প্রিয় বয়স্য হইবেন। "ফুলডালি" ও "আর্য্যগাথা," দুই খানি গ্রন্থের দুইটি স্বতন্ত্র সমালোচনা। সমালোচনার সমালোচনা, এ ক্ষেত্রে আমাদের অভিপ্রেত নহে। এই সংখ্যায়, "বুদ্ধদেবের সিদ্ধিলাভ" ও "স্বরলিপি"ও প্রকাশিত হইয়াছে। স্বরলিপির গানটির বিষয়—"ভারত-জাগানো";—কিন্তু নব্যবঙ্গের কবিগণের উৎকট উচ্ছ্বাসের কল্যাণে, ইতি-পূর্ব্বেই এ বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট "অরুচি" জন্মিয়াছে। বর্ত্তমান গানেও রুচিপরিবর্ত্তনের আশা দেখিলাম না।

ভারতী। কার্ত্তিক। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়ের "বাবিলোনীয় জ্যোতিষীগণ" মন্দ নহে। লেখক যদি আরও সাবধানে ভাষার জটিলতা দোষ পরিহার করেন ত ভাল হয়। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের "গল্প ত অল্প—" একটি রহস্যপূর্ণ নক্সা। রচনাটি বেশ পরিপাটী হইয়াছে। "চক্র" এবারও প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের "ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ" একটি চিন্তাপূর্ণ উপাদেয় সন্দর্ভ; এবার দ্বিতীয় প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে। জনৈক 'বাবু-ভীতি'-চিকিৎসকের "বাবু-ভীতি বা বাবুফোবিয়া" রহস্যরচনা—তেমন সফল বলিয়া বোধ হইল না। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর গোস্বামীর "কবি কীর্ত্তিবাস" একটি সমালোচনা। এখনও সমাপ্ত হয় নাই। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের "পার্শি সম্প্রদায়" একটি সঙ্কলিত প্রবন্ধ। ইহাতে বিশেষ নূতন কথা কিছু দেখিলাম না। "আলোচনায়" শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় 'নিছনি' শব্দের অর্থ অনুসন্ধান করিতেছেন। "উদ্ভিজ্জাণু—ব্যাকটিরিয়া" শ্রীযুক্ত শ্রীপতিচরণ রায়ের একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। এরূপ প্রবন্ধ বর্ত্তমান সময়ের অত্যন্ত উপযোগী। এই উপলক্ষে একটি কথা বলা আবশ্যক;—বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের ভাষা যেরূপ প্রাঞ্জল হওয়া আবশ্যক, এক্ষণে সেরূপ হইতেছে না। এই সময়ে এ দোষের পরিহার না করিলে, বাঙ্গলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক শাখা ভবিষ্যতে বড় ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। আশা করি, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের লেখকগণ, এ বিষয়ে আরও অবহিত হইবেন। "শকুন্তলা" শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবীর একটি দীর্ঘ কবিতা। কবিতাটি প্রশংসাযোগ্য নহে। মিষ্ট কথা ও সাধারণ 'মিল' ভিন্ন কবিতাটিতে আর কিছু পদার্থ নাই। "কেমনে বুঝিবে?" ও "মালা" আর দুইটি কবিতা। এ দুটি সম্বন্ধেও ঐ কথা। "কার্ণো" শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্তের একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত জলধর সেনের "বদরিকাশ্রমে নারায়ণ দর্শন"—হিমালয়ভ্রমণের বিবরণ। কত দিনে শেষ হইবে?

জেলা দিনাজপুর
বরেন্দ্রভূমি (বরীন্দ)
দিনাজপুর যাইবার পথ
দিনাজপুর যাইবার পথ
রাঙামাটী
মোরগ্রাম
মাধাইপুর
ইংরেজ বাজার
ভোলাহাট
গৌড়
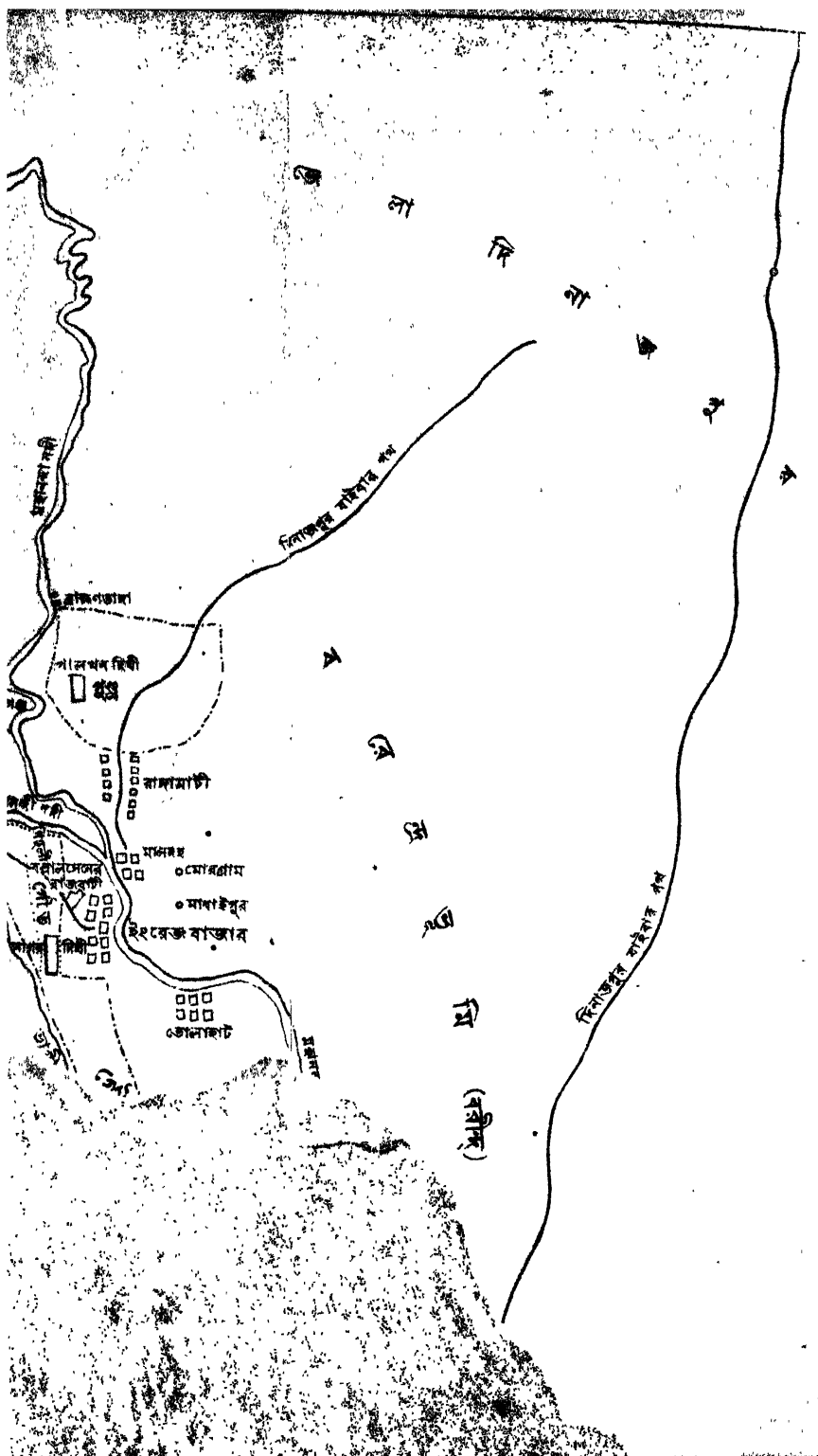
"লক্ষ্মণাবতী।"

প্রাচীন-বঙ্গের সমাধিস্থান যদি কাহারও দেখিবার সাধ থাকে, তবে তাঁহাকে মালদহ জেলায় আসিতে হইবে।

যে ভূখণ্ডের লোকের মাতৃভাষা বাঙ্গলা, আমরা বঙ্গশব্দে সেই ভূভাগকেই বুঝি। সেই ভূখণ্ডের "বঙ্গ" এই নাম অপেক্ষাকৃত আধুনিক। কালিদাসের পূর্ব্বে কোনও গ্রন্থে বঙ্গ এই নাম দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। কালিদাসের সময়ে বঙ্গের পূর্ব্বাংশের নাম ছিল সুহ্মদেশ। বোধ হয়, এই সুহ্মদেশ হইতে পরবর্ত্তী "সুহ্মতট" বা "সমতট" শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। "পুণ্ড্রদেশ" এই নাম বঙ্গ অপেক্ষাও প্রাচীন; কেন না, ঐতরেয়ব্রাহ্মণেও পুণ্ড্রের নাম শুনা যায়। কীকট বা মগধের পশ্চিমাংশে আধুনিক ভোজপুর নামক প্রদেশে বিশ্বামিত্র ঋষির বাসস্থান ছিল, ইহা কিম্বদন্তী, রামায়ণের বর্ণনা ও ঋগ্বেদ মিলাইয়া দেখিলে জানা যায়। বিশ্বামিত্রের কোনও কোনও পুত্র পিতৃদ্রোহ অপরাধে স্বদেশ হইতে তাড়িত হইয়া পুণ্ড্রদেশে গিয়া বাস করিয়াছিলেন, এই ইতিহাস ঐতরেয়ব্রাহ্মণে দেখিতে পাই। তাহাতে পুণ্ড্র যে অতি প্রাচীন রাজ্য, তাহা প্রমাণিত হইতেছে। মহাভারতে এবং মনুসংহিতাতে পুণ্ড্রের উল্লেখ আছে।

এই প্রবন্ধ সাধারণ পাঠকের যাহাতে সুবোধ হইতে পারে, তজ্জন্য ইহার শেষভাগে একটি মানচিত্র প্রদত্ত হইল। * এই মানচিত্রে গঙ্গা ও মহানন্দা-

* ১৮৯২ খৃঃ অব্দের নবেম্বর মাসের ৬ই হইতে ১০ই তারিখ পর্য্যন্ত অমৃতি নামক স্থানে শিবিরে অবস্থানকালে এই নক্সা অঙ্কিত হইয়াছিল। ইংরেজবাজার হইতে রাজমহলের পথে ইংরেজবাজারের পশ্চিমে ৬ মাইল দূরে সোনাতলা নামে গ্রাম; এই গ্রামের এক মাইল পশ্চিমে অমৃতি। সোনাতলার অব্যবহিত পূর্ব্বেই একটি জঙ্গলাকীর্ণ উচ্চ ভূমিখণ্ড, উত্তর দক্ষিণে লম্বাভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। এই ভূমিখণ্ডের উপর দিয়াই রাজমহল যাইবার পথ। সোনাতলার নিকটে এই ভূমিখণ্ডের নাম "সোনাতলার কাঠাল"। অনেক প্রাচীন কৃষকের মুখে শুনিলাম যে, এই "কাঠাল" পূর্ব্বে গৌড়নগরের অন্তর্গত ছিল, এবং ইহার পশ্চিম অংশে বরাবর নদী ছিল। কাঠাল বরাবর উত্তর দিকে কালিন্দী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উত্তরাংশের কাঠালকে "পিছলীর কাঠাল" বলিয়া স্থানীয় লোকে বর্ণনা করিল। এই কাঠালের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে কালিন্দীতটে গঙ্গারামপুর নামক স্থানে প্রাচীন গড়ের চিহ্ন বর্ত্তমান। স্থানীয় অনেক পুরাতন লোকের বিশ্বাস, এবং তাহারা তাহাদের পিতা পিতামহ হইতে শুনিয়া আসিতেছে যে, পিছলীর কাঠালে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের রাজবাটী ছিল। আমি এই কাঠালের

নদীর বর্ত্তমান সঙ্গমস্থান দেখিতে পাওয়া যাইবে। মহানন্দানদীকে বঙ্গের পশ্চিম সীমা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। আজিও মহানন্দার পশ্চিমাংশের গ্রামবাসীরা পূর্ব্বপারের গ্রামবাসীদিগকে বাঙ্গাল এবং তাহাদের দেশকে বাঙ্গলা বলে। মহানন্দার পূর্ব্বভাগে অধিকাংশই বাঙ্গলাভাষী কোচ, পলী

মধ্যে ভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি, ইহার প্রায় সকল স্থানেই মৃত্তিকার মধ্যে রাশি রাশি ইষ্টক নিখাত। "সোনাতলা কাঠালের" পশ্চিম প্রান্তে দাঁড়াইলে, চড়া পড়িয়া বুজিয়া যাওয়া নদীর তীরে দাঁড়াইয়াছি বলিয়া স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। কাঠালের নীচেই "দিয়ারা"। অমৃতির উত্তর-পূর্ব্বে কানাইপুর গ্রাম, তাহারই পূর্ব্বাংশে কাঠালের যে স্থান গোপীনাথপুর নামে অভিহিত, তথায় আমি একটি লম্বা খাত দেখিলাম। শুনিলাম, এই খাত দেড় ক্রোশ দুই ক্রোশ লম্বা এবং কালিন্দীতে গিয়া পড়িয়াছে। গোপীনাথপুরে কাঠালের মধ্যেই অপর প্রান্ত শেষ হইয়াছে। এই খাতের পার্শ্বেই ইষ্টকপরিপূর্ণ ভূমি।

কানাইপুরের ঘঁতু মণ্ডল নামক নাগরজাতীয় ৭২ বৎসর বয়স্ক এক প্রাচীন কৃষক গল্প করিল যে, একদা কতকগুলা ডাকাইতে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের রাজবাটী লুণ্ঠনের জন্য গোপীনাথপুর হইতে সুরঙ্গ কাটিতে আরম্ভ করে; কিন্তু ঠিক রাজবাটীতে সুরঙ্গ তুলিতে না পারিয়া তাহার পার্শ্ব দিয়া কালিন্দী-তীরে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। ডাকাইতেরা এইরূপে বিফলমনোরথ হইল। সেই সুরঙ্গ এখানে খাতের আকারে বর্ত্তমান। ঘঁতু আপনার বৃদ্ধপিতামহ, যে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক বৃদ্ধাবস্থায়,—যখন ঘঁতুর বয়স ১২ বৎসর—তখন মরিয়াছে, তাহার নিকটে এবং আরও অনেক প্রাচীনের মুখে এই সুরঙ্গ কাটার গল্প শুনিয়াছে।

ফলতঃ, এই খাত বর্ত্তমান মালদহ নগরের সর্ব্বরী নামক পল্লীর উভয় পার্শ্বে যে লম্বা ক্যানালের মত খাত দেখা যায়, তাহার সদৃশ। এই খাতের মাটিতে ইষ্টক নির্ম্মাণ হইত, এবং খাতের পার্শ্বে ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহশ্রেণীর পায়খানা সকল ছিল বলিয়া অনুমান হয়। বৎসর বৎসর কালিন্দীজলে সেই মল ধৌত হইত।

গোপীনাথপুরের কাঠালের মধ্যে এক স্থানে একটি প্রস্তরস্তম্ভ এবং তাহার নিকটে মুসলমানদের কবরের চিহ্ন বর্ত্তমান। এই স্থানকে "পীর নগরীর" স্থান কহে। নগরী, বা নেগোরী নামক মুসলমানপীর, কোন এক সময়ে এই স্থানে ছিলেন।

কালিন্দী হইতে মহদিপুর পর্য্যন্ত বরাবর কাঠালের উপর দিয়া ফুটপাথ আছে। বন্যার জলে এই কাঠাল কোন কালেই নিমগ্ন হয় না। বর্ষায় যখন চারিদিকের ভূমি জলমগ্ন হইয়া যায়, তখনও এই কাঠাল দিয়া মহদিপুর পর্য্যন্ত বরাবর হাঁটিয়া যাওয়া যায়।

এই জঙ্গলাকীর্ণ স্থান কোন কোন স্থানে আবাদ হইতেছে ও হইয়াছে; কিন্তু লোকে ইহার মধ্যে বাস করে না। ইহার হাওয়া ভাল নয় ব'লে। ফলতঃ সকলেই বলে, এক সময়ে বড় বড় লোকের এখানে বাস ছিল, এবং ইহা সহর ছিল। ঘঁতু কহিল, "হুজুর। এ সব 'গওড়' খা"।

রাজবংশী ও মুসলমান জাতির বাস। কিন্তু পশ্চিমপার হইতে ভাষা বিগড়াইয়াছে দেখা যায়। এ পারেও যে বাঙ্গলা ভাষা প্রচলিত নাই তাহা নহে, কিন্তু সাধারণ নাগর, চাঁইমণ্ডল, ধানুক, গণেশ ইত্যাদি উপাধিধারী লোকেরা খোট্টাই-মিশ্রিত বাঙ্গলা ভাষা ব্যবহার করে। এই সকল লোকের যাহা চলিত ভাষা, তাহা অধিক পরিমাণে মৈথিলী-মিশ্রিত। এই ভাগের বাঙ্গলা স্কুলেও, বিশেষতঃ উত্তর বিভাগে, ছেলেরা যখন বাঙ্গলা গ্রন্থ পড়ে, তখন তাহাদের উচ্চারণ বিকৃত বোধ হয়। তাহাদের মাতৃভাষা কি অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, তাহা মৈথিলীর অপভ্রংশ। এই জন্য মহানন্দা নদীকেই বাঙ্গলার সীমা বলিয়া গণ্য করিতে হয়।

এই নদী দার্জিলিঙ্গ জেলার হিমালয় পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া জলপাইগুড়ী জেলার পশ্চিমভাগ দিয়া পূর্ণিয়া জেলায় প্রবিষ্ট হইয়াছে, এবং তথা হইতে বক্রভাবে মালদহ জেলার কিয়দ্দূর উত্তরাংশে প্রবাহিত হইয়া অবশেষে উত্তর দক্ষিণে মালদহ জেলাকে প্রায় মাঝামাঝি দ্বিখণ্ড করিয়া অবশেষে রাজসাহী জেলার সীমায় গোদাগাড়ী নামক স্থানে পদ্মায় মিশিয়াছে।

কিন্তু অতি পূর্ব্বকালে গঙ্গার গতি এক্ষণকার সময়ের মত ছিল না—অতিশয় বিভিন্ন ছিল। এক্ষণে দেখা যায়, মালদহ জেলার পশ্চিমাংশে পূর্ণিয়ার সীমার নিকট হায়াতপুর নামক গঞ্জের সন্নিকট পর্য্যন্ত গঙ্গানদী পূর্ব্ববাহিণী থাকিয়া ঐখানে দক্ষিণ দিকে বক্র হইয়াছে। পূর্ব্বকালে এই হায়াতপুরের সন্নিকটে হয় ত মূল গঙ্গাস্রোত, না হয় গঙ্গার একটি প্রবল শাখা পূর্ব্বমুখেই প্রবাহিত থাকিয়া, এক্ষণে যেখানে পীরগঞ্জ নামক গ্রাম অবস্থিত, তথায় মহানন্দার সহিত মিলিত হইয়াছিল। এই পীরগঞ্জের অতি নিকটে, মহানন্দার পূর্ব্বপারে, প্রাচীন পুণ্ড্রনগরের চিহ্ন দেখা যায়। এই স্থানে পালখনদিঘী বা রায়খাঁদিঘী নামক একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা আছে। ইহা উত্তর দক্ষিণে লম্বা, তাহাতে হিন্দুর খাত বলিয়া সহজেই বুঝা যায়। ইহার দক্ষিণ তীরে কনকচম্পার জঙ্গল মধ্যে প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। পুণ্ড্রনগর এক্ষণে "পাঁড়ুয়ার কাঠাল" অর্থাৎ পাঁড়ুয়ার জঙ্গল বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভাষা কথায় পুণ্ড্র শব্দ পাঁড়ুয়া এই আকার ধারণ করিয়াছে। গঙ্গা ও মহানন্দার প্রাচীন সঙ্গমস্থানে অবস্থিত থাকায়, এই পুণ্ড্রনগর এক সময়ে অতিশয় সমৃদ্ধ হইয়াছিল। পুণ্ড্রনগরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান পুণ্ড্রবর্দ্ধন বা পুণ্ড্রদেশ বলিয়া অভিহিত হইত। এবং এই প্রদেশের উচ্চশ্রেণীর লোকেরা পুণ্ড্র বা

পুণ্ড্রক বলিয়া উল্লিখিত হইত। এক্ষণে পুণ্ড্র শব্দ ভাষায়—"পুঁড়া" হইয়াছে। এবং পুঁড়ারা একটি জাতিতে পরিণত হইয়াছে। মালদহ জেলার পুঁড়া-জাতির লোকের সংখ্যা এক্ষণে প্রায় নয় সহস্র।

আমি কোনও সংস্কৃত গ্রন্থে দেখিয়াছি,—কোথায় দেখিয়াছি, তাহা ঠিক মনে পড়িতেছে না,—(হয় ত আমাদের পাঠকদের মধ্যেও কেহ কেহ দেখিয়া থাকিবেন) যে, পুণ্ড্রের "চন্দেল" এই এক নামান্তর ছিল। বাঙ্গলা দেশের যে সকল অধিবাসী এক্ষণে "পোদ" বা "চণ্ডাল" বলিয়া উল্লিখিত হয়, ইহারাও পুণ্ড্র বা চন্দেলজাতীয় বলিয়াই আমার বোধ হয়। পুঁড়া ও পোদ এক জাতি বলিয়াই পরিগৃহীত হইয়া থাকে, কিন্তু আচারব্যবহার, ভাষা ও আকৃতিতেও পূর্ব্ব বাঙ্গলার চণ্ডালের সহিত পোদজাতির বিশেষ সাদৃশ্য দেখি। আমার বোধ হয়, আমাদের সংস্কৃতভাষী পণ্ডিতমহাশয়েরা "চন্দেল" এই দেশীয় নামকে সংস্কৃত "চণ্ডাল" বলিয়া গোল বাধাইয়াছেন। চণ্ডালেরা আপনাদিগকে ভুলিয়াও চণ্ডাল বলে না; তাহারা আপনাদের প্রাচীন প্রভুত্ব স্মরণ করিয়া শূদ্রজাতির সকল লোকের মধ্যে আপনাদের উৎকর্ষ খ্যাপন জন্য আপনাদিগকে "নমশূদ্র" বলিয়া পরিচয় দিতে ভালবাসে।—ফলতঃ, পুণ্ড্রনগরের দক্ষিণে মহানন্দার পূর্ব্বতীরে আজিও একটি বিস্তীর্ণ ভূভাগের নাম চাঁদলাই পরগণা। এই পরগণার কিয়দংশ ভূমি রাজসাহী ও দিনাজপুরের মধ্যে পড়ে। আমি দেখি নাই, কিন্তু বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি যে, চাঁদলাই পরগণার মধ্যে চাঁদলাই নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে; তথায় প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। সম্ভবতঃ, পুণ্ড্রবর্দ্ধনের নামান্তর যে চন্দেলদেশ, তাহারই কিয়দংশ আজিও চাঁদলাই পরগণা বলিয়া অভিহিত হইতেছে।

পুণ্ড্রনগর হইতে আরম্ভ করিয়া বরাবর সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত ভাগীরথীতীরে পুণ্ড্র বা চন্দেলজাতির (আধুনিক পুঁড়া, পোদ ও চন্দেলজাতির) আধিপত্য ছিল। মালদহ হইতে আরম্ভ করিয়া চব্বিশ পরগণা পর্য্যন্ত ভাগীরথীতীরে এই জাতির লোক আজিও সমধিক পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়।

গঙ্গার সহিত সাগরসঙ্গমে পুণ্ড্রদের শাসিত ভূখণ্ড শেষ হইলেই, তাহার অপর পারে মেদিনীপুর জেলার কাঁথী মহকুমায় উড্রদের শাসিত ভূখণ্ডের আরম্ভ। মনুসংহিতায় প্রসিদ্ধ "পুণ্ড্রকাশ্চোড্রদ্রবিড়া" ইত্যাদি যে শ্লোক তৎকালীন আর্য্য উপনিবেশের সীমা নির্দ্দেশ করে, তাহাতেও পুণ্ড্র ও উড্র রাজ্য পাশাপাশি থাকা শুনা যায়।

এই প্রাচীন ও বিস্তীর্ণ পুণ্ড্র রাজ্যের রাজধানী পুণ্ড্রনগরী এক্ষণে পাঁড়ুয়ার কাঠালে পরিণত। গৌড়ে পালবংশীয় রাজাদের প্রাদুর্ভাব হইলে,—পুণ্ড্রবর্দ্ধন পালেদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়।

কালবশে গঙ্গাস্রোত পীরগঞ্জে মহানন্দার সহিত না মিলিয়া দক্ষিণ দিকে সরিয়া সরিয়া এক্ষণে মালদহ নগরের নিম্নে আসিয়া মিলিয়াছে। প্রাচীন গঙ্গা-স্রোত এক্ষণে পুথুরিয়া নদী নামে আখ্যাত। স্থানে স্থানে প্রাচীন গঙ্গাগর্ভ এই প্রদেশে জলাভূমি বা বিল অর্থাৎ হ্রদে পরিণত হইয়াছে।

এক্ষণে যে গঙ্গাস্রোত মালদহ নগরের নিম্নে মহানন্দার সহিত মিলিত, তাহার স্থানীয় নাম কালিন্দী। ইহাকে কেহ কেহ কালিন্দীগঙ্গাও বলে। গঙ্গা এইরূপে সরিয়া আসিলে, এক্ষণে কালিন্দীর একপারে যেথানে পিছলীর কাঠাল ও গঙ্গারামপুরের কাঠাল, ও অপর পারে শোলপুর গ্রাম,—এইথানে পালবংশীয় রাজাদের আমলে একটি নূতন নগরের পত্তন হয়, এবং তাহা "গৌড়" * এই নামে বিখ্যাত হয়। প্রাচীন পুণ্ড্রে বাণিজ্য ও গতায়াতের অসুবিধা, কিম্বা উক্ত নগর নদী সরিয়া গেলে অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়ায়, বোধ হয়, এই নূতন রাজধানীর উৎপত্তি হইয়াছিল।

গৌড়নগর বলিলে এক্ষণে ইংরাজবাজার নগরের তিন মাইল দক্ষিণে আরম্ভ করিয়া বহুদূরব্যাপী গড়বেষ্টিত যে ভূভাগে রাশি রাশি পুষ্করিণী ও ইষ্টকালয়ের ভিটাবাড়ীর এবং মসজীদ ও রাজপ্রাসাদাদির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, সচরাচর লোকে তাহাকেই বুঝিয়া থাকে। কিন্তু এই গৌড়কে "মুসলমান গৌড়" বলা উচিত। পালবংশের ও সেনবংশের আমলে গৌড়নামে যে রাজধানী ছিল, তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন; তাহা ইহার উত্তরে কালিন্দীতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

স্থানীয় লোকের মুখে শুনিয়াছি যে, কালিন্দীর সন্নিকটে পিছলী গঙ্গারাম-

---

* অতি পূর্ব্বকালে অযোধ্যার একাংশকে গৌড়দেশ বলিত। পাণিনিসূত্রে যে গৌড়দেশের উল্লেখ আছে, তাহা আমার বোধ হয় এই গৌড়। গৌড়দেশীয় রাজারা কালে পূর্ব্বাভিমুখে রাজ্যবিস্তার করিলে, অযোধ্যা হইতে বাঙ্গলার সীমা পর্য্যন্ত গঙ্গার উত্তরতীরস্থ সমগ্র ভূভাগই গৌড়দেশ বলিয়া বিখ্যাত হয়। এই ভূভাগে একদা পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন গৌড়রাজ্য থাকায়, তাহারা পঞ্চগৌড় ও তাহাদের রাজারা পঞ্চগৌড়াধিপ বলিয়া বিখ্যাত হয়েন। পালবংশের প্রথম রাজারা এই সমগ্র গৌড়েরই রাজা ছিলেন, কিন্তু শেষাশেষি পাল রাজারা বেহারের কিয়দংশ ও বাঙ্গলা দেশমাত্র দখল করিতেন। বোধ হয়, এই সময়েই মালদহের গৌড়ের উৎপত্তি।

পুরে রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজবাটী ছিল। পরে প্রমাণান্তরের দ্বারা এই কথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিব। ফলতঃ, এক্ষণে ইংরাজবাজার নগরের দক্ষিণে একটি প্রকাণ্ড গড় দৃষ্ট হয়, এটি পুরাতত্ত্ব-অনুসন্ধায়ীদের বিশেষ লক্ষ্য করিবার বস্তু। এই গড়ের একপ্রান্ত মহানন্দার পশ্চিমতীরে গিলাবাড়ী নামক গ্রামে শেষ হইয়াছে। তথা হইতে ইংরাজবাজারের সংলগ্ন মহেশপুর গ্রামে এই গড় আসিয়াছে। এই স্থানে কোথাও ইহাকে শিকারতলীর গড়, কোথাও বা চাঁদমুনির গড় বলে। পরে মালদহের জেলের কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিক হইয়া পূর্ব্বমুখে গড়টি সিঙ্গতলা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। এইখানে গৌড়রোড্ গড় ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহার পর, হাথিমারি ও বাঘবাড়ী গ্রাম দিয়া যেখানে এই গড় চলিয়া গিয়াছে, তথায় গড়ের সংলগ্ন রাজা বল্লালসেনের রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ পরিদর্শিত হয়। তাহার পর গড়টি বরাবর সোনাতলার কাঠালের উপর দিয়া, প্রাচীনকালে ঐ কাঠালের পূর্ব্বাংশে যথায় গঙ্গাস্রোত ছিল, তথায় গিয়া মিলিয়াছে। তাহাতে দেখা যাইবে, মহানন্দা হইতে গঙ্গানদী পর্য্যন্ত এই গড়টি বিস্তৃত ছিল। গড়ের দক্ষিণাংশে ও সোনাতলা কাঠালের পূর্ব্বাংশে ভূমি জলা-ময়; বর্ষাকালে ইহা একবারে জলমগ্ন হইয়া যায়; কিন্তু সোনাতলা কাঠাল উচ্চস্থান, উহা ডুবে না।

এই গড়টিই পালরাজধানী হিন্দুগৌড়ের দক্ষিণ সীমার গড়। পূর্ব্বে মহানন্দা নদী, উত্তরে কালিন্দী নদী, পশ্চিমে মূল গঙ্গাস্রোত, দক্ষিণে এই গড়, এই চতুঃসীমার মধ্যেই হিন্দুগৌড় অবস্থিত ছিল, স্পষ্ট বিবেচনা হয়। তবে কালিন্দীর অপর পারেও গৌড়নগরের কিয়দংশ অবস্থিত ছিল।

পালবংশের ধ্বংস হইলে এবং সেনবংশ বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করিলে, এই ভূভাগের মধ্যেই বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের রাজবাটী থাকার কথা, আজিও লোকের স্মৃতিতে জাগরূক আছে। বল্লালসেনের রাজবাটী হইতে পশ্চিমে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত একটি জাঙ্গাল ছিল, তাহা আজিও বিদ্যমান। যে গড়ের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, মহারাজা লক্ষ্মণসেন ইহার দক্ষিণে উচ্চভূমির উপর গঙ্গাতীরে এক নূতন নগর নির্ম্মাণ করেন।—এবং তাহাকেও গড়-বেষ্টিত করেন। এই গড়ের পশ্চিমোত্তর ভাগে এক স্থানে রাজবাটী নির্ম্মিত হয়, এবং পুরদ্বারে নগররক্ষিণী চণ্ডীদেবীর মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। দুর্গের যে স্থানে পুরদ্বার ছিল, তাহা আজিও দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহার নাম "দ্বারবাসিনী" তোরণ। দ্বারবাসিনী চণ্ডীর মূর্ত্তি মুসলমানেরা বিনষ্ট করিয়াছে, কিন্তু যেখানে চণ্ডী

ছিলেন, তথায় এক্ষণে একটা লাক্ষানির্ম্মিত দেবতার মুণ্ড লাগান আছে। উহাই আজিও চণ্ডী বলিয়া পূজিত হইতেছে, এবং তাহার সম্মুখে বলিদান হয়। নূতন নগরের দক্ষিণপ্রান্তে মহারাজা লক্ষ্মণসেন এক বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা খনন করাইতে আরম্ভ করেন; কিন্তু ইহা সমাপ্ত না হইতে হইতেই তিনি বখ্‌তিয়ার খিলজ্বী কর্ত্তৃক পাশ্চাত্য বঙ্গ হইতে তাড়িত হয়েন। মুসলমানেরা এই দীর্ঘিকা খনন শেষ করেন। ইহার নাম "সাগরদিঘী"; ইহা উত্তরদক্ষিণে লম্বা দীর্ঘে ১৬০০ গজ, প্রস্থে তাহার অর্দ্ধেক ও কিছু বেশী। ইহার পাড় মধ্যে ইষ্টক-নির্ম্মিত, উপরে মৃত্তিকাচ্ছাদিত। ইহার চারি পাড়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছের জঙ্গল—জল আজিও টল টল করিতেছে! এত বড় ও এত সুন্দর জলাশয় বাঙ্গালার আর কুত্রাপি আছে কি না সন্দেহ।

গৌড়নগরকে আয়তনে এইরূপে বাড়াইয়া ও তথায় নূতন নূতন ইষ্টাপূর্ত্তের কার্য্য আরম্ভ করিয়া মহারাজ লক্ষ্মণসেন স্বনামে এই নগরকে বিখ্যাত করিবার অভিলাষে, ইহার "লক্ষ্মণাবতী" এই নূতন নামকরণ করেন।

ইহারই কিছুকাল পরে, ১১২৪ শকে (১২০২ খ্রীষ্টাব্দে) তুরস্কেরা অর্থাৎ বখতিয়ার খিলজীর সৈন্যদল—যাহারা তৎকালে এদেশে তুরস্ক বলিয়া বিখ্যাত ছিল—তাহারা গৌড়রাজ্যের পশ্চিম ও উত্তর ভাগ অধিকার করিল। লক্ষ্মণ যখন নবদ্বীপ হইতে বিনা যুদ্ধে পলায়ন করিলেন, তখন বখ্‌তিয়ার খিলজ্বী মহম্মদ শিরান নামক আপনার একজন সেনাপতিকে লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন, এবং স্বয়ং ভোটরাজ্য জয় করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। দিনাজপুর জেলায় পূর্ণভবা নদীর তীরে দেবকোট নামে যে একটি নগর ছিল, এইখানেই বখতিয়ার আপন স্কন্ধাবার স্থাপন করেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি ভোট হইতে পলাইয়া আসার পর আলিমর্দ্দান নামক জনৈক মুসলমান নায়কের হস্তে এই দেবকোটেই নিহত হয়েন। ফলতঃ দেখা যায়, মুসলমানদের বঙ্গাধিকারের অব্যবহিত পরেই লক্ষ্মণাবতী মুসলমান রাজধানীতে পরিণত হয় নাই। বখতিয়ারের মৃত্যুর পর মুসলমান স্কন্ধাবার কিছুকাল দেবকোটেই ছিল। পরে হিসামুদ্দীন আবজ নামক বখতিয়ারের জনৈক সেনাপতি বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তৃত্ব পদে নিযুক্ত হইয়া সর্ব্বপ্রথমে মুসলমানদের "জয়স্কন্ধাবার"—অর্থাৎ রাজধানী,—লক্ষ্মণাবতীতে আনয়ন করেন। হিসামুদ্দীন আবজ্ ইতিহাসে গিয়াসুদ্দীন নামেই বিশেষ পরিচিত।

Stewart সাহেব বাঙ্গালার ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে,—

"After the flight of the Raja (অর্থাৎ লক্ষ্মণসেন) Bukhtyar gave up the city (নবদ্বীপ) to be plundered by his troops, reserving for himself only the Elephants and public stores. He then proceeded without opposition to Luknowty, and *Established the ancient City of Gaur as the capital of his dominions.* As necessary part of this ceremony, he destroyed a number of Hindu temples and with their materials created mosques, Colleges, Caravan Series on their ruins"—p 28.

এই বিষয়ের Italic অংশ ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। তিনি লক্ষণাবতী অধিকার করিয়া লক্ষণের চণ্ডী প্রভৃতি দেবমূর্ত্তি বিনাশ করেন ও নগর লুট-পাট করেন সত্য, কিন্তু তৎকাল পর্য্যন্ত যেখানে মুসলমান সৈন্যের বিজয়-স্কন্ধাবার, তাহাই তাহাদের রাজধানী বলিয়া গণ্য হইত। দেবকোটে এই জয়স্কন্ধাবার স্থাপিত হওয়ায়, তাহাই তৎকালে বাঙ্গালার রাজধানী বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য।

Stewart সাহেবের বিবরণ অনুসারে, ১২১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১৫ বৎসর কাল, গিয়াসুদ্দীনের রাজত্ব। ইহারই প্রথম ভাগে লক্ষ্মণাবতী মুসলমান-শাসিত বঙ্গের রাজধানীতে পরিণত হয়, দেখা যায়।

উক্ত সাহেব লিখিয়াছেন;—"বাঙ্গলার রাজসিংহাসনের জন্য নির্ব্বাচিত হইলে তিনি গিয়াসুদ্দীন উপাধি ধারণ করিলেন, এবং লখনৌতি নগরে তিনি আপন বাসস্থান উঠাইয়া লইয়া গেলেন। এই নগরের অভ্যুদয় ও সৌষ্ঠব সাধ-নের জন্য তিনি বিস্তর প্রয়াস এবং অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে তিনি একটি জমকাল গোছের মসজীদ, একটি বিদ্যালয় এবং একটি পান্থশালা নির্ম্মাণ করেন। গৌড়ের নিকটবর্ত্তী ভূমি জলা-ময় থাকায়, তিনি এক দিকে বীরভূম-স্থিত নগর পর্য্যন্ত, অপর দিকে দেবকোট পর্য্যন্ত, দশ দিনের পথ গতিবিধির সৌকর্য্যার্থে জাঙ্গাল প্রস্তুত করেন। তাহাতে বর্ষাকালে যে স্থান অতি দুর্গম ছিল, তথায় যাতায়াতের পক্ষে লোকের বিস্তর সুবিধা ঘটিয়াছিল।"

গিয়াসুদ্দীনের মৃত্যুর ১৬ বৎসর পরে, অর্থাৎ ১২৪৩—৪৪ খৃষ্টাব্দে, তব-কতনাসিরী নামক প্রসিদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থের লেখক মিনহাজ উদ্দীন জেবরজানি সাহেব লক্ষ্মণাবতী নগরে আগমন করেন। তিনি আপন গ্রন্থে লিখিয়া গিয়া-ছেন;—"এই গ্রন্থের লেখক হিজিরার ৬৪১ অব্দে লক্ষ্মণাবতী নগরে উপস্থিত হয়েন, এবং ঐ রাজা (হিসামুদ্দীন আবজ্) যে সকল ধর্ম্মকার্য্যসম্পর্কীয় অট্টা-লিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা পরিদর্শন করেন। লক্ষ্মণাবতী দুই শাখায় বিভক্ত, এক একটি শাখা গঙ্গার এক এক পারে। গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্ত্তী

অংশের নাম "ডাল"; এবং লক্ষ্মণাবতীর যে অংশ সহর, তাহা ঐ তীরে। লক্ষ্মণাবতী হইতে নগর পর্য্যন্ত এক দিকে এবং দেবকোট পর্য্যন্ত অপর দিকে, দশ দিনের পথ ব্যাপিয়া একটি জাঙ্গাল আছে। বর্ষাকালে এই জাঙ্গাল দেশকে জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করে; এই জাঙ্গাল যদি না থাকিত, তবে স্থানীয় অট্টালিকা সকল নৌকা ব্যতিরেকে অন্য উপায়ে দেখিতে যাইবার উপায় থাকিত না;—তাঁহার সময় হইতে জাঙ্গাল নির্ম্মিত হইবায়, পথটি সকলের সুগম হইয়াছে।" মিন্‌হাজের এই বিবরণ পাঠ করিয়া অনেকে আশ্চর্য্য হয়েন। কেন না, সচরাচর যাহা গৌড় বলিয়া বিদিত, অর্থাৎ মুসলমান গৌড়,—তাহা গঙ্গার দুই তীরে কোনও কালেই অবস্থিত ছিল না। উহা ভাগীরথীর পূর্ব্ব তীরে ছিল। মিন্‌হাজের লক্ষ্মণাবতীর সহর-অংশ যদি মুসলমান গৌড় বলিয়া ধরা যায়, তবে উহা গঙ্গার পশ্চিম তীরে হয় না। প্রকৃত বৃত্তান্ত এই যে, মিন্‌হাজ কালিন্দীকেই গঙ্গা বলিয়া গিয়াছেন। গঙ্গারামপুর কাঠালের নিকটে কালিন্দী বক্রভাবে উত্তর-দক্ষিণ-বাহিনী হইয়াছে। পিছলী গঙ্গারামপুর নদীর পশ্চিমে,—শোলপুর নদীর পূর্ব্বে—এই দুই গ্রামই তৎকালের লক্ষ্মণাবতীর অন্তর্গত ছিল। তবে লক্ষ্মণাবতীর প্রধান ভাগই নদীর পশ্চিম তীরে ছিল। শোলপুর হইতে গিয়াসুদ্দীনের জাঙ্গাল পীরগঞ্জ অভিমুখে প্রসারিত ছিল। আজিও তাহার চিহ্ন জাজ্জল্যমান; আমি চক্ষে দেখিয়াছি। এই জাঙ্গাল এক্ষণে জঙ্গলে পরিপূর্ণ, তাহা দিয়া আর লোক চলে না। ফলতঃ শোলপুর হইতে উত্তরপূর্ব্বাভিমুখে পীরগঞ্জ পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বমুখে কালিন্দীর ধারে ধারে মালদহ নগর পর্য্যন্ত, দুইটি জাঙ্গালের চিহ্ন বর্ত্তমান। প্রথমটিই মিন্‌হাজের উল্লিখিত জাঙ্গাল বোধ হয়। পীরগঞ্জের অপর পারেই প্রাচীন পুণ্ড্র নগর। তথা হইতে উক্ত জাঙ্গাল বরাবর পূর্ব্বমুখে টাঙ্গন নদীর তীরে রাণীগঞ্জ নামক স্থানে গিয়াছে। রাণীগঞ্জে একটি দুর্গ ছিল। ইহার অপর পারেও জাঙ্গালের চিহ্ন এক্ষণে অনেক দূর পর্য্যন্ত বর্ত্তমান। ইহাকে স্থানীয় লোকে ডোখলার বাঁধ বলিয়া থাকে। ইহা মালদহ জেলা অতিক্রম করিয়া দিনাজপুরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, এবং ইহা দেবকোটে গিয়া শেষ হইয়াছিল।

অপরদিকে লক্ষ্মণাবতী হইতে বীরভূম জেলার নগর পর্য্যন্ত যে জাঙ্গালের কথা মিন্‌হাজ বলেন, তাহার চিহ্নও অদ্যাপি জাজ্জল্যমান। সোণাতলা কাঠালের মধ্য দিয়া প্রাচীন গঙ্গার তীরে তীরে এই জাঙ্গাল দক্ষিণ দিকে প্রধাবিত ছিল।

সোণাতলা কাঠালের মধ্যে ইহা এখনও বর্ত্তমান। ধোবড়া গ্রাম পর্য্যন্ত ইহার চিহ্ন দেখা যায়।

ইহাতে দেখা যায় যে, মিনহাজ কালিন্দীতটে বসিয়াই আপন বিবরণ লিখিয়াছেন। এবং তখনকার লক্ষণাবতী কালিন্দীর তীরে শৌলপুর ও পিছলী গঙ্গারামপুর হইতে সাগরদিঘী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল মাত্র। সাগরদিঘীর দক্ষিণে যে নূতন নগর নির্ম্মিত হয়, তাহা পরবর্ত্তী কালের।

১৩৪৩ খৃষ্টাব্দে হাজি ইলায়াস্ সুলতান সামসুদ্দীন উপাধিধারণপূর্ব্বক বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, এবং ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহাঁর সময়ে দিল্লীর সম্রাট্ ফিরোজ বাঙ্গালা আক্রমণ করেন; বিপন্ন হইয়া সামসুদ্দীন স্বয়ং একডালায় * এবং তাঁহার পুত্র পুণ্ড্রে (পাঁড়ুয়ায়) রাজ্যরক্ষার্থ সেনানিবেশ সংস্থাপন করিলেন। এই সময়ে রাজধানী লক্ষণাবতী হইতে আবার উঠিয়া গেল এবং সামসুদ্দীনের সময় হইতে রাজা কংস বা রাজা গণেশের সময় পর্য্যন্ত, প্রাচীন পুণ্ড্রনগর নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের ন্যায় আর একবার জ্যোতিতে স্ফীত হইল। সামসুদ্দীনের পুত্র সুলতান সেকেন্দর সাহ, বিখ্যাত আদিনা মসজীদের নির্ম্মাণকর্ত্তা।

বাঙ্গালার ইতিহাসে রাজা কংস বা রাজা গণেশের মত আশ্চর্য্য ব্যক্তি অতি বিরল। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার ইতিহাস একবারেই অপরিজ্ঞাত বলিলেও বলা যায়। যত দূর জানা যায়, তাহাতে তিনি দ্বিতীয় সামসুদ্দীনের রাজত্বকালে বিদ্রোহী হইয়া উক্ত রাজাকে যুদ্ধে নিহত করেন, এবং স্বয়ং রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি খৃষ্টাব্দ ১৩৮৫ হইতে ১৩৯২ পর্য্যন্ত সাত বৎসর কাল রাজত্ব করেন। এবং পুণ্ড্রনগরের উন্নতিকল্পে অনেক প্রয়াস পাইয়াছিলেন। Stewart বলেন:—During the reign of Raja Kanis, the city of Pandua was much extended and celebrated in the East, and the temples of idolatry again raised their heads. কিন্তু গণেশের মৃত্যুর পর, তৎপুত্র যদুসেন, জেলালুদ্দীন উপাধিধারণপূর্ব্বক মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। জেলালুদ্দীন পুণ্ড্র পরিত্যাগপূর্ব্বক আবার গৌড়েই রাজধানী স্থাপিত করিলেন।

১৪০৯ খৃষ্টাব্দে জেলালুদ্দীনের মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্র আহম্মদ সাহ ১৪২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গৌড়ে রাজত্ব করেন। তিনি অপুত্রক হইয়া কালগ্রাসে পতিত

* কেহ কেহ বলেন, একডালা পূর্ব্ববঙ্গে; কেহ কেহ বলেন ইহা দিনাজপুরে।

হয়েন, এবং তাঁহার পর হাজি ইলায়েসের বংশ পুনর্ব্বার রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। এই পুনঃস্থাপিত বংশের প্রথম রাজার নাম নাসীরসাহ; তিনি দীর্ঘকাল (১৪২৬ হইতে ১৪৫৮ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত) নির্ব্বিবাদে রাজত্ব উপভোগ করেন,—এবং তাঁহারই রাজত্বকালে মুসলমান গৌড়ের চারিদিকের গড় নির্ম্মিত হয়।

রাজা গণেশের পুত্র জেলালুদ্দীনকেই অন্তিম গৌড় বা মুসলমান রাজধানী গৌড়ের স্থাপনকর্ত্তা বলিয়া গণ্য করিতে হয়। এই নূতন নগর সাগরদিঘীর দক্ষিণে অবস্থিত। Stewart বলেন :—Jelal-ud-din removed again the seat of Government from Pandua to Gour, and expended large sums of money in improving that city. The mosque, baths, reservior, and caravanserai, distinguished by the name Jellally were all constructed by him.—P. 61. প্রকৃত বৃত্তান্ত এই যে, প্রাচীন গৌড় বা লক্ষ্মণাবতীর দক্ষিণে যে উপনগর গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল, মহারাজ যদুসেন ওরফে সুলতান জেলালুদ্দীন, তথায় এক নূতন "গৌড়" নগর নির্ম্মাণ করিলেন। নূতন রাজবাটী নির্ম্মিত হইলেই তাহার চারি দিকে নূতন সহর সমুত্থিত হইয়া থাকে। এক্ষণে ভাগীরথীতীরে যথায় মুসলমান রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে, ঐখানেই জেলালুদ্দীন আপন রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে ইহার চারিদিকে এক গুলজার সহর সমুত্থিত হইল। এবং নাসীর সাহার সময়ে তাহা গড়-বেষ্টিত হইল।

সে কালের মলমূত্রদূরীকরণপ্রণালী ভাল ছিল না, এবং জলশোধন করিয়া পান করিবারও রীতি ছিল না। সুতরাং প্রশস্ত নদীতীর ভিন্ন প্রকাণ্ড নগর স্থায়ী হইবার উপায়ান্তর ছিল না। নদীর জলে ময়লা ধৌত হইয়া যাইত, নদীর স্রোতের জলে স্নান ও পান নির্ব্বাহ হইত। নদীর অবস্থান-পরিবর্ত্তন হইলেই, এই স্বাভাবিক সুবিধার হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে নগর সকল সরিয়া যাইত। যতদিন পুণ্ড্রের নিকট গঙ্গা ছিল, ততদিন পুণ্ড্রনগরী অভ্যুদয়সম্পন্ন ছিল। গঙ্গা যখন সরিয়া আসিলেন, তখন পালরাজাদের সময়ে কালিন্দীতীরে নূতন গৌড়নগর সমুত্থিত হইল। আবার গঙ্গা যেমন সরিয়া সরিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমে যাইতে লাগিলেন, তেমনি নগরও সরিয়া সরিয়া সেইদিকে গেল। লক্ষ্মণ সেনের সময় পর্য্যন্ত বল্লাল সেনের রাজবাটীসংলগ্ন বাঘবাড়ীর গড় (যাহা মহানন্দা হইতে গঙ্গা পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ) গৌড়ের দক্ষিণ সীমা ছিল। মহারাজা লক্ষ্মণ সেন ইহার দক্ষিণে নূতন নগর নির্ম্মাণ করেন, তাহাই পূর্ব্বের গৌড়ের সহিত 'লক্ষ্মণাবতী' নামে

ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। এই সময়ের পরও গঙ্গার পশ্চিমদক্ষিণে অপসরণক্রিয়া আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। পুরাতন সহর গলিজ ও ময়লা হইলেই, তখনকার রাজারা সরিয়া সরিয়া রাজবাটী নির্ম্মাণ করিতেন। এই নিয়ম অনুসারেই রাজধানীর এত পরিবর্ত্তন হইত। অবশেষে এই নিয়ম-অনুসারেই যদু সেনের নূতন গৌড় নগর রামকেলী গ্রামের নিকটে গঙ্গাতীরে নির্ম্মিত হয়। ইহাকেই সর্ব্বসাধারণ পাঠকে গৌড় বলিয়া জানে, এবং এই স্থানেই হুসেন সাহের রাজ্যকালে রূপসনাতনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য চৈতন্যের আগমন হইয়াছিল। কিন্তু স্থানীয় লোকে লক্ষ্মণাবতী কোথায় ছিল, তাহা আজিও ভুলে নাই। সেই স্থান এক্ষণে অধিকাংশ অরণ্য, তথায় লোকের বসতি নাই।

আমি মালদহ জেলাকে প্রাচীন বাঙ্গালার সমাধিস্থান বলিয়াছি; ইহাকে এক অর্থে মুসলমান বাঙ্গালারও সমাধি বলা চলে। নবাব সেরাজউদ্দৌলা ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২১ জুন তারিখে পলাসীর সংগ্রামে হারিলেন। যুদ্ধস্থান হইতে তিনি ভগবানগোলায় পলাইয়া আসিলেন। তৎকালে মীরজাফরের এক সেনাপতি রাজমহলে অবস্থিতি করিতেছিলেন; গঙ্গাপথে গেলে পাছে তাঁহার হস্তে পড়িতে হয়, সেই ভয়ে হতভাগ্য নবাব নৌকায় করিয়া মহানন্দা নদীতে প্রবেশ করিলেন। এই নদী উজানে বাহিয়া তিনি গুপ্তবেশে মালদহ নগরের নিকট কালিন্দীতে উত্তীর্ণ হইলেন, এবং বখতিয়ার খিলজী একদা যে লক্ষ্মণাবতী লুটপাট করিয়াছিলেন, কালিন্দী বাহিয়া তিনি তাহারই মধ্য দিয়া, রতুয়া থানার নিকট বড়াল নামক গ্রামে পৌছিলেন। এই গ্রামে দানাসাহা নামক এক মুসলমান ফকীর বাস করিত। সে নবাবকে চিনিতে পারিয়া, অর্থলোভেই হউক, অথবা প্রতিহিংসাপ্রণোদিত হইয়াই হউক, (কেন না, কেহ কেহ বলেন যে, মুরসিদাবাদে সিরাজুদ্দৌলার আদেশে ইহার কর্ণ ছিন্ন হইয়াছিল) তাঁহাকে ধরাইয়া দিল। যেস্থানে সিরাজুদ্দৌলা ধৃত হইলেন, ঐ স্থান কালিন্দীতীরবর্ত্তী; উহা তদবধি "সুবামার" নামে বিখ্যাত। স্থানীয় লোকে তাহাকে "শুওরমারা" নাম দিয়াছে। হায় বিধাতঃ! মূর্খের জিহ্বাতে তুমি সুবা সিরাজুদ্দৌলাকে শূকরে পরিণত করিয়াছ!! বাঙ্গালাদেশে মুসলমান রাজত্বসূর্য্যও যাহা লক্ষ্মণাবতীতেই উদিত হইয়াছিল,—তাহা সিরাজুদ্দৌলার বন্ধনদশায় এই রূপে লক্ষ্মণাবতীর অদূরেই অস্তমিত হইল।

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।

ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন।

অগ্রহায়ণ মাসের "সাহিত্যে" শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়, মৎপ্রকাশিত ধর্ম্মপালের নূতন তাম্রশাসনের তাৎপর্য্য সমালোচনা করিয়াছেন। আমার সহিত কোনও কোনও স্থানে তাঁহার মতভেদ হইয়াছে।

প্রথমতঃ, আমি যে পাঠোদ্ধার করিয়াছি, তাহার শুদ্ধিবিষয়ে তাঁহার সন্দেহ আছে। তিনি আক্ষেপ করিয়াছেন যে, আমি যে পাঠ দিয়াছি, তাহার সহিত তাম্রশাসনের একটি লিথো বা ফটো-জিংকোগ্রাফ্ প্রদত্ত হয় নাই। তাম্রশাসনখানি সম্প্রতি পণ্ডিতগণের দেখিবার জন্য এসিয়াটিক্ সোসাইটিতে স্থাপিত হইয়াছে। সিংহ মহাশয় তথায় গেলে আসল জিনিষ দেখিতে পাইবেন। সোসাইটির ১৮৯৪ সালের ১নং জর্ণালেও উহার একটি ফটো দেখিতে পাইবেন। আমার পাঠে দুই এক স্থানে অশুদ্ধি থাকা সম্ভব; সিংহ মহাশয় তাহা যদি দেখাইয়া দেন, পরম বাধিত হইব।

তাহার পর শাসনখানি দেবোত্তরের সনন্দ, না ব্রহ্মোত্তরের সনন্দ, এ বিষয়ে সিংহ মহাশয়ের সন্দেহ জন্মিয়াছে। দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তরের কথা ছাড়িয়া দিয়া প্রশ্ন এই যে,—শাসনের নারায়ণভট্টারক, এক জন মনুষ্য, না কোনও দেবপ্রতিমা?

শাসনে লিখিত আছে:—

মতমস্তু ভবতাং।

মহাসামন্তাধিপতিশ্রীনারায়ণবর্ম্মণা দূতকযুবরাজশ্রীত্রিভুবনপালমুখেন বয়মেবং বিজ্ঞাপিতাঃ যথাস্মাভির্ম্মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যাভিবৃদ্ধয়ে শুভস্থল্যাং দেবকুলং কারিতস্তত্র প্রতিষ্ঠাপিতভগবন্নুন্ননারায়ণভট্টারকায় তৎপ্রতিপালকলাটদ্বিজদেবার্চ্চকাদিপাদমূলসমেতায় পূজোপস্থানাদিকর্ম্মণে চতুরোগ্রামান্ তত্রত্যহট্টিকাতলবাটকসমেতান্ দদাতু দেব ইতি। ততোঽস্মাভিস্তদীয়বিজ্ঞপ্ত্যা এতে উপরিলিখিতকাশ্চত্বারো গ্রামাস্তলবাটকহট্টিকাসমেতাঃ স্বসীমাপর্য্যন্তাঃ সোদ্দেশাঃ সদশাপচারাঃ অকিঞ্চিৎ প্রগ্রাহ্যাঃ। পরিহৃতসর্ব্বপীড়াঃ ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন চন্দ্রার্কক্ষিতিসমকালং তথৈব প্রতিষ্ঠাপিতাঃ।

সিংহ মহাশয়ের অনুবাদ:—

"তোমরা অবগত হও। মহাসামন্তাধিপতি শ্রীনারায়ণবর্ম্মা কর্ত্তৃক দূতস্বরূপ যুবরাজ ত্রিভুবনপালের মুখে আমরা (ধর্ম্মপাল) এইরূপে বিজ্ঞাপিত হইয়াছি যে, আমা (নারায়ণ বর্ম্মা) কর্ত্তৃক মাতা পিতা ও নিজের পুণ্য বৃদ্ধির জন্য শুভস্থলীতে একটি দেবকুল (দেউল) নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। তাহাতে স্থাপিত ভগবান নুন্ননারায়ণ ভট্টারক (দেবতা) কে তাঁহার প্রতিপালক (পরিচর্য্যা-কারক) লাটদেশীয় ব্রাহ্মণ ও দেবপূজক প্রভৃতি পরিচারকের

সহিত পূজা ও উপস্থানাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য তথাকার হাট ঘাট খাল ইত্যাদির সহিত চারিখানা গ্রাম মহারাজ দান করুন। সেই হেতু আমার (ধর্ম্মপাল) দ্বারা তাঁহার (নারায়ণ বর্ম্মার) বিজ্ঞাপন অনুসারে উপরে লিখিত স্বসীমান্তর্গত চারিখানা গ্রাম হাট ঘাট খাল ইত্যাদি ও সর্ব্বপ্রকার ভূমির অবস্থান পরিবর্ত্তনের সহিত আমাদের গ্রহণীয় কর প্রভৃতি রহিত করিয়া সর্ব্বপ্রকার বাধা বিঘ্ন পরিহার পূর্ব্বক চন্দ্র সূর্য্য ও পৃথিবীর স্থিতিকাল পর্য্যন্ত ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়ে সেইরূপ প্রদত্ত হইল।"

ইহার পর সিংহ মহাশয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন,—

"ইহা দ্বারা তাম্রশাসনের মর্ম্ম আমরা এইরূপ স্থির করিয়াছি যে, মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মপালের অধীনস্থ সামন্ত নরপতি নারায়ণবর্ম্মা শুভস্থলী নামক স্থানে এক দেবকুল নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে "নুন্ননারায়ণ" নামক এক (বিষ্ণু) দেবতা স্থাপন করেন। তিনি সেই দেবতার সেবা পূজা প্রভৃতি নির্ব্বাহ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য, লাটদেশীয় কতকগুলি ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত সামন্ত নরপতি নারায়ণবর্ম্মা যুবরাজ ত্রিভুবনপালের দ্বারা দেবতার সেবা পূজার ব্যয় এবং পূজক প্রভৃতির জীবিকানির্ব্বাহের জন্য চারিখানি গ্রাম নিষ্কর প্রদান করিবার কারণ—ধর্ম্মপালের নিকট প্রার্থনা করেন। কারণ, অন্যান্য তাম্রশাসনপাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, সামন্ত নরপতিবর্গের এইরূপ নিষ্কর ভূমি প্রদানের অধিকার ছিল না, এজন্য নারায়ণ বর্ম্মা ধর্ম্মপালের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ধর্ম্মপাল নারায়ণবর্ম্মার সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করেন।"

এ স্থলে আমার বক্তব্য এই যে, আমি এ পর্য্যন্ত "নুন্ননারায়ণ" নামক কোনও দেবতার নাম শুনি নাই। আমি বিবেচনা করি, "ভগবন্নুন্ন" এই সমস্ত পদটি "নারায়ণভট্টারকের" বিশেষণ।

"ভগবন্নুন্ন" শব্দের তাৎপর্য্যপরিগ্রহের পূর্ব্বে, লাহিড়ী-বংশাবলীতে ভট্টনারায়ণের যেরূপ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত আবশ্যক। তথায় লিখিত আছে,—

> "শুষ্কোৎফুল্লাক্ষপদ্মে স্ফুরতি সচকিতং বেদবেদাঙ্গবাণী
> ম্মানী কোদণ্ডপাণিঃ পবনগতিহয়ঃ কৌঙ্কিকোষ্ণীষমৌলিঃ।
> কণ্ঠে শ্রীশৈলচক্রং মলয়জতিলকৈরেতি কোলাঞ্চদেশাৎ
> সাক্ষান্নারায়ণশ্রীঃ সনিজপরিকরৈর্ভট্টনারায়ণোঽয়ং॥
> রাজা শ্রীধর্ম্মপালঃ সুখসুরধুনীতীরদেশে বিধাতুং
> নাম্নাদিগাঞী বিপ্রং গুণযুতনয়ং ভট্টনারায়ণস্য।
> যজ্ঞান্তে দক্ষিণার্থং সকনকরজতৈর্ধামসারাভিধানং
> গ্রামং তস্মৈ বিচিত্রং সুরপুরসদৃশং প্রাদদৎ পুণ্যকামঃ॥
> শাণ্ডিল্যগোত্রজাতানাং বরেন্দ্রেঽস্মৌ দ্বিজন্মনাং।
> আদিস্ততো জয়মণির্ভট্টো জজ্ঞে তু নন্দনঃ॥" ইত্যাদি।

এই প্রমাণে জানা যাইতেছে যে, ভট্টনারায়ণ ধর্ম্মপালের সময়ে এদেশে আগমন করেন। ইহাতে ভট্টনারায়ণপুত্র আদিগাঞী ওঝাকে ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক গ্রামদানের কথা আছে, যদিও ভট্টনারায়ণকে কোনও গ্রামদানের কথা নাই

বটে, কিন্তু তাহার কারণ এই উপলব্ধি হয় যে, ভট্টনারায়ণের বিস্তীর্ণ বংশাবলীর মধ্যে একটি বংশের, অর্থাৎ লাহিড়ী বংশের বিবরণমাত্র এ স্থলে লিখিত হইয়াছে। উক্ত বংশের আদিপুরুষ আদিগাঞী ওঝাকে যে গ্রাম দান করা হইয়াছিল, তাহারই বিবরণ কেবল তজ্জন্য এ স্থলে লিখিত হইয়াছে।

সিংহ মহাশয় ভট্টনারায়ণকে ধর্ম্মপালের সমকালীন ব্যক্তি বলিয়া অঙ্গীকার করিতে প্রস্তুত আছেন।—এখন দেখা যায়, ভট্টনারায়ণ একজন অতিশয় ধার্ম্মিক, দেবতুল্য, বেদাভিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। কবিতায় তাঁহাকে "সাক্ষাৎনারায়ণশ্রীঃ—বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। ঈদৃশ ব্যক্তি যে তাম্রশাসনে বিশেষ সম্মানের সহিত উল্লিখিত হইবেন, তাহা বিচিত্র নহে।

এক্ষণে "ভগবন্নুন্ন" শব্দের অর্থ কি, দেখা যাউক। নুদ-প্রেরণে—এই ধাতু হইতে "নুন্ন" অর্থাৎ প্রেরিত এই শব্দ নিষ্পন্ন হয়। চুদ্ ধাতুর অর্থও এইরূপ। ব্রাহ্মণদের গায়ত্রীমন্ত্র স্মরণ করিলে, এই ভগবন্নুন্ন শব্দের অর্থ পাওয়া যাইবে। "তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ।" যে ভগবান আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির নোদনকর্ত্তা, তাঁহার পরম জ্যোতিঃকে ধ্যান করার নাম গায়ত্রীজপ। মন্ত্রে যে সবিতা শব্দ আছে, ভাষ্যকার সায়ণ তাহার অর্থ করেন,—"সর্ব্বান্তর্যামিতয়া প্রেরকস্য"। অর্থাৎ যে ঈশ্বর মনুষ্যমাত্রের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে সৎকার্য্যে প্রেরণ করেন—তাঁহার নাম সবিতা—বা প্রেরক দেবতা। ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা ঈশ্বরের সেই নোদনা বা প্রেরণা অঙ্গীকার করিলে, "ভগবন্নুন্ন"-শব্দে অভিহিত হইবার যোগ্য হয়েন। ভগবন্নুন্ন অর্থাৎ ভগবৎপ্রেরিত, অর্থাৎ ধর্ম্মকর্ম্মে পরমনিষ্ঠাবান্।

আমি দেখাইয়াছি যে, ভট্টারক শব্দের আভিধানিক অর্থমালার মধ্যে "তপোধন ব্রাহ্মণ" একটি অর্থ। এই শব্দ রাজার প্রতি, দেবতার প্রতি, এবং তপোধন ব্রাহ্মণের প্রতি তুল্য প্রযুজ্য। সিংহ মহাশয় বলেন, অভিধানে যাহা হউক, ব্যবহারে দেবতা ও রাজা ভিন্ন ভট্টারক অন্যের প্রতি প্রযুক্ত হয় নাই; কিন্তু তিনিও এক ফুট-নোটে আবার স্বীকার করিয়াছেন যে, কয়েকজন জৈন গুরুর নামের সহিত "ভট্টারক" ও "ভট্টারকমুনি" শব্দ সংযুক্ত দেখা যায়। অতএব সিংহ মহাশয় আপনার আপত্তির উত্তর আপনিই দিয়াছেন।

তাম্রশাসনের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, ইহাতে স্বার্থে "ক"-এর ব্যবহার কিছু বেশী। "দূত" স্থানে "দূতক", "হট্ট" স্থানে "হট্টিকা", "বাট" স্থানে "বাটক", "লিখিত" স্থানে "লিখিতক", এইরূপ শব্দপ্রয়োগ

কেবল উদ্ধৃত অংশমধ্যেই দেখা যায়। সমুদায় শাসনে আরো অনেক উদাহরণ দেখা যাইবে। এই সম্প্রসারণপ্রণালী অনুসারেই "ভট্ট"-শব্দের পরিবর্ত্তে সমানার্থক "ভট্টারক" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়।

"ভগবন্নন্নারায়ণভট্টায়" শুনিতেও কিছু মুড়া মুড়া বোধ হয় বলিয়া, লেখক "ভট্টায়" স্থানে "ভট্টারকায়" লিখিয়াছেন বোধ হয়।

"তত্রপ্রতিষ্ঠাপিতভগবন্নন্নারায়ণভট্টারকায়" স্থলে প্রতিষ্ঠাপিত শব্দের অর্থ, আমি বুঝিয়াছি এই যে, যাঁহাকে বাস করান হইয়াছে। কোন দূর দেশ হইতে সমাগত ব্যক্তিকে কোনও স্থানে ভূমি-আদিদানের আশা দিয়া বসবাস করাইলে, তাঁহাকে "তত্রপ্রতিষ্ঠাপিত" বলা যায়। এ স্থলে প্রণিধানের যোগ্য কয়েকটি কথা আছে। নারায়ণবর্ম্মা এই বিজ্ঞাপন পাঠাইবার পূর্ব্বেই রাজার কোনও অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই দেবকুল নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। দেবকুলে অবশ্য কোনও দেবতা ছিল, কিন্তু তাহার এ স্থলে কোনও উল্লেখ নাই। দেবকুলের জন্য যাহা কিছু কর্ত্তব্য, তাহা নারায়ণবর্ম্মা স্বয়ং নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। যদি কোনও মন্দির বা তত্রত্য দেবতার জন্য বা দেবার্চ্চনার জন্য ভূমির প্রার্থনা আবশ্যক হইত, তবে মন্দিরনির্ম্মাণের পূর্ব্বেই, এবং তৎপ্রতিপালক দ্বিজ দেবার্চ্চকদিগকে নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বেই, ভূমির প্রার্থনা করা সম্ভব হইত। কিন্তু এ স্থলে দেখা যাইতেছে যে, বিজ্ঞাপনের সময়ে মন্দিরনির্ম্মাণ শেষ হইয়া গিয়াছে, এবং তথায় প্রতিপালক ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইয়া গিয়াছে। ইহাতে অন্য কারণে ভূমির প্রার্থনাই অধিক সম্ভবপর।

লাটদেশ ও লাঢ় বা রাঢ় দেশ অভিন্ন কি না, তাহা এ স্থলে মীমাংসার বিশেষ আবশ্যক নাই। দেখা যায়, নারায়ণ বর্ম্মা দেবকুল নির্ম্মাণ করিয়া, তথায় লাটদেশীয় কয়েক জন ব্রাহ্মণ ও দেবার্চ্চক প্রভৃতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহাঁরা মান্য ব্যক্তি ছিলেন, তাই সম্ভ্রমসূচক "পাদমূল" শব্দ তাঁহাদের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে। পিতাকে সংস্কৃতে সম্ভ্রম-সূচক "তাতপাদাঃ", রাজাকে "দেবপাদাঃ", গুরুকে "আচার্য্যপাদাঃ" বলা রীতি। সেই রীতি-অনুসারে এখানে উক্ত মান্য ব্যক্তিরা "তৎপ্রতিপালকলাটদ্বিজদেবার্চ্চকাদিপাদাঃ" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। তৎপ্রতিপালক অর্থাৎ সেই দেবকুলের প্রতিপালক বা রক্ষক ও কার্য্যনির্ব্বাহক। তৎপ্রতিপালকলাটদ্বিজদেবার্চ্চকাদিপাদানাং যৎ মূলং তত্র সমেতায় সমাগতায় ইত্যর্থঃ। বিদেশ হইতে অপরিচিত কোনও ব্রাহ্মণ আসিলে প্রথমে কোনও দেবমন্দিরেই তাঁহার আশ্রয় বা আতিথ্যগ্রহণ সম্ভব। ভট্ট-

নারায়ণ কোলাঞ্চ হইতে পুণ্ড্রবর্দ্ধনে আসিয়া শুভস্থলীতে নারায়ণবর্ম্মা কর্তৃক নির্ম্মিত দেউলের রক্ষক ব্রাহ্মণদের নিকট অতিথিস্বরূপ উপস্থিত হয়েন। ইহাই আমার বিবেচনায় তৎপ্রতিপালক 'লাটবিজ্জদেবার্চ্চকাদিপাদমূলসমেতায়' শব্দের অর্থ। নারায়ণবর্ম্মা যখন কান্যকুব্জদেশীয় ভট্টনারায়ণের ন্যায় এক জন বিশিষ্ট বেদবেদাঙ্গবিশারদ সুকবি পরমধার্ম্মিক ব্রাহ্মণের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিলেন, তখন তাঁহাকেও আপনার নির্ম্মিত দেবকুলের পূজা ও উপস্থান-কার্য্যে ব্রতী করিতে অভিলাষী হইলেন। এবং তাঁহাকে বিশিষ্টগুণবান জানিয়া, যুবরাজ ত্রিভুবনপালকে বলিয়া, রাজার নিকট হইতে চারিখানি গ্রামের সনন্দ বাহির করিয়া দিলেন। আমি এই অর্থই বুঝিয়াছি। কৈলাস বাবু এই অর্থে কি দোষ দর্শন করেন, জানিলে বাধিত হইব।

কৈলাস বাবুর সংশয় এই যে, যদি এক জন ব্রাহ্মণকে ইহা ভূমিদানের সনন্দ হয়, তবে তাঁহার পিতা, পিতামহাদি ও গোত্রপ্রবরের নাম উল্লেখ নাই কেন?

কৈলাস বাবুকে দেখাইতে হইবে যে, খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ, বা নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে, বৌদ্ধ নরপতিরা ব্রাহ্মণদিগকে যে ব্রহ্মোত্তর দান করিতেন, তাহার সনন্দে সম্প্রদানের পিতা পিতামহাদির নামোল্লেখ করিবার রীতি অক্ষুণ্ণ ছিল। যতক্ষণ তিনি এই কথা প্রতিপন্ন করিতে না পারেন, ততক্ষণ তাঁহার সংশয় অমূলক বোধ হয়।

দলিলের খশড়া সকল দেশে সকল সময়ে যে সমান হইবে, ইহা আশা করা যায় না। গোলমাল বাধিলেই বাঁধাবাঁধির আধিক্য দেখা যায়। যেখানে এক নামের অনেক লোক থাকা সম্ভব, তথায় তাহাদের বংশাবলী গোত্র প্রবরাদির কীর্ত্তন আবশ্যক হয়। কিন্তু ভট্টনারায়ণের মত বিখ্যাত গ্রন্থকার ব্যক্তির পক্ষে তাহা হয় ত আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। পুণ্ড্রদেশে তখন ব্রাহ্মণ-সংখ্যা অতি কম। বিশেষ, তাম্রশাসনের যেখানে ভট্টনারায়ণের উল্লেখ দেখিতে পাই, তাহা সুপারিশ মাত্র। তথায় তাঁহার গোত্র প্রবরাদির উল্লেখেরও বিশেষ আবশ্যকতা নাই। আমার নির্ম্মিত দেবকুলে ভট্টনারায়ণ নামে এক "ভগবদ্রূপ" ব্যক্তি সমাগত হইয়াছেন, মহারাজ তাঁহাকে চারিখানি গ্রাম দিউন, ইহা নারায়ণবর্ম্মার বিজ্ঞাপন। ধর্ম্মপাল সেই বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠে কেবল "তথাস্তু" বলিয়া তাহা মঞ্জুর করিলেন মাত্র। এ আর তেমন শ্রৌতস্মার্ত্ত বিধি অনুযায়িক স্নান করিয়া কুশহস্তে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে দান করা

নয়। একজন বেদপাঠী ক্ষত্রিয়ের অনুরোধে, একজন "পরম সৌগত" রাজা 'আচ্ছা দিলাম' বলিয়া এক সনন্দ প্রেরণ করিলেন মাত্র। এখানে গোত্র প্রবরের অনুল্লেখ-জন্য সম্প্রদান যে মনুষ্য নহেন, ইহা সংশয় করিবার কোনও কারণ দেখি না।

তাম্রশাসনের নারায়ণভট্টারক সম্বন্ধে আমি যে অর্থ বুঝিয়াছি, তাহা উপরে বিবৃত হইল। এবং তৎসম্বন্ধে সিংহ মহাশয়ের অভিপ্রায় কি, তাঁহাও জানিবার ইচ্ছা রহিল। সম্প্রতি ভারতীয় পুরাতত্ত্বসম্বন্ধীয় গবেষণা গঙ্গার চড়ার মত। এক স্থানে আজি চড়া পড়িতেছে, কাল আবার স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। এরূপ স্থলে ভ্রমপ্রমাদ মার্জনাযোগ্য। হইতে পারে, আমি অর্থ বুঝিতে ভুলিয়াছি। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ভুলিয়াছি বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না। তাম্রশাসনখানিতে এদেশীয় ইতিহাসের অনেক কথা পরিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা। ইহাতে ভূরি পরিমাণে অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিতের মনোযোগ-আকর্ষণ বাঞ্ছনীয়।

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।

ফার্মেণ্টেশন।

পচন-শীর্ষক প্রবন্ধের এক স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে যে, জৈবিক পদার্থের পচনও এক প্রকার ফার্মেণ্টেশন। হয় ত আমাদের পাঠকদিগের মধ্যে কেহ কেহ ফার্মেণ্টেশন জিনিসটা কি, তাহা সবিশেষ অবগত নহেন। তাঁহাদের গোচরার্থ আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে এতৎসম্বন্ধে একটু সুবিস্তৃত আলোচনা করিব।

বলা বাহুল্য, ফার্মেণ্টেশন ইংরাজী শব্দ। ইহার প্রতিবাক্য চলিত বাঙ্গলা ভাষায় নাই। কিন্তু তাহা না থাকিলেও, উহার অর্থ বুঝিবার পক্ষে বিশেষ কোনও দুরূহত্ব অনুভব করিতে হয় না। আমরা যখন ব্যতিরেকী (abstract) ফার্মেণ্টেশন পদটি পরিহার করিয়া ফার্মেণ্টেশনের একটি স্থূল দৃষ্টান্ত লইয়া দেখি, তখন অতি সহজেই উহার অর্থ বোধগম্য করিতে পারি। পাঠক! নিশ্চয়ই দেখিয়া থাকিবেন, সুমিষ্ট খেজুর রস বা তাল রস অধিকক্ষণ বাহিরে পড়িয়া থাকিলে ক্রমশঃ বিস্বাদ হইয়া যায়, এবং উহার উপরে এক প্রকার শুভ্র ফেণা জন্মে। রস-পাত্র অল্পপরিসর হইলে, ফেণা জমিয়া জমিয়া পাত্র ছাপিয়া উঠে। উক্ত সুমিষ্ট রসের এইরূপ বিস্বাদ হওয়া এবং উহার উপরে এইরূপ ফেণা জন্মানকেই উহার ফার্মে-

ণ্টেশন বলে। চলিত গ্রাম্য বাঙ্গলায় [illegible] রসের এইরূপ অবস্থান্তরকে 'গাঁজিয়া উঠা' কহে।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, ফার্মেণ্টেশন প্রকৃতপক্ষে এইরূপ গাঁজিয়া উঠা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। প্রাচীনকালে ফার্মেণ্টেশনের এইরূপ একটা সঙ্কীর্ণ অর্থ ছিল বটে, কিন্তু বর্ত্তমানে ফার্মেণ্টেশন অনেক বিস্তীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কেন না, এক্ষণে এমন অনেক প্রকারের প্রক্রিয়াকে ফার্মেণ্টেশন বলা হয়, যেখানে গাঁজিয়া উঠা, বা ফেণা জন্মান, এ সব কিছুই হয় না। সুতরাং কেবল গাঁজিয়া উঠা বা ফেণা জন্মানই ফার্মেণ্টেশন পদের প্রকৃত ব্যাখ্যা নহে। তবে যে আমরা খেজুর বা তাল রসের গাঁজিবার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া ফার্মেণ্টেশনের অর্থ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিলাম, সে এইজন্য যে, অতি পুরাকাল হইতেই নানাবিধ মাদক পানীয়ের প্রস্তুতপ্রণালী পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে চলিত থাকায়, সাধারণ লোকের মধ্যে উহা এক সচরাচর গোচরীভূত দৃশ্য; আর আদৌ গাঁজিয়া উঠা বা ফেণা জন্মানর সহিতই ফার্মেণ্টেশন শব্দের বিশেষ যোগ। যে লাটিন ধাতু হইতে ইংরাজী ফার্মেণ্টেশন শব্দের উৎপত্তি, তাহার অর্থ,—অত্যুষ্ণ হইয়া ফোটা (To boil) কৃত্রিম উত্তাপ বা অগ্নির সহিত কোনও সংস্পর্শ নাই, অথচ যাহা পচিয়া সুরা হয়, তাহা আপনাআপনিই যেন ফুটিতে থাকে। এই সময়ে উত্তাপ নির্গত হয়, আর ঘ্যাম্লজারক বাষ্প বহির্গত হয়। ঘ্যাম্লজারক বাষ্পের উদগমন হেতু ফেণার উৎপত্তি হয়। প্রাচীনকালে এইরূপ প্রক্রিয়াকে ফার্মেণ্টেশন বলা হইত। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ফার্মেণ্টেশন এখন অনেক বিস্তীর্ণ অর্থে প্রযুক্ত হয়। কেবল উত্তাপনির্গমন, বা ফোটা, আর দ্ব্যম্লজারক বাষ্পের উদ্ভাবনেই ফার্মেণ্টেশন শব্দ বদ্ধ নহে। বলিতে গেলে, ফার্মেণ্টেশন প্রকৃতপক্ষে এক প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া। জীবদেহস্থ নানাবিধ রস ও অন্যান্য পদার্থ (জীব শব্দ যে আমরা উদ্ভিদ ও জন্তুর সাধারণ সংজ্ঞারূপে ব্যবহার করি, পাঠকেরা অনুগ্রহ করিয়া তাহা মনে রাখিবেন।) কতকগুলি জৈবিক পদার্থের দ্বারা বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তিত হয়। এইরূপ রাসায়নিক পরিবর্ত্তনপ্রণালীকে সংক্ষেপে ফার্মেণ্টেশন বলা যাইতে পারে। আর যে জৈবিক পদার্থের মধ্যবর্ত্তিতার দ্বারা এবম্বিধ রাসায়নিক পরিবর্ত্তন বা বিশ্লেষণ সাধিত হয়, তাহাকে 'ফার্মেণ্ট' বলে।

ফার্মেণ্ট দ্বিবিধ;—জৈবিক (Organised), আর জীবশরীরসঞ্জাত (Or-

ganic); শেষোক্ত প্রকারকে রাসায়নিকও বলা যাইতে পারে। জৈবিক ও রাসায়নিক ফার্মেণ্টদিগের মধ্যে জৈবিক ফার্মেণ্টের কার্য্য-ক্ষেত্র অতি প্রশস্ত। সমুদয় ভূ-পৃষ্ঠ ব্যাপিয়া বিভিন্ন প্রকারের অসংখ্য জৈবিক ফার্মেণ্ট অহর্নিশি নানাবিধ ফার্মেণ্টেশন উৎপন্ন করিয়া, প্রকৃতিভাণ্ডারের সাম্য রক্ষা করিতেছে। ইহাদের বিষয় আমরা পরে বলিব। রাসায়নিক ফার্মেণ্ট জীবশরীরের মধ্যে উৎপন্ন হইয়া, তন্মধ্যে নানাবিধ হিতকর ফার্মেণ্টেশন সাধন করিয়া জীবদেহের পরিপোষণের সহায়তা করে। টায়ালিন (Ptyaline), পেপসিন (Pepsin), ট্রিপসিন (Trypsin), ডায়াষ্টেজ (Diastase) প্রভৃতি কয়েকটি, জীবশরীরজাত ফার্মেণ্টের উদাহরণ। টায়ালিন আমাদের লালার সহিত মিশ্রিত থাকে। ইহার সাহায্যে ভুক্ত পদার্থের শ্বেতসারাংশ (Starchy matter) শর্করারূপে পরিণত হয়। পেপসিন আমাদের পাকস্থলীতে থাকিয়া মাংস বা ডিম্বের যবক্ষারজানসংঘটিত পদার্থকে জীর্ণ করিয়া দেয়। ট্রিপসিনও ঐরূপ পরিপাকক্রিয়ার সহায়তা করে। ডায়াষ্টেজ ঔদ্ভিদিক বীজ। যেমন গোধূম, ধান্য, অন্য শস্য। নিহিত শ্বেতসারাংশকে শর্করারূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া অঙ্কুরবিকাশের সাহায্য করে।

জৈবিক ফার্মেণ্ট নানা প্রকার। ইহা অতি ক্ষুদ্র, আণুবীক্ষণিক পদার্থ। অতিশয় ক্ষুদ্র বলিয়া ইহাদিগকে জীবাণু বলা হয়। ইহারা অশেষ প্রকারের; অসংখ্য অসংখ্য জীবাণু বায়ুর সহিত মিশ্রিত থাকে। অন্যান্য জীবের ন্যায় ইহাদের জন্ম, বংশবর্দ্ধন ও মৃত্যু হয়। যবক্ষারজান ইহাদের প্রধান খাদ্য। ইহারা তন্মধ্যে ফার্মেণ্টেশন উৎপন্ন করে, তন্মধ্যে কোনও প্রকারে পতিত হইয়া আপনাদের আহার অন্বেষণ করে, এবং উপযুক্ত আহারসামগ্রী পাইলে অচিরে (প্রত্যেক ১৫।২০ মিনিটের মধ্যে এক এক বংশের উৎপত্তি হয়) আপনাদের সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত করে। কিন্তু এই খাদ্যসংগ্রহকালেই ইহারা উক্ত পদার্থের মধ্যে এক রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সাধন করে। সেই পরিবর্ত্তন-প্রণালীকে ফার্মেণ্টেশন বলে।

রাসায়নিক ফার্মেণ্টকৃত ফার্মেণ্টেশন ছাড়িয়া দিলে, জৈবিক ফার্মেণ্ট-জনিত ফার্মেণ্টেশন তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। যথা,—

১। য়্যালকোহলিক বা সুরাসার-ঘটিত ফার্মেণ্টেশন।

২। রোগোৎপাদন-সম্বন্ধীয় ফার্মেণ্টেশন।

৩। পচনমূলক ফার্মেণ্টেশন।

১। য়্যালকোহলিক ফার্ম্মেণ্টেশন। যে ফার্ম্মেণ্টেশনের ফলস্বরূপ সুরা উৎপন্ন হয়, তাহার নাম য়্যালকোহলিক ফার্ম্মেণ্টেশন। কিন্তু সুরা ব্যতীত অন্য কয়েকটি ফার্ম্মেণ্টেশনও য়্যালকোহলিক ফার্ম্মেণ্টেশনের অন্তর্ভুক্ত। আমরা ইহাদের বিষয় পরে বলিতেছি। প্রধানতঃ য়্যালকোহলিক ফার্ম্মেণ্টেশনে শর্করা রূপান্তরিত হইয়া সুরাসাররূপে পরিণত হয়। মিষ্ট ফল মূল হইতে জাত শর্করা, অথবা ধান্য, গোধুম, যব প্রভৃতি শস্যে নিহিত শ্বেতসারাংশ হইতে যে শর্করা জন্মে, সেই শর্করা জৈবিক ফার্ম্মেণ্টের সাহায্যে রূপান্তরিত হইয়া, সুরাসার প্রস্তুত হয়। এই নিমিত্ত সচরাচর সুরা প্রস্তুত করিবার জন্য মিষ্ট ফল যেমন দ্রাক্ষা, অথবা শ্বেতসারবিশিষ্ট নানা শস্য যেমন যব, ব্যবসায়ীরা ব্যবহার করিয়া থাকে। জৈবিক ফার্ম্মেণ্ট অর্থাৎ জীবাণু, শর্করামিশ্রিত রসের মধ্য হইতে আপনাদের আহারীয় যবক্ষারজান পদার্থ সংগ্রহ করিতে গিয়া, উহার মধ্যে এক রাসায়নিক বিশ্লেষণ আনয়ন করে। সেই বিশ্লেষণের ফলই সুরাসার বা য়্যালকোহল।

সুরাসার ফার্ম্মেণ্টবীজ আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ুরাশিতে অবলম্বিত থাকে। যদি কোনও প্রকারে একটি বীজ উপযুক্ত ক্ষেত্রে পতিত হয়, তাহা হইলে সেই বীজ স্বীয় বংশবর্দ্ধন দ্বারা সত্বর তন্মধ্যে ফার্ম্মেণ্টেশন উৎপন্ন করে। সুরাসার ফার্ম্মেণ্টের কথিত ইংরাজী নাম ঈষ্ট (yeast), বৈজ্ঞানিক নাম সাকারোমাইসিটিজ সোরভিজিই (Saccharomycetis Cervisiae)। সুরাসার প্রস্তুত করিবার জন্য যে ঈষ্ট ব্যবহার করিতে হয়, ইহা অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিদিত ছিল। কিন্তু অতি অল্পদিন হইল, ঈষ্টের ও সুরাসারপ্রস্তুতপ্রক্রিয়ায় বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। ঈষ্টের বিশুদ্ধতার উপর উৎকৃষ্ট সুরার প্রস্তুতকরণ সম্পূর্ণ নির্ভর করে। এই তথ্য জানিবার পর হইতেই অমিশ্র ও বিশুদ্ধ ঈষ্ট নির্ব্বাচন করিবার জন্য জার্ম্মানির নানা লাবরেটরিতে অণুবীক্ষণযন্ত্র লইয়া কত লোক নিযুক্ত থাকে। এমন কি, এক্ষণে জার্ম্মানির কোনও কোনও অঞ্চলে বিশুদ্ধ ও অমিশ্র ঈষ্টের এক বিস্তৃত ও লাভজনক ব্যবসায় হইয়া উঠিয়াছে। প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকার বিশুদ্ধ ঈষ্ট-বীজ তথা হইতে পৃথিবীর নানা স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে।

বোধ হয়, পাঠকেরা জানেন, সুরাসার ও সুরা, একই পদার্থ নহে। যে পদার্থকে ফার্ম্মেণ্টযুক্ত করিয়া সুরা প্রস্তুত করিতে হয়, সেই পদার্থকে তাহার ফার্ম্মেণ্টেশন হইয়া যাইবার পর, চুয়াইয়া লইলে যাহা পাওয়া যায়, তাহার

নাম সুরাসার। বিশুদ্ধ সুরাসারে জলীয়াংশ থাকে না। কিন্তু চুয়াইবার সময় যে জলীয় অংশ সুরাসারের সহিত মিশ্রিত হয়, তাহা বড় সহজে নিকাশিত করা যায় না। বার বার চুয়াইয়া এবং অন্য উপায় দ্বারা উহা হইতে জলীয়াংশ বিযুক্ত করিয়া লইয়া, বিশুদ্ধ সুরাসার সংগ্রহ করিতে হয়। এই সুরাসারের সহিত জল ও অন্যান্য স্বাদু ও সুগন্ধ পদার্থ মিশাইলে যে পানীয় হয়, তাহাকেই সুরা বলে। অনেক সময়ে স্বতন্ত্র করিয়া জল মিশাইয়া সুরা প্রস্তুত করিতে হয় না। যে পদার্থ ফার্ম্মেণ্টেশন উৎপন্ন করা হয়, তাহারই জলীয় অংশ উক্ত ফার্ম্মেণ্টেশন-জাত সুরাসারের সহিত মিশ্রিত থাকে, এবং তাহাই মদিরারূপে ব্যবহৃত হয়। মদিরানিহিত সুরাসারই উত্তেজক এবং ইহারই জন্য সুরার মাদকতা শক্তি। নানাবিধ মদিরায় সুরাসারের পরিমাণের অল্পাধিক্য থাকে বলিয়াই, উহাদের মাদকতাশক্তির তারতম্য হইয়া থাকে।

তাল বা খেজুর রসের মধ্যেও ঈষ্টই ফার্ম্মেণ্টেশন উৎপন্ন করে। কেহ ঈষ্ট-বীজ রোপণ না করিলেও, আমরা দেখি, উক্ত সুমিষ্ট রস ক্ষণকাল বাহিরে থাকিলে আপনা-আপনিই বিকৃত হইতে থাকে। ইহার কারণ এই যে, বায়ুমধ্যে ঈষ্ট অবলম্বিত থাকে। সুতরাং উক্ত রসমধ্যে উহাদের নিপতিত হইবার সম্ভাবনা। ঈষ্টবীজ কোনও মতে রসমধ্যে পড়িলেই, আপনার খাদ্য সংগ্রহ করিতে করিতে রসকেও বিশ্লিষ্ট করিয়া ফেলে। তাহার স্বাভাবিক ফল এই হয় যে, সেই রসে নিহিত শর্করা-অংশ সুরাসাররূপে পরিণত হয়। বিকৃত তাল বা খেজুর রসের মদিরার ন্যায় মত্ততাদায়ী শক্তি, উহাতে উৎপন্ন সুরাসারেরই জন্য। আমাদের এ দেশে সুরাপ্রস্তুতকারীরা ঈষ্টের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অবগত নহে। তাহারা জানে যে, গুড় বা তালরস আপনি পচিয়াই মাদকরূপে পরিণত হয়। ফলতঃ, এ পৃথিবীতে জীবাণু অর্থাৎ উদ্ভিদগণের সাহায্য ব্যতীত কোনও প্রকারেই পচন-কার্য্যই সাধিত হইবার নয়।

সুরা ভিন্ন সির্কা ও দধিপ্রস্তুতপ্রণালী, য়্যালকোহল ফার্ম্মেণ্টেশনের মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। সির্কা মূলতঃ এক প্রকার অম্লাক্ত পদার্থ। রাসায়নিক ভাষায় এই পদার্থকে য়্যাসেটিক য়্যাসিড কহে। সুরার য়্যালকোহল অংশের সহিত অতিরিক্ত অম্লজন বাষ্পের রাসায়নিক সংযোগ হইলেই, য়্যাসেটিক য়্যাসিড প্রস্তুত হয়। সুরা পচিয়া যায়, ইহা বোধ হয় অনেকেই জানেন; অন্ততঃ সুরাব্যবসায়ীরা তাহা বিশেষরূপ জানে। কেন না, তাহারা ইহাতে বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু সেই বিকৃত সুরার অন্যতর নাম যে

সির্কা বা ভিনিগার, তাহা বোধ হয় পাঠকদিগের সকলের নিকট পরিচিত নহে। সুরাসহ বিশুদ্ধ সুরাসার ও জল ব্যতীত নানাপ্রকার স্বাদুকর ও গন্ধদ্রব্য মিশ্রিত থাকে, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই সঙ্গে কিয়ৎপরিমাণে যবক্ষারজানঘটিত পদার্থও সুরা সহ মিশ্রিত হইয়াযায়। সির্কা-ফার্মেণ্ট, সুরা-সংশ্লিষ্ট এই যবক্ষারজান পদার্থ সংগ্রহ করিবার সময় বায়ু হইতে অম্লজন বাষ্প লইয়া সুরাসারের সহিত রাসায়নিক ভাবে মিশাইয়া দেয়। তজ্জন্যই সুরা অম্লাক্ত হয়। ইহাকেই সুরা পচিয়া যাওয়া বলে। অম্লাক্ত সুরাই ভিনিগার বা সির্কা। এ দেশে ইক্ষুরস পচাইয়া সির্কা প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইক্ষুরসনির্ম্মিত শর্করা প্রথমে য়্যালকোহল হয়, পরে ঐ য়্যালকোহল হইতে সির্কা ফার্মেণ্টের সাহায্যে সির্কা হয়। সির্কা-ফার্মেণ্ট ঈষ্টের ন্যায় বায়ুসহ মিশ্রিত থাকে। ইহাকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় মাইকোডার্মা য়্যাসেটি (Mycoderma Aceti) কহে। ইহার অত্যাচার হইতে মদিরা রক্ষা করিবার জন্য, ব্যবসায়ীদিগকে নানা উপায় অবলম্বন করিতে হয়। যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন না করিলে, বায়ু-অবলম্বিত সির্কা ফার্মেণ্ট অনায়াসেই মদিরাকে বিকৃত করিতে পারে। এই জীবাণুরা অতিশয় ক্ষুদ্র, এবং বায়ুর সহিত মিশ্রিত থাকে; কোনও মতে মদিরাপাত্রমধ্যে একবার প্রবেশ করিতে পারিলেই শীঘ্র উহা নষ্ট করিয়া ফেলে। এই জন্য ব্যবসায়ীরা কেবল সচ্ছিদ্র কাক দিয়া বোতলের মুখপথ বন্ধ করিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। ধাতব পদার্থের পাতলা পাত দ্বারা উহাকে আবার আবৃত করিতে হয়। কিন্তু ইহাতেও ক্ষুদ্র জীবাণুর অনিষ্টসাধনের সকল পথ বন্ধ করা হয় না। হয় ত, দ্রাক্ষাফল হইতে রস নিংড়াইবার সময় সেই রসের সহিত কোনও প্রকার সির্কা-জীবাণু মিশ্রিত হইয়াছে, অথবা কাচপাত্রমধ্যে সুরা পুরিবার সময় বায়ুর সহিত কোনও একটি সির্কা-বীজ সুরাপাত্রমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, —এইরূপে পরস্পর একটি বা দুটি বীজ উপযুক্ত ক্ষেত্রে পরিবর্দ্ধিত হইয়া অনায়াসেই শীঘ্র সমুদয় সুরা বিকৃত করিয়া দিতে পারে। সম্প্রতি এইরূপ নানাবিধ সম্ভাব্য অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্য, বোতলপূর্ণ মদিরা একবার এক মিনিট কালের জন্য ফুটন্ত জলের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া লওয়া হয়। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, অপেক্ষাকৃত অধিক উত্তাপে সির্কা-বীজ মরিয়া যায়। সুতরাং যদি একবার মদিরাপাত্রকে উত্তপ্ত করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে মদিরা বিকৃত হইবার সমস্ত ভাবী আশঙ্কা দূর হইয়া যায়।

দধি-ফার্মেণ্ট দুগ্ধনিহিত শর্করাকে রূপান্তরিত করিয়া, একপ্রকার অম্লাক্ত

পদার্থ উৎপন্ন করে। এই অম্লাক্ত পদার্থকে রাসায়নিক ভাষায় ল্যাকৃটিক য়্যাসিড বলে। দুগ্ধের সহিত জল, শর্করা, যবক্ষার-জান সংঘটিত পদার্থ (ইহাকে ইংরাজীতে কেসিন বলে) আর তৈলাক্ত পদার্থ থাকে। ইহা ব্যতীত, ক্যালসিয়ম, ফস্‌ফেট প্রভৃতি Salts থাকে। উত্তপ্ত দুগ্ধের সহিত যখন একটু দধি নিক্ষিপ্ত হয়, তখন সেই দধির সহিত উত্তপ্ত দুগ্ধে দধি-বীজ বা ল্যাকৃটিক ফার্মেণ্ট উপ্ত হয়। ল্যাকৃটিক ফার্মেণ্ট দুগ্ধের শর্করা অংশকে আক্রমণ করিয়া ল্যাকৃটিক য়্যাসিডরূপে পরিণত করে। ইহাতে দুগ্ধনিহিত কেসিন অংশ কতক পরিমাণে স্বতন্ত্র হইয়া জমাট বাঁধে। তাহাতেই দধি জমাট দেখায়। দধির সহিত দুগ্ধের অন্য সকল উপাদানই বিদ্যমান থাকে। কেবল থাকে না শর্করা। শর্করা রূপান্তরিত হইয়া ল্যাকৃটিক্ য়্যাসিড হইয়া যায়। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, ল্যাকৃটিক্ য়্যাসিডের বিদ্যমানতার জন্যই দধির অম্ল আস্বাদন হয়।

দুগ্ধের তৈলাক্ত অংশ বা মাখমেও এক প্রকার ফার্মেণ্টেশন্ হয়। ইহার ফল বিউটিরিক্ য়্যাসিডের উৎপত্তি। বিউটিরিক্ ফার্মেণ্টও এক প্রকার জীবাণু। সুতরাং ইহাও এক জৈবিক ফার্মেণ্ট।

২। রোগোৎপাদনসম্বন্ধীয় ফার্ম্মেণ্টেশন। এক্ষণে জানা গিয়াছে যে, জীবশরীরের নানা দুশ্চিকিৎস্য ও সংক্রামক রোগের মূল কারণ এক প্রকার জীবাণু। জীবাণু বলিলে, অনেকের মনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটের কথা হয় ত উদিত হইতে পারে। কিন্তু এই সকল রোগোৎপাদক জীবাণুরা কীট নহে। ইহারা জন্তুশ্রেণীভুক্তই নহে। এই জীবাণুগণ সম্পূর্ণরূপেই উদ্ভিদ, এই জন্য ইহাদিগকে এবং প্রস্তাবোল্লিখিত অন্য সকল প্রকার জৈবিক ফার্মেণ্টকে উদ্ভিজ্জাণু বলাই ভাল। এই উদ্ভিজ্জাণুরা জীবদেহে কোনও মতে প্রবিষ্ট হইলে, তন্মধ্যে এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন করে। ইহাই দেহস্থ শোণিতের সহিত মিশ্রিত হইয়া রোগোৎপত্তি করিয়া থাকে। উদ্ভিজ্জাণুগণ যে প্রণালীতে জীবদেহস্থ রস বিশ্লেষণ করিয়া রোগমূলক বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন করে, তাহাকে ফার্ম্মেণ্টেশন বলে। কিন্তু এই ফার্ম্মেণ্টেশন-ক্রিয়ার চরম ফল রোগোৎপাদন; এই নিমিত্ত ইহাকে রোগোৎপাদনসম্বন্ধীয় ফার্ম্মেণ্টেশন বলা হইয়া থাকে।

শীতজ্বর, টাইফইড জ্বর, সূতিকা-জ্বর, বসন্ত, যক্ষ্মা, ইরিসিপেলাস, ডিপ্‌থিরিয়া, বিসূচিকা, ধনুষ্টঙ্কার, প্রভৃতি নানা অনারোগ্য ও মারাত্মক ব্যাধি, এবং খুব সম্ভব, জলাতঙ্ক রোগ পর্য্যন্ত উদ্ভিজ্জাণুকৃত ফার্ম্মেণ্টেশন ক্রিয়ার চরম ফল। এই সমুদয় ব্যাধির প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র প্রকারের উদ্ভিজ্জাণু

আছে। ইহারা রোগীর থুতু, গয়ের, শোণিত, পুয, মল, মূত্র, প্রশ্বাস প্রভৃতির সহিত বাহির হয়। কোনও সুস্থদেহ জন্তু যদি কোনওরূপে এই সকল উদ্ভিজ্জাণুর কোনও একটি বীজ দেহস্থ করে, সেই বীজ অচিরে বংশবর্দ্ধন করিয়া, সেই সুস্থ দেহের শোণিতের মধ্যে ফার্ম্মেণ্টেশন দ্বারা এক বিশেষ রোগ উৎপন্ন করিয়া তাহার জীবনসংশয় করিতে পারে। অনেকেই জানেন, পূর্ব্বোল্লিখিত রোগ গুলির অনেকের কোনও আরোগ্যকারী ঔষধ নাই। চিকিৎসাবিজ্ঞান ঐ সকল কাল-ব্যাধির গতিরোধে সম্পূর্ণ অসমর্থ। নিতান্ত নিরুপায় হইয়া ঐ সকল রোগাক্রান্ত কত সহস্র জন্তু অকালে কালের কবলে কবলিত হয়। এক সুখের বিষয় এই যে, আধুনিক বিজ্ঞান ঐ সমুদয় মারাত্মক ব্যাধির মূল কারণ অবগত হইতে পারিয়াছে। সুতরাং আশা করা যায়, একদিন বিজ্ঞানই ঐ সকল ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবার উপায়বিধান করিবেন। আমরা জানি, ইহারি মধ্যে দুই চারিটি সংক্রামক ও মারাত্মক ব্যাধির প্রতি-ষেধক ও ব্যাধিনিবারক উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এই ক্ষুদ্র উদ্ভিজ্জাণুদিগের অস্তিত্ব ও মারাত্মক কার্য্য পরিজ্ঞাত হইবার পর হইতে আমরা অনেক প্রকারে সতর্কতা অবলম্বন করিয়া দুরপনেয় অনিষ্টের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারি। পূর্ব্বে দেহের কোনও স্থান ক্ষত হইলে তথায় উদ্ভিজ্জাণুরা আশ্রয় লইয়া সময়ে সমস্ত দেহের শোণিতকে বিষাক্ত করিয়া জীবন বিনষ্ট করিতে পারিত। কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা এই সকল অনিষ্টকারী উদ্ভিজ্জাণুর কার্য্যরোধ করিবার জন্য নানা উপায়ে উহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া ফেলি। সুতরাং বিপদের সম্ভাবনা অনেক অল্প হয়। বর্ত্তমান অস্ত্রচিকিৎসার Anti-septic প্রণালীর কৃতকার্য্যতার একমাত্র কারণ এই যে, উহাতে ক্ষত স্থানে 'Germ' প্রবেশ করিতে পারে না। জারম্ এই ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক উদ্ভি-জ্জাণু বই আর কিছুই নহে। কার্ব্বলিক, স্যাসিড্, আইওডাইন্ প্রভৃতি আরক ব্যবহার দ্বারা সকল Germ বিনষ্ট করিয়া ফেলা হয়। এই জন্য ক্ষত স্থান পচিতে পায় না, অর্থাৎ সেখানে উদ্ভিজ্জাণুরা ফার্ম্মেণ্টেশন উৎপন্ন করিতে পায় না। তাই দেহস্থ শোণিতের বিষাক্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। পচন-প্রতিরোধী Anti-septic প্রণালী অবলম্বিত হইয়া অবধি,—অস্ত্র-চিকিৎসকেরা সাহস করিয়া নানাপ্রকার কঠিন অস্ত্রচিকিৎসা দ্বারা কত রোগীর রোগনাশ ও জীবনরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

৩। পচনমূলক ফার্ম্মেণ্টেশন। এ সম্বন্ধে আমরা পচন-শীর্ষক প্রবন্ধে

অনেক কথা বলিয়াছি। এখানে স্বতন্ত্র করিয়া আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। কেবল এইমাত্র বলা আবশ্যক যে, মৃত পদার্থকে বিশ্লিষ্ট করিবার জন্য, কতকগুলি উদ্ভিজ্জাণু, তন্মধ্যে ও তদুপরি একপ্রকার ফার্ম্মেণ্টেশন উৎপন্ন করে। তাহারই ফলে যৌগিক জীবদেহ সকল রূঢ় পদার্থে বিশ্লিষ্ট হয়। অবশ্য, উদ্ভিজ্জাণুই নিঃস্বার্থভাবে অথবা জ্ঞাতসারে ইহা সম্পন্ন করে না। উহারা আপনাদিগের আহারীয় সংগ্রহ করিতে গিয়াই নিতান্ত গৌণভাবে মৃত পদার্থকে রূঢ় পদার্থে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেয়। এইরূপ বিশ্লিষ্ট করার জন্য প্রকৃতির কত মহদুপকার সাধিত হয়, পাঠকেরা অনুগ্রহ করিয়া আমাদের 'পচন' প্রবন্ধ একবার দেখিলে, সমুদয় জানিতে পারিবেন।

ফার্ম্মেণ্টেশন মতবাদ সম্বন্ধেও মূল কথা উক্ত প্রবন্ধে বিবৃত হইয়াছে। পুনরুক্তিভয়ে আমরা এ স্থলে আর তাহার উল্লেখ করিলাম না। কেবল বোধ হয় এই টুকু বলা আবশ্যক যে, বর্ত্তমানের উদ্ভিজ্জাণু মতবাদ, অর্থাৎ উদ্ভিজ্জাণু দ্বারাই যে নানা প্রকার ফার্ম্মেণ্টেশন কার্য্য সাধিত হয়, তাহা সুবিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক পাষ্টর কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত। তিনি নানা পরীক্ষা দ্বারা পূর্ব্বপ্রচলিত লীবিগ মতবাদের খণ্ডন করিয়া, স্বীয় Germ theoryর নিত্যতা ও সত্যতা সপ্রমাণ করেন। সেই অবধি পাষ্টর-প্রবর্ত্তিত—জীবাণু অর্থাৎ উদ্ভিজ্জাণু মতবাদ যে সকল প্রকার ফার্ম্মেণ্টেশনের যথার্থ ব্যাখ্যা, ইহা সর্ব্বদেশীয় বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী মধ্যে স্বীকৃত ও সম্মানিত হইয়া আসিতেছে।

শ্রীশ্রীপতিচরণ রায়।

বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ।

কেরোসিনের উৎপত্তি।

কেরোসিনের উৎপত্তি লইয়া বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ে অনেক দিন অবধি নানা আন্দোলন চলিতেছে। গৃহকার্য্য ও কলকারখানাদিতে এই আকরিক তৈলের বহুল প্রচলন হওয়াতে, ইহার প্রকৃত উৎপত্তি-কারণের নিরূপণ বড়ই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় জানেন,—কেরোসিন অপরিষ্কৃত অবস্থায় ভূগর্ভের অতি নিম্ন স্তরে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমেরিকা ও রুষিয়া প্রভৃতি দেশে ইহার অনেক আকর আছে; ভূগর্ভ হইতে উত্তোলন করিয়া পরিষ্কৃত করিলেই, ইহা ব্যবহারোপযোগী হয়। কেরোসিনের ভাণ্ডার, পাথুরিয়া কয়লার ন্যায় ক্ষয়শীল ও সীমাবদ্ধ কি না, এই প্রশ্নের মীমাংসার্থে, অনেকে বিশেষ সচেষ্ট আছেন। বাস্তবিকই যদি ইহা পাথুরিয়া কয়লার ন্যায় ক্ষয়শীল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে কেরোসিনের ক্রমিক ক্ষয়ের সহিত যে একটি মহান ভবিষ্যৎ বিপ্লবের সূত্রপাত হইবে,

তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আজ কাল য়ুরোপ ও আমেরিকার অনেক কল কেরোসিন ও আকরিক বাষ্প * দ্বারা চালিত হইতেছে,—কাজেই দুষ্প্রাপ্য হইলে উপযুক্ত সাহায্যাভাবে কলকারখানা সম্পূর্ণ অচল হইবে ভাবিয়া, বৈজ্ঞানিকগণ বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। শৈশবে ঠাকুরমার নিকট গল্প শুনিয়াছিলাম, সহরের দুর্গন্ধময় ময়লা হইতে, সাহেবেরা নানা কৌশলে কেরোসিন প্রস্তুত করেন। পাকা পয়ঃপ্রণালী দ্বারা বহুব্যয়ে ময়লা স্থানান্তরিত করিবার অন্য কোনও পার্থিব কারণ ঠাহরাইতে না পারিয়া, সেই সময়ে ঠাকুরমার কথাটা বড়ই সত্য মনে করিতাম। ইহার ফলে কেরোসিনের পবিত্রতার উপর একটা ঘোর সন্দেহ বহুকাল হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। শৈশবের কথা স্মরণ করিয়া মনে হয়, আজ কাল নানাদেশীয় বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীতে কেরোসিনের উৎপত্তি ও ইহার ভাণ্ডারের অবশ্যম্ভাবী শূন্যতা লইয়া যে প্রকার মহা আন্দোলন চলিতেছে,—ঠাকুরমার আবিষ্কৃত সিদ্ধান্তটি অন্ততঃ আংশিক সত্য হইলেও, অনেকগুলি লোকে সুস্থচিত্তে কালযাপন করিতে পারিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আধুনিক ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে অনেকেই, উদ্ভিদাদি জৈবিক পদার্থের ধ্বংসাবশেষ হইতে কেরোসিনের উৎপত্তি হয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন, এবং কাযেই দূর ভবিষ্যতে ইহাও যে পাথুরিয়া কয়লার ন্যায় দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িবে, তাহাতে এ পর্য্যন্ত কেহ সন্দেহ করেন নাই। মেণ্ডেলিফ (Mendeleef) নামক জনৈক বিখ্যাত রুষীয় বৈজ্ঞানিক, সম্প্রতি কেরোসিনের উৎপত্তির একটি অভিনব মতবাদ প্রচার করিয়া, পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তের বিষয়ে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত করিয়াছেন।

অধ্যাপক মেণ্ডেলিফ বলেন, যে সকল পণ্ডিতগণ উদ্ভিজ্জাত জৈবিক পদার্থ হইতে কেরোসিনের উৎপত্তি হয় বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তাঁহারা বড় ভ্রান্ত, এবং তাঁহাদের মতবাদও সম্পূর্ণ যুক্তিহীন। কেরোসিনের সহিত পাথুরিয়া কয়লার কেবলমাত্র রাসায়নিক সাদৃশ্য দেখিয়া, উভয়ই একজাতীয় পদার্থ ও ইহাদের উৎপত্তিপ্রকরণও এক বলিয়া উপসংহার করা, কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নয়। য়ুরোপের প্রধান প্রধান কেরোসিন ক্ষেত্রগুলি পরীক্ষা করিলে, তৈলের আকর প্রায়ই ভূপৃষ্ঠের তৃতীয় যুগের (Reptilian Age) স্তরমধ্যবর্ত্তী দেখা গিয়া থাকে ; এই প্রমাণ অবলম্বন করিয়া পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন,—পূর্ব্ববর্ত্তী উদ্ভিজ্জ-যুগের (Carboniferous Age) স্তরসমূহে যথেষ্ট উত্তাপ ও চাপ সহযোগে, প্রোথিত উদ্ভিজ্জকঙ্কাল সকল কেরোসিনে পরিণত হয়, এবং পরে ক্রমিক পরিবর্ত্তন দ্বারা, ইহা উর্দ্ধতন স্তরে নীত হইয়া থাকে। মেণ্ডেলিফের মতে এই প্রাচীন মতবাদ আমূল ভ্রমপূর্ণ। তিনি য়ুরোপ ও আমেরিকার তৈলক্ষেত্র পরিদর্শন করিয়া দেখিয়াছেন, অধিকাংশ স্থানে উদ্ভিজ্জ-যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী (Devonian Age) সময়ের স্তরাবলিতে বহুল কেরোসিন দৃষ্ট হইয়া থাকে ; এ সকল স্থানে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তানুসারে উর্দ্ধতন উদ্ভিজ্জযুগের তৈল উৎপন্ন হইয়া, পরে কঠিন প্রস্তরাবরণ ও দুর্ভেদ্য স্তরের মধ্য দিয়া, ইহা যে নিম্নে সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা কল্পনা করাও অসম্ভব ; কাযেই প্রাচীন সিদ্ধান্তীগণের কথা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

মেণ্ডেলিফের মতে কেরোসিনের উৎপত্তির সহিত জৈবিক পদার্থ মাত্রেরই কোনও সম্বন্ধ নাই। এই তৈল ভূমধ্যস্থ ধাতব পদার্থ দ্বারা নৈসর্গিক উপায়ে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পাঠক পাঠিকাগণ অবগত আছেন, ভূগর্ভের অনেক স্থানই, আধুনিক বিজ্ঞানানুসারে, লৌহ ও লৌহমিশ্র পদার্থ দ্বারা পূর্ণ বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। মেণ্ডেলিফ বলেন, ভূগর্ভনিহিত এই

---

* ইহা কেরোসিনের প্রকারভেদ মাত্র ; কেরোসিনের আকরে স্বাভাবিক বাষ্পাবস্থায় ইহা বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়।

লৌহ ও অঙ্গারযুক্ত লৌহ (Carbides) কেরোসিন উৎপন্ন হয়। ভূগর্ভের অতি নিম্নস্তরস্থ উত্তপ্ত অঙ্গারযুক্ত লৌহে কোন প্রকারে জলসংযোগ হইলে, কতক জল বিশ্লিষ্ট হইয়া লৌহস্থ অঙ্গারের সহিত মিশিয়া, কেরোসিন উৎপন্ন করে। এই নিম্ন স্তরে তাপাধিক্য প্রযুক্ত ইহা বাষ্পাকারে থাকে, পরে জলীয় বাষ্প সংমিশ্রিত হইয়া, আয়তন ও চাপের বৃদ্ধি প্রযুক্ত উপরের স্তরাভিমুখে প্রবাহিত হয়; তথায় শীতল স্তরের সংস্পর্শে ক্রমে তরল পদার্থে পরিণত হইয়া, সেখানেই ইহা, কেরোসিন রূপে সঞ্চিত হইতে থাকে।

রুষিয়ান্ আচার্য্যের এই নবপ্রচারিত সিদ্ধান্ত দ্বারা অনেকে বিশেষ আশ্বস্ত হইয়াছেন। লৌহ ও অঙ্গার ভূগর্ভে এত অধিক পরিমাণে সঞ্চিত আছে যে, কোটী বৎসর ধরিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কেরোসিন উৎপন্ন হইলেও, পৃথিবীর ভাণ্ডারের অত্যল্প ক্ষয় অনুভবযোগ্য হইবে না; কাযেই, ভবিষ্যতে কেরোসিন দুষ্প্রাপ্য হইবে বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণের যে একটা মহা আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে, এখন তাহা অপনীত হইবে, এবং পৃথিবী কয়লা ও কেরোসিন শূন্য হইলে, ইহাদের স্থানপরিপূরক একটি নূতন দাহ্য পদার্থ আবিষ্কার করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণের যে একটি মহা ভাবনার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারও বোধ হয় অনেকটা লাঘব হইবে। মেণ্ডেলিফ্ আরো পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন,—একস্থান হইতে কেরোসিন উত্তোলিত হইলে, শূন্য স্থানের পূরণার্থে তৎক্ষণাৎ স্বতঃই নূতন তৈল সঞ্চিত হইয়া থাকে। সাহেবের এই শেষ কথা দ্বারা কেরোসিন ক্ষেত্রের সত্বাধিকারীগণ আকর অক্ষয় থাকিবে ভাবিয়া, বিশেষ আশান্বিত হইয়াছেন। এখন তৈলের এই নূতন সিদ্ধান্তটি প্রাচীনমতবাদী প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিতগণের তর্কের সম্মুখে অটল থাকিয়া, মেণ্ডেলিফের আশ্বাসবাণী সফল করিলে, সকল দিকেই মঙ্গল।

মক্ষিকার দৌত্যকার্য্য।

কাব্যে, বিরহ-বিধুরা নায়িকা কর্তৃক প্রণয়ীর উদ্দেশে ভ্রমর ও মক্ষিকাকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিবার বিবরণ অনেক দেখা যায়। এ ত গেল প্রাণীর কথা, মলয়ানিল ও মেঘাদি জড়কেও দূতপদে নিয়োগ করিবার উদাহরণ, কাব্যে বড় দুষ্প্রাপ্য নয়। কবির চিত্র, প্রায়ই প্রত্যক্ষ স্বভাবের নিখুঁৎ ছবি হয় না, হইলেও ইহার সৌন্দর্য্য থাকে না; এজন্য প্রায়ই ইহা অলঙ্কারের একটি সূক্ষ্ম আবরণে আচ্ছাদিত থাকে; পাঠক, কবির নানা প্রলাপোক্তি ত্যাগ করিয়া, সারটুকু গ্রহণ করেন। কিন্তু আজ কাল কবির প্রলাপও সত্য হইতে চলিল,—পাঠক-পাঠিকাগণ বার্ত্তাবহ কপোতের কথা শুনিয়া থাকিবেন, ইহার বিবরণ জানিলে দময়ন্তীর বার্ত্তাবহ হংসের কথায় কবিকল্পনাসৃষ্ট বা প্রণয়িণীর বিকৃত মস্তিষ্কজ উন্মত্ত প্রলাপ বলিয়া কেহই সন্দেহ করিতে পারিবেন না। তবে দুর্ভাগ্যবশতঃ মেঘদূতের পুনরভিনয়সংবাদ আজও আমাদের কর্ণগোচর হয় নাই। যাহা হউক, কপোতের সাহায্যে বার্ত্তাবহন কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে দেখিয়া, টেনাক্ (Teynac) নামক জনৈক প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত, মধুমক্ষিকা দ্বারা দূরদেশে সংবাদপ্রেরণের চেষ্টা করিতেছেন, এবং এই অদ্ভুত প্রয়াসে আংশিক কৃতকার্য্যও হইয়াছেন।

অনেকেই জানেন, মধুমক্ষিকাগণ মধুসংগ্রহার্থে দূরবর্ত্তী বনে অবিশ্রান্ত বিচরণ করে, এবং যথাসময়ে সায়াহ্নে স্বীয় চক্রে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া থাকে; কোন প্রকারে বিনষ্ট বা ছিন্নপক্ষ না হইলে, দূরগমনে ইহাদের পথভ্রান্তি হয় না। মক্ষিকার এই ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়া, এক নূতন উপায়ে ইহাদিগকে মনুষ্যের কার্য্যোপযোগী করিবার কথা, সহসা টেনাকের মনে উদিত হইয়াছিল। মক্ষিকার উক্ত ক্ষমতার সীমা কত দূর, তাহা স্থির করিবার জন্য, সাহেবটি

একটি ক্ষুদ্র থলিয়া মক্ষিকাপূর্ণ করিয়া, পাঁচ ক্রোশ ব্যবধানে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতেও একটিরও পথভ্রান্তি হয় নাই, সকল গুলিই ঘণ্টায় সাত মাইল বেগে উড়িয়া নির্দ্দিষ্ট চক্রে উপস্থিত হইয়াছিল। টেনাক, ইহা দেখিয়া, কপোতের ন্যায় মক্ষিকাকে পৃথক্ ভাবে বার্ত্তাবহন শিক্ষা দেওয়া বা বিশেষ জাতি অনুসারে ইহাদের নির্ব্বাচন করিবার কোনও আবশ্যক হইবে না, বিবেচনা করিয়াছিলেন। এবং অনায়াসে শীঘ্রই ছয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী তাঁহার এক বন্ধুর সমীপে যথেচ্ছ সংবাদাদিপ্রেরণে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

টেনাকের অবলম্বিত উপায়টি অতি সহজ। প্রথমতঃ, কতকগুলি সবলপক্ষ সুস্থ মক্ষিকা সংগ্রহ করিয়া যথেচ্ছ বহির্গমন ও প্রবেশোপযোগী ছিদ্রযুক্ত একটি খোপে যথেষ্ট আহারাদি দিয়া, ইহাদিগকে কিছু দিন আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন; এই উপায়ে আবাসস্থানের সহিত তাহাদের বিশেষ পরিচয় হইলে, এই পালিত মক্ষিকাগুলির মধ্যে, কয়েকটিকে একটি লৌহজালে আবৃত ক্ষুদ্র বাক্সে আবদ্ধ করিয়া, তাঁহার বন্ধুর নিকট ডাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বাক্স হস্তগত হইলে, টেনাকের উপদেশানুসারে, তিনি প্রথমতঃ বন্ধনমুক্ত করিয়া ইহাদের সম্মুখে এক পাত্র মধু রাখিতেন, ক্ষুধার্ত্ত মক্ষিকাগণ নিকটে আহার পাইয়া ইতস্ততঃ উড়িবার চেষ্টা না করিয়া মধুপানে নিযুক্ত হইত। তিনিও এই অবসরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজখণ্ডে, ঈপ্সিত সংবাদ লিখিয়া, শিরিশ দিয়া, এ গুলি তাহাদের পক্ষের সন্ধিস্থলে সতর্কতার সহিত লিপ্ত করিয়া দিতেন। মক্ষিকাগণ মধুপানে পরিতৃপ্ত হইয়া, ইতস্ততঃ উড়িয়া পরিচিত আবাস না পাইয়া, দ্রুত পক্ষে তদনুসন্ধানে বহির্গত হইত, এবং অল্পকালের মধ্যে প্রেরকের নিকট তাহাদের পূর্ব্বপরিচিত আবাসে উপস্থিত হইয়া, নির্দ্দিষ্ট ছিদ্র দ্বারা আশ্রয়গ্রহণের চেষ্টা করিত। কিন্তু উক্ত ছিদ্র সকল এককালীন একটি মাত্র মক্ষিকাশরীর প্রবেশের উপযোগী করিয়া নির্ম্মাণ করায়, পক্ষ আকুঞ্চিত করিয়াও ইহারা গাত্রলিপ্ত পত্র সহ কোটরপ্রবিষ্ট হইতে পারিত না, এবং প্রবেশচেষ্টা হইতেও বিরত হইত না। ইহা দ্বারা কাগজখণ্ড বার বার ছিদ্রমুখে ঠেকিয়া শরীরচ্যুত হইয়া কোটরসম্মুখে পড়িয়া থাকিত,—মক্ষিকাপ্রেরক যে কোনও সময়ে আসিয়া তাহা পাঠ করিতে পারিতেন। টেনাকের বন্ধুরও এই প্রকার এক দল মক্ষিকা ছিল, বন্ধুপ্রেরিত বাক্স শূন্য হইলে, তিনি আবার ইহা স্বপালিত মক্ষিকায় পূর্ণ করিয়া, টেনাকের নিকট প্রেরণ করিয়া সংবাদ আনয়ন করিতেন। এই প্রকারে বন্ধুদ্বয় অনেক দিন অবধি সংবাদের আদান প্রদান করিয়াছিলেন। টেনাক, আজও এ বিষয়ের পরীক্ষায় নিযুক্ত আছেন। দশ বারো মাইলের অধিক দূরবর্ত্তী স্থানে লইয়া গেলে, মক্ষিকাগণের পথভ্রান্তি হয় দেখিয়া, বিশেষ কোনও শিক্ষা বা বংশোন্নতি দ্বারা, দূরতর প্রদেশে সংবাদপ্রেরণ সম্ভবপর কি না, এখন তাহারই পরীক্ষা করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে ডাক বসাইয়া মক্ষিকার সাহায্যে শীঘ্র সংবাদ প্রেরণ করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু যুদ্ধাদিকালে যখন মক্ষিকাদির দৌত্যকার্য্য বিশেষ আবশ্যক, সেই সময়ে পথিমধ্যে মক্ষিকাবাসাদি নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করা, সম্পূর্ণ অসম্ভব বিবেচনা করিয়া, এই শেষ সংকল্প পরিত্যক্ত হইয়াছে।

ঘ্রাণশক্তি।

প্রাণিমাত্রেই অল্পাধিক ঘ্রাণশক্তির লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। একজাতীয় জীবের মধ্যে কোনও নির্দ্দিষ্ট গন্ধ সমভাবে অনুভূত হয় না। স্নায়ুমণ্ডলীর উপর ইহার প্রভাব বড়ই জটিল ও শৃঙ্খলাহীন বলিয়া বোধ হয়। আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই, যে গন্ধ এক ব্যক্তির প্রীতিকর বলিয়া বিবেচিত হয়, ব্যক্তিভেদে তাহাই বিরক্তি-উৎপাদক হইয়া পড়ে। অনেকে পলাণ্ডুর গন্ধ সহ্য করিতে পারেন না, কিন্তু আবার কেহ কেহ সেই পলাণ্ডুযুক্ত ব্যঞ্জন অতি উপাদেয়

বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। কথিত আছে, জগদ্বিখ্যাত গেটে আপেল ফলের ঘ্রাণ অসহনীয় বিবেচনা করিতেন; আবার শিলার তাহা বড় প্রীতিকর বলিয়া আদর করিতেন। বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন, ঘ্রাণোত্তেজক স্নায়ুমণ্ডলীর প্রকৃতিভেদে, একই গন্ধের এই প্রকার ভিন্ন ফল প্রত্যক্ষ করা যায়। এতদ্ব্যতীত, ঘ্রাণের আরো অনেক কার্য্য আছে; ইহার অনেক গুলিই আমরা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, কিন্তু অনাবশ্যক বোধে মনঃসংযোগ করি না। সম্প্রতি ডাক্তার রিচার্ডসন্ নানা ঘটনা সংগ্রহ করিয়া, জীবশরীরের উপর ঘ্রাণের কার্য্য সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। * ইহাতে কয়েকটি নূতন কথারও সমাবেশ আছে। ইঁহার মতে, ঘ্রাণশক্তির সহিত স্মৃতিশক্তির একটি বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে: সাহেবের এক বন্ধুর কথা দ্বারা এবং আরো অনেক বাস্তব ঘটনার উল্লেখ করিয়া, লেখক ইহার সত্যতা বেশ প্রমাণ করিয়াছেন। রিচার্ডসনের উল্লিখিত বন্ধুটি অতি শৈশবে গাড়ি উল্টাইয়া বিশেষ আহত হইয়াছিলেন; উক্ত দুর্ঘটনাস্থলে একটি দুর্গন্ধময় গোময়স্তূপ ছিল, এই গোময় ঘটনাক্রমে বালকের বস্ত্রে সংলগ্ন হওয়ায়, ইহার দুর্গন্ধে তাঁহাকে বিশেষ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল। ইহার পর, উহা বাল্যঘটনার সামান্য স্মৃতিমাত্রও লোকটির মন হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। উক্ত ঘটনার পঞ্চাশ বৎসর পরে, এক দিবস একটি গ্রাম্যপথে গোময়ের দুর্গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া, তাঁহার মনে পূর্ব্বকার গোময়স্তূপের কথা সহসা উদিত হইয়াছিল। স্মৃতি ও ঘ্রাণশক্তি সম্বন্ধে আরো অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। পাঠকপাঠিকাগণ দেখিয়া থাকিবেন,—কোনও দুর্গন্ধবিশিষ্ট পদার্থের স্মরণ করিলে, তাহার ঘ্রাণ যেন স্বতঃই নাসারন্ধ্রে উপস্থিত হইয়া, বমনোদ্বেগ উৎপাদন করে,—রিচার্ডসনের মতে, ইহাও উক্ত শক্তিদ্বয়ের ঘনিষ্ঠতার ফল। মনুষ্য অপেক্ষা ইতর প্রাণীর মধ্যে এই বিষয়ের আরো সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়; ইহারা ঘটনাপরম্পরার সাহায্যে, বা মনুষ্য অবলম্বিত অন্য কোনও উপায়ে, কোনও অতীত ঘটনা স্মৃতি পথে আনিতে পারে না, ঘ্রাণ দ্বারাই ইহারা স্মৃতিরক্ষণে সমর্থ হয়। শিকারী কুকুরদিগের ঘ্রাণই প্রধান বল, ঘ্রাণ না পাইলে ইহারা শিকারের আকৃতি প্রকৃতি বা আক্রমণ কৌশলাদির বিষয় কিছুই মনে করিতে পারে না। আর এক জাতীয় কুকুরের মধ্যে, ঘ্রাণশক্তির আরো অদ্ভুত কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, কোনও পদার্থ ইহাদের সম্মুখে ধরিয়া, কোনও গুপ্ত স্থানে লুক্কায়িত রাখিলে, যে পর্য্যন্ত পদার্থটির গন্ধ আঘ্রাণ করিতে পায়, তাহার কথা ইহারা কিছুতেই ভুলে না, এবং শিক্ষিত কুকুর হইলে অনায়াসে পদার্থটি খুঁজিয়া বাহির করিতেও পারে; কিন্তু কোনও উপায়ে ইহার প্রকৃত গন্ধ বিলুপ্ত করিলে, গন্ধের সহিত পদার্থের স্মৃতিও এককালীন লোপ প্রাপ্ত হয়, এবং সম্মুখে থাকিলেও জানিতে পারে না।

এতদ্ব্যতীত, প্রত্যেক গন্ধের বিশেষ বিশেষ গুণ আছে; রিচার্ডসন্ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, কতকগুলি গন্ধ আঘ্রাণ করিলে সহজে নিদ্রাবেশ হয়, আবার কতকগুলি দ্বারা নিদ্রাভঙ্গ হইয়া থাকে। নিদ্রাবস্থায় গলিত জীব শরীরের পূতি গন্ধ আঘ্রাণ করিলে নানা ভয়ানক স্বপ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

* Dr. B. W. Richardson in the *Asclapiad.*

মীরকাশেম।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

মীরকাশেম এক্ষণে তাঁহার উচ্চাভিলাষের চরম সীমায় উঠিলেন। যে আশা তাঁহাকে বাঙ্গালার মসনদের জন্য উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল, যাহার প্রলোভনে তিনি মহা-দুঃসাহসিকতায় নির্ভর করিয়া অসম্ভবও সম্ভব করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই আশা এক্ষণে অন্য মূর্ত্তিতে তাঁহাকে বিভীষিকা দেখাইতে লাগিল। তিনি বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যায় অধিপতি হইলেন বটে, কিন্তু শূন্য রাজকোষ, কাজ কর্ম্মে ও হিসাবপত্রে বিশৃঙ্খলা, কর্ম্মচারীদিগের অনুরাগ ও বিরাগ, নানা-বিষয়ে তাঁহার মনে ঘোর চিন্তা আনিয়া দিল।

ইংরাজ কোম্পানীকে সন্ধির সর্ত্তানুযায়ী যে সমস্ত টাকা দিতে হইয়াছে, তাহাতে রাজকোষ একেবারে শূন্য; এমন কি, কপর্দ্দক পর্য্যন্তও নাই। মীরজাফরের আমলে শৃঙ্খলা বলিয়া একটা পদার্থ ছিল না; বিশেষতঃ, সেরাজের সিংহাসনচ্যুতির পর হইতে রাজকোষ ক্রমাগত লুণ্ঠিত ও শোষিত হইয়াছে। যে অর্থের বিনিময়ে তিনি বাঙ্গালার সিংহাসন কিনিলেন, সেই অর্থের অভাবই এক্ষণে তাঁহার মসনদ কণ্টকময় করিয়া তুলিল।

তার পর তাঁহার নিজের সেনাদিগের বেতন দিতে হইবে। তাহারা অনেক দিন ধরিয়া মাহিয়ানা পায় নাই, ক্রমে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিতেছে। দিল্লীর বাদসাহের গতিরোধ করিবার জন্য তিনি পাটনায় একদল ইংরাজ সৈন্য রাখিয়াছিলেন; তাহাদেরও বেতন বাকি। ইংরাজ কোম্পানীকে যে টাকা ধার দিতে তিনি প্রতিশ্রুত ছিলেন, তাহারও অন্ততঃ অর্দ্ধেক দেওয়া চাই। এত গোলযোগের ও অর্থাভাবের মধ্যে পড়িয়াও, মীরকাশেম সাহস, দৃঢ়তা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি হারাইলেন না।

অন্য নবাব হইলে প্রজাপীড়ন করিয়া অতি সহজেই রাজকোষের শূন্য অংশ পূর্ণ করিয়া লইতেন। কিন্তু মীরকাশেম প্রজাপীড়ক নহেন; বিধাতা সে উপাদান তাঁহার মধ্যে এক তিলও রাখেন নাই। তিনি অন্য উপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

মীরজাফরের আমল—লুটের ও বিশৃঙ্খলার আমল। তাঁহার আমলে অনেক বড় বড় হিন্দু ও মুসলমান কর্ম্ম করিয়া লুঠতরাজে পেট মোটা করিয়া ঐশ্বর্য্যের

সুখভোগ করিতেছিলেন। মীরকাশেম তাঁহাদের হিসাবপত্র তলব করিয়া, নিকাশের মুখে অনেক টাকা আদায় করিয়া লইলেন। রাজস্ববিভাগে আদায় পত্র ও হিসাব রক্ষা সম্বন্ধে কঠোর নিয়মের প্রচলন করিয়া, নিজে সমস্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিতে লাগিলেন। অতিশীঘ্রই ইহার ফল ফলিল। তিনি অতি অল্পকালের মধ্যেই নিজের ও ইংরাজ সেনাদের বেতন শোধ করিয়া দিয়া, কলিকাতায় কোম্পানীকে প্রতিশ্রুত অর্থের অর্দ্ধকাংশ পাঠাইয়া দিলেন।

বাদসাহের গতিরোধ করিবার জন্য পাটনায় যে মিশ্র সেনাদল রক্ষিত হইয়াছিল, মীরকাশেম নিজে তাহাদের অধিনায়কত্ব করিয়া, বাদসাহের সঙ্গে কয়েকটি যুদ্ধ করিলেন। জয়শ্রী তাঁহাকেই উপযুক্ত পাত্র ভাবিয়া তাঁহার গলদেশে মাঙ্গলিক জয়মাল্য নিক্ষেপ করিলেন। বাদসাহ সন্ধি করিয়া, মীরকাশেমকে তিন প্রদেশের সুবাদারি দিয়া, দিল্লীতে চলিয়া গেলেন।

সেনাদলের মধ্যে যে একটা ভয়ানক বিশৃঙ্খলা বিরাজমান এবং রাজপদোচিত ক্ষমতা ও বাহুবল বৃদ্ধি করিতে গেলে যে তাহাদের সংশোধন বিশেষ আবশ্যক, বাদসাহের সহিত পাটনার যুদ্ধকালে, মীরকাশেম এ বিষয়ের গুরুত্ব বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সেনাদলের মধ্যে একটি মহা ত্রুটি এই যে, তাহারা নবাবের বেতনভোগী হইলেও, ইংরাজ সেনানায়কেরা তাহাদের পরিচালন ও শিক্ষার ভার লইয়া আসিতেছেন। মীরকাশেম সমস্ত সেনাকে নুতন উপায়ে সুশিক্ষিত করিয়া, নিজের হস্তে তাহাদের পরিচালন ও সন্নিবেশক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মীরকাশেম, মীরজাফর নহেন। ইংরাজ তাঁহাকে সিংহাসন দিয়াছে, বেশ কথা। কিন্তু কেন দিয়াছে? তাঁহার রাজকোষের প্রচুর অর্থের বিনিময়ে কি নহে? ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে কি একটা ধারাবাহিক ও চিরস্থায়ী সম্বন্ধ থাকিয়া যায়? তাঁহার বাড়ী ঘর, তাঁহার রাজ্য, তাঁহার প্রজা, তিনি রাজস্বের মালিক, শত শত সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহার মুখ চাহিয়া অত্যাচার অবিচারের বিচার প্রার্থনা করিতেছে। ইংরাজ কে যে, তাঁহাকে এই সমস্ত অধিকার হইতে দূরে রাখিয়া নিজের হাতে ক্ষমতা লইবার চেষ্টা করে?

রাজ্য তাঁহার, রাজস্ব-আদায়ের ভার তাঁহার, প্রজা তাঁহার, তাহাদের পালন, ও দোষগুণের বিচারক্ষমতা তাঁহার। কর্ম্মচারী নিযুক্ত ও পদচ্যুত করিবার ক্ষমতা ন্যায়ানুসারে রাজ্যাধিপতির। ইহা ত আবহমান কাল হইতে

প্রচলিত প্রথা ; তবে কেন ইংরাজ তাঁহার রাজ্যসম্বন্ধীয় ব্যাপারে, তাঁহাদের কোনও স্বত্ব বা দাবি দাওয়া ও অধিকার না থাকা সত্বেও, মুরশীদাবাদ হইতে অনেক দূরে থাকিয়াও হস্তক্ষেপ করিবার চেষ্টা পায়।

দেশের প্রকৃতিপুঞ্জ তখনও শুষিতেছে। অত বড় ছিয়াত্তরের মন্বন্তরটা সমস্ত বাঙ্গালা দেশের বুকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়া, একবারে দেশটাকে উজাড় করিয়া গিয়াছে। যাহারা বাঁচিয়াছে, তাহাদেরও বলসঞ্চয় করিতে অনেক সময় লাগিবে। ইংরাজ ও ভূতপূর্ব্ব নবাবের কর্ম্মচারিগণ, ডবল গবর্মেণ্টের সমস্যার মধ্যে পেষণ করিয়া, মীরজাফরের আমলে, প্রজাকে অস্থিকঙ্কালসার করিয়া তুলিয়াছেন। প্রজা না থাকিলে, তাহাদের রক্ষা করিতে না পারিলে, তাহাদিগকে বলসঞ্চয় করিবার অবসর না দিলে, তিনি কাহাদের বলে রাজমুকুট পরিবেন ? মীরকাশেম, প্রজারক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

মীরজাফর তাঁহার ইংরাজ বন্ধুদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু কাশেম আলি তাহাদের সম্পূর্ণ অবিশ্বাস ও সন্দেহ করিতেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলিকাতা কৌন্সিলের কর্ম্মচারীরা এই সময়ে আবার বড় বাড়াইয়া তুলিয়াছিলেন। * পূর্ব্বে নবাবের সময়ে তাঁহারা ও তাঁহাদের অধীনস্থ ইংরাজেরা বাণিজ্যাদি কাণ্ডে যে সমস্ত অন্যায্য স্বত্ব ভোগ ও দাবি দাওয়া করিয়া আসিয়াছেন, এখনও সেইরূপই করিতে লাগিলেন। অর্থসঞ্চয় তাঁহাদের মূলমন্ত্র। রাজা প্রজা, ন্যায় অন্যায়, বিচার অবিচার, তাঁহারা কিছুরই ধার ধারেন না। উচ্চপদের সহায়তায়, তাঁহারা রাজ্যের চিরপ্রতিষ্ঠিত মঙ্গলকর নিয়মগুলির মস্তকে যথেচ্ছ পদাঘাত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির সীমা অতিক্রম করিল। সে গুলি কি, তাহা আমরা ক্রমশঃ বুঝাইতেছি।

* কোন নিরপেক্ষ ইংরেজ লেখক এই সময়ের অবস্থা বর্ণনোদ্দেশে মীরকাশেমকে লক্ষ করিয়া বলিয়াছেন—He (Mir Kasem) had full reason to do so for the annals of no nation contain records of conduct more unworthy, more mean, more disgraceful than that which characterised the English Government of Calcutta during the three years which followed the removal of Merzaffer. That conduct is attributable to one cause, the basest and meanest of all *the desire for personal gain* by any means and at any cost. It was the same longing which has animated the robbers of the Northern clime, the pirate of the Southern sea, which has stimulated the individuals to robbery even to murder. In point of morality the members of the governing digne of Calcutta from 1761 to 1763 Mr. Vansittart and Mr. W. Hastings excepted were not a whit better than the perpetrators of such deeds.

মীরকাশেম, মসনদে বসিবার পূর্ব্বে, কলিকাতা কৌন্সিলের সদস্যগণের সহিত অর্থ সম্বন্ধে যে একটা চুক্তি করেন, পরিশেষে তাহা কড়ায় গণ্ডায় পরিশোধ করিয়া দিলেন। ঘটনাক্রমে এই সময়ে পূর্ব্ব সদস্যেরা কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর লইলেন। তাঁহাদের স্থানে নূতন লোক নিযুক্ত হইল। নবনিযুক্ত সদস্যগণ এতদূর অর্থগৃধ্নু ও স্বার্থপর যে, কৌন্সিলে বসিয়াই তাঁহারা উদরপূর্ত্তির উপায় দেখিতে লাগিলেন। পীড়নটা নবাবের উপরই চলিতে লাগিল। যাঁহারা তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইয়াছেন, তাঁহারা তখন ভারতবর্ষ ছাড়িয়া ব্রিটানিয়ার হিমানীসিক্ত শীতল সমীরণ উপভোগ করিতেছেন। থাকিবার মধ্যে একমাত্র Vancitart সাহেব। তিনি একক; যে কার্য্য করিবার ইচ্ছা করেন, অন্যান্য সদস্যেরা সমবেত শক্তির সাহায্যে তাহাতে বাধা দেন। সুতরাং অতিশীঘ্র মীরকাশেমের সহিত সংঘর্ষণ ঘটিবার জোগাড় হইয়া উঠিল।

মোগল বাদসাহের সহিত সন্ধি হইবার পরই কাশেম আলি খাঁ পাটনার গবর্ণর রামনারায়ণকে পদচ্যুত করেন। একপক্ষে রামনারায়ণ ইংরাজের গোঁড়া, অপর পক্ষে নবাব নিজে ইংরাজবিদ্বেষী। রামনারায়ণ কেবল উৎকোচ ও অত্যাচারে ধনসঞ্চয় করিয়াই বর্দ্ধিতপ্রতাপ হইতেছিলেন। ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালার নবাবকে উপেক্ষা করিতেও তাঁহার সাহস হইয়াছিল। মীরকাশেম সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন। কলিকাতা হইতে মুরশীদাবাদ অতি নিকটে, তিনি ইংরাজের নিকট হইতে দূরে থাকিবার বাসনা করিয়া মুঙ্গেরে নিজ রাজধানী পরিবর্ত্তন করিলেন। মুঙ্গের গঙ্গার উপকূলে, বড় রম্য স্থান, রাজধানীর বড় উপযুক্ত; তাহার উপর মুঙ্গেরে একটি সুন্দর দুর্গ ছিল। মীরকাশেম, মুঙ্গেরে রাজধানী পরিবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা ও প্রয়োজন মত দুর্গের সংস্কার আরম্ভ করিলেন। ইংরাজের সহিত কড়ার মত সমস্ত দেনা পাওনা পরিশোধ করিয়া দিয়া, তিনি রাজস্ববৃদ্ধিতে মনোযোগ দিলেন। ইহার যথেষ্ট ফলও ফলিল। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দের রাজস্ব আয়ব্যয়ের তালিকায় ব্যয়ের ভাগ কম হইয়া শূন্য রাজকোষ অনেকাংশে পরিপূর্ণ হইল।

তাহার পর, মীরকাশেমের উৎক্রোশদৃষ্টি সেনাদলের উপর আকৃষ্ট হইল। সিংহাসনে বসিবার পর তিনি যে কয়েকটি যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সেনাগণ কি কি বিষয়ে ইংরাজ ও মোগল সেনা অপেক্ষা হীন, তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ইংরাজের ন্যায় ইউরোপীয় জাতির ক্ষমতায় বাধা দিতে হইলে, সৈন্যগণকে ইউরোপীয় মতে শিক্ষিত করা চাই। কিন্তু সেরূপ শিক্ষা-

দাতা পাওয়া বড় দুষ্কর। কোনও শিক্ষিত ইংরাজসৈনিকই তাঁহার চাকরী গ্রহণ করিবেন না, ইহাও স্থির নিশ্চয়। সৌভাগ্যক্রমে অন্য ইউরোপীয় জাতিভুক্ত দুই জন বৈদেশিক তাঁহার চাকরী গ্রহণ করিল। এক জন Alsatian Reinhard ও অপর জন Gregory Markar. প্রথমোক্ত ব্যক্তি ইউরোপে সমরু, ও দ্বিতীয় সাধারণের নিকট গুরগণ খাঁ বলিয়া পরিচিত।

সমরু ফরাসি, মার্কার আরমিনিয়ান। ইংরাজ নয় বলিয়াই মীরকাশেম তাঁহাদের পাইলেন। দুইজনেই উপযুক্ত লোক। যে কাযের জন্য নবাব লোক খুঁজিতেছিলেন, তাঁহারা সেই কাজের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। মীরকাশেম, উভয়েরই প্রচুর বেতনের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

১৭৬২ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বরের পূর্ব্বে, এই দুই জন বৈদেশিকের শিক্ষাধীনে, বাঙ্গলার নবাব ২৫ হাজার পদাতিক সৈন্য ইউরোপীয় প্রথামত সুশিক্ষিত করিলেন। এক দল শিক্ষিত কার্য্যক্ষম গোলন্দাজ সেনাও এই সঙ্গে সঙ্গে তৈয়ারী হইল। কামান ও গোলাগুলি ঢালাই করিবার জন্য নবাব কারখানা খুলিয়াছিলেন। তাহা হইতে উৎকৃষ্ট কামান প্রস্তুত হইতে লাগিল। মীরকাশেম নিয়মিতরূপে এই সৈন্যদলের বেতনপ্রদান, উপযুক্তরূপে শ্রেণীনির্দ্দেশ করিয়া পদবিভাগ ও কার্য্যদক্ষতার পুরস্কারদান করিতেন। নিজ চক্ষে, নিজ অধিনায়কত্বে পরিচালন করিয়া, দুই জন বৈদেশিকের সহায়তায়, মীরকাশেম যে সৈন্যদল সংগঠিত করিলেন, তাহাতে কলিকাতা কৌন্সিল বুঝিলেন, মীরকাশেম মীরজাফর বা সেরাজউদ্দৌলা নহেন ;—অসাড়, জড় প্রকৃতির পরিবর্ত্তে এক কার্য্যকরী তীব্র শক্তি মুঙ্গেরে বসিয়া তিন সুবার শাসনশক্তি পরিচালিত করিতেছেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

প্রতিশোধ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

এইখানে একটু পিছাইয়া গিয়া আমরা বিশ্বনাথের অনুসরণ করিব।

রণ্‌পা সহায়ে বিশ্বনাথ সচরাচর সুদক্ষ অশ্বারোহীর মত অতি অল্প সময়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিত। শোনা যায়, ডাকাইত-সঙ্কুল প্রদেশে এখনও সেই

ক্রুতযানের চলন সম্পূর্ণ নিবারিত হয় নাই। নহিলে সিপাহী সাহেবেরা রোঁদে বাহির হইলে যে "দাগী বদ্‌মাস্‌কে" গৃহে হাজির পাইয়া থাকেন, সেই আবার তিন চারি ঘণ্টার অবসরে দশ ক্রোশ দূরে ডাকাইতি করিয়া প্রাতে আপন শয়নকক্ষে দিব্য ভালমানুষটীর মত নিদ্রা দেয়, এ রহস্যের অর্থ কি? ফলতঃ, কদন্নভোজী, নামমাত্র মৎস্যাহারী বাগ্দী, বা গৌড় গোয়ালা জাতীয় জওয়ানেরা এখনও যে সুশাসিত বাঙ্গালার বুকে বসিয়া অসাধ্য-সাধন করিয়া থাকে, এর একটা নৈসর্গিক কারণ আছেই আছে।

ঘোরান্ধকারে, আন্দাজে মাঠের সোজা পথ ধরিয়া, বিশ্বনাথ চূর্ণী নদীর গতি অনুসরণ করিয়া চলিল। সেই ভরা ভাদ্রের জলে ভরা ধান্য ক্ষেত্রে এবং পঙ্কিল "আইল্" পথের পার্শ্বদেশ হইতে অবিশ্রান্ত ঝিল্লিরব উঠিতেছিল। সৌভাগ্যক্রমে আকাশে মেঘের সঞ্চার ছিল না। মাঝে মাঝে প্রান্তরে ইতস্ততঃ সঞ্চিত বর্ষাজলে, নক্ষত্রসনাথ নভোমণ্ডল ছায়া হিল্লোলে ঈষৎ কাঁপিতেছিল। কচিৎ ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরে প্রবাহিত জলের করুণ কল্লোল ধ্বনিত হইতেছিল। কোথাও গ্রামপ্রান্তে নিবিড় বটচ্ছায়ার ছেদশূন্য অন্ধকার মধ্যে পেচক-দম্পতি বিকট চীৎকার করিতেছিল। নিশীথের এই রুদ্র গাম্ভীর্য্য যে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, সে বাস্তবিক অনন্তের বিরাট মূর্ত্তি দেখিয়াছে।

অবলীলাক্রমে বিশ্বনাথ এইরূপ ভয়ানক দৃশ্যাবলী পশ্চাতে রাখিয়া স্থির-লক্ষ্য শ্যেনপক্ষীর মত দ্রুত ধাবিত হইতেছিল। ক্রমে কূলে কূলে প্লাবিত চূর্ণীর খরপ্রবাহশব্দ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। বিশ্বনাথ বুঝিল, বৈদ্যনাথের আশ্রয়-স্থান অদূরে। এমন সময়ে সহসা মাথার উপরে উড্ডীয়মান টিট্টিভ পক্ষী নিনাদ করিয়া উঠিল। সে রব উদাসীনের দূরাগত সঙ্গীতবৎ বিশ্বনাথের হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। স্মৃতিসাগর মন্থন করিয়া বিশ্বনাথ মনশ্চক্ষে প্রথম জীবনের একমাত্র পরাজয়-দিন অঙ্কিত দেখিতে পাইল। চন্দ্রকরপ্রফুল্ল ভৈরবনদী-সৈকতে দণ্ডায়মান বিক্রমসিংহের দীর্ঘ মূর্ত্তি বহুদিন পরে সহসা চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। বিশ্বনাথ বুঝিতে পারিল না, এই ঘটনায় হৃদয় তাহার কম্পিত হইল কেন? ইচ্ছা ছিল, তীরে একটু অপেক্ষা করিয়া "আস্তানার" সংবাদ লইবে, কিন্তু তাহাতে আর প্রবৃত্তি হইল না। অপেক্ষাকৃত মন্থরগতিতে বিশ্বনাথ নদীবক্ষ লক্ষ্য করিতে করিতে চলিল। কোথাও কিছু নাই—নৌকার চিহ্নমাত্র নাই। শেষে বিশ্বনাথ গোবরডাঙ্গার হাটে আসিয়া পৌছিল।

রাত্রি গভীর হইয়াছিল—দ্বিপ্রহরের আর বড় দেরি ছিল না। দোকান

পাট সব বন্দ—কাহারও সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না। কেবল ভগবান ময়রের দোকানের ঝাঁপ তখনও সম্পূর্ণ বন্ধ হয় নাই। ক্ষীণ প্রদীপালোক সম্মুখে অর্দ্ধ-শয়ানাবস্থায় সে মধুরকণ্ঠে কীর্ত্তনের সুরে গাইতেছিল,—

পাপ এত মনোহর করে কেন গড়ে ছিলে।
বিষবল্লরী কেন আপাতরম্য কুসুম-ভূষণে সাজাইলে।
এত ঋজু যদি পাপ-পথ কেন হৃদয়ে বল না দিলে।
এই অসম দ্বন্দ্বে, জীববৃন্দে, পরীক্ষা কর কি ছলে।

নিঃশব্দে রনুপা রাখিয়া বিশ্বনাথ দোকানে প্রবেশ করিল। কিন্তু দীপ-ছায়ায় ধরা পড়িল। ভগবান শয়ন বন্ধ করিয়া হাসিয়া বলিল, "কি বাবা, এই মাত্তর এলে না কি?" বিশ্বনাথ বিস্মিত হইয়া সুধাইল—"আমি আস্‌ব, তুমি জান্‌লে কেমন করে বাবা?" ভগবান হাসিল। "সংসারে এখন ভাবি কেবল হরিনাম, আর বিশে বাগ্দীর রূপ। আগে থাক্‌তে মন জান্‌তে পার্‌বে, এ আর বেশী কথা কি বাপু?"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

ভগবান তখন বিশ্বনাথের পরিচর্য্যায় রত হইল। তাহাকে তামাক সাজিয়া খাওয়াইল, এবং সম্মুখে প্রচুর মিষ্টান্ন ও ঘটীতে জল রাখিয়া দিল। বিশ্বনাথ বলিল, "ও সব এখন থাক্। আমি তোমার এখানে এসেছি কেবল একটা খবরের জন্য। নইলে আমার এখন এক তিল দেরি করার সময় নেই। এক খানা সওয়ারী নৌকো এই নদীতে ভেটেল মুখে গেছে, তার কোন খবর রাখ কি না? ব'দে ব্যাটার হালচাল কিছু বল্‌তে পার কি না?"

ভগবান বলিল, "বাপু উপস্থিত ত্যাগ কর্‌তে নেই। আগে একটু জলযোগ করে নাও, সব খবর দিব এক্ষুনি। কিন্তু জল একটু না খেলে নয়।" তখন ভগবান স্বহস্তরচিত বিবিধ মিষ্টান্ন বিশ্বনাথকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইল। অনিচ্ছায় বিশ্বনাথ গুরুতর আহার করিল,—কেন না, হাত তুলিতে উদ্যত হইলেই ভগবান কুটুম্বিনীর মত কখন পরিহাস, কখনো স্নেহপূর্ণ শপথ বা গালির উৎস খুলিয়া দিতেছিল।

জলযোগের পর ভগবান আবার তামাক সাজিতে বসিয়া গেল। বিশ্বনাথ একটু কুপিত হইয়া বলিল, "ভগবান, এতক্ষণ যে ঘোড়ার মতন ছুটে এলাম, সেটা কি কেবল তোমার নেমন্তন্ন খেতে? যখন তুমি বাপু বৈষ্ণবের ভেক্

ধরে থাক্‌তে, তখন তোমার কিছু আক্কেল ছিল। আসল বৈষ্ণব হবার যোগাড় করে তুমি একেবারে বয়ে যেতে বসেছো। ডাকাতি করতে আসিনি, সে ভয় করো না। তা হ'লে তোমার ফাঁদে পা দিতাম না।"

ভগবান বিশ্বনাথের হাতে কলিকা দিয়া বলিল,—"যে জন্যে তুমি এসেছ, তা আমি জানি; খানিকটে মন জানতে পারে, খানিকটে জেনে নিতে হয়। বদের লোক তোমার কাছে গেল, সে খবর যখন পেলাম, তখনই বুঝলুম, বাপধন আমার যদি ঠিকানায় থাকেন, তবে একবার দেখা দিতে আসবেনই আসবেন। তা না হলে বাপু এই চাষার হাটে তুই হঠাৎ এসে মেঠাই, জেলাপি, রসগোল্লা টাট্‌কা টাট্‌কা খেলি কেমন করে? এত বুদ্ধি ধরিস, এটুকু বুঝ্‌তে পার্‌লিনে বাপু! হাজার হোক্ জেতে বাগ্দী তার কত হবে বল?"

বিশ্বনাথ হাসিল। "তুই বাপু জেতের বড়াই নিয়েই গেলি। তবু যদি এই বাগ্দীর ছেলে না হতিস্। কিন্তু আজ গানটা বড় গাচ্ছিলি সরেস। আসল কথাটা বলে ফ্যাল শীগ্‌গির, যদি কোন বিলি ব্যবস্থা করে থাকিস্ ত বল—আমি তা হলে নড়িনে। তোর গান শুনে রাত কাটাই।"

তখন ভগবান যাহা জানিত, বলিল। শুনিয়া বিশ্বনাথ কহিল, "বিক্রম সিংহের আশ্রয়ে বামুনের মেয়েটিকে পাঠিয়ে তুমি যেমন নিশ্চিন্ত হয়েচো, আমিও তেমনি হতে পারতাম। কিন্তু তবু মনটা কেমন খুঁৎ খুঁৎ কোর্‌চে। তোমার মুখে সিংহ মহাশয়ের নাম শুনে আমার গায়ে বাপু কাঁটা দিয়েছিল।" বিশ্বনাথ পথিমধ্যে টিট্টিভ পক্ষীর রব শুনিয়া যে ভাবে বিচলিত হইয়াছিল, সে গল্প করিল। তখন বিক্রমসিংহের কোন অমঙ্গলসূচনায় উভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল, বিশ্বনাথ আবার বলিল, "এর পর আর দেরি করা ভাল হয় না। বদে ব্যাটার ত কাণ্ডজ্ঞান নেই, দরকার বুঝ্‌লে বুড়ো মানুষটোকে অপমান ত কর্‌বেই, মেরে ফেল্‌তেও আটক নেই। তুই বাপু আমার সঙ্গে চল্। পথে তোর গানটা শুন্‌তে শুন্‌তে ফির্‌ব। কবে শিখ্‌লি, কই সেদিন ত এটা গাস্‌নি? চল্। পাঁচ কোশ্ রাস্তা বই ত নয়—লহমায় যাব, লহমায় আস্‌ব! তোর রন্‌পা জোড়া বার্ কর্।"

ভগবান। "আমাকে আর এ সবে জড়াস্ কেন বাপু! ও পথে আর নয়। তোর অনুরোধে দোকানের ঠাট্ করে এমন জায়গায় আছি, যেখানে কথা কইবার একটা লোক পাইনে। নূতন গান সেদিন শিখেছি, একটি রাহী বাবাজীর কাছে। নবদ্বীপে তাঁর সঙ্গে একবার দেখা কর্‌তে হবে। এখনও

সুরটো ঠিক কায়দা হয় নি। তোকে বাপু কতবার মিনতি কর্‌চি, তুই নবদ্বীপে আমায় থাকতে নাই দিলি, ওপারে স্বরূপগঞ্জে তোর আড্ডার কাছাকাছিই না হয় রাখ্। এত লোককে এত দয়া করিস্, বুড়ো বাপের এ অনুরোধ টুকু রাখ্‌তে পারিস্‌নে!"

বিশ্বনাথ দোকানের চারি দিক লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিল—শেষের কথা কটা শুনিয়া একমুখ হাসিল। বলিল, "আচ্ছা তাই হবে! কোম্পানি যে রকম বাদে লেগেছে, আমাকেও শীগ্‌গির্ সেই জায়গায় যেতে হবে দেখ্‌চি। এখন বাপু বাজে কথা রাখ্। তোর রণ্‌পা জোড়া কই?—দেখ্‌চিনে যে! লক্ষ্মী বাপ্ আমার চল্, লহমায় যাব, লহমায় আস্‌ব।"

ভগবান্। তোর রণ্‌পা ফন্‌পা আমি কি আর কিছু রেখেছি বিশু—তুই একলা যা! ফিরে এসে গান শুনিস্। আমি জেগেই থাক্‌ব। মেয়েটা যদি জেগে ওঠে, তাকে থামাবে কে? তুই একলা যা বিশু!"

বিশু তাহা শুনিল না। ত্রস্তহস্তে দা লইয়া আপনার সুদীর্ঘ রণ্‌পার * প্রথমার্দ্ধ কাটিয়া ফেলিল। দেখিতে দেখিতে দুইজোড়া রণ্‌পা প্রস্তুত হইল। তখন বিশ্বনাথ ভগবানকে টানিয়া এক জোড়ায় দাঁড় করাইল। নিজে তাহার দোকানের ঝাঁপ বাঁধিয়া স্বয়ং আর এক জোড়ায় লাফাইয়া উঠিল। তার পর দুই জনে পাশাপাশি বন্য ঘোটকযুগলের মত তীব্রবেগে ছুটিয়া চলিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

সেই সন্নিহিত রণ্‌পা-শব্দ আসন্ন শত্রুর তূর্য্যনিনাদবৎ বৈদ্যনাথের কর্ণে ধ্বনিত হইল। সকলের আগে সে বুঝিল, আগন্তুক আর কেহ নহে—বিশ্বনাথ স্বয়ং। বুঝিল, সে অবস্থায় দলপতির সম্মুখে পড়িলে তাহার লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না। মুহূর্ত্তে মনঃস্থির করিয়া বৈদ্যনাথ হাঁকিল—"গুড়াও"। ‡ তখন সেই ক্ষুদ্র দস্যুসেনা নিমেষে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু সড়কীতে যে গুরুতর আহত হইয়াছিল, তাহার গতিশক্তি ছিল না। স্বহস্তে বৈদ্যনাথ সেই আহত

* রন্‌পার নীচে এবং উপরে অনেক স্থানেই পা রাখিবার স্থান থাকে। অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব গতিতে যাইবার জন্য ডাকাতরা নীচের দিক্‌টা ব্যবহার করে। অত্যন্ত দ্রুত গমনের জন্য উপরে পা রাখিবার দরকার হয়।

‡ অর্থাৎ, গুটাও বা জাল উঠাও। সর্দ্দারের এই সঙ্কেতবাক্য উচ্চারিত হইবামাত্র ডাকাইত দলে, যে যে অবস্থায় থাক, পলায়ন করে।

মুমূর্ষুর শিরশ্ছেদ করিল, এবং এক জনকে আদেশ করিল, ছিন্নমুণ্ড আমূল তরবারি বিদ্ধ করিয়া লয়। নিজে সরলার সেই বেতের ক্ষুদ্র পেটরাটি উঠাইয়া লইল। দেখিতে দেখিতে তাহারা রণ্‌পার শব্দের বিপরীত দিকে ঘোরান্ধকার মধ্যে অন্তর্হিত হইল।

অনতি পরেই বিশ্বনাথ ভগবান সঙ্গে ঘটনাস্থলে অবতীর্ণ হইল। বিক্রম-সিংহের গৃহসম্মুখে দস্যুদের নিক্ষিপ্ত মশালের ভগ্নাংশ সকল তখনও অল্পবিস্তর আলোক বিকীর্ণ করিতেছিল। গ্রামস্থ লোকেরা সজাগ হইয়াছে বটে, কিন্তু সাহস করিয়া ঘটনাস্থলে আসিতে পারিতেছে না। সদ্যোহৃতশির কবন্ধ-মূর্ত্তি রুধিরাপ্লুত হইয়া পথিমধ্যে ভয়ানক দেখাইতেছিল। প্রথমতঃ উভয়ের আশঙ্কা হইয়াছিল, হয় ত স্বয়ং বিক্রম সিং দস্যুহস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। সবিশেষ জানিবার জন্য উভয়ে সেই মুক্ত দ্বারপথে প্রবেশ করিল। দেখিল, যোদ্ধৃবেশে বৃদ্ধ বিক্রম সিং অঙ্গন মধ্যে পড়িয়া আছেন। মুক্তকুন্তলা বিধবা আপন অঙ্কে মস্তক রাখিয়া সযত্নে তাহাতে জলসেক করিতেছেন। আর পার্শ্বে বসিয়া কিশোরী বালিকা চোকের জল মুছিতে মুছিতে অঞ্চল দোলাইয়া তাঁহাকে বায়ু বীজন করিতেছে, এবং তাঁহার পরিহিত চর্ম্মবন্ধন শিথিল করিতে প্রয়াস পাইতেছে—কিন্তু পারিতেছে না।

ত্রস্তহস্তে বিশ্বনাথ সেই ভূপতিত বীরের দীর্ঘ দেহ চর্ম্মচ্যুত করিয়া ফেলিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিক্রম সিং একেবারে অজ্ঞান হন নাই। অর্দ্ধজাগ্রতাবস্থায় সকল কথা শুনিতে বুঝিতে পারিতেছিলেন। প্রায় চারি দণ্ডের শুশ্রূষার পর তাঁহার দৌর্ব্বল্য কিছু পরিমাণে দূর হইল। চক্ষু মেলিয়া তিনি বিশ্বনাথের দিকে চাহিলেন। হাসিয়া বলিলেন, "বুড়্‌ঢা বিক্রমের শীকার খেলা দেখ্‌তে এসেছ বুঝি? সেই রাতের কথা মনে পড়ে বিশ্বনাথ? ওঃ, সে কতদিন হলো—কই তুমি ত কিছু বদলাও নি, ঠিক্ তেমনি আছ! আমার কিন্তু সে বল আর নেই। ছয়টা ডাকাত আজ আমায় হারিয়ে দিয়ে গেল।"

বিশ্বনাথ বৃদ্ধের পদধূলি লইয়া বলিল, "আপনি আমার গুরু, আপনাকে কে জয় কর্‌তে পারে? কই আপনার গায়ে ত আঁচড়ও লাগেনি। কিন্তু তারা সব প্রাণের ভয়ে পালিয়েচে।"

বিক্রম স্মিতমুখে কহিলেন, "আমায় তারা মূর্চ্ছিত করে গেছে বটে, কিন্তু

কাপুরুষগুলো আমার এই বালিকা কন্যার তরওয়ালের কাছে দাঁড়াতে পারেনি বিশ্বনাথ! সেই আহ্লাদে আজ আমি নিজের অপমান ভুলে গেছি। আর আমার সেই ভৈরবীমূর্ত্তি তোমরা দেখতে পেতে ত আমার আনন্দ বুঝতে!”

মীরা লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল!

* * * * * * *

বিক্রমসিংহের মুখে বিশ্বনাথ পলায়নপর ডাকাইদের সকল কথা শুনিল। তাঁহার মূর্চ্ছার অবসরে যাহা ঘটিয়াছিল, মীরা তাহা বিবৃত করিল। বিশ্বনাথ ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল, ইচ্ছা তখনই বৈদ্যনাথের অনুসরণ করিয়া তাহার উপযুক্ত শাস্তি বিধান করে। এবং সে জন্য বিক্রমের কাছে বিদায় ভিক্ষা করিল।

ভগবান বলিল,—“বিশু! কোম্পানিবাহাদুর তোমার নামে হুলিয়া করেচে। এ সময়ে তোমার বাপু রাগ একটু সামলাতে হয়। বদে তোমার হাট হদ্দ সব জানে। এখন একটু বুঝে সুজে কাজ করো। কি বলেন সিংহী মশায়?”

বিক্রম সিং এই পরামর্শ অনুমোদন করিয়া কহিলেন—“বিশ্বনাথ, বদের দলের খেলোয়াড় দেখে আজ আমার মনে হয়েচে, বাঙ্গালী লড়ায়ে পটু নয় বলে যে বদনাম আছে, সেটা ডাহা মিছে কথা। তোমার দলে তেমন খেলোয়াড় কত আছে জানিনে, কিন্তু আমার মনে হয়, ইচ্ছা করলে তুমি কোম্পানীকেও একদিন হাত দেখাতে পার। কিন্তু তোমার দলে অধর্ম্ম ঢুকেচে। বদের আজকের ব্যবহার তার প্রমাণ। নারায়ণ তোমার প্রতি বিরূপ না হলে আর এমনটি ঘটে না। কোম্পানীর হুলিয়ার কথা শুনে তোমার জন্য আমার ভাবনা হলো।”

বিশ্বনাথ হাসিয়া বলিল, “জন্ম হলেই মরণ আছে, তাতে আমার ভয় নেই। ভাবনা কেবল এক বুড়ো মার জন্যে। তা মা কালীর যদি সেই ইচ্ছে, আমার তাতে হাত কি সিংহী মশায়। তবে কুকুর বিড়ালের মতন লুকিয়ে লুকিয়ে থাকা, সে আমার কর্ম্ম নয়। আশীর্ব্বাদ করুন, বিশে যেন মানুষের মতন মরতে পারে।”

এই কথার পর বিশ্বনাথ সরলার কথা পাড়িল। বৈদ্যনাথ সরলার সর্ব্বস্ব লইয়া গিয়াছে শুনিয়া বিশ্বনাথের বড় কষ্ট হইতেছিল। সঙ্গে কিছু অর্থ ছিল, ইচ্ছা, সরলাকে দিয়া যায়। কিন্তু স্পষ্ট বলিতে সাহস হইতেছিল না। ভগবান বিশুকে যেমন চিনিত, এমন আর কেহ নহে। সরলা মীরার কাছে নিকটেই

বসিয়া ছিল। হাসিয়া ভগবান তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "মা, আজ আমার মা হয়ে তোমার এই বিপদ গেল। কিন্তু তোমার আর একটি ছেলে। তার ইচ্ছে, যদে তোমার যা নিয়ে গেল, তার কতক ফিরিয়ে দিয়ে যায়। তার পর চাই কি, সবই পাওয়া যেতে পারে। পথে তোমার খরচপত্রের দরকার। ডাকাত ছেলের প্রণামী কিছু নিতে দোষ কি মা?"

সরলা কথা কহিল না, কিন্তু মীরার কানে কানে অসম্মতি জানাইল। মীরা সে কথা বলিলে বিক্রম কহিলেন, "খরচ যা পড়ে, আমি দেব। এর পরে পাঠিয়ে দিস্ মা!" ইহাতেও সরলা সম্মত হইল না। অন্যের অশ্রাব্য স্বরে মীরাকে বলিল, "দিদি! আমার ছেলেদের বল, এখন এই এক বস্ত্রেই আমার শ্বশুরবাড়ী যাওয়া ভাল!" বিশ্বনাথ প্রশংসমান চক্ষে এ কথা শুনিল। বস্ত্রমধ্য হইতে এক লৌহাঙ্গুরীয় বাহির করিয়া বলিল, "মা, এ একটা লোহার আংটী, এ নিতে তোমার কি আপত্তি? যদি কখন বিপদে পড়, এই পাঠিয়ে ছেলেকে মনে করো!"

তার পর বিশ্বনাথ ভগবান সহ বিদায় হইয়া গেল। ক্রমশঃ।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

কলুঙ্গার যুদ্ধ।

(শেষ)

২৪এ নভেম্বর দিল্লী হইতে Battering train আসিয়া উপস্থিত হইল, কালবিলম্ব না করিয়া তাহার পর দিনই ইংরাজ সৈন্য পুনর্ব্বার অগ্রসর হইল। দুর্গ হইতে ৬ শত হস্ত দূরে একটী সমতল স্থানে কামান সংস্থাপন করিয়া শত্রুদুর্গের দিকে ক্রমাগত গোলা বর্ষিত হইতে লাগিল। ২৬এ দেখা গেল যে, দুর্গের সেই অংশটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তখন দুর্গ-আক্রমণের আদেশ প্রদত্ত হইল। এবারেও উভয় পক্ষে ভয়ানক যুদ্ধ চলিল, উভয়ই নির্ভীক এবং শিক্ষিত; একদলের চেষ্টা এই অসভ্য পার্ব্বত্য জাতিকে বিধ্বস্ত ও তাহাদের গিরিদুর্গ সমভূমি করিতে হইবে; অপরের চেষ্টা, প্রাণ যায়, তাহাও স্বীকার, শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দুর্গ রক্ষা করিতে হইবে। এই যুদ্ধে এই দিনও তিন চারি জন ইংরাজ সেনানায়ক কর্ণেল প্রাণত্যাগ করিলেন; অনেক কষ্টে এবং বহুসংখ্যক ইংরেজ সৈন্য হত আহত হওয়ার পর, ইংরেজ সৈন্যের এক অংশ দুর্গতলে উপস্থিত হইল।

কিন্তু দুর্গের যে অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তাহার ভিতর দিয়া দুর্গে প্রবেশ করা অসম্ভব। গিরি-গুহা-দ্বারে গুহাসীন সিংহ অবস্থান করিলে, সেই গুহায় প্রবেশ করা যেমন অসম্ভব, গুর্খাবীরগণের দ্বারা সযত্নে রক্ষিত এই ভগ্নস্থান দিয়া দুর্গ-প্রবেশও ইংরাজ সৈন্যের পক্ষে তদ্রূপ অসম্ভব হইয়া উঠিল। এই সকল গুর্খাবীরের সহিত ইংরেজগণের অনেকক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধ চলিল। গুর্খা অসভ্য হউক, কিন্তু তাহাদের আগ্নেয়াস্ত্রের ক্ষমতা অল্প নহে; ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি পড়িতে লাগিল, প্রতিবারই দশ পনের জন ইংরেজ সৈন্য হত বা আহত হইয়া পড়িতে লাগিল; এবং শীঘ্রই তাহারা বুঝিতে পারিল, এই ভয়ানক স্থানে অগ্রসর হওয়া সহজ নহে, বৃথা প্রাণদানে অস্বীকার করিয়া তাহারা হটিয়া আসিল; মুষ্টিমেয় পার্ব্বত্য গুর্খা একবার নয়—দুই দুই বার শিক্ষিত ইংরেজ সৈন্যকে বিমুখ করিল। ইংরেজের অব্যর্থ-সন্ধান অসভ্য গুর্খার বল ও সাহসের সম্মুখে ব্যর্থ হইয়া গেল; ভারতের ইতিহাসে এরূপ ঘটনা অধিক ঘটে নাই, এবং যাহা ঘটিয়াছে, ইতিহাস-প্রণেতৃগণ তাহারও বড় উল্লেখ করেন না। মানুষ চিত্রকর, তাই সিংহ মানবহস্তে পরাভূতরূপে চিত্রিত হয়, ইহা কোনও বিখ্যাত শ্রদ্ধেয় লেখকের উক্তি;—কিন্তু চিরকালই কি এ নিয়ম থাকিবে? ইহাতে মনুষের বল এবং কৌশল প্রমাণিত হউক, কিন্তু মানুষের মহত্ত্ব প্রমাণিত হয় কি না সন্দেহ।

যুদ্ধ-পিপাসা প্রশমিত হইল না, দুর্গজয়ের আশাও ইংরেজগণ ত্যাগ করিতে পারিলেন না। দুর্গ আক্রমণের জন্য আবার আয়োজন চলিতে লাগিল। ৫৩ সংখ্যক সৈন্যদল পূর্ব্বে দুইবার অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু এবার তাহারা ক্লান্ত ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িল, তাহারা যুদ্ধ-ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে চাহে না, যুদ্ধ-ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া নির্ভীক ভাবে প্রাণত্যাগ করিতেও তাহারা প্রস্তুত, কিন্তু তাহারা বৃথা অগ্রসর হইতে প্রস্তুত নহে।

তিন দিন পরে সমস্ত ইংরেজ সৈন্য একযোগে দুর্গ আক্রমণ করিল; সমস্ত ইংরেজ সৈন্যের প্রতিহিংসা, ক্রোধ এবং তাহাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা অগ্নির ন্যায় তাহাদিগকে দগ্ধ করিবার জন্য, তাহাদিগের বিরুদ্ধে প্রধাবিত হইল। ক্রমাগত গোলাবর্ষণে দুর্গের পাঁচ ছয়টি স্থান ভাঙ্গিয়া গেল। তখন সেই মুষ্টিমেয় দুর্গবাসীগণের দ্বারা দুর্গ রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। বীর বলভদ্র দেখিলেন, আর দুর্গ রক্ষা করা যায় না, এখনি ইংরেজ সৈন্য ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহাদের উপর আসিয়া পড়িবে; যদি মরিতে হয়, তবে বীরের মত মরাই বিধেয়।

ইংরেজ যোদ্ধাগণকে তাহাদের ভুজবীর্য্য দেখাইতে কৃতসংকল্প হইয়া, বীর বলভদ্র হতাবশিষ্ট সত্তর জন সহচর সমভিব্যাহারে, দুর্গ ত্যাগ করিল। সেই সত্তর জন বীর নিষ্কাসিত অসি হস্তে আপনাদের পথ পরিষ্কার করিয়া ইংরেজ সৈন্য-রেখার অভ্যন্তর দিয়া আপনাদের অভীষ্ট স্থানে চলিয়া গেল।

এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। বলভদ্র সিংহের পার্ব্বত্য দুর্গে পানীয় জলের কোনও প্রকার বন্দোবস্ত ছিল না। এক নালাপানি ভিন্ন নিকটে অন্য কোনও নির্ঝরও ছিল না; কিন্তু নালাপাণিতে ইংরেজ সৈন্যের ছাউনি, সেখান হইতে জল আনিয়া তাহা পান করা অসম্ভব। উষ্ণপ্রধান প্রদেশ হইলে হয় ত তাহারা এক দিনও সহ্য করিতে পারিত না, কিন্তু হিমালয়ের ক্রোড়ে শৈত্যের মধ্যে পিপাসার প্রাবল্য অধিক নহে। গুর্খা সৈন্য দল কয়েক দিন জল পান না করিয়াও অতিবাহিত করিয়াছিল, কিন্তু যুদ্ধে তাহারা ক্রমেই ক্লান্ত হইতে লাগিল, পিপাসা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া তাহাদিগকে অধৈর্য্য করিয়া তুলিল, আহারসামগ্রী ফুরাইয়া আসিল, এবং ইংরেজ সৈন্যের অক্লান্ত আক্রমণে তাহাদের বল ক্ষীণতর হইতেছিল। ইহার উপর দুর্গপ্রাচীর ভগ্ন হইল, সুতরাং এখন দুর্গত্যাগ ভিন্ন আর কি উপায় হইতে পারে? তাই তাহারা জীবনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, প্রাণপণ শক্তিতে ইংরেজ সৈন্য ভেদ করিয়া অগ্রসর হইল।

নালাপাণি তাহাদের লক্ষ্যস্থান হইয়াছিল। ইংরেজ সৈন্য কোনক্রমেই তাহাদিগকে প্রতিহত করিতে পারিল না, ইংরেজ সৈন্য-রেখা বিদীর্ণ করিলে, কতকগুলি ইংরেজ সৈন্য তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিল। কিন্তু সেই বীর গুর্খাগণ হিমাচলের প্রিয় সন্তান; তাহারা যে পথে যেরূপ অক্লেশে অথচ দ্রুতগতিতে চলিয়া গেল, শিক্ষিত ইংরেজ সৈন্য তাহাদিগের অনুসরণে কোনও ক্রমেই সফলকাম হইল না। তাহারা প্রাণ ভরিয়া নালাপাণির নির্ম্মল জল পান করিল, এই জল দুর্গ মধ্যে পাইলে তাহাদিগকে এই অবস্থায় কখন এখানে আসিতে হইত না। যে সকল সৈন্য পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা রণজিৎ সিংহের সৈন্যদলে যোগদান করিয়াছিল।

বিজয়ী ইংরেজ সৈন্য, বলভদ্র সিংহের পরিত্যক্ত কলুঙ্গাদুর্গে প্রবেশ করিল। যাহা দেখিল, তাহাতে বিস্মিত হইয়া গেল। দেখিল, দুর্গমধ্যে হত ও আহতের সংখ্যা পঞ্চাশ জনের অধিক হইবে না। এত সামান্যসংখ্যক সহচরের সহায়তায়, বলভদ্র সুশিক্ষিত ইংরেজ সৈন্যকে এতদিন বিফলপ্রযত্ন করিয়াছিলেন, পানীয় জলের অভাব না হইলে দুর্গরক্ষায় তাহারা কৃতকার্য্য হইত না, কে বলিবে?

দুর্গপ্রাচীরের মধ্যে কোনও গৃহাদি ছিল না। উন্মুক্ত শূন্য আকাশ তাহাদের চন্দ্রাতপ এবং বিশাল শালবৃক্ষ তাহাদের পর্ণকুটীরের অভাব বিদূরিত করিতে-ছিল। হিমমণ্ডিত, মুক্ত গিরির অন্তরালে বসিয়া একটি স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছিল। স্বাধীনতার প্রিয় সন্তানবর্গের দুর্ভেদ্য দুর্গ বলিয়া, ইংরেজ সৈন্যগণ লোলুপ দৃষ্টিতে ইহার দিকে চাহিয়াছিলেন। অন্যান্য দুর্গের ন্যায় ইহারও একটা মোহকর আকর্ষণ ছিল, কিন্তু দুর্গবাসীগণের দুর্গত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সেই মোহিনীশক্তিও যেন বিদূরিত হইল। দেখিল, দুর্গে ধনসম্পত্তির নাম মাত্র নাই। আহারদ্রব্য যৎকিঞ্চিৎ পড়িয়া আছে, হত ও আহতগণে দুর্গ পরিপূর্ণ, দুর্গন্ধে তিষ্ঠান কঠিন।

ইংরেজগণ কলুঙ্গাদুর্গ সমভূমি করিয়া ফেলিল, এবং একটি বীরজাতি যেখানে এক দিন স্বাধীনতারক্ষার জন্য প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়াছিল, সে কথাটা যেন পৃথিবী হইতে লুপ্ত করিবার জন্যই প্রকৃতি লতাপল্লবে এই পাষাণময় গিরি-অন্তরাল আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। কলুঙ্গাযুদ্ধ, সাধারণ পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য কোনও ঐতিহাসিক কর্ত্তৃক উজ্জ্বল-ভাষায় বর্ণিত না হইলেও, উদার ইংরেজ লেখক এ বিষয়ে কৃপণতা করেন নাই। দেরাদূনের ইতিহাস-লেখক R. C. Williams B. A., C. S. এই যুদ্ধের উল্লেখকালে নির্ভীক বীর বলভদ্রের প্রশংসা করিয়া উপসংসারে বলিয়াছেন, "such was the conclusion of the defence of Kalunga a feat of arms worthy of the best of chivalry, conducted with a heroism almost sufficient to palliate the disgrace of our own reserves."

জিলেস্পাই সাহেবের মৃতদেহ মিরটে সমাহিত করা হইয়াছিল, সেখানে আজও তাঁহার সমাধিস্তম্ভ আছে। সুদৃশ্য মার্ব্বেল স্তম্ভ এখনও নিম্নলিখিত কথা কয়টি বক্ষে ধারণপূর্ব্বক পর্ব্বতের স্তব্ধ প্রান্তে অক্ষুণ্ণভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে :—

Vellore Cornellis Palinbang, Sir R. R. Gillespie, D. Joejocarta,—*31st October 1814,—Kalunga.*

আর, As a tribute of respect for our gallent Adversary Bulbhudder."—দেরাদূনের জঙ্গলে রিচপানা নদীর তীরে নির্জ্জন প্রদেশে সেই ক্ষুদ্র মনুমেণ্ট। ক্ষুদ্র হইলেও ইহা বীর প্রতিদ্বন্দীর প্রতি প্রদর্শিত প্রকাশ্য সম্মান, এবং যতই সামান্য হউক, বীর ইংরাজ জাতি বীরের সম্মান রক্ষা করিয়া আপনাকে সম্মানিত করিয়াছেন।

এই যুদ্ধের সময় একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহার উল্লেখ করা কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি। কারণ ইহা দ্বারা গুর্খা জাতির চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কথা পাঠকের মনে পরিস্ফুটরূপে উদিত হইতে পারে; যে গুণ প্রাচীন হিন্দু বীরগণের মধ্যে অসাধারণ ছিল না, ভারতে রাজস্থানের ইতিহাস এবং প্রতীচ্য ভূমণ্ডলে গ্রীস ও রোমের ইতিহাসে যে গুণ প্রায় প্রত্যেক বীরের জীবনে পরিত্যক্ত হইয়াছিল, এই অসভ্য গুর্খা জাতির মধ্যেও সেই গুণের অভাব ছিল না;—তাহা বিশ্বস্ততা এবং স্বজাতিপ্রেম।

দ্বিতীয় বার আক্রমণের সময় হঠাৎ একজন গুরখা সৈনিক পুরুষ দুর্গ হইতে বাহির হইয়া ইংরাজ সৈন্যের রেখা অভিমুখে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল; সে বামহস্তে তাহার মুখ আবৃত করিয়া দক্ষিণ হস্তের সঙ্কেতে তাহার প্রতি গুলি বর্ষণ নিষেধ পূর্ব্বক অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া, বিস্মিত ইংরাজ সৈন্য সেই মুহূর্ত্তেই গোলা বর্ষণ বন্ধ করিয়া, তাহার অভিপ্রায় অবগত হইবার জন্য কুতূহলীভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। সেই গুরখা সৈন্য ইংরাজ সৈন্য-শ্রেণীতে উপস্থিত হইলে দেখা গেল, ইংরাজ-নিক্ষিপ্ত গুলিতে তাহার নীচের দন্তপাটী ভাঙ্গিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে, এবং ওষ্ঠদ্বয়েরও অভাব হইয়াছে। মৃত্যুভয়ে তাহার কাতরতা ছিল না, কিন্তু অকর্ম্মণ্য ভাবে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করা মৃত্যু অপেক্ষা সহস্র গুণে অধিক কষ্টকর মনে করিয়া, সে চিকিৎসার জন্য ইংরেজ ডাক্তারের নিকট আসিয়াছিল; ইংরেজ সেনানায়ক তরবারীর এক আঘাতে সেই দন্তহীন যন্ত্রণাটাকে ইহলোকের পরপ্রান্তে প্রেরণ না করিয়া চিকিৎসালয়ে প্রেরণ করিলেন, এবং তাহার সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কিছু দিন চিকিৎসার পর সে আরোগ্য লাভ করিল। তখন তাহাকে ইংরাজ সেনাদলে কাজ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল। কারণ ইংরেজ সেনাপতির বিশ্বাস হইয়াছিল, এত দিন সেবা শুশ্রূষায় তাহার বীর হৃদয় যে পরিমাণে অধিকার করা হইয়াছে, তাহাতে সেই বিশ্বাসী গুরখা সৈনিক পুরুষ ইংরাজের একজন অনুরক্ত ও বিশ্বস্ত অনুচর হইবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সে বিনয়ের সহিত এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল, এবং পুনর্ব্বার ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য স্বীয় সৈন্যদলে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। যদিও সেই অসভ্য পরিস্ফুট ভাবে কোনও কথা বলে নাই, তথাপি সে সংক্ষেপে এমন একটি ভাব প্রকাশ করিয়াছিল যে, যতদিন জান বাঁচিবে, স্বদেশ ও স্বজাতির জন্যই তাহার বন্দুক ও খুকরী ধরিবে, এবং স্বদে-

শের জন্য সম্মুখ যুদ্ধে বীরের ন্যায় পতন ভিন্ন তাহার অন্য উচ্চাশা নাই। তাহার পুণ্যকথা শুনিয়া ঐ গানটা আমার মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল :—

"তোমারই তরে মা সঁপিনু বীণা, তোমারই তরে মা সঁপিনু প্রাণ,
তোমারই তরে এ আঁখি বরষিবে, তোমারই তরে মা গাহিব গান।"

শ্রীজলধর সেন।

মুসলমান কবির বাঙ্গলা কাব্য।

১০০ বৎসর হইল, সৈয়দ আলাওল নামক জনৈক মুসলমান, রোসাঙ্গের (?) রাজা মাগন ঠাকুরের আদেশে, "পদ্মাবতী" নামক বাঙ্গলা কাব্য রচনা করেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর যেমন পরাগল খাঁর আদেশে মহাভারতের অনুবাদ করিয়াছিলেন, শ্রীকরনন্দী যেরূপ ছুটি খাঁর আদেশে অশ্বমেধ পর্ব্বের অনুবাদ রচনা করিয়াছিলেন, সৈয়দ আলাওল সেইরূপ মাগন ঠাকুরের আদেশে পদ্মাবতী প্রণয়ন করেন। কিন্তু এই দুই প্রকার উদ্যমে গুণের পার্থক্য আছে। হিন্দু, হিন্দুশাস্ত্রের অনুবাদ করিবেন, ইহাতে তাঁহার একটা গৌরব কি?—গৌরব উৎসাহদাতা মুসলমানের; প্রশংসা, মুসলমান প্রভুর উদারতার। যদি গ্রন্থের কোনও স্থলে কবিত্বের বিকাশ থাকে, কবি তজ্জন্যই যশের দাবী করিতে পারেন, এই পর্য্যন্ত। কিন্তু মুসলমান, হিন্দুর উপাখ্যান রচনা করিতে চেষ্টিত, আশ্রয়দাতা হিন্দু হউন না কেন, এ স্থলে কবির প্রাপ্যই অধিক, আশ্রয়দাতার প্রাপ্য অল্প। তাই সৈয়দ আলাওলের এই উদ্যম প্রশংসনীয়। যদি এই উদ্যম সফল হইয়া থাকে, তবে প্রশংসার ষোল আনাই কবির। যাঁহারা মীর মসরফ্ হুসেনের 'বিষাদ-সিন্ধুর' উল্লেখ করিয়াই মুসলমানের বাঙ্গালা সাহিত্যে কৃতিত্বের গৌরব করিয়া থাকেন, তাঁহারা দেখিবেন, 'পদ্মাবতীর উপাখ্যানের' নিকট 'বিষাদ-সিন্ধু' যেন পদ্মের নিকট কিংশুক,—অতি অকিঞ্চিৎকর। মুসলমানরচিত পুস্তক বলিয়া 'পদ্মাবতী' অতিরিক্ত আদরের প্রত্যাশী নহে; এই পুস্তক বঙ্গীয় যে কোনও প্রাচীন কবির রচনার নিকট দাঁড়াইয়া গুণের গৌরব করিতে পারে।

পদ্মাবতী, মুসলমান কবির অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। ইহার কৃতিত্ব শুধু কল্পনা-জাত নহে। ইহা সংস্কৃতের শব্দভাণ্ডার হইতে রত্নরাশি আহরণ করিয়া ধনী; সংস্কৃত

কাব্যের উৎকৃষ্ট ভাবরাশি দ্বারা এই পুস্তক সরস ও সুগ্রথিত। কবি যে সব স্থলে পিঙ্গলাচার্য্যের অষ্টমহাগণের * তত্ত্ব বুঝাইতেছেন; কিম্বা তত্ত্ব, বিতত্ত্ব, সুচিরাদি পঞ্চ শব্দের লক্ষণ; খণ্ডিতা, বাসকশয্যা, কলহান্তরিতাদি অষ্ট নায়িকার ভেদ; ষড়ঋতুর বিশেষ বিশেষ ভাব; বিরহের দশ অবস্থার সূক্ষ্ম বিচার এবং জ্যোতিষের গূঢ়তত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেছেন; সে সব স্থলের সম্পূর্ণ অর্থ করিতে আমাদের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মহাশয়েরাও একটুকু গোলে পড়িয়া যান। তাঁহার বর্ণনাগুলি সংস্কৃতের প্রভায় প্রভাময়; হিন্দুর আচার ব্যবহার, বিবাহ, কবি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সে সব পড়িলে, তিনি যে এই সমাজের বাহিরের একজন, এ কথা একবারও মনে হয় না। আমরা যাহা জানি না, আমাদেরই এমন অনেক কথা মুসলমান কবি বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু এই উদার সহানুভূতি সত্বেও, তিনি মুসলমানদিগের অপ্রিয় হইবার কোনও কারণ দেন নাই। পুস্তকের প্রারম্ভে সম্পূর্ণ মুসলমানী ভাবে তিনি ঈশ্বর ও মহম্মদের স্তুতি করিয়াছেন। ঈশ্বরের স্তুতি হইতে কিছু উদ্ধৃত হইল,—

"আপনা প্রচার হেতু সৃজিলে জীবন,
নিজ ভয় দর্শাইতে সৃজিল মরণ।
মিষ্ট রস সৃজিলেক কৃপা অনুরোধ,
তিক্ত কটু কসা সৃজি জানাইল ক্রোধ।
পুষ্পে জন্মাইল মধু গুপ্ত আকার,
মক্ষিকা সৃজিয়া কৈল তাহার প্রচার।"

এই কাব্যে কবিত্বের অভাব নাই। নীলোজ্জ্বল তরুরাজি নীলাকাশে অলক্ষিতে মিশিয়া যায়, এই কাব্যের উজ্জ্বল কবিতারাশিও স্থলে স্থলে দর্শনের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। সেই সব রচনা আধুনিক ভাবুকের ভাবনার ন্যায় সরস ও গাঢ়। প্রাচীন বাঙ্গালা হইতে, বিশেষতঃ চট্টগ্রাম হইতে, আমরা তাহা আশা করি নাই। যথা,—

"কাব্য কথা সকল সুগন্ধি ভরপুর,
দূরেতে নিকট হয় নিকটেতে দূর।
নিকটেতে দূর যেন পুষ্পেতে কলিকা,
দূরেতে নিকট মধু মাঝে পিপীলিকা।
বনখণ্ডে থাকে অলি কমলেতে বশ,
নিকটে থাকিয়া ভেকে না জানায় রস॥ †

---

* লঘু গুরু জানিলে গুণের ভেদ পায়,
তেকারণে লঘু গুরু জানিতে জুয়ায়।
হ্রস্ব ইকার হ্রস্ব উকার, অ' কার সকল,—
এই তিন লঘু আর গুরু যে সকল।
কবিতার চরণের প্রথম তিনাক্ষর,
বিচারিবা কেবা লঘু কেবা গুরুতর।
তিন গুরু হৈলে তারে বলিবে মগণ;
নিধি স্থির বন্ধ প্রাপ্ত হয় ততক্ষণ।
আদ্যে লঘু দুই গুরু অন্তে হয় যার,
তাহারে যগণ বলি বুঝিবে বিচার।
মধ্যে লঘু দুই দিগে দুই গুরু হয়,
সেই সে রগণ হয় জানিও নিশ্চয়॥

† সাধারণ পাঠকের সুবিধার জন্য আমরা উদ্ধৃত পংক্তি কয়েকটির অর্থ দিতেছি। "কবি স্বীয় শক্তি দ্বারা নিকটের বস্তু দূরে ফেলিয়া, পাঠককে দূরের আলেখ্যে মুগ্ধ করিতে পারেন

সৈয়দ আলাওলের বাড়ী ফতেয়াবাদ * পরগণায় জালালপুরে,—তিনি কোন দুর্ঘটনায় পড়িয়া রোসাঙ্গায় আসিয়া অবস্থিতি করেন। এবং মাগন ঠাকুরের আদেশে পদ্মাবতীকাব্যের রচনায় প্রবৃত্ত হন। পদ্মাবতী উপাখ্যানটি, চিতোরের পদ্মিনীর বৃত্তান্ত। আলাউদ্দীন চিতোরের রূপসী রাণীকে হস্তগত করিতে ইচ্ছুক হইয়া যে যুদ্ধানল বা কামানল জ্বালিয়াছিলেন, ইহা তাহারই ইতিহাস। কিন্তু কবি ঠিক ইতিহাসের অনুসরণ করেন নাই। তিনি চিতোর-রাজ ভীমসেনকে রত্নসেন নামে অভিহিত করিয়াছেন, সংগ্রামে চিতোর-রাজের জয় ও আলাউদ্দীনের পরাজয় বর্ণিত হইয়াছে। এরূপ অনেক স্থলেই ঐতিহাসিক তত্ত্বের বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। কিন্তু কাব্য এবং ইতিহাস দুই স্বতন্ত্র জিনিষ। ইহারা পরস্পরের ঋণ গ্রহণ না করিলে, পাঠক কাহাকেও দোষী সাব্যস্ত করিতে পারেন না। ইতিহাস সম্বন্ধে যে ভ্রমের উল্লেখ করিলাম, তাহা ছাড়া, কবি শুকমুখে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, হরপার্ব্বতীকে কাব্যোক্ত ব্যক্তিগণের নিকট আনিয়াছেন। এ সবও কলেজের বালকের নিকট অস্বাভাবিক বোধ হইতে পারে। কিন্তু সেই সব বালক হ্যামলেটের ভূত ও ম্যাকবেথের পেত্নীর বৃত্তান্ত মহাহ্লাদসহকারে পাঠ করিয়া থাকে। তবে দু এক স্থলে কবির কল্পনা লাগামশূন্য ঘোড়ার মত দৌড়াইয়াছে। বিরহিণী রাজকুমারী স্বামীর নিকট স্বীয় দুঃখের বার্ত্তা জানাইতে একটি পক্ষীকে নিযুক্ত করিয়াছেন, কবি বিরহিণীর দুঃখ বুঝাইবেন ঃ—

"দুঃখের সংবাদ লয়ে বিহঙ্গ উড়িল,
সেই দুঃখে জলদ শ্যামলবর্ণ হৈল।
স্ফুলিঙ্গ পড়িল উড়ি চাঁদের উপর,
অন্তরে শ্যামল তহি ভেল শশধর।
উড়িতে নারিল পাখা শূন্যের উপর,
উল্কাপাত হয় হেন বলে তারে নর।
সমুদ্র উপর দিয়া করিল গমন
জলনিধি হৈল তহি পুর্ণিত লবণ।"

এবং তাহাই নিকটবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। বস্তুতঃ; নিকটের বস্তুও সময় সময় অতি দূরবর্ত্তী হইয়া পড়ে, এক সেকেণ্ড পূর্ব্বে যাহা কলি, এক সেকেণ্ড পরে তাহা ফুল,—কলি এবং পুষ্প অতি নিকট, অথচ একবার পুষ্প হইলে পর তাহার আর ফিরিয়া কলি হইবার উপায় নাই। তাই নিকটবর্ত্তী হইয়াও পুষ্প এবং কলি বহুদূরবর্ত্তী। এইরূপে আবার দূরবর্ত্তী সামগ্রীও সময় সময় অতি নিকটবর্ত্তী হয়। মধুমধ্যে পিপীলিকা স্বগণ হইতে বহুদূরে পতিত, অথচ তাহার হৃদয় যাহা চায়, তাহা লাভ করিয়া দূরই তাহার নিকট হইয়াছে; বনে বাস করিলেও জলজ কমলই ভ্রমরের অতি নিকট (প্রিয়) জলে বাস করিয়াও ভেকের নিকট কমল বহুদূরবর্ত্তী।—শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

* আধুনিক ফরিদপুর।—শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

এখন বিরহিণীর কত দুঃখ, দেখুন দেখি!

পদ্মাবতীর পুঁথি এখন যে আকারে আছে, তাহাতে ইহা মৃত্তিকার মূল্যেও বিকাইবার কথা নয়। এই পুস্তক আলাওল কবি পার্শী অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। চট্টগ্রামে এখনও এই প্রথা প্রচলিত আছে, বাঙ্গালা কেতাব পার্শী অক্ষরে লিখিত হইয়া থাকে। এই পার্শী অক্ষরকে বাঙ্গালা করিয়াছেন, চট্টগ্রামবাসী হামিদুল্লা নামক মুসলমান। বাঙ্গালাভাষায় ইঁহার প্রখর পাণ্ডিত্য। সহজ পুস্তক হইলেও ইঁহার হস্তে অনেক বর্ণাশুদ্ধি ও শব্দ-বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী হইত। সুতরাং আলাওল কবির বড় বড় সংস্কৃত শব্দ,—যথা বিধুন্তুদ, ছুছুন্দরী যে হামিদুল্লার হস্তে নিতান্ত বিকৃতরূপ ধারণ করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? হামিদুল্লা এই পুস্তকের কাপি-রাইট খরিদ করিয়া, "সন ১৮৪৭ সালের বিশ আইন অনুসারে রেজেষ্টরি" করিয়াছেন; সুতরাং অন্য কেহ যে শীঘ্র এই পুস্তকখানির উদ্ধার করিবেন, তাহার পথ নাই। আলাওল কবি এই কাব্যে অনেক নূতন ছন্দের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা পুস্তকে সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু সেই সব ছন্দোবদ্ধ কবিতা পার্শী অক্ষর হইতে বাঙ্গালায় আনিতে যাইয়া হামিদুল্লা সব গুলিরই তন্তচ্ছেদ করিয়াছেন। এক ছত্রের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অপর ছত্রে জোড়া লাগিয়া বিকট আকৃতি ধারণ করিয়াছে। আমি দুই জন কাব্যতীর্থ-উপাধিধারী পণ্ডিতের সাহায্যে চেষ্টা করিয়াও সেই তন্তগুলি ঠিক গুটাইয়া উঠিতে পারি নাই।

এখন আমরা আলাওল কবির রচনা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকমণ্ডলীকে উপহার দিব।

পদ্মাবতীর রূপবর্ণনা।

(বয়ঃসন্ধি।)

"আড় আঁখি বঙ্ক দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে হয়,
ক্ষণে ক্ষণে লাজে তনু আসি সঞ্চরয়।
সম্বরয় গীম হরে কটির বসন,
চঞ্চল হইল আঁখি ধৈরয গমন।
চোর রূপে অনঙ্গ অঙ্গেতে উপজয়,
বিরহ বেদনা ক্ষণে ক্ষণে মনে হয়।
অনঙ্গ সঞ্চার অঙ্গে রঙ্গ ভঙ্গ সঙ্গে,
আমোদিত পদ্মগন্ধ পদ্মিনীর অঙ্গে।
নানা পরিমল অঙ্গে করিয়া লেপন,
সহজে ত্যজিল অলি পুষ্পের কানন।
চন্দনের বৃক্ষ তনুপৃষ্ঠে নাগ বেণী,
শেষে আইল রক্ষক ললাটে চন্দ্রমণি।
কামধনু জিনিল ঈষৎ ভুরুভঙ্গে,
কটাক্ষে হরয় প্রাণ নয়ন কুরঙ্গে।
শুক চঞ্চু নাসিকা কমলমুখ চাহে,
পদ্মিনীর মুখ দেখি জগ-মন মোহে।
অভেদ আছয়ে দুই কমলের কলি,
না জানি পরশে কোন্ ভাগ্যবন্ত অলি।
নবীন বয়সী যত রসের সখিনী,
কমল নিকটে যেন শোভে কুমুদিনী।"

পদ্মিনী যখন স্নান করিতে যান, তখন,—

"সরোবর মোহিত কন্যার রূপ হেরি।
পদ দরশন হেতু করয় লহরী॥"

ষড়ঋতু বর্ণনা হইতে,—

"নিদাঘ সময় অতি প্রচণ্ড তপন,
রৌদ্রত্রাসে রহে ছায়া চরণে শরণ।
চন্দন চম্পক মাল্য মলয় পবন,
সতত দম্পতি পাশে ব্যাপৃত মদন।
শীতল গম্ভীর ছায়া সতীপতি সঙ্গে,
করয় বিবিধ কেলি মনোহর রঙ্গে।"

বর্ষাকালে,—

ঘোর শব্দ করিয়া মল্লার রাগ গায়,
দদ্দুরী শিখিনীরব অতি মনে ভায়।
স্বামিসঙ্গে নানারঙ্গে নিশি বসি জাগে,
চমকিলে বিদ্যুৎ, চমকি কণ্ঠে লাগে।
বজ্রপাতে কমলিনী ত্রাসিত হইয়া,
ধরয় পতির গীমে অধিক চাপিয়া।"

দিল্লীশ্বরের কারাধ্যক্ষের রূপবর্ণনা হইতে,—

হাবেসি পুরুষ এক সাহার সেবায়,
বক্র ভুরু ক্রোধমুখ থাকয় সদায়।
উপরের ওষ্ঠ তার নাসিকা উপর,
চিবুক ঢাকিছে পুষ্ট লম্বিত অধর।
কোটর নয়ন যুগ্ম ঘোরে অবিরত,
বিকট সে আস্যে হাস্য নহি কদাচিত।
বক্রকেশ গোপ দাঁড়ি পিঙ্গল বরণ,
শ্যাম অঙ্গে লোমাবলী ভল্লুকলক্ষণ।
নারীকে না বলে প্রিয়া সদায় কিলায়,
ভিক্ষুক দ্বারেতে গেলে দণ্ড লয়ে ধায়।

আলাওল কবির রচনা অনেক স্থলে বৈষ্ণব কবিদিগের কবিতার ন্যায় সরস ও মসৃণ। ইহারা উহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়। যথা,—

ফুটিল কবরী কুসুম মাঝ,
তারকামণ্ডলে জলদ সাজ।
শশিকলা প্রায় সিন্দুর ভালে,
বেড়ি বিধুমুখ অলকজালে।
সুন্দরী কামিনী কাম-বিমোহে,
খঞ্জন গঞ্জন নয়নে চাহে।
মদন ধনুক ভুরু বিভঙ্গে,
অপাঙ্গ ইঙ্গিতে বাণ তরঙ্গে।
নাসা খগপতি নহে সমতুল,
সুরঙ্গ অধর বাঁধুলী ফুল।
দশন মুকুতা বিজলি হাসি,
অমিয়া বরিষে আঁধার নাশি।
উরজ কঠিন হেম কটোর,
হেরি মুনি-মন বিভোর।
হরি করি কুম্ভ কটি নিতম্ব,
রাজহংস জিনি গতি বিলম্ব।
কবি আলাওলে মধু গায়,
মাগন আরতি রহুক সদায়।

স্থলবিশেষে জয়দেবকে মনে পড়ে। জয়দেবেরই কথা, জয়দেবেরই ছন্দ,—কেবল ভাষাটি সংস্কৃত নহে, বাঙ্গালা; কবি হিন্দু নহেন, মুসলমান;—

"বসন্তে নাগরবর নাগরী বিলাসে,
বর বালা দুই ইন্দু, শ্রবে যেন সুধাবিন্দু।
মৃদুমন্দ অধরে ললিত মধুহাসে,
প্রফুল্লিত কুসুম, মধুব্রত ঝঙ্কৃত
হুঙ্কৃত পরভৃত কুঞ্জে রত রাসে,
মলয়া সমীর, সুসৌরভ সুশীতল।
বিলোলিত পতি অতি রস ভাবে,
প্রফুল্লিত বনস্পতি, কুটিল তমাল ক্রম।
মুকুলিত চূতলতা কোরক জলে,
যুবজন হৃদয়, আনন্দে পরিপূরিত।
রঙ্গ মল্লিকা মালতি মালে।

এক শত বৎসর পূর্ব্বে যে কোন হিন্দু কবি এইরূপ রচনা করিলে তাহা আদরের বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিতে হইত। মুসলমান কবি এরূপ উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা লিখিতে পারিতেন, ইহা বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয়।

পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, সংস্কৃতের ছন্দ, শব্দ ও রসের লক্ষণ, কবি উৎকৃষ্টরূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন। ইহা ছাড়া চিকিৎসাশাস্ত্রে ও জ্যোতিষে তাঁহার অধিকার ছিল। তিনি আচার্য্যের ন্যায় পঞ্জিকা দেখিতে পারিতেন। রত্নসেন সিংহল হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন, সেই উপলক্ষে কবি পঞ্জিকা-জ্ঞানের পরিচয় দিতেছেন :—

শুক্র রবি পঞ্চমীতে গমন কঠিন,
শুক্রবারে সিদ্ধি নহে গমন দক্ষিণ।
সোম শনি পূর্ব্বেতে না যায় কদাচন,
উত্তরে মঙ্গল বুধে অশুভ লক্ষণ।
অবশ্য যাইব যদি নাহিক এড়ান,
তাহার ঔষধ কহি শুন বুদ্ধিমান।
শুক্রে পশ্চিমে যাইতে মুখে দিবে রাই,
বৃহস্পতি দক্ষিণে চলিবে গুয়া খাই।
উত্তরেতে মঙ্গলে ধনিয়া মুখে দিবে,
দর্পণ দেখিয়া সোমে পূর্ব্বেতে চলিবে।
বায়ু ভক্ষি শনিবারে পূর্ব্বে চলো সুখে,
রবিবারে পশ্চিমে তাম্বুল দিবে মুখে।
বুধবারে উত্তরে খাইয়া যাবে দধি,
বিচারি কহিল সপ্তবারের ঔষধি।

ইহার পরে যোগিনীচক্রের ব্যাপার ; এটি বড় বৃহৎ পালা। কিছু নমুনা দিতেছি,—

এবে চক্র যোগিনীর কথা শুন সার,
ত্রিস অষ্টদিকে যোগী ফেরে বারে বার।
এক নব ষড়দশ চতুর্ব্বিংশ দিন,
পূরব দক্ষিণ দিকে যোগিনীর চিন।
অষ্টাদশ সপ্তবিংশ তিন একাদশে,
সুনিশ্চিত যোগিনী দক্ষিণদিকে বেশে।

অনেক স্থলেরই কবিত্ব সুন্দর,—আর একটি স্থান উঠাইব।

পদ্মিনীর গোরা ও বাদলের নিকট গমন।

"সখীর বচনে বালা ত্বরিত গমনে,
পদব্রজে গেলো গোরা বদলের স্থানে।
কোন কালে কন্যা নাহি হাটে পদগতি,
পথে পথে রুধিরে তিতিল বসুমতী।
যত সখিগণ দেখি বুকে হানে ঘা,
স্বামী শোকে যায় সতী না নিরখে পা।
কতক্ষণে গেল যদি বাদল মন্দিরে,
শত শত নারী আসি নিলেক কন্যারে।
দুই ভাই দেখি অতি কম্পিত তরাসে,
অশ্বত্থের পত্র যেন প্রবল বাতাসে।
পদরেণু ঝাড়িলেন কেশ খসাইয়া,
দুই দিকে বীজে দুই চামর লইয়া।
বসিতে আসন দিল, না বসিল রাণী ;
মুখে না নিঃসরে বাণী চক্ষে ঝরে পানি।
ভক্তিভাবে শান্তাইয়া পুছে দুইজন,
অনুচিত কার্য্য আজি কিসের কারণ।
কি কারণে উলটা বহিল গঙ্গাপানি,
সেবকের গৃহেতে আসিলা ঠাকুরাণী।
দ্বারে আসি দাসী যদি ডাকিত আমারে,
মস্তক হাঁটিয়া যাইত ঈশ্বরীর দ্বারে।"

এই পুস্তক নানা স্থানেই কবিত্ববিন্দুপাতে উজ্জ্বল। কুড়াইয়া কত দেখাইব! পাঠক স্বীয় কৌতূহলনিবারণের জন্য নিজে পড়িবেন। কিন্তু একটি কথা, প্রাচীন জিনিষের রস আস্বাদ করিতে ধৈর্য্য ও ক্ষমা, এই দুই বৃত্তি চাই।

'পদ্মাবতী' প্রথম শ্রেণীর কাব্য না হইলেও, দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিবে, সন্দেহ নাই। অনুবাদ গ্রন্থগুলি ব্যতীত কবিকঙ্কণ ও ভারতচন্দ্রের পরে আলাওল কবি দাঁড়াইতে পারেন। ইনি ঘনরাম অপেক্ষা নানা বিষয়েই প্রশংসনীয়। রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরের যে স্থান, প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে আলাওল কবির পদ্মাবতীরও সেই স্থান প্রাপ্য। এক বিষয়ে পদ্মা-বতী বিশেষ আদরের যোগ্য। ছন্দ প্রভৃতি নানা জ্ঞানগর্ভ বিষয়ের পর্য্যা-লোচনা ও সংস্কৃতের সঙ্গে এত ঘনিষ্ট সম্পর্ক, ইহার মত খুব অল্পসংখ্যক গ্রন্থেই আছে! মুসলমান লেখকের পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে।

অনেক মুসলমান লেখকই বঙ্গ ভাষায় পদ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন; তাহাতে এত আরবী ও পার্শী শব্দের ছড়াছড়ি যে, তাহা আমাদের একরূপ অভক্ষ্য। এই পদ্মাবতীর উপাখ্যানের টাইটেল-পেজে প্রিণ্টার আবদুর রাউফ যে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছেন, তাহাই দেখুন না কেন ?

"আমি অধীন আবদুর রাউফ জোনাবে সবার। ভুল চুকের দাবী ভাই কেহ না করিবে।
আদাব ও ছালাম মোর হাজার হাজার॥ খোদার তরফ হেতে রেহাই করিবে॥
কম্পজ কেরেট আর ইম্পজ তামাম। তার পর দিবে দোওা মিলিয়া সবাই।
সমাপ্ত করিবে পুঁথি জানিবে এছলাম॥ আল্লা তালা হাসরেতে যেন করেন রেহাই॥"

এই বিকৃত ভাষাক্ষেত্রে এরূপ কাব্য পাইব বলিয়া বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু বঙ্গসাহিত্যসেবায় জীবন সমর্পণ করিয়া সহিষ্ণুতাকে মনের ধর্ম্ম করিয়াছি। যাহা পাই, তাহা ধরিয়া সমগ্র পাঠ করিতেছি। ভরসা কেবল "যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দে'খ তাই, পেলেও পাইতে পার অমূল্য রতন।"

বাং ৯২৭ সালে, মীরমহম্মদ নামক জনৈক মুসলমান, হিন্দুস্থানী ভাষায় পদ্মাবতীর পুঁথি রচনা করেন। তাহাই অবলম্বন করিয়া, আলাওল বঙ্গভাষায় এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন। পরন্তু আরোও জানা যাইতেছে যে, দৌলত কাজি নামক জনৈক মুসলমান লস্কর উজির আসরফের আজ্ঞায়, হিন্দুদের বিষয় লইয়া "চন্দ্রানী" নামক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। সেই পুস্তক কোথায় গিয়াছে, কে বলিবে? মীরমহম্মদের হিন্দুস্থানী ভাষায় লিখিত পদ্মাবতী উপাখ্যানই বা কোথায় গেল? এসিয়াটীক সোসাইটি এই পুস্তক গুলির উদ্ধার করিলে, একটি ভাল কাজ হয়।

আলাওল কবি পদ্মাবতী উপাখ্যান ছাড়া "ভেলুয়া সুন্দরী" নামক বঙ্গ-ভাষায় এক বৃহৎ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তাহা আমার নিকট আছে ও পড়িবার জিনিষ বটে।

এই সব বিবরণ ও কাব্য পর্য্যালোচনা করিতে করিতে মনে হয়, হিন্দু ও মুসলমান ভাই ভাই ছিলেন ও আছেন, এবং থাকাই স্বাভাবিক। দুষ্ট রাজনীতি ভ্রাতৃবিরোধ জন্মাইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু আমাদের সমবেত হইয়া সেই চেষ্টার প্রতিরোধ করা উচিত।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

পদ্মাবতী সম্বন্ধে মন্তব্য।

কবি সৈয়াদ আলাওল কৃত "পদ্মাবতী" কাব্য দীনেশ বাবু আমাকে দেখিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে গ্রন্থের কোন কোন অংশ আমি পাঠ করিয়াছি। ইহা একখানি উৎকৃষ্ট প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্য। কবি যে সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, গ্রন্থ মধ্যে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। মুদ্রিত গ্রন্থের ৮৮ পৃষ্ঠায় একটি সংস্কৃত শ্লোক দৃষ্ট হয়। প্রকাশক শ্রীযুক্ত হামিদুল্লা মহাশয় শ্লোকটিকে জবাই করিয়াছেন। আমরা কয়েক জন পণ্ডিত বন্ধুর সাহায্যে, তাহারা সংশোধন করিয়া, এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম,—

মূর্খাণাং প্রতিমা দেবাঃ বিপ্রদেবো হুতাশনঃ।
যোগিনাং প্রমথা দেবাঃ দেবদেবো নিরঞ্জনঃ॥

দীনেশ বাবু মাগন ঠাকুরকে রোসাঙ্গের রাজা লিখিয়াছেন। কিন্তু বোধ হয়, রসাঙ্গ রাজ্যের প্রকৃত পরিচয় তিনি অবগত নহেন। কারণ, প্রবন্ধের প্রারম্ভে "রোসাঙ্গের" পর প্রশ্নবোধক চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্ব-বঙ্গবাসীগণ প্রাচীনকালে আরাকাণকে রসাঙ্গ বলিত। আমরা বাল্যকালে প্রাচীনদিগের নিকট "রসাঙ্গ" নামটি শ্রবণ করিয়াছি। তদনন্তর ভারতপুরাতত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়া, কর্ণেল উইলফোর্ডের নিকট ইহা বিশেষরূপে জ্ঞাত হই। এই দেশের বাঙ্গালা নাম রসাঙ্গ বা রসাং, এবং মগী নাম রাক্ষিয়াং (সংস্কৃত রক্ষপুর) ইয়োরোপীয়গণ সেই রাক্ষিয়াং হইতে "আরাকান" শব্দের সৃষ্টি করিয়াছেন।

কবি আলাওল বাঙ্গালী, এ জন্য তিনি রসাঙ্গের মগরাজকে বাঙ্গালী হিন্দু রাজার ন্যায় বর্ণনা করিয়াছেন। পাঠকগণ শ্রবণ করুন,—

মাঙ্গের "ম"কার আর ভাগ্যের "গ"কার,
শুভযোগ নক্ষত্র (হইতে) আনিল "নকার"।
এ তিন অক্ষরে নাম মাগন সম্ভবে,
রাখিলেও মহাজনে অতি মনশুভে।
আর এক কথা শুন পণ্ডিত সকল,
কাব্য ছন্দমূল পুস্তক পিঙ্গল।

পিঙ্গলের মধ্যে অষ্টমহাগণ মূল,
তাহাতে "মগন" আদ্য বুঝ কবিকুল।
নিধি স্থির ফলপ্রাপ্তি মগন ভিতর,
মগন মাগন এক আকার অন্তর॥
আকার সংযোগে নাম হইল মাগন,
অনেক মঙ্গল ফল পাইতে কারণ।

কাব্যপ্রকাশক শ্রীযুক্ত হামিদুল্লা যদি "তওয়ারিখে হামিদী" নামক চট্টগ্রামের ইতিহাস-প্রণেতা হন, তাহা হইলে তিনি পারসিভাষায় অনেক সুপণ্ডিত ব্যক্তি। আরবি পারশি ভাষায় সুপণ্ডিত মৃত মহাত্মা ব্লাকমান সাহেব "হুসনি" বংশের ইতিহাস লিখিতে যাইয়া "তওয়ারিখে হামিদী" হইতে অনেক স্থল অনুবাদ করিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার "তওয়ারিখে হামিদী" একখানি উপাদেয় ইতিহাস গ্রন্থ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বাঙ্গালা কিম্বা সংস্কৃত ভাষায় হামিদুল্লা মহাশয়ের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, এ জন্য আলাওল কবির সোনার "পদ্মাবতী" তাঁহার হস্তে পড়িয়া মাটীতে পরিণত হইয়াছে।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

সহযোগী সাহিত্য।

সমাজনীতি।

মালাবারের বিবাহ-প্রথা।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির পশ্চিমাংশে মালাবার প্রদেশ অবস্থিত। এই প্রদেশের ব্রাহ্মণদিগকে 'নাম্বুদিরি' বলে। ইহাঁরা প্রায়শঃ হিন্দুশাস্ত্রানুসারেই চলিয়া থাকেন। কিন্তু এই প্রদেশবাসী নেয়ার ও অপরাপর হিন্দুজাতির মধ্যে 'মরুমক্কাতায়ম্' (Maruma-khatayam) অর্থাৎ ভাগিনেয়াধিকার নামক স্ত্রীস্বত্বমূলক এক বিচিত্র উত্তরাধিকার প্রথা প্রচলিত। সম্প্রতি ইহাদের বিবাহপ্রথার সংস্কার মানসে এক আইনের প্রস্তাব ভারত গবর্মেণ্ট ও ষ্টেট সেক্রেটরী মহোদয়ের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। প্রস্তাবিত বিধির প্রয়োজনীয়তা দেখাইবার নিমিত্ত, বিগত সেপ্টেম্বর মাসের কলিকাতা রিভিউ পত্রে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা উক্ত প্রবন্ধ হইতে মালাবার প্রদেশীয় এই নেয়ার জাতির বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

ভাগিনেয়ের উত্তরাধিকার।

নেয়ার জাতি 'তরওয়াদ্' নামক একান্নবর্ত্তী পরিবারসমূহে বিভক্ত। প্রত্যেক পরিবার এক একজন স্ত্রী ও তাহার সন্তান সন্ততি লইয়া গঠিত। তরওয়াদের সম্পত্তিতে ইহাদের সকলেরই সমান অধিকার। তবে পরিবারের মধ্যে যে পুরুষ সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, পারিবারিক সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে তাহারই কর্ত্তৃত্বাধীন। তরওয়াদভুক্ত বালকবালিকাদিগের ইনিই একমাত্র অভিভাবক। এইরূপ অভিভাবকদিগকে মালাবার প্রদেশে 'কর্ণবান' বলে। এক এক জন কর্ণবানের অধীনে বহুসংখ্যক স্ত্রী পুরুষকে একত্র অবস্থান করিতে দেখা যায়। কিন্তু পরিবারভুক্ত কোনও পুরুষের ঔরসজাত পুত্র বা কন্যাগণ উহাতে স্থান প্রাপ্ত হয় না, তাহাদিগকে মাতার সহিত মাতুলালয়ে অবস্থান করিয়া সেই পরিবারস্থ কর্ণবানের অধীন হইতে হয়। পুত্রকন্যাদিগের পিতৃধনে কিছুমাত্র অধিকার নাই। ইহার কারণ এই যে, নেয়ারদিগের মধ্যে আইনসঙ্গত কোনও বিবাহপ্রথার অস্তিত্ব না থাকাতে, সন্তানগণের পিতৃনিরূপণ করা প্রায়শঃ অতি সুকঠিন; কিন্তু মাতৃনিরূপণে সেরূপ কোনও বিঘ্ন নাই। সম্প্রতি ইহার কতকটা পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে। নেয়ারগণ অনে-

নেয়ার জাতি।

কেই একমাত্র স্ত্রী গ্রহণ পূর্ব্বক স্বতন্ত্রভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাদের একান্ত ইচ্ছা যে, ইহাদের স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তিতে ইহাদের স্ত্রী বা কন্যাদিগেরই অধিকার সংস্থাপিত হয়। এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া গবর্মেণ্টের কোনও কোনও কর্ম্মচারী নেয়ারদিগের উত্তরাধিকার আইনের সংস্কারার্থ গবর্মেণ্টকে অনুরোধ করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে যে কমিসন নিযুক্ত হন, তাঁহারাও এই কথার সমর্থন করেন। কমিসনের পরামর্শানুসারে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজ ব্যবস্থাপকসভায় এক পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত হইলে, মান্দ্রাজ গবর্মেণ্ট উহা বিধিবদ্ধ করিতে সম্মত হইয়া গবর্ণর জেনারলের নিকট পাঠাইয়া দেন। কিন্তু ভারত গবর্মেণ্ট হঠাৎ কোনও হুকুম না দিয়া, এক বৃহত্তর কমিসনের হস্তে উহার ভারার্পণ করেন। উক্ত কমিসন ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আপনাদের রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। এখন ষ্টেট সেক্রেটারী মহোদয় কি করেন, বলা যায় না।

আইন সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। কালিকটের জামরিন্, ব্রাহ্মণবংশীয়েরা ও দেশাচারবদ্ধ ব্যক্তি মাত্রেই ইহাতে ঘোরতর আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, এই প্রথা নেয়ারধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ। বিষ্ণুর অবতার পরশুরাম সমুদ্রগর্ভ হইতে মালাবার প্রদেশ কাড়িয়া লইয়া তাঁহার প্রিয় ব্রাহ্মণ অনুচরদিগের মধ্যে উহার বিভাগ করিয়া দেন। কিন্তু ভবিষ্যৎ বিভাগ নিবারণার্থ তিনি জ্যেষ্ঠাধিকার প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি এই নিয়ম করেন যে, জ্যেষ্ঠ সহোদর ব্যতীত আর কেহই ব্রাহ্মণপত্নী গ্রহণ করিতে পারিবে না। এমন কি, তাহাদের ধর্ম্মানুমত বিবাহই একবারে নিষিদ্ধ। কিন্তু যিনি ভগবানের অবতার, তিনি যে মানুষের পশুপ্রবৃত্তির খবর লইয়া তাহার কোনও বন্দোবস্ত করিবেন না, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। উদারহৃদয় অবতার এক উদার হুকুম জাহির করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যতীত অপরাপর সন্তানেরা, ছাগ মেষ বৃষ প্রভৃতির ন্যায় ব্রাহ্মণেতরজাতীয়া রমণীমণ্ডলীর মধ্যে যথেচ্ছ বিহার বিচরণ করিয়া বেড়াইবে। আর পাছে নারীজাতিসুলভ লজ্জা ও সতীত্ব ভাব কালে বিকশিত হইয়া এই প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করে, সেই ভয়ে দূরদর্শী শাস্ত্রকার একটা অতিরিক্ত শ্লোক রচনা করিয়া তাঁহার পুঁথীর মধ্যে বসাইয়া দিয়াছেন।—মূল শ্লোকটি পাই নাই, এ জন্য দুঃখিত। সুতরাং দুধের পরিবর্ত্তে অনুবাদের ঘোলে পাঠক মহাশয়ের সাধ মিটাইতে বাধ্য হইলাম।

আইনে মতামত।

"আমার অধিকৃত এই দেশে, সর্ব্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে, এমন কি রাজপরিবারের ভিতরেও, যেখানে যত স্ত্রীজাতীয় মনুষ্য আছে, তাহারা যেন কেহ কখনও সতীত্ব ধর্ম্ম প্রতিপালন না করে। ব্রাহ্মণপত্নীর পক্ষে নিয়ম স্বতন্ত্র; তাহাদিগকে কায়মনোবাক্যে পাতিব্রত্য রক্ষা করিতে হইবে। নিম্নজাতীয় সম্বন্ধে সতীত্বের কোনও নিয়ম নাই। আমি এই সত্য সংস্থাপন করিলাম।"

এইরূপে ব্রাহ্মণেতরজাতীয়া স্ত্রীদিগকে ব্রাহ্মণ মহাশয়দিগের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উপায়স্বরূপে জীবনধারণ করিতে হইতেছে। ইহাদের পরিণয় সংস্কার বা সতীত্বের বিধান নাই; সুতরাং ইহাদের সন্তানগণের পিতৃনিরূপণ অসম্ভব। তাই মাতুলাধিকারপ্রথার উৎপত্তি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিবাহ না হউক, কন্যা ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বে, 'তালী বন্ধন' নামক একটা উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে; তালী একটা কণ্ঠাভরণ মাত্র। কোনও কোনও স্থলে কাজটা ব্রাহ্মণ-যুবকের দ্বারা সম্পন্ন হয়; কোথাও বা সমজাতীয় পুরুষের সাহায্য প্রয়োজনীয়। কেহ কেহ এই উৎসবকে রীতিমত বিবাহ-উৎসবের ন্যায় অবলোকন করে। উভয় পক্ষের ঠিকুজী মিলাইয়া বরকন্যা নির্ব্বাচিত হইলে পর, সৌভাগ্যশালী বর মহাশয় কৃপাণ হস্তে সদল বলে যাত্রা করিয়া, পথিমধ্যে কন্যাযাত্রীদিগের সহিত

ব্রাহ্মণের কামপত্নী।

সম্মিলিত হন। তার পর বিবাহসভায় নীত কন্যার পার্শ্বে স্থাপিত হইয়া তাহার গলদেশে তালী বন্ধন করিয়া দেন। এই সময়ে কন্যাকে একটি তীর ও একখানি দর্পণ ধারণ করিয়া থাকিতে হয়। অতঃপর সকলের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া, পতিপত্নী অন্দরমহলের ন্যায় এক গৃহে তিন দিবস যাপন করিবেন। চতুর্থ দিবসে পুষ্করিণী বা নদীর জলে স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিবেন, কন্যার অভিভাবকের গৃহদ্বার রুদ্ধ। তখন উহা ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করিবেন। আর উভয়ে এক পাত্রে আহার করিয়া, একখানি বস্ত্রকে দ্বিখণ্ডিত করিবার ছলে, পরস্পরের সম্পর্কটা চিরদিনের নিমিত্ত বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবেন। ইহার পর নেয়ার যুবতী যে কোনও যুবকের সহিত যথেচ্ছরূপে সম্মিলিত হইতে পারেন। তাহাতে কি মানুষ, কি দেবতা, কাহারও কোনও আপত্তি নাই।

সম্মিলনে স্বাধীনতা।

এই বিচিত্র প্রথা যে কেবল নিম্নশ্রেণীস্থ নেয়ারগণের মধ্যেই নিবদ্ধ, এমন নহে। মালাবার ও কোচিন প্রদেশের উচ্চতর রাজবংশসমূহেও ইহার সম্পূর্ণ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। রাজপুত্র ও রাজসভাসদ সকলেই ব্রাহ্মণের ঔরসজাত। 'নাম্বুদিরি'-দিগের সহিত এইরূপ সম্বন্ধ সংস্থাপন এত অধিক গৌরবের বিষয় বলিয়া পরিগণিত যে, অধিকাংশ রাজপরিবার ইহাদিগকে আপনাপন আলয়ে রাখিয়া চিরদিন প্রতিপালন করিয়া থাকেন। প্রাচীন পদ্ধতির প্রতি ভক্তির আধিক্য বশতঃ, ইহাদের মধ্যে সামাজিক বিবাহ বন্ধন এখন পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে নাই।

বিচিত্র প্রথার বিস্তৃতি।

কিন্তু প্রকৃতি দেবী কোনও প্রকার অত্যাচার চিরদিন নীরবে সহ্য করিতে পারেন না। উন্মার্গপ্রবৃত্তের দণ্ড অবশ্যম্ভাবী। এই নাম্বুদিরি ব্রাহ্মণেরাই ইহার দৃষ্টান্ত। ইহারা সমাজের শীর্ষস্থানীয় হইলেও, কি বাহ্যিক কি মানসিক, সর্ব্ব প্রকার উন্নতির পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। আজীবন আলস্য ও অনাচার বশতঃ ইহারা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি, বর্ত্তমান কুপ্রথার সংস্কার না হইলে, ইহাদের বিলোপ অনিবার্য্য। প্রস্তাবিত আইনের বিরোধী এক জন দেশীয় জজ বলিয়াছেন,—

"The Nambudiri keeper himself very often takes a pride in seeing the woman excelling in her love intrigues, and not unfrequently he makes a trade of her accomplishments."

ইংরাজী-অনভিজ্ঞ পাঠক মার্জ্জনা করিবেন; আমরা ইহার অনুবাদ দিতে পারিলাম না। ইহা শিথিল দাম্পত্যবন্ধনের চরমাবস্থা। পক্ষান্তরে, নাম্বুদিরি সুন্দরীগণকে অতি সাবধানে মুসলমানোচিত সন্দেহের সহিত সর্ব্বদা অন্তঃপুরমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়। কারণ, একমাত্র জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহাধিকার নিবন্ধন, তাঁহাদের অধিকাংশেরই ভাগ্যে বর জুটিয়া উঠে না।

আজকাল অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে একপ্রকার না এক প্রকারের বিবাহপ্রথা ক্রমশঃ প্রবেশলাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। অনেকস্থলে দাম্পত্যবন্ধনকে আজীবনস্থায়ী করিবার চেষ্টা হইতেছে। "অপরাপর দেশে পিতৃগণ নিজ নিজ সন্তানকে যেরূপ স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন, মালাবার-বাসীরা আপনাপন ভাগিনেয়দিগকে সেই চক্ষে দর্শন করে,"—এ কথা এখন আর সকল স্থলে তেমন খাটে না। কেহ কেহ বলেন, বিচারালয়সমূহে এই সকল বিবাহপ্রথার বিধিবদ্ধতা স্বীকৃত হইলে আর নূতন আইন করিবার প্রয়োজন হয় না। রিভিউর লেখক এই মতের বিরোধী। তিনি আইনের স্বপক্ষে কয়েকটি যুক্তি প্রদান করিয়াছেন;—

বিভ্রাট।

(১) গবর্মেণ্ট-নিয়োজিত কমিসনের অধিকাংশ সভ্য বলিয়াছেন যে, এই সকল বিবাহবন্ধন আইন আদালতে টিকিবার অতি অল্পই সম্ভাবনা।

(২) যাঁহারা ধর্ম্মের দিক হইতে ইহাতে আপত্তি করেন, তাঁহাদের বুঝা উচিত, যে স্ত্রীজাতির সতীত্ব রক্ষাই প্রধান ধর্ম্ম।

(৩) কর্ণবানদিগের হস্তে তরওয়াদ-সমূহের ক্রমশঃ ধনক্ষয় ও অবনতি হইয়া আসিতেছে। কর্ণবানেরা যে আপন স্ত্রীপুত্রের ভাবনা না ভাবিয়া নিঃস্বার্থভাবে তরওয়াদের উন্নতি চেষ্টা করিবে, ইহা নিতান্ত প্রকৃতিবিরুদ্ধ। জীব জগতে আপনাপন স্ত্রী পরিবারের প্রতি স্নেহই সর্ব্বাপেক্ষা স্বাভাবিক। সুতরাং, তরওয়াদভুক্ত স্ত্রীপুরুষদিগের সত্বরক্ষার্থ আইন প্রয়োজন।

(৪) শ্রমলব্ধ ধনে ব্যক্তিগত অধিকার না থাকায়, নেয়ারেরা নিতান্ত অলস ও অমিতব্যয়ী হইয়া পড়িতেছে। তরওয়াদের দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। কারণ, যে কাজ সকলেরই, তাহা প্রকৃতপক্ষে কাহারও নহে;—ভাগের মা গঙ্গা পায় না। অপরাপর জাতির সহিত সংঘর্ষে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের (Natural Selection) নিয়মানুসারে, ইহাদের বিলোপ অবশ্যম্ভাবী। আইন পরিবর্ত্তনে বিলম্ব করিলে আর রক্ষা নাই।

(৫) তরওয়াদভুক্ত রমণীকুলের দুর্দ্দশার সীমা নাই। কর্ণবাণের হুকুমমত তাহাদিগকে অনেক সময় স্বামিত্যাগ ও নূতন স্বামী গ্রহণ করিতে হয়। তার উপর সতীনের জ্বালা ত সর্ব্বদা লাগিয়াই আছে। তাহাদের শিক্ষার কোনও উপায় নাই। কর্ণবান এ বিষয়ে উদাসীন, বালকদিগের বিদ্যালাভে অর্থলাভের সম্ভাবনা; বালিকাদিগের শিক্ষায় কেবল অর্থহানি।

উপসংহার। আইনের বলে কোনও জাতি ও সমাজকে উন্নত ও সংস্কৃত করিবার বিজাতীয় রাজার অধিকার আছে কি না, সমাজতত্ত্বদর্শী শাসননীতিজ্ঞেরা তাহার বিচার করিবেন। আমরা কেবল, মানুষ যে আদৌ পশুমাত্র ছিল, এবং এখনও অনেক স্থলে রহিয়াছে, তজ্জন্য পাঠক-বন্ধুবর্গের সমক্ষে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বিদায় লইলাম।

সাহিত্য।

সেকস্‌পীয়র ও রেসিন।

মধ্যে একটা কথা উঠিয়াছিল যে, ফরাসী লেখক পলভারলেন বলিয়াছেন যে, সেকস্‌পীয়রের গ্রন্থ অপেক্ষা রেসিনের গ্রন্থ উৎকৃষ্ট। দুই জন এইরূপ গ্রন্থকারের তুলনায় সমালোচনা করিয়া সহসা একটা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া সহজ নহে, সেই জন্য কথাটার প্রকাশ জন্য আত্মসমর্থনার্থ লেখককে একটা কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছে।—তাহাতে তিনি প্রথমেই বলিতেছেন যে, তিনি অসুস্থ এবং নিকটে কোন পুস্তক নাই বলিয়া, তিনি যাহা লিখিতেছেন, তাহা তাঁহার প্রকৃত হৃদয়ের কথা। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, এইরূপ সমপ্রতিভাসম্পন্ন দুই জন লেখকের মধ্যে এক জনকে তিনি সাহিত্যশিল্পী হিসাবে উচ্চতর স্থান দিতে সক্ষম নহেন। আমরা "ফর্টনাইটলি রিভিউ" হইতে তাঁহার প্রবন্ধের সার সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

এক জন ফরাসীর পক্ষে রেসিনকে অসীম প্রশংসা করায় কিছুই আশ্চর্য্য নাই। বিশেষ রেসিনের আকুলতা এবং আবেগ অন্য কোন গ্রন্থকারের নাই বলিয়াই বোধ হয়। সেকস্‌পীয়রের প্রশংসা সম্যকভাবে ব্যক্ত করাই লেখকের পক্ষে অসম্ভব; তবে সেকস্‌পীয়রে বুদ্ধির

প্রতিভা। গাম্ভীর্য্য অর্থাৎ মানসিক বিকাশই অধিক দৃষ্ট হয়। রমণীচরিত্রবিশ্লেষণে রেসিন সেকস্‌পীয়র অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা প্রকাশিত করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।—তিনি রমণীচরিত্রের অনেক জটিল, দৃষ্টির অগোচর অংশের উপরেও উজ্জ্বল আলোক প্রতিফলিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সেকস্‌পীয়রের স্বর্গীয় প্রতিভা কেবল

আদর্শভাবে রমণীচরিত্র লইয়াই ব্যাপৃত,—লেডী ম্যাকবেথ দুরাকাঙ্ক্ষা, ডেস্‌ডিমোনা সরল-প্রাণা-রমণী এবং ওফিলিয়া একটি মাধুরীর স্বপ্ন। রেসিনের রমণী-চিত্র ইহা হইতে ভিন্ন; তাহাতে বিশ্লেষণক্ষমতা অধিক প্রকাশ পায়। রেসিন স্ত্রীচিত্র আপনার হস্তে রাখেন, আর সেক্‌স্‌পীয়র মনে রাখেন। রেসিনের হৃদয়ে রমণীর স্থান অধিক—মোলেয়ার ভিন্ন আর কেহই রমণীচরিত্র এমন বিশ্লেষণ করিতে পারেন নাই। সেকস্‌পীয়র এবং রেসিন, এতদুভয়ের মধ্যে কাহার প্রতিভা অধিক, সে বিষয়ে তর্কের শেষ হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

সেকস্‌পীয়র জীবনটি সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করিয়াছিলেন, স্বাধীন জীবন যাপন করিয়াছিলেন। তিনি যৌবনে অনেক ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং সে গুলি সবই জানিতেন। তিনি ষ্ট্রাটফোর্ড-অন-এভনে শীকার চুরি কলঙ্কে কলঙ্কিত এবং তাহার পর নানা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন; কাজেই তাঁহার প্রতিভা অভিজ্ঞতার ফল। প্রতিভা এবং পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহার ভাগ্যে প্রভুত ধনলাভ হইয়াছিল, কিন্তু তিনি অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই প্রাণত্যাগ করেন (৫২ বৎসর)। এবং পরিশেষে তিনি আপনার অসংযত জীবনের মধ্যে আপনার গাম্ভীর্য্য এবং প্রকৃত মনুষ্যত্ব পাইয়াছিলেন। সেকস্‌পীয়রে সকলই আতিশয্যময়—তাঁহার সনেট গুলিই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ, এবং তাঁহার উপাসক হুগোও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। আপনাতে এবং অন্যে জীবনপ্রিয়তা তাঁহার বিশেষত্ব—তাহাতেও সেই আতিশয্য-প্রিয়তা দৃষ্ট হয়। এ কথা অস্বীকার করিয়া ফল নাই যে, সেকস্‌পীয়রে স্থানে স্থানে সেই আতিশয্যপ্রিয়তার অন্যায় ব্যবহার ও এবং অপব্যবহারও দৃষ্ট হয়।

সেকস্‌পীয়র।

সেকস্‌পীয়রে একটা কোমলতা এবং পরিচ্ছন্নতা আছে, যাহা তাঁহার নিজস্ব। একমাত্র "As You Like it" পড়িলেই তাহা বুঝা যায়। তাঁহার জীবনের প্রথমাঙ্ক অসংযত আতিশয্যময়—রচনাতেও সেই ছায়া নিপতিত। কিন্তু সে সময়কার রচনায় আতিশয্য কেমন ছিল, এবং সেকস্‌পীয়রের অসাধারণ প্রতিভাবলে তাহা কখনই বিরক্তিকর হইয়া দাঁড়ায় না। গম্ভীর বা সাধারণ, যে ভাবেই রচিত হয়, তাহা পুনরুক্ত হয় না—ভিন্নরূপে দর্শন দেয় মাত্র। কখন তাহা কূলপ্লাবী প্রবল প্রবাহ, কখন বা কলগীতিময় সূর্য্যকিরণ-উদ্ভাষিণী স্রোতস্বতী; রূপ ভিন্ন ভিন্ন।

হুগো বলিয়াছেন, রেসিন স্বর্গীয় অমানুষী কিছু। সেকস্‌পীয়রে বিরক্তিকর একঘেয়েমি নাই, রেসিনে আছে কি? তাঁহার রচনায় এই বৈচিত্র্যহীনতা আছে বলিলে সেই মহাকবির প্রতি অবিচার করা হয়। তাঁহার রচনায় একটা স্থির প্রণালী, সৌন্দর্য্য এবং একই প্রকার খাঁটি সরল ভাষা দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহা কখনও বিরক্তিকর একঘেয়ে নহে। রচনাপ্রণালী লইয়া অবশ্যই রেসিনকে কিছু বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। সেকস্‌পীয়রের খুঁটিনাটি দর্শন কখনই বিরক্তিকর নহে, তাঁহার একঘেয়ে ভাব পাঠককে আশ্চর্য্য করে এবং দর্শন, কিম্বদন্তী বা উপাখ্যান যেরূপ আনন্দদায়ক, তাহাও সেইরূপ। সেকস্‌পীয়রের নাটকের গল্পাংশের একটা বিশেষ মূল্য আছে, এবং তিনি তাহা আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। আর প্রথম নেপোলিয়ান রেসিনের বিয়োগান্ত নাটক সম্বন্ধে সত্যই বলিয়াছেন যে, সেগুলি ফরাসী সাহিত্যে একটা চরম সীমার দৃষ্টান্ত। আবেগ এইখানে সর্ব্বাপেক্ষা সমধিকভাবে দৃষ্ট হয়। ইহাতে কিম্বদন্তী প্রভৃতির প্রয়োজনাভাব।

রেসিন।

রেসিনের রচনাপ্রণালী ঠিক তাঁহার উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে, কেহ কেহ বলেন যে, রেসিনের ভাষা, একটুও ঘুরে ফিরে না, ঠিক কার্য্যস্থানে উপনীত হয়, ইহাতে রচনা একটু নীরস হইয়া আসে। কিন্তু রেসিনের ভাষা ও শব্দবিন্যাসমাধুরী ফরাসী সাহিত্যে অতুল্য,

তাহাতে যে ত্রুটী যথেষ্ট সংশোধিত হইয়াছে। দুই শতাব্দীরও অধিক পূর্ব্বে সেই কঠোর আদর্শ হইতে রচিত রেসিনের গ্রন্থ হইতে যে আজও সাহিত্যে শত আনন্দ উপভোগ করা যায়, সে জন্য বোধ হয়, অন্য সকল ফরাসী নাটককার অপেক্ষা ফরাসীদিগের কৃতজ্ঞতার ঋণ রেসিনের নিকট অধিক। রেসিনের রচনার রমণীয় গাম্ভীর্য্য তাঁহার বিশেষত্ব। সেক্‌স্‌পীয়র সর্ব্বদা এই গাম্ভীর্য্যের অনুসরণে সক্ষম নহেন—স্থানে স্থানে আবশ্যক সময়ে তাঁহার মনোরমা প্রতিভা তাঁহাকে সেই গাম্ভীর্য্যের মধ্যে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে, কিন্তু তাঁহার নাটকে শেষভাগ ভিন্ন এই গাম্ভীর্য্য দৃষ্ট হয় না। তাই বলিয়াছি, ইহা রেসিনের বিশেষত্ব। রেসিন কেবলমাত্র নাটককার নহেন—তিনি এবং হুগো, এই দুই জনই ফরাসী গীতিকবিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

হাস্যরসে সেক্‌সপীয়রের ক্ষমতা অত্যন্ত অধিক, এ কথা স্বীকার করিতে হয়। যখন ইচ্ছা করিয়াছেন, তখনই তিনি হাস্যরসের পূর্ণ অবতার; ইংরাজী এবং ফরাসী, উভয় ধরণের

হাস্যরস।

রসিকাতেই তাঁহার অসীম অসাধারণ অধিকার দৃষ্ট হয়। রেসিনও হাস্যরসে অনভিজ্ঞ নহেন। তিনিও স্থানে স্থানে ইহা তীব্রভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন; কিন্তু হাস্যরসের পূর্ণবিকাশে সেক্‌সপীয়র তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এখন এই দুই গ্রন্থকারের শিক্ষাপ্রণালী ও তত্তৎ জীবনে তাহার প্রভাব আলোচনা করিব।

রেসিন রাজকর্ম্মচারীর পুত্র, তাঁহার সুশিক্ষালাভের সুবিধা ছিল, এবং আর্থিক অবস্থাও মন্দ ছিল না। তিনি ধর্ম্মসম্বন্ধে কঠোর পবিত্রভাবে প্রতিপালিত এবং মহানগরী প্যারীসে

শিক্ষা।

শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন, এবং রাজপারিষদ হইয়া সেই সময়েই সাহিত্যসেবাজনিত কষ্টের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। এ দিকে সেক্‌সপীয়র শীকার চৌরবৃত্তির অপবাদে কলঙ্কিত, তিনি নাট্যশালায় সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং কসাইয়ের সন্তান বলিয়া নাকি পঞ্চদশ বৎসর বয়সে গোহত্যা গৌরবজনক বলিয়া মনে করিতেন!!

সেক্‌স্‌পীয়র ভদ্রসমাজে শিক্ষিত হয়েন নাই, তিনি যোগেযাগে পড়িতে পারিতেন, এবং কষ্টেসৃষ্টে লিখিতে পারিতেন। তিনি উপকথা প্রভৃতিই কেবল প্রথম বয়সে পাঠ করিয়াছিলেন, এবং পাঠ করিয়া শিক্ষা অপেক্ষা শুনিয়া শিক্ষাই তাঁহার অধিক হইয়াছিল। প্রাচীন সাহিত্যের সহিত তাঁহার পরিচয় যৎসামান্য এবং তাহাও অনুবাদের সাহায্যে, পক্ষান্তরে রেসিন একবার একখানি গ্রীক উপন্যাস মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কাজেই সেক্‌স্‌পীয়র সমাজের সর্ব্বনিম্ন সোপান হইতে, সর্ব্বত্র হইতে হাস্যরস সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, এবং আপনার বিশেষ কৌশলের সহিত সে গুলি ব্যক্ত করিতেন। রেসিনের হাস্যে একটা ভদ্রোচিত সংযম এবং শুচিতা সর্ব্বদাই দৃষ্ট হয়। উভয়ের জীবন ও রচনায় তুলনা করিলে সহজেই মনে হয় যে, উভয়ের প্রতিভার গতি কতকটা একদিকেই ছিল, এবং উভয়ের শিক্ষা ও সংসর্গই প্রতিভার উপর চিরস্থায়ী প্রভাব সংস্থাপন করিয়াছিল। ফরাসী, ইংরাজী, জার্ম্মাণ প্রভৃতি সকল য়ুরোপীয় ভাষায়, এই দুই জনের সম্বন্ধেই যথেষ্ট মতামত প্রকাশিত হইয়াছে। ভলটেয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া এত সমালোচক এত কথা বলিয়াছেন যে, আর বড় কিছু অব্যক্ত আছে বলিয়া মনে হয় না।

জীবনে যাহাই হউক, মরণের পর সেক্‌স্‌পীয়রের যশের যেরূপ পূর্ণগ্রাস হইয়াছিল,—সাহিত্যাকাশে বোধ হয় কোনও কবির যশের ভাগ্যে সেরূপ দুর্দ্দশা হয় নাই। তিনি

জীবনে ও মরণে।

রঙ্গোপজীবী এবং কতকটা ভাঁড়-গোছের বলিয়া জানিত ছিলেন, এখন তাঁহার জীবনচরিতকারগণ তাঁহার স্বভাবকে নীতির আলোকের সম্মুখে ফেলিয়া এমন করিয়া বিশ্লেষণ করিলেন যে, তাহাতে সত্যসত্যই মৃত ব্যক্তিকে

প্রতি দয়ার উদ্রেক হয়। বর্ত্তমান সময়ে এতগার এজেন গোড়ে লইয়া কতকটা সেইরূপ হই-য়াছে। তাহার পর, পিউরিট্যান-প্রবৃত্তি-পরায়ণ কঠোর, 'কমন্ ওয়েলথের' কালে সুকুমার শিল্পের অবস্থা বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; 'কমন্ ওয়েলথের' পরও তিনি অজানিত রহিলেন, অথচ কত হীন তুচ্ছ আনন্দান্ত ও বিষাদান্ত পুস্তক যশোলাভ করিতে লাগিল। তাহার পর, শেষ জর্জের রাজত্বকালে বায়রণ, সেলী, কিট্‌স্, মুর প্রভৃতির চেষ্টায়, আবার সেক্‌সপীয়রের ভাগ্যে উপযুক্ত যশোলাভ ঘটিয়াছিল। বাস্তবিক, সেক্‌সপীয়রের প্রতি সম্মান সহসা ফিরিয়া আসে নাই; তাঁহার নাটক অভিনয়ের সময় গ্যারিক তাহা নিজে সংশোধন করিয়া লইতেন, এবং সময় সময় একেবারে এক আধটি দৃশ্যই বাদ দিতেন। ফরাসীতে সেক্‌সপীয়রের অনুবাদে চরিত্র সকলের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। লেটুরনুরের অনুবাদে সত্য সত্যই ভাল অনুবাদ করিবার চেষ্টা দৃষ্ট হয়, কিন্তু ভলটেয়ার বলিয়াছেন যে, অনুবাদকের মানসিক শক্তির অভাব, এবং সেক্‌সপীয়র "মদ্যপায়ী বর্ব্বর"। ডুমা, মরিস, হুগো প্রভৃতির উৎকৃষ্ট অনুবাদ সকল প্রকাশিত হইবার পরে, ফরাসী সাহিত্যে সেক্‌সপীয়রের প্রকৃত সম্মান লাভ হইয়াছিল। এখন ফরাসী সাহিত্যে তাঁহার নাম সুপরিচিত, এবং তাঁহার রচনার অনু-করণে রচিত বা তাঁহার রচনার প্রভাব হইতে সমুৎপন্ন গ্রন্থ, প্রতি বৎসর ফরাসী সাহিত্যের কলেবর বৃদ্ধি করিতেছে।

রেসিনের কথা স্বতন্ত্র—জীবিত অবস্থাতেই তাঁহার রচনাপ্রকাশের সফলতা বুঝা গিয়া-ছিল, এবং তিনি গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। সকলেই তাঁহার রচনার আদর করিত; রমণী-রাও তাঁহার রচনার প্রশংসা করিতেন। কৃতজ্ঞ ভক্তিময় প্রিয়জনের মধ্যে, সম্মানিত অপ-মানে (!) তিনি প্রাণত্যাগ করেন। এবং মনে হয় যে, তাঁহার মরণের সময়ই তাঁহার প্রকৃত জয়ের সময়—বিপক্ষের সমালোচনা তাঁহার বহুব্যাপ্ত বিপুল যশকে স্পর্শও করিতে পারে নাই। মৃত্যুর পরে এই দুই শতাব্দীর অধিক কাল ধরিয়া তিনি অতুলনীয় যশোভোগ করিতে-ছেন; ফ্রান্সের কথা ছাড়িয়া দিলেও, ইংলণ্ডে তাঁহার যশ অপ্রত্যাশিত অধিক, অসীম; জার্ম্মেনিতে গেটে, শিলার প্রভৃতি তাঁহার রচনা অনুবাদ করিয়াছেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে এক জন অপরিণতবয়স্ক লেখক তাঁহার গৌরবহানি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু পরিণত বয়সে তিনি আপনার ধৃষ্টতা বুঝিয়া লজ্জিত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান শতাব্দীর সর্ব্বপ্রধান লেখকগণ, সাহিত্যসমালোচকগণ, শিল্পসমালোচকগণ এবং কবিগণ, একবাক্যে রেসিনের প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার গৌরব কালস্রোতকে তুচ্ছ করিয়া এত বিপ্লব পরিবর্ত্তনের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ মহিমায় প্রজ্বলিত। রেসিনের জন্মস্থানে বহুকাল পূর্ব্বে তাঁহার একটি প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু প্যারীনগরী রাজনীতি প্রভৃতি লইয়া বড়ই ব্যস্ত; সেখানে Theatre Francaisএ ভিন্ন রেসিনের প্রতিমূর্ত্তি নাই। এ ত্রুটি সংশোধিত হওয়া প্রার্থনীয়, পূর্ব্বে লিস্‌টার-উদ্যানের অবস্থা বড়ই শোচনীয় ছিল, সেখানে সেই বিশুষ্ক তৃণভূমি এবং মূর্ত্তিহীন অশ্বের প্রতিকৃতি, কেবলমাত্র হাস্যোদ্দীপক ছিল; কিন্তু বহুকাল পরে ইংলণ্ড সেখানে একটি মনোরম উদ্যান রচনা করিয়া, তাহার মধ্যে আপনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ও উপযুক্ততম পুত্রের প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়াছে, ইহা সুখের বিষয়। ইংলণ্ড বিদেশীয় মহাত্মাদিগের সম্মান করিতে কখন কুণ্ঠিত নহে; তবে রেসিনের প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপন না করায় তাহাকে কোনও দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু প্যারীর এত অপবাদ সত্ত্বেও, সেখানে সেক্‌সপীয়রের একটি প্রতিমূর্ত্তি ও মিলটনের নামে একটি রাস্তা আছে—প্যারীর প্রশংসা করিতে হয়।

বিবিধ।

রুসিয়ার সম্রাট।

জন্ম ও মৃত্যু জগতের নিয়ম। বারিবিম্বকে জলবিম্বের মত মানবজীবন গঠিত হইতেছে ও সেই জলেই আপন সমাধিশয়ন রচনা করিতেছে। জগতে প্রতিদিন শত শত মানব মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতেছে, কিন্তু এক এক জন মরণের ঘনান্ধকারে প্রবেশ করিবার সময় জগতের উপরে অন্ধকার ছড়াইয়া যায়। সে সৌভাগ্য সকলের সুলভ নহে। কিন্তু যাহাদিগের সুবিধা থাকে, তাহারাও সকলে সে সুবিধার সদ্ব্যবহার করিতে সমর্থ হয় না; সেই জন্য, এইরূপ সৌভাগ্যবান পুরুষ আরও দুর্লভ। অল্প দিন হইল, বিশাল রুশিয়ার বক্ষে লিভেডিয়ার প্রাসাদে এইরূপ এক ভাগ্যবান পুরুষের জীবন শেষ হইয়াছে। রুসিয়ার সম্রাট তৃতীয় আলেকজান্দারের জন্য সভ্যদেশবাসী সকলেই দুঃখিত। আমরা "রিভিউ অফ রিভিউস্" পত্র হইতে তাঁহার সম্বন্ধীয় কতকগুলি বিষয় সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

সমগ্র রুসিয়ার সম্রাটের মৃত্যুসংবাদে, সমগ্র সভ্যদেশ যেরূপ আলোড়িত হইয়াছে, সেরূপ বহুদিন হয় নাই। দুই মাস পূর্ব্বে য়ুরোপে তাঁহার মত বলশালী বড় কেহ ছিল না। আর আজ ধরণীর স্নেহময় অঙ্কে ক্ষমতাহীন জড়ের মত সেই মহাপুরুষ মরণের মহাস্বপ্নে অভিভূত। উপযুক্ত ধৈর্য্য এবং গম্ভীরতামণ্ডিত হইয়া সম্রাট একাকী মানবের শেষ আবাসে প্রতিগমন করিয়াছেন। বিশাল সাম্রাজ্য, অতুল ঐশ্বর্য্য, অনন্ত উদ্বেগ, অসীম কর্ত্তব্য, সকলই স্বপ্নের মত মিলাইয়া গিয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্বদিবসেও তিনি শয্যা ত্যাগ করিয়া যথাসম্ভব কার্য্যনির্ব্বাহ করিয়াছেন, এবং স্নেহময় বাক্যে সকলকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন। তাহার পর আপনার অন্তিম শয্যায় শয়ন করিয়াছেন। কয় জন তাঁহার মত মরিতে জানে? তাঁহার মৃত্যুতে জগতের কত ক্ষতি হইয়াছে, তাহা জগৎ এখন বুঝিতে পারিবে, পূর্ব্বে পারে নাই। দেখিতে দেখিতে একটা ইন্দ্রপাত হইয়া গেল।

(পার্শ্বটীকা: সম্রাট।)

কার্লাইল এইরূপ আর এক মৃত্যুশয্যার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন; কিন্তু সম্রাটের এই চিত্রের জন্য জগৎকে দুই শতাব্দী অপেক্ষা করিতে হয় নাই, আমরা এখনই তাহা পাইয়াছি। সত্যের অপলাপ করিয়া, সম্রাটের মিথ্যা কুৎসা রটনা করা, আট বৎসর পূর্ব্বে সাময়িক সাহিত্যে ফ্যাশান ছিল। পশ্চিম য়ুরোপ সেই স্থির শান্তিপ্রিয় সম্রাটকে অর্দ্ধবর্ব্বর সংগ্রামপ্রিয় বলিত, সেই সংযমী মহাপুরুষকে সুরাসক্ত, দুর্ব্বল, বর্ব্বর এবং মানব নামের অযোগ্য করিয়া চিত্রিত করিত। কিন্তু এখন স্রোত ফিরিয়াছে; সকলেই স্বীকার করিতেছে যে, আলেকজান্দারের মৃত্যুতে য়ুরোপে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান জীবনের অভিনয় শেষ হইয়াছে। য়ুরোপের শান্তিবিধাতা আর নাই।

(পার্শ্বটীকা: মৃত্যুশয্যা।)

লেখক বলিতেছেন যে, আজ তিনি গর্ব্ব করিতে পারেন যে, তিনিই প্রথম সম্রাটের সম্বন্ধীয় সত্য স্বদেশীয়দিগকে অবগত করাইয়াছিলেন। সম্রাট তাঁহাকে স্বীয় রাজনৈতিক বাসনার কথা সরলভাবে খুলিয়া বলিয়াছিলেন। তিনি কথাবার্ত্তায় ধীর ও চাপা ছিলেন; কিন্তু তিনি সকল কথা, সকল ভাব, বেশ গুছাইয়া বুঝাইতে পারিতেন। তিনি যাহা বুঝিতে না পারিতেন সরলভাবে তাহা স্বীকার করিতেন; মিথ্যার ভান করিতেন না। মিষ্টার গ্লাডষ্টোনের পর কে ইংলণ্ডের উদারনৈতিক দলের চালক হইবেন, সে চিন্তা সর্ব্বদাই তাঁহার মনে ছিল। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে লেখকের সহিত সাক্ষাতের সময় তাঁহার মত ছিল যে,—ডিভনসায়রের বর্ত্তমান ডিউকই সে পদের উপযুক্ততম ব্যক্তি।

(পার্শ্বটীকা: ব্যক্তিগত।)

বাস্তবিক সম্রাটের ও তাঁহার চরিত্রে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। তিনি সংগ্রামপ্রিয় ছিলেন না, পরন্তু সংগ্রাম তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, নরশোণিতে তাঁহার রাজত্বকাল কলঙ্কিত না হয়, সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। বিংশতি লক্ষ সশস্ত্র সেনার অধীশ্বর আলেকজান্দারের সাম্রাজ্যে তিনি কখন অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা শুনেন নাই। তিনি ঈশ্বরে দৃঢ়বিশ্বাসবান্ ছিলেন, সৃষ্টির অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় রহস্যভেদে তিনি বলিতেন, "ঈশ্বর ভালই জানেন। আমার পক্ষে আজ যদি সব শেষ হয়, তাহাতেও দুঃখের কারণ নাই।" একবার এক হত্যাকারীর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার পর তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি প্রস্তুত আছি। যেমন করিয়া হউক, আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করিব।" যদি তাঁহার সমাধিস্তম্ভের উপর কিছু লিখিবার আবশ্যক হয়, তবে এইটুকু লিখিলেই যথেষ্ট হইবে।

সম্রাটের পারিবারিক জীবন অতিশয় সুখময় ছিল, তাঁহার পত্নীপ্রেম, সন্তানস্নেহ অসাধারণ। অতিরিক্ত সন্তানবাৎসল্যই তাঁহার শেষ পীড়ার কারণ। পুত্র জর্জের শারীরিক দুর্ব্বলতার জন্য সম্রাট ও সাম্রাজ্ঞী সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন। একদিন শিকারে জর্জ একটা পাখী গুলি করেন, তৃণমণ্ডিত ভূমির উপর গতপ্রাণ বিহঙ্গম ঘুরিয়া আসিয়া পড়িল; রাজপুত্র বুঝিতে পারিলেন না যে, সেখানে জলাভূমি চোরাবালী পূর্ণ, পক্ষী আনিতে গিয়া তিনি সেই মৃত্তিকাভ্যন্তরে ডুবিতে লাগিলেন। চীৎকার শব্দে আসিয়া পিতা দেখিলেন, পুত্র আগ্রীব নিমজ্জিত; দৈত্যের মত বলীয়ান পিতা পুত্রকে তুলিলেন, কিন্তু উভয়েই তখন জলসিক্ত। পিতা পুত্রে প্রাসাদে আসিলেন—পুত্রের জ্বর ও পিতার সর্দ্দিবোধ হইল। স্পালার বৃহৎ প্রাসাদে এক প্রান্তে পুত্রের শয্যাগৃহ ও মধ্যভাগে পিতার শয্যাগৃহ। রাত্রিতে পিতা পুত্রকে দেখিতে যাইতে চাহিলেন—সাম্রাজ্ঞী বলিলেন, তাহাতে তাঁহার স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা। পত্নীকে অসন্তুষ্ট করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না, সম্রাট শয়ন করিয়া নিদ্রার ভান করিলেন। পত্নী চলিয়া গেলে, তিনি সেই শয়নপরিচ্ছদে পুত্রকে দেখিতে গেলেন। ফলে হইল যে, পুত্রকে উদ্ধার করিতে যাইয়া যে সর্দ্দি হইয়াছিল, তাহা গুরুতর হইয়া উঠিল, এবং তাহাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ।

পীড়া।

মৃত্যুর কিছু দিবস পূর্ব্বে, সম্রাট ইংলণ্ডের সমরসজ্জা হ্রাস করিবার প্রস্তাবে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। য়ুরোপে এখন সমর নাই, অথচ সমরসজ্জারও বিরাম নাই। এই সশস্ত্র স্থিরতা বড় ভীষণ; এই যে প্রত্যেক দেশে ক্রমাগত বারুদের স্তূপ প্রস্তুত হইতেছে, কবে এতটুকু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আসিয়া পড়িবে, আর ভীষণ উৎক্ষেপে লোককোলাহলময় মহাদেশ মহাশ্মশানে পরিণত হইবে। য়ুরোপের শান্তিরক্ষক আলেকজান্দার বলিয়াছিলেন যে, এখন প্রাচ্য ভূখণ্ডে সমর চলিতেছে, ইহার পরে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যাইবে। কিন্তু অসীম ক্ষমতাবলে মরণ রাজনৈতিক কর্ণধারকে চিরশান্তি দিয়াছে। এখন নূতন সম্রাট ইচ্ছাসত্ত্বেও সহজে একা হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না।

আলেকজান্দারের নিকট য়ুরোপের কৃতজ্ঞতার ঋণ সহজশোধ্য নহে। সে দিন তাঁহার অসুস্থতার সময় মন্ত্রীবর লর্ড রোজবেরি যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতেই ইহা উপলব্ধ হইবে। তিনি বলিয়াছেন যে, সকলেরই চিন্তার বিষয়। এখন আলেকজান্দারের অতীতকালে রুষিয়ার সহিত অনেক বিষয়ে গুরুতর মতভেদ হইয়াছে সত্য, কিন্তু বর্ত্তমান সম্রাটের নিকট য়ুরোপের কৃতজ্ঞতার ঋণ অসাধারণ। রুষিয়ার কথা ছাড়িয়া বিদেশীয় সম্পর্কে দেখিলে সম্রাটের জীবনের উপাস্য কেবল সত্য ও শান্তি। তিনি সিজার বা নেপোলিয়ন নহেন সত্য, কিন্তু যদি সংগ্রাম ও শান্তি সমতুল্য হয়, তবে ইতিহাসে তাঁহার স্থান সিজার বা নেপোলিয়নের নিম্নে নহে। তিনি য়ুরোপের শান্তিরক্ষা করিয়াছেন,

ইংলণ্ডের কৃতজ্ঞতা।

তিনি কখনও অসত্য ও প্রতারণা ক্ষমা করিতেন না। বিগত ২৪ বৎসর যে য়ুরোপে শান্তি আছে, তাহা অনেকটা তাঁহারই প্রাসাদাৎ। তাঁহার মৃত্যু হইলে, জগতের শান্তিরক্ষার সর্ব্বপ্রধান স্থিরতা যাইবে।

য়ুরোপের শান্তিরক্ষক আলেকজান্দার অনন্ত শান্তির রাজ্যে গমন করিয়াছেন, এখন য়ুরোপ ও এসিয়া নূতনের রাজ্যে আসিয়া পড়িল। নব সম্রাটের সম্বন্ধে বড় কিছু জানা যায় নাই। তবে তিনি নাকি বল অপেক্ষা দুর্ব্বলতাই প্রকাশ করিয়াছেন, এবং শুনা যায়, যে, নৈতিক চরিত্র ও শারীরিক বলের পক্ষে অনিষ্টকর অভ্যাসও তাঁহার ছিল। বাল্যকালে তিনি বুদ্ধিমান ও চালাক ছিলেন, মিষ্টার গ্ল্যাডষ্টোন এইরূপ বলিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস কতকটা দ্বিতীয় আলেকজান্দারের মত। বাল্যকালে এক দিন বাইবেল পড়িতে পড়িতে বালক নিকোলাস ধর্ম্মপ্রচারক ও শাসনকর্ত্তাদিগের হস্তে খৃষ্ট অত্যাচরিত হইয়াছিলেন বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন; শিক্ষক রাজপুত্রকে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন খৃষ্ট যদি যেরুজালেমের ন্যায় রুসিয়ার রাজপথে ধর্ম্ম প্রচার করিতেন, তবে পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া কারাগারে প্রেরিত হইতেন।

নব সম্রাট অল্প দিন হইল, ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। তিনি এসিয়া-পরিভ্রমণের সময় এদেশেও আসিয়াছিলেন; কিন্তু রুসিয়ার রাজপরিবার সমস্ত সাধারণ লোকের মধ্যে থাকিয়াও এত দূরে থাকেন যে, তাঁহার ভ্রমণের সঙ্গীরা তাহার পর আর তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তার অধিকার প্রাপ্ত হয়েন নাই। এখন জগতের ভবিষ্যৎ অনেক পরিমাণে রাজকুমারী এলিকসের উপর নির্ভর করিতেছে। তিনি সম্রাটের উপর যেরূপ প্রভাব সংস্থাপন করিতে পারিবেন ফল সেইরূপ হইবার সম্ভাবনা।

ইংলণ্ড ও রুসিয়ার মধ্যে যে সখ্যভাব দৃষ্ট হইতেছে, তাহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক, এবং নব সম্রাট পিতার ন্যায় য়ুরোপের শান্তি রক্ষা করুন। যেন শান্তিচ্ছায়াস্নিগ্ধ রাজত্বে নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া সংগ্রামের সংহারক ভেরীনিনাদ শ্রুত না হয়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

সাধনা।—পৌষ। "বিচারক" একটি গল্প। এই গল্পটির রচনাপ্রণালী ও বলিবার ভঙ্গী অতি চমৎকার। ক্ষীরোদা একজন হতভাগিনী; বিধবা; যৌবনের প্রারম্ভে এক যুবকের প্রলোভনে পড়িয়া গৃহত্যাগ করে। "অনেক অবস্থান্তরের পর অবশেষে গতযৌবনা ক্ষীরোদা যে পুরুষের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিল সেও যখন তাহাকে জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া গেল তখন অন্ন জুটিবার জন্য দ্বিতীয় আশ্রয় অন্বেষণের চেষ্টা করিতে তাহার অত্যন্ত ধিক্কার বোধ হইল। * * * যে দিন প্রাতঃকালে জাগিয়া উঠিয়া দেখিল তাহার প্রণয়ী পূর্ব্ব রাত্রে তাহার সমস্ত অলঙ্কার ও অর্থ অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে,—বাড়ী ভাড়া দিবে এমন সম্বল নাই, তিন বৎসরের শিশুপুত্রটিকে দুধ আনিয়া খাওয়াইবে এমন সঙ্গতি নাই—* * * তখন সে ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভূমিতে লুটাইয়া বারংবার কঠিন মেঝের উপর মাথা খুঁড়িতে লাগিল,—সমস্ত দিন অনাহারে মুমূর্ষুর মত পড়িয়া রহিল। এই সময় "এক জন পুরাতন প্রণয়ী আসিয়া 'ক্ষীরো' 'ক্ষীরো' শব্দে দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল। ক্ষীরোদা অকস্মাৎ দ্বার খুলিয়া ঝাঁটা হস্তে বাঘিনীর মত গর্জ্জন করিয়া ছুটিয়া আসিল,—রসপিপাসু যুবকটি অনতিবিলম্বে পলায়নের পথ অবলম্বন করিল। ছেলেটা ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদিয়া

কাঁদিয়া খাটের নীচে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সেই গোলমালে জাগিয়া উঠিয়া অন্ধকারের মধ্য হইতে ভয়কাতর কণ্ঠে মা মা করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন ক্ষীরোদা সেই ক্রন্দমান শিশুকে প্রাণপণে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া নিকটবর্ত্তী কূপের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল।" তার পর প্রতিবেশীরা শব্দ শুনিয়া কূপের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল,—এবং ক্ষীরোদাকে যখন তুলিল, তখন তিন বৎসরের শিশুটি ঐহিক যাতনার অতীত হইয়া গিয়াছে। ক্ষীরোদা হাসপাতালে গিয়া আরোগ্য লাভ করিল,—এবং যথাবিধি বিচারালয়ে সমর্পিত হইল। জজ মোহিতমোহন দত্ত। ষ্ট্যাটুটারী সিভিলিয়ান। তাঁহার কঠিন বিচারে ক্ষীরোদার ফাঁসীর হুকুম হইল। উকিলেরা ক্ষীরোদার পক্ষে দয়া ভিক্ষা করিলেন,—কিন্তু মোহিত বাবু "তাহাকে তিলমাত্র দয়ার পাত্রী বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না।" এই স্থলে লেখক,—মোহিত বাবুর পূর্ব্ব ইতিহাস বর্ণিত করিয়া, কেন তিনি দয়া করিতে পারিলেন না,—তাহার কারণ সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। সংক্ষেপে, মোহিত বাবু যৌবনে চরিত্র রক্ষা করিতে পারেন নাই,—তৎসূত্রে স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার আন্তরিক অবিশ্বাস। কুলত্যাগিনীর কঠোর শাস্তি না হইলে "সমাজপিঞ্জরে একটি কুলনারীও অবশিষ্ট থাকিবে না"—এই প্রকার তাঁহার মনের ভাব। মোহিত বাবু যৌবনে একটি বালবিধবাকে গৃহত্যাগ করাইয়া পরিশেষে বর্জ্জন করিয়াছিলেন, লেখক এই স্থলে বিস্তৃত ভাবে সেই ঘটনাটির বর্ণনা করিয়াছেন। যাহা হউক,—বিচারক মোহিত বাবু ক্ষীরোদার দণ্ডবিধান করিবার পর এক দিন জেল পরিদর্শনে গিয়াছিলেন,—তথায় দেখেন, "ক্ষীরোদা প্রহরীর সহিত ভারী ঝগড়া বাধাইয়াছে।" জজ বাবুকে দেখিয়া ক্ষীরোদা বলিয়া উঠিল,—"ওগো জজ বাবু, দোহাই তোমার, উহাকে বল আমার আংটি ফিরাইয়া দেয়।" জজ মোহিত বাবু প্রহরীর নিকট হইতে আংটি চাহিয়া লইলেন—"তিনি হটাৎ যেন জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে লইলেন এমনই চমকিয়া উঠিলেন। আংটির একদিকে হাতির দাঁতের উপর তেলের রঙ্গে আঁকা একটি গুম্ফশ্মশ্রুশোভিত যুবকের অতি ক্ষুদ্র ছবি বসানো আছে, এবং অপর দিকে সোনার গায়ে খোদা রহিয়াছে—বিনোদচন্দ্র। তখন মোহিত আংটি হইতে মুখ তুলিয়া একবার ক্ষীরোদার মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিলেন। চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বেকার আর একটি অশ্রুসজল প্রীতিসুকোমল সলাজ শঙ্কিত মুখ মনে পড়িল; সে মুখের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। মোহিত আর একবার সোনার আংটিটির দিকে চাহিলেন এবং তাহার পরে যখন ধীরে ধীরে মুখ তুলিলেন, তখন তাঁহার সম্মুখে কলঙ্কিনী পতিতা রমণী একটি ক্ষুদ্র স্বর্ণাঙ্গুরীয়কের উজ্জ্বল প্রভায় স্বর্ণময়ী দেবী প্রতিমার ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।" পাঠকবর্গকে আর বলিয়া দিতে হইবে না,—এইখানেই গল্পটির সমাপ্তি। একটি ছোট গল্প কেন,—এই আখ্যানবস্তুকে লেখক একটি বড় উপন্যাসে পরিণত করিতে পারিতেন। ক্ষুদ্র আকারে এই গল্পের সকল উদ্দেশ্য, সমস্ত সৌন্দর্য্য, পূর্ণবিকশিত হইবার অবসর পায় নাই,—ক্ষুদ্র গল্পের প্রয়োজনে ও আয়তনে তাহার উপযোগিতা ও সম্ভাবনাই ছিল না। যেখানে লেখক মোহিতমোহনের সঙ্গে একটি বিধবা কুলবালার গৃহত্যাগের বর্ণনা করিয়াছেন,—গল্পটির উপসংহারভাগের সহিত সেই স্থলটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে; অথচ লেখক তাহা অবান্তরভাবে নিজে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন মাত্র।—কেবল নিজের কথায় তাহার একটা বিবরণ না দিয়া,—ঘটনাটিকে স্বতন্ত্র প্রাধান্য দিয়া, ঘটনার কালে রাখিয়া, আর একটু বিশেষত্ব দিলে,—গল্পের পরবর্ত্তী অংশ আরো উজ্জ্বল হইত, মনে করি। লেখক পাপপুরী হইতে ক্ষীরোদাকে সংগ্রহ করিয়াছেন বটে,—কিন্তু পাপের আনুষঙ্গিক ঘৃণাজনক ব্যাপার গুলি বর্জ্জন করিয়া, তাহাকে এমন সাবধানে পাঠকবর্গের সম্মুখে আনিয়াছেন যে, ক্ষীরোদার দুঃখে হৃদয় গলে। তাহার ঘোরতর নিরাশা,—তাহার দারুণ অবসাদ, তাহার পাপের পরিণাম, পাঠকের সহানুভূতির উদ্রেক করে,—কিন্তু পাপ অনেক দূরে থাকে। এই গল্পে যে একটি সমুচিত সংযম ও সুরুচিপ্রিয়তার নিদর্শন আছে, তাহা বাস্তবিকই অনুকরণের যোগ্য। বাস্তব চিত্র যথাযথ অঙ্কিত করিবার জন্য যাঁহারা হাল ছাড়াইয়া পাপের অস্থি কঙ্কাল ও পূতি-

যতক্ষণ প্রেতদেহের চিত্র দেখান,—তাহারা বীভৎস রসের সঞ্চার করেন মাত্র। তাহাতে উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে কণ্টক পড়ে,—পরন্তু কুরুচির চিত্রে অভীষ্ট আদর্শ আবৃত হইয়া যায়। লেখক কারাগারের জীবনের বাস্তব ফটো তুলিয়াছেন,—কিন্তু তাহার ব্যবচ্ছেদ করিয়া পাঠককে বিব্রত করেন নাই। যাঁহারা বাস্তবচিত্রাঙ্কনের ছলে দেশে কুরুচির বীজ বপন করেন,—তাঁহারা "বিচারক" গল্পে, বাস্তবের সংযত ও সুসঙ্গত চিত্ররচনার দৃষ্টান্ত পাইবেন।" পরিশেষে একটি কথা,—বর্ত্তমান সময়ে ষ্টাচুটারী সিভিলিয়ানের সংখ্যা অতি অল্প,—এবং বাঙ্গালী পাঠকেরা 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' দিতে প্রায় কখনও কুণ্ঠিত নহেন। এ অবস্থায়, মোহিতমোহনকে ষ্টাচুটারী সিভিলিয়ান না করিলেই ভাল ছিল। "আগ্রা" এক জন ফরাসী ভ্রমণকারীর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে অনুবাদিত। "নূতন অবতার" একটি রহস্যরচনা। এতখানি পরিশ্রমের উদ্দেশ্য যদি কেবল বিন্দুমাত্র হাস্যরসের অবতারণা মনে করা যায়, তাহা হইলে রচনাটি সফল হইয়াছে বলিতে হইবে। "মহারাষ্ট্রীয় ভাষা" প্রবন্ধটি পাঠযোগ্য ও সুন্দর হইয়াছে; বর্ত্তমান প্রবন্ধে লেখক অনেকগুলি বাঙ্গালা শব্দের মহারাষ্ট্র প্রতিবাক্য সঙ্কলিত করিয়াছেন। তাহাদের সম্যক আলোচনা ও বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রয়োগ করিবার চেষ্টা আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। "সঙ্গীতের গঠনরীতি" প্রবন্ধে লেখক বর্ত্তমান বঙ্গসঙ্গীতের প্রণালীবিষয়ে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ও সংশোধনের প্রস্তাব করিয়াছেন। "সঞ্জীবচন্দ্র" একটি সমালোচনা। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু স্বর্গীয় সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "সঞ্জীবনী সুধা" নামক পুস্তকখানির প্রথমে সঞ্জীবের প্রতিভার যে সমালোচনা করিয়াছেন, "সাধনার" লেখক বর্ত্তমান প্রবন্ধে অনেক স্থলে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। এক্ষণে মান্যবর চন্দ্রনাথ বাবু কি বলেন, দেখা যাউক। প্রবন্ধের মধ্যে এই অংশই বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য।

ভারতী।—অগ্রহায়ণ। এবারকার ভারতীর বড় দুরবস্থা। দশটি প্রবন্ধের মধ্যে শ্রীযুক্ত শ্রীপতিচরণ রায়ের "উদ্ভিজ্জাণু—ব্যাক্টিরিয়া" ও শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়ের "বিশ্ব" এই দুইটি মাত্র বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য।

সমীরণ।—অগ্রহায়ণ। "নক্সা—জরীর জুতা" এবারকার সমীরণে প্রকাশিত হইয়াছে।—কিন্তু যিনি "নক্সা" আঁকিয়াছিলেন,—তিনি আর ইহলোকে নাই। আমাদের পরম সুহৃৎ ক্ষেত্রনাথ গুপ্ত,—সম্প্রতি, জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। সেই সমবেদনাপূর্ণ, উদার হৃদয় সেই সরল প্রফুল্ল প্রকৃতি,—সেই স্বাধীন তেজস্বী ভাব, যে একবার অনুভব করিয়াছে, সেই মুগ্ধ হইয়াছে। ক্ষেত্রনাথ সাহিত্যসংসারেও নিতান্ত অপরিচিত নন,—"সমীরণের" পাঠকেরা তাঁহার সাহিত্যশক্তির পরিচয় পাইয়াছেন। এই "জরীর জুতা" নক্সায় "গৌরী" গল্পে, ক্ষেত্রনাথের সাহিত্যশক্তির পরিচয় আছে। এই শক্তি পরিণত হইলে,—হায় আমরা আশা করিয়াছিলাম,—বাঙ্গালাভাষা উপকৃত হইবে। ক্ষেত্রনাথের সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণশক্তি ছিল,—ভাষার বৈচিত্র্য ছিল, সর্ব্বোপরি, তাঁহার হৃদয় ছিল, এবং সহৃদয়তা ও আন্তরিকতা তাঁহার রচনা অনুপ্রাণিত করিত। কিন্তু হায় কাল! কে জানিত, তুমি এত শীঘ্র ক্ষেত্রনাথকে অপহরণ করিবে। আশা ও উৎসাহের অংশভাগী সহৃদয় বন্ধুর বিয়োগ, বড় অসহ্য। সাধারণের সহিত তাহার সম্বন্ধ অতি অল্প,—এবং ক্ষেত্রনাথের সংক্ষিপ্ত কিন্তু উজ্জ্বল সাহিত্য-জীবন,—যাহার সহিত পাঠকগণের সম্পর্ক,—তাহার সম্যক্ সমালোচনায় এক্ষণে আমরা অক্ষম। তাঁহার আত্মা নির্বৃতি লাভ করুক,—ভগবান তাঁহার শোকাচ্ছন্ন পরিবারে শান্তি দিন।

সরস্বতী।

বঙ্গদেশে সরস্বতী দেবীর পূজামহোৎসব সম্পন্ন হইয়া গেল। সরস্বতী সাহিত্য-সেবকের নিত্য-উপাস্য দেবতা। সাহিত্য-রসিকেরা সেই উপাস্য দেবতার ইতিহাসপর্য্যালোচনায় আনন্দলাভ করিবেন বিবেচনায়, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিতে অগ্রসর হইয়েছি।

দেবতার আবার ইতিহাস কি?—আছে; দেবতারও ইতিহাস আছে। মনুষ্যের উন্নতির সহিত মনুষ্যের উপাস্য দেবতারও উন্নতি, অবনতির সহিত অবনতি হইয়া থাকে। সরস্বতীদেবীরও তদ্রূপ ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাস উন্নতির ইতিহাস কি অবনতির ইতিহাস, আমরা তাহার বিচার করিব না। পাঠকদের উপর তাহার বিচারের ভার রহিল। আমরা ইতিহাস লিখিয়াই ক্ষান্ত থাকিব।

সরস্বতী অতি প্রাচীন দেবতা। ভারতে আর্য্য-উপনিবেশ-সংস্থাপনের পূর্ব্বেও সরস্বতী দেবতা বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু আজকাল যেমন তাঁহার প্রতিমা গঠিত হয়, পূর্ব্বকালে তেমন প্রতিমা নির্ম্মিত হইত না। এক্ষণে সরস্বতী একটি বীণাপাণি স্ত্রীর মূর্ত্তিতে আমাদের চর্ম্মচক্ষের সমক্ষে উপস্থিত হয়েন। কিন্তু পূর্ব্বকালে তাঁহার তাদৃশী মূর্ত্তি কল্পিত হইত না।

সরস্বতী সম্বন্ধে এক্ষণে একটি কুৎসিত উপাখ্যান সৃষ্ট হইয়াছে। তিনি যাঁহার কন্যা, তাঁহারই পত্নী। যে হতভাগ্য কবির কল্পনায় এই হতশ্রী আখ্যায়িকার জন্ম, সুরুচি ব্যক্তিগণ তাহাকে তিরস্কার না করিয়া থাকিতে পারেন না।

গণিকাগৃহে আজকাল সরস্বতীপূজার বড় ধুম। সরস্বতীকে কেহ কেহ বিশেষতঃ কলাবিদ্যার দেবতা বলিয়া মনে করেন। প্রাচীন সরস্বতী তাদৃশী ছিলেন না।

ভদ্রলোকের গৃহেও এক্ষণে যে সরস্বতীর প্রতিমা নির্ম্মিত হয়, পুষ্পাঞ্জলি দিবার সময় তাঁহার শোভনীয় বক্ষঃস্থলের উল্লেখ করিয়া পূজা করা হয়। ইহাতে সরস্বতীদেবীর মনে কি ভাবের উদ্রেক হয়, তাহা তিনিই জানেন।

জয়দেব, বিদ্যাপতি ও ভারতচন্দ্রের দেশে, সরস্বতীর এই পরিণাম ঘটিয়াছে।

প্রাচীন সরস্বতীকে হাতে গড়া হইত না, মন্দিরে বা মণ্ডপে বসান হইত

না, এবং তিনি একটি রমণীয় কলাবিদ্যাবিশারদ অপ্সরাঃ বলিয়াও উপাসকের পুষ্পাঞ্জলি পাইতেন না। বলিতে কি, প্রাচীন সরস্বতীর কোনও মূর্ত্তিই ছিল না।

এক্ষণে যে সকল বৈদিক শব্দ অপ্রচলিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—তন্মধ্যে "সরস্" একটি। সরস্ শব্দের আদিম অর্থ জ্যোতিঃ; এবং তজ্জন্য সূর্য্যের একটি বৈদিক নাম "সরস্বান্"। সরস্বতী,—অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়ী দেবতা।

এই জ্যোতির্ম্ময়ী দেবতার অপর নাম "বাগ্‌দেবী"। এ স্থলে 'বাক্' অর্থেও সাধারণ বাক্যমাত্র বুঝিলে ভ্রম হইবে। যাহা বেদাত্মিকা বাক্, তাহাই এই বাক্‌শব্দের অভিধেয়। বাক্‌দেবী—অর্থাৎ, বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

ঋষিরা সকল পদার্থেরই, বিশেষতঃ সর্ব্বপ্রকার উৎকৃষ্ট শ্রীসম্পন্ন বিস্ময়কর পদার্থমাত্রেরই অধিদেবতা কল্পনা করিতেন। অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম 'অগ্নি', বায়ুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম 'বায়ু', সূর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম 'সূর্য্য', এইরূপ। তদ্রূপ বেদবাক্যরূপ উৎকৃষ্ট বাক্যরাশিরও এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পিত হইয়াছিল,—এবং তাহা একটি অদ্ভুত জ্যোতিঃস্বরূপ বলিয়া তাঁহার 'সরস্বতী' বা জ্যোতির্ম্ময়ী, এই নাম রক্ষিত হইয়াছিল।

এই নাম কল্পিত হইবার পরে, আর্য্যেরা যৎকালে ব্রহ্মাবর্ত্ত নামক জনপদে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, তৎকালে তথাকার এক নদীবিশেষেরও 'সরস্বতী' এই নাম সংরক্ষিত হইয়াছিল। এই জনপদে অঙ্গিরা ও অথর্ব্বা নামক ঋষিগণ, এবং মনু ও দধীচ প্রভৃতি আদিম প্রজাপতিগণ, সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে "যজ্ঞ" নামক উপাসনাপ্রণালীর প্রচার করেন। বেদবাক্য দ্বারা যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত, এবং বেদবাক্যের অপর নাম 'ব্রহ্ম' বলিয়া, এই জনপদ পরবর্ত্তী সময়ে 'ব্রহ্মাবর্ত্ত' বলিয়া বিখ্যাত হয়। ব্রহ্মাবর্ত্তের এক দিকে তৎকালে একটি সাগরগামিনী গভীর নদী প্রবাহিত ছিল। সেই নদীর তীরেই যাজ্ঞিক ঋষিদের গ্রাম ও আবাসস্থান ছিল। তথায় তাঁহারা সংবৎসরকাল স্থায়ী 'সত্র' নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। সম্বৎসর তথায় বেদধ্বনি হইত বলিয়া, তাহা যেন বাগ্‌দেবীর বাসস্থান বলিয়া প্রতীত হইত, এবং কালক্রমে তাহাও 'সরস্বতী' এই নাম প্রাপ্ত হইল।

জ্যোতিঃস্বরূপিণী বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এইরূপে এক নদীবিশেষেরও অধিষ্ঠাত্রী দেবতাতে পরিণত হইলেন। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দার সময়ে সরস্বতী বলিলে বাগ্‌দেবীকেও বুঝাইত, এবং নদীবিশেষের অধিষ্ঠাত্রীকেও বুঝাইত। মধুচ্ছন্দা সরস্বতী বিষয়ে যে একটি মন্ত্র রচনা করেন,—তাহা অতি

কৌশলে রচিত হইয়াছিল ;—তাহার এক পক্ষে বাগ্দেবীকেও বুঝায়, অপর পক্ষে সরস্বতী নদীর অধিষ্ঠাত্রীকেও বুঝায়। সেই মন্ত্রটি এই :—

পাবকানঃ সরস্বতী	চোদয়িত্রী সূনৃতানাম্	মহো অর্ণঃ সরস্বতী
বাজেভির্বাজিনীবতী।	চেতন্তী সুমতীনাম্।	প্রচেতয়তি কেতুনা।
যজ্ঞং বষ্টু ধিয়া বসুঃ॥	যজ্ঞং দধে সরস্বতী॥	ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি॥

নদীপক্ষে ইহার অর্থ এই :—

"পবিত্রতোয়া (১) ধনাঢ্যজনপদবেষ্টিতা (২) যজ্ঞময়তীরশালিনী (৩) সরস্বতী দেবী আমাদের যজ্ঞ কামনা করুন। মনোহর বেদবাক্য সকলের প্রেরণকর্ত্রী, সুন্দর স্তুতির উদ্বোধনকারিণী, (৪) সরস্বতী যজ্ঞকে ধারণ করিয়াছিলেন (৫)। তিনি আপন স্রোতোরূপ পতাকা দ্বারা মহার্ণবকে প্রকাশ করেন ; তিনি সমুদায় যজ্ঞক্রিয়া শোভাময় করেন।"

বাগ্দেবীর পক্ষে ইহার অর্থ এই :—

"যিনি মনুষ্যের হৃদয়কে পবিত্র ও নির্ম্মল করেন, যিনি যজ্ঞশালিনী এবং অন্নদাত্রী, সেই সরস্বতী দেবী আমাদের যজ্ঞ কামনা করুন। তিনি সুন্দর ও সত্য বাক্যের প্রেরণকর্ত্রী, তিনি সুবুদ্ধির উদ্বোধনকারিণী—তিনি যজ্ঞের ধারণকর্ত্রী। তিনি মহাসমুদ্রের ন্যায় অসীম পরমাত্মার চিহ্নের দ্বারা প্রকাশ করেন ; তিনি সমুদয় নরনারীর হৃদয়ে জ্যোতিঃ সঞ্চারিত করেন।"

যিনি বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ইহা অপেক্ষা তাঁহার আর মনোহর স্তুতি কি হইতে পারে ?—তিনি "পাবকা,"—আমাদের হৃদয়ের কামক্রোধাদিরূপ মল তিনি দূর করেন। তিনি আমাদের হৃদয়মন্দিরকে ঈশ্বরের অধিষ্ঠানের যোগ্য করেন। তিনি যজ্ঞশালিনী ;—তিনি যজ্ঞকার্য্য দ্বারা বেষ্টিতা। তিনি অন্নদাত্রী,—কেন না, তাঁহার প্রসাদে মনুষ্যেরা দেবতার উপাসনা করিয়া দেবতার অনুগ্রহে অন্নলাভ করে বলিয়া ঋষিরা বিশ্বাস করিতেন। মনুষ্যের হৃদয়ের সুচিন্তা—মনুষ্যের জিহ্বায় মনোহর সত্য বাক্য—সরস্বতীরই কার্য্য। সুচিন্তা

---

(১) মূল—"পাবকাঃ।"

(২) মূল—"বাজেভিঃ।" বাজেভিঃ অন্নৈঃ উপলক্ষিতা ইত্যর্থঃ।

(৩) মূল—"বাজিনীবতী।"

(৪) মূল—"সুমতীনাম্।" এখানে মতি শব্দের অর্থ স্তুতি।

(৫) মূল—"যজ্ঞং দধে।" অর্থাৎ, সরস্বতীতীরেই প্রথমে আর্য্যবর্ত্তে যজ্ঞপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

ও সত্যবাক্য বেদানুশীলনের ফল। সে কালে যজ্ঞই প্রধান সৎকর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত ছিল। সুস্বাদু অন্নপানের দ্বারা জীবের তৃপ্তিসাধন করা, যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত। আজিও ভাষা কথায় 'যগ্যি' বা 'যজ্ঞ' বলিলে, বৃহৎ ভোজ বুঝায়। যজ্ঞ-শব্দে সৎকর্ম্ম বুঝিলে, বেদই সৎকর্ম্মের মূলাধার; কেন না, বেদে ঈশ্বরের প্রীতিকামনা করিয়া সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠানের উপদেশ দেয়। আর বেদ হইতে আমরা মহাসমুদ্রের (১) ন্যায় অনন্ত পরমাত্মা কি,—তাহা বুঝিয়া থাকি; কিরূপে,—'কেতুনা', চিহ্নের দ্বারা। সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিকৌশলের চিহ্ন আমাদের চারি দিকে জাজ্বল্যমান। সেই সকল চিহ্নের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বেদ বলেন, দেখ, এই বিস্ময়কর সংসার,—এক বিস্ময়কর বিশ্বকর্ম্মার সৃষ্টি না হইয়া যায় না! এইরূপে সরস্বতী স্বাভাবিক অজ্ঞান-তিমিরে সমাচ্ছন্ন মনুষ্য-হৃদয়ে এক স্বর্গীয় জ্যোতির সঞ্চার করিয়া দেন।

সংস্কৃতে 'বাক্' স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ; তাই তাহার অধিষ্ঠাত্রী স্ত্রী হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে আদিম সরস্বতী স্ত্রীও নহেন, পুরুষও নহেন; তিনি এক অদ্ভুত জ্যোতিঃ মাত্র। যেমন সূর্য্যের আলোকে বৃক্ষলতাদি প্রত্যক্ষ হয়—তদ্রূপ এই অদ্ভুত জ্যোতির আলোকে ঈশ্বর মনুষ্যের হৃদয়ে প্রত্যক্ষ হয়েন। এই জ্যোতিঃ বেদবাক্যের মধ্যে বাস করে। যখন সরস্বতীর উপাসনা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, তখন এই নিরাকার জ্যোতিঃই দেবতা বলিয়া উপাসনাভাজন হইয়াছিল।—এখন কি আমরা মহাকবি কালিদাসের ভাষায় এরূপ আশা করিতে পারি যে, "শ্রুতিমহতী সরস্বতী" তাঁহার প্রিয় আর্য্যাবর্ত্তে পুনর্ব্বার 'মহীয়সী' হইবেন?

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।

আত্মা কি?

গত আশ্বিন মাসের সাহিত্যে, শ্রীযুক্ত বাবু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্-এ, মহোদয়, "একটি পুরাতন বিষয়ের" অবতারণা করিয়াছেন। বিষয়টি অতি পুরাতন হইলেও ইহার নূতনত্ব এখনও অন্তর্হিত হয় নাই, এবং এ সম্বন্ধে বাক্‌বিতণ্ডা আজ পর্য্যন্তও চলিতেছে। ইহার নূতনত্ব আজও আছে বলিয়া আমরা ইহার সম্বন্ধে দুই চারি কথা আজ পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করিতে সাহসী হই-

(১) মধুচ্ছন্দার সময়ে মহাসমুদ্র অনন্ত ও অসীম বলিয়া বিবেচিত হইত। এখনকার ভূতত্ত্ব তখন অপরিজ্ঞাত ছিল।

তেছি। এ প্রবন্ধে নূতন কোনও মত স্থাপিত করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। রামেন্দ্র বাবু তাঁহার প্রবন্ধে "আত্মা" সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, এবং তাঁহার মতের স্বপক্ষে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলাই আমাদের উদ্দেশ্য। পূর্ব্বেই বলিয়া রাখি, আমাদিগের এ প্রবন্ধ কোনও ব্যক্তিবিশেষের বা মতবিশেষের যুক্তি অবলম্বনে লিখিত হয় নাই। রামেন্দ্র বাবু যে সকল যুক্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা কত দূর সঙ্গত, তাহার বিচার করাই আমাদের এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

হিন্দু দর্শনশাস্ত্রে এবং অন্যান্য অনেক জাতির দর্শনশাস্ত্রেও উল্লেখ দেখিতে পাই যে, এই জড়দেহ ব্যতিরিক্ত এবং দেহ-আশ্রয়ী আর একটা কিছু আছে,—যাহা লইয়া আমাদিগের পূর্ণ মনুষ্যত্ব। কিন্তু এই "আর একটা কিছু" জিনিষটা কি প্রকার, তাহা আজ পর্য্যন্ত কেহ নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারিত করিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমাদের বোধ হয় না।

> "আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনং আশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।
> আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥"

তাই বলিতেছিলাম, এই পুরাতন বিষয়টি সম্বন্ধে অনেক শুনিয়াছি, এবং শুনিতেছি; কিন্তু বাস্তবিক ব্যাপারটা কি, সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। অতি প্রাচীন বিষয় হইলেও যখনই এ বিষয়ের আলোচনা করিতে যাই, তখনই বোধ হয়, বিষয়টি সম্পূর্ণ নূতন। দেহাতিরিক্ত চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়বর্গের অগোচর আর একটা কিছু আমাদের ভিতরে রহিয়াছে, এবং ইহাই "আত্মা", অন্ততঃ "আত্মা" বলিলে আমরা ইহাই বুঝি, ইহা আমাদিগকে প্রথমেই স্বীকার করিয়া লইতে হইতেছে। যাঁহারা দেহাতিরিক্ত অন্য কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহাদের সহিত আমাদিগের এ স্থলে কোন সম্পর্ক নাই।

যাঁহারা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা অবশ্য ইহাও স্বীকার করেন, আত্মা দেহাতিরিক্ত অন্য একটা কিছু। যত গোল এই "অন্য কিছু" জিনিষটা কি প্রকার, ইহা লইয়া। অন্য মতের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ এ স্থলে নাই; রামেন্দ্র বাবুর মতের পর্য্যালোচনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

রামেন্দ্র বাবুর মতে, "পরস্পর কিয়দংশে সদৃশ ও কিয়দংশে বিসদৃশরূপে প্রতীত জ্ঞানসমূহের যে সমষ্টি, তাহারই নাম, অথবা অভিধান অথবা সংজ্ঞাই আত্মা অথবা আমি।" আত্মা অর্থে এই জ্ঞানসমূহের সমষ্টির অতিরিক্ত অন্য

কোন পদার্থ আছে, ইহা তাঁহার মতে স্বীকার্য্য নহে। স্বীকার্য্য কি না, ক্রমে দেখা যাইবে। প্রথমতঃ দেখা যাউক, এই জ্ঞানসমূহের সমষ্টি অর্থে কি বুঝায়, এবং পরস্পর বিশেষ কোন সম্বন্ধ রহিত পৃথক্ পৃথক্ অনুভূতিগুলির একত্র সমাবেশে জ্ঞানসমূহের একটি "সমষ্টি" কি প্রকারে হইতে পারে। রামেন্দ্র বাবু গোড়াতে দুইটি স্বতঃসিদ্ধ অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন—যথা "(১) জ্ঞান অনুভূতি প্রভৃতির অস্তিত্ব, (২) তাহাদের মধ্যে একটি সাদৃশ্য বোধের ও ভেদ-বোধের অস্তিত্ব।" তিনি বলিতেছেন—"সম্মুখে ঐ গাছ দেখিতেছি; সুতরাং 'ঐখানে গাছ রহিয়াছে' এ কথা পূরা সাহসের সহিত বলা যায় না। কেন না, মরীচিকা, প্রতিবিম্ব, স্বপ্ন, মানসিক অস্বাস্থ্য বা বিকারে অনেক সময়ে গাছের ভ্রান্তি জন্মিতে পারে; অথচ সেখানে গাছ নাই। তবে আমি গাছ দেখিতেছি, এ কথা সকল সময়ে সকল অবস্থাতেই বোধ করি সাহসের সহিত বলা যাইতে পারে। স্বপ্নই হউক আর বিকারই হউক, আমার যে ঐরূপ বোধ হইতেছে, ইহা একটা সত্য কথা। ঐ বোধটুকু বা জ্ঞানটুকু সত্য, উহাতে কাহারও আপত্তি সম্ভবে না। এবং বোধ হয় এই বোধ বা অনুভূতি বা জ্ঞানকে সকলেই সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে স্বতঃসিদ্ধরূপে গ্রহণ করিতে আপত্তি করিবেন না। ঐখানে গাছ আছে, ইহা সত্য না হইতেও পারে; কিন্তু আমার ঐরূপ প্রতীতি হইতেছে, ইহা ঠিক।"

কতকগুলা বিবিধ জ্ঞান, বোধ, প্রতীতি, অনুভূতি জন্মিতেছে, ইহা প্রথমতঃ স্বীকার্য্য; যথা ভয়, দুঃখ, ঘৃণা, লজ্জা, শীত, গ্রীষ্ম ইত্যাদি ইত্যাদি।

"আরও কিছু স্বীকার্য্য আছে। কতকগুলা জ্ঞান ও অনুভূতি জন্মিতেছে; কেবল তাহাই নহে। এই জ্ঞানগুলির মধ্যে পরস্পর একটা সম্বন্ধের অনুভূতিও জন্মিতেছে। * * এই বিবিধ জ্ঞানসমূহের মধ্যে যে নানাবিধ সম্বন্ধ অনুভব করি, তাহার একটা সম্বন্ধের সংজ্ঞা সাদৃশ্য। আর একটা সম্বন্ধের সংজ্ঞা ভেদ।"

তবে এই পর্য্যন্ত দাঁড়াইল যে, "কতকগুলা জ্ঞান আছে ও তাহাদের মধ্যে সাদৃশ্য ভেদ সম্বন্ধ এই সংজ্ঞাবিশিষ্ট একটা প্রতীতি আছে। এই পর্য্যন্তের অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকার্য্য, অন্যথা বিচার চলে না ও কিছুই থাকে না।"

পাঁচ রকম বোধ আছে, ইহা রামেন্দ্র বাবু স্বীকার করিয়া লইতেছেন। যথা—বর্ণবোধ, আকৃতিবোধ, শ্রুতিবোধ, স্বাদবোধ, ঘ্রাণবোধ। এই পাঁচ রকম বোধ ছাড়া তাঁহার মতে আরও দুই প্রকার বোধ আছে—যথা দেশবোধ ও কালবোধ। এই সকল বোধ জ্ঞান বা প্রতীতি আমারই ভিতরে আছে।

এগুলি আমার অংশ, আমার চৈতন্যের উপাধি, আমার আত্মার উপাদান মাত্র। এই সকল জ্ঞান ছাড়া জ্ঞানের অনুরূপ কোন পদার্থ আমার বাহিরে আছে কি না, তাহা আমার জানিবার উপায় নাই। এক্ষণে এই সকল যুক্তি কতদূর প্রত্যয়মূলক, একবার দেখা যাউক। সম্মুখে "ঐ গাছ দেখিতেছি" বলিয়া "ঐখানে গাছ রহিয়াছে" এ কথা সকল সময়ে সকল অবস্থাতে বলা যায় না। অবশ্যই যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া জ্ঞানাতিরিক্ত গাছ এই সংজ্ঞা-বাচক কোন পদার্থ ঐখানে আছে, ইহা কোন সময়ে কোন অবস্থাতেই বলা যায় না, এ কথা স্বীকার করিতে পারি না। মরীচিকা, স্বপ্ন, মানসিক বিকার ইত্যাদি কারণে গাছ ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায় এরূপ ভ্রম সচরাচর হইবার কোন কারণ দেখি না। যদি সকল সময়ে সকল অবস্থা-তেই আমার ভ্রম হইতেছে, এরূপ বলা যায়, তাহা হইলে ভ্রমসংজ্ঞাবাচক কিছু থাকিতে পারে না। জ্ঞানসমূহের মধ্যে কতকগুলি মিথ্যা, ইহা স্বীকার করিতে হইলে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি সত্য, ইহাও স্বীকার করা প্রয়োজন। মিথ্যায় সত্যবোধই ভ্রান্তি। মানসিক বিকার অবস্থায় গাছের অবস্থিতিবিষয়ে ভ্রম জন্মিতে পারে, ইহা স্বীকার করিতে হইলে, মনের সাধারণ সুস্থাবস্থাতে এরূপ ভ্রম হয় না, ইহা স্বীকার করিতে হয়। নতুবা সুস্থাবস্থা কি বিকারাবস্থা, জাগ্রতাবস্থা কি স্বপ্নাবস্থা, এ সকলের বিচার করিবার উপায় কি? "ঐ গাছ দেখিতেছি" এইরূপ একটা প্রতীতি আমার হইতেছে, সে বিষয়ে অবশ্যই কোন সন্দেহ নাই। মানসিক বিকারবশতঃই হউক বা স্বপ্নাবেশেই হউক, যেরূপেই হউক, গাছ দেখার প্রতীতি সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু এই প্রতীতির অনুরূপ ইহার কারণভূত কোন পদার্থ ঐখানে রহিয়াছে কি না, ইহা আমার পক্ষে জানা সম্ভব কি না? যদি সম্ভব না হয়, তবে আমার এ স্বপ্নাবস্থা কি জাগ্রতাবস্থা, আমি সুস্থ কি বিকারগ্রস্ত, তাহার নির্ণয় করি কিরূপে? যে অবস্থায়, আমার জ্ঞান হইতেছে এবং জ্ঞানানুরূপ জ্ঞেয় পদার্থের অস্তিত্ব রহিয়াছে, জানি সেই অবস্থাকে আমি সাধারণ সুস্থাবস্থা এবং জাগ্রতা-বস্থা বলিয়া থাকি, এবং যে অবস্থায় আমার একটা জ্ঞান হইতেছে সত্য, কিন্তু জ্ঞানের কারণভূত কোন পদার্থের বাহ্য অস্তিত্ব নাই, সেই অবস্থাকে মানসিক বিকারাবস্থা বা স্বপ্নাবস্থা বলিয়া থাকি। ইহা ছাড়া অন্য কোন অর্থে সুস্থাবস্থা এবং বিকারাবস্থা বুঝা যাইতে পারে কি না, জানি না।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, জ্ঞেয় পদার্থের অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব নির্দ্ধারণ করি-

বার উপায় কি? সুস্থাবস্থাতে ঐ গাছ দেখিতেছি, গাছ দেখার একটা প্রতীতি হইতেছে, বিকারাবস্থাতেও ঠিক ঐরূপ একটা প্রতীতি হইতেছে। তবে ঐ গাছটা কোন্ সময়ে অস্তি এবং কোন্ সময়ে নাস্তি, ইহা নির্দ্ধারণ করি কিরূপে? অবশ্যই ইহা নির্ণয় করিবার উপায় আছে। না থাকিলে সত্য এবং ভ্রম বলিয়া দুইটা কথার সৃষ্টি হইতে পারিত না, এবং কথা দুইটা একেবারে নিরর্থক হইত। এখানে আমরা গাছ "দেখা" শব্দ ব্যবহার করিতেছি, কিন্তু ঐ গাছ-দেখার প্রতীতিব্যাপারে কেবলমাত্র দর্শনেন্দ্রিয়ের কার্য্য হইতেছে, এরূপ বুঝি না। শুধু দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা বর্ণবোধ হওয়া সম্ভব—ইহা দ্বারা গাছের আকৃতি, ইহার কাঠিন্য বা কোমলতা, ইহার ব্যাপ্তি ইত্যাদির বোধ কখনই হইতে পারে না। দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত স্পর্শেন্দ্রিয়ের যোগ না হইলে এই গাছ দেখা এবং তৎসম্বন্ধে জ্ঞান হওয়া, এত বড় একটা ব্যাপার ঘটিতে পারে না। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি পরস্পর এক সঙ্গে মিলিয়া কার্য্য করিয়া থাকে, এবং সেই জন্য বিভিন্ন ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রতীত অনুভূতিগুলির পুনঃপুনঃ একত্র সমাবেশে তাহাদিগের মধ্যে পরস্পর একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ জন্মিয়া থাকে, এবং এই অনুভূতি-সমষ্টির কোন একটি অনুভূতি উপস্থিত থাকিলে ইহার সহিত দৃঢ়সম্বন্ধ অন্যান্য অনুভূতিগুলিও আসিয়া পড়ে। তাই এই গাছ দেখা ব্যাপারে যদিও শুদ্ধ দর্শনেন্দ্রিয়ের কার্য্য হইতেছে, তথাপি পূর্ব্বপূর্ব্বাবস্থায় দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত স্পর্শেন্দ্রিয়ের যোগ হইয়াছিল বলিয়া আজ ঐ গাছ চক্ষুর গোচর হইবামাত্র ইহার বর্ণবোধ এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইহার আকৃতি, কাঠিন্য প্রভৃতি অন্যান্য গুণেরও অনুভূতি জন্মিতেছে। গাছটির প্রকৃত পক্ষে অস্তিত্ব আছে কি না, জানিতে হইলে আমার দেখা উচিত, ইহা আমার স্পর্শেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত কি না। যাহাকে জড়পদার্থ বলি, তাহার প্রধান স্বভাব এই যে, আমি তাহাকে স্পর্শ করিতে পারি। যাহা স্পর্শগ্রাহ্য নহে, তাহার বাহ্য অস্তিত্ব আছে কি না, জানি না। যাহা স্পর্শগ্রাহ্য, তাহার বাহ্য অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। গত কল্য একটা কুকুর দেখিয়াছিলাম, তাহার স্মৃতি রহিয়াছে, এই মুহূর্ত্তে কুকুরটার অবশ্য বাহ্য অস্তিত্ব নাই। তাহার প্রমাণ, জ্ঞেয় পদার্থটি এই মুহূর্ত্তে আমার স্পর্শেন্দ্রিয়ের অধীন নহে। মানসিক বিকারাবস্থায় যে সকল প্রতীতি হইয়া থাকে, এই প্রমাণ দ্বারাই সে সকলকে ভ্রম বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যায়।

আমাদিগের দেশে সামান্য বাজিকরগণ অনেক প্রকার বাজি করিয়া থাকে,

অনেকেই দেখিয়াছেন। অনেকে দেখিয়া থাকিবেন, এই সকল বাজিকরগণ দর্শকদিগের সমক্ষে বীজরোপণ করিয়া তাহা হইতে আম্র বৃক্ষ উৎপন্ন করাইয়া তাহাতে ফল ধরাইয়া থাকে। অনেকেই হয় ত শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, এই গাছ, ফল প্রভৃতির বাহ্য অস্তিত্ব নাই। কোন অদ্ভুত উপায়ে ইহারা দর্শকদিগের চক্ষে ধাঁধা উৎপাদন করিয়া থাকে। ইহার প্রমাণ, এই সকল পদার্থ আমরা স্পর্শ করিতে পারি না, এবং সেই জন্যই বাজিকরগণ কদাচ কাহাকেও ঐ সকল বস্তু স্পর্শ করিতে দেয় না। শুনা যায়, এক সাহেব এই অত্যাশ্চর্য্য বৃক্ষের উৎপত্তি দর্শন করিয়া ইহার একটা ফটোগ্রাফ্ তুলিয়া লইয়াছিল, কিন্তু ফটোগ্রাফ তুলিয়া দেখে, চতুর্দ্দিকের সমস্ত দ্রব্যের ছবি উঠিয়াছে, কেবল সেই বৃক্ষটির চিহ্নমাত্র নাই।

তবেই দেখা যাইতেছে যে, আমার জ্ঞানাতিরিক্ত জ্ঞানের কারণভূত কোন পদার্থের অস্তিত্ব আছে কি না, জানিতে হইলে, সেই পদার্থটি আমার স্পর্শেন্দ্রিয়ের গোচর কি না, নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক, এবং এই প্রমাণ দ্বারাই পদার্থের অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। অবশ্য আমরা এখানে পদার্থ শব্দে ইন্দ্রিয়ানুভূত পদার্থই বুঝিতেছি। ইন্দ্রিয়ানুভূতির বহির্ভূত অন্য কিছু (যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে) জ্ঞেয় পদার্থে থাকিতে পারে কি না, সে প্রশ্নের সহিত আমাদিগের আপাততঃ কোন সংস্রব নাই।

এক্ষণে দেখা যাউক, অনুভূতির কারণভূত পদার্থের অস্তিত্ব অন্য কোন প্রমাণ দ্বারায় প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে কি না।

রামেন্দ্রবাবু বলিতেছেন "* * আমাকে ছাড়িয়া, আমার অনুভূতি ছাড়িয়া, তাহার বাহিরে এমনইতর একটা কিছু আছে এইরূপ বলিলে, এইরূপ কল্পনা করিলে আমার সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিকই আছে, এ কথা জোর করিয়া বলিবার আমার কোন অধিকার নাই।" আমরা বলিতে চাই, অধিকার আছে। আমার অনুভূতির বাহিরে ইহার অনুরূপ যদি কিছুর অস্তিত্ব না থাকে, তবে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ অনুভূতি হইতেছে, ইহার কারণ কি ? এই মানুষ দেখিতেছি, এই রাস্তা দেখিতেছি, এই বাড়ী দেখিলাম, এই গাড়ীতে চড়িলাম, এই এক স্থান ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে আসিলাম, এগুলি অবশ্যই পৃথক্ পৃথক্ অনুভূতি। এ সকল পৃথক্ পৃথক্ অনুভূতির অবশ্যই পৃথক্ পৃথক্ কারণ আছে, না থাকিলে অনুভূতিগুলির পার্থক্য হয় কিসে ? মানুষ দেখিবার সময় যে আমি, বাড়ী দেখিবার সময়ও সেই আমি, আবার গাড়ীতে

চড়িয়া অন্ত স্থানে আসিয়াও সেই আমি। "আমার আমিত্বে" কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই, তবে আমার অনুভূতিগুলির মধ্যে এত বৈলক্ষণ্য ঘটে, ইহার কারণ কি? অবশ্যই "আমি" ছাড়া আমার বাহিরে অন্ত কারণ আছে, যাহার জন্ত আমার বিভিন্ন প্রকার অনুভূতি হইতেছে। তবে আমার অনুভূতির কারণ সেই সেই অনুভূতির অনুরূপ পদার্থের অস্তিত্ব ছাড়া আর কি হইতে পারে? গত কল্য লাট সাহেবকে দেখিয়াছিলাম, অথবা রামেন্দ্র বাবুর ভাষায়, সেই রকম একটা প্রতীতি আমার হইয়াছিল। অন্ত এই মুহূর্ত্তে সে প্রতীতি নাই, ইহার কারণ কি? "আমি" যদি কেবল প্রতীতির সমষ্টিমাত্র হই, তাহা হইলে যতক্ষণ "আমার" অস্তিত্ব আছে, ততক্ষণ যাহা লইয়া "আমার অস্তিত্ব", সে প্রতীতিগুলিরও অস্তিত্ব থাকা উচিত। তবে এই লাট সাহেব দেখা (এবং অন্যান্ত অনেক বস্তু দেখার) প্রতীতি এই মুহূর্ত্তে নাই কেন? কেহ বলিতে পারেন, সেই প্রতীতি না থাকিলেও তাহার স্মৃতি থাকিতে পারে। অবশ্যই পারে। কিন্তু স্মৃতি অর্থে কি বুঝি? সহজ ভাষায় স্মৃতি বলিলে বুঝি একটা প্রতীতি প্রতিকৃতি বা ফটো। স্মৃতিও অবশ্যই একটা প্রতীতি। যদি প্রতীতি ছাড়া সংসারে অন্ত কিছু না থাকে, তবে একটা প্রতীতি ও সেই প্রতীতির স্মৃতি, এ দুয়ের মধ্যে তারতম্য করা যাইতে পারে কিরূপে? লাট সাহেবকে দেখিয়া তাহার একটা ছবি আমার মনে অঙ্কিত হইয়াছে, এই মুহূর্ত্তে হয় ত সেই ছবি মনে উদিত হইয়াছে। লাট সাহেবকে দেখা ও লাট সাহেবের এই ছবি দেখা ঠিক এক জিনিষ কি? যদি না হয়, তবে কোন্ লক্ষণ দ্বারা ইহাদের বিভেদ নির্ণয় করিব?

ফলে প্রতীতির অতিরিক্ত কিছু না স্বীকার করিলে সকলই যেন কেমন রহস্যময় হইয়া উঠে। সম্মুখে ঐ অগ্নি জ্বলিতেছে, অবশ্যই একটা প্রতীতি হইতেছে। অগ্নিতে অঙ্গুলি প্রদান করিলাম, এও একটা প্রতীতিবিশেষ। অঙ্গুলি দগ্ধ হইতে লাগিল, বড় কষ্ট, এও একটা প্রতীতি?

তাই বলিতেছিলাম, অনুভূতির কারণভূত পদার্থ না থাকিলে বিভিন্নপ্রকার অনুভূতি সম্ভব হয় কিরূপে? তাই বলিতেছিলাম, "আমার অনুভূতি ছাড়িয়া আমার বাহিরে এমনইতর একটা কিছু আছে, এ কথা জোর করিয়া বলিবার অধিকার নাই", এ কথা স্বীকার্য্য নহে।

তবে এক্ষণে কি দাঁড়াইল, দেখা যাউক। রামেন্দ্র বাবুর প্রথম স্বতঃসিদ্ধ "আমাদিগের কতকগুলি অনুভূতি জন্মিতেছে ইহা স্বীকার্য্য, ইহার অধিক

কিছু স্বীকার্য্য নহে।" আমরা বলিতে চাই, ইহার অধিক কিছু স্বীকার না করিলে অনুভূতির কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। এখন এক প্রকার, অন্য সময়ে অন্যপ্রকার, আবার এই পর মুহূর্ত্তেই অন্যপ্রকার অনুভূতি কেন হয়, ইহা বুঝিতে পারি না। অবশ্য অনুভূতিগুলির বিভিন্নতার কারণ আমি নহি। কারণ আমার ইচ্ছার উপর ইহারা নির্ভর করে না। আমার দর্শনেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া যতক্ষণ হইতেছে, ততক্ষণ একটা বিশেষরূপ অনুভূতি হইবেই হইবে। চক্ষু যতক্ষণ অন্য দিকে না ফিরাইয়া লইয়াছি, ততক্ষণ কি জানি কেন, আমি ইচ্ছা করি বা নাই করি, "ঐ গাছটার" অনুভূতি হইবেই, আমি ইহা নিবারণ করিতে পারি না। অতএব অনুভূতির একটা বাহ্য কারণের অস্তিত্বও স্বীকার করিতে হইতেছে; না করিলে এ বিশ্ব ব্যাপারটা মনুষ্যবুদ্ধির অতীত একটা বিকট রহস্য হইয়া উঠে।

রামেন্দ্র বাবুর প্রথম স্বতঃসিদ্ধের আলোচনা হইল। দেখা যাউক, দ্বিতীয় স্বতঃসিদ্ধটি কতদূর যুক্তিমূলক। প্রতীতিগুলি ছাড়া তাহাদের মধ্যে সাদৃশ্য ভেদ সম্বন্ধ এই সংজ্ঞাবিশিষ্ট আর একটা প্রতীতি আছে, রামেন্দ্র বাবুর মতে ইহাও স্বতঃসিদ্ধ। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, এই যে সাদৃশ্যবোধ ও ভেদ-বোধ সংজ্ঞাবিশিষ্ট দুই প্রকার প্রতীতি, এগুলি প্রথমজাতীয় প্রতীতির সদৃশ কি না? রামকে দেখিতেছি, একটা প্রতীতি হইল। যাহাকে দেখিতেছি—এ ব্যক্তি রাম, ইহার প্রমাণ কি? রামকে পূর্ব্বে একবার দেখিতেছিলাম, একটা প্রতীতি হইয়াছিল; তাহার স্মৃতি রহিয়াছে; সেই অতীত প্রতীতির সহিত বর্ত্তমান প্রতীতি মিলাইয়া দেখিলাম, তাহাদের মধ্যে একটা সম্বন্ধ আছে;—তাহার অভিধান "সাদৃশ্য"। এই সম্বন্ধের প্রতীতি আমার হইতেছে বলিয়া বুঝিলাম, এ ব্যক্তি সেই রাম। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, এই সাদৃশ্য-বোধরূপ প্রতীতিটি এবং রামের অনুরূপ প্রতীতিটি, এ দুটি ঠিক একজাতীয় প্রতীতি নহে।

যদি দ্বিতীয় প্রকার প্রতীতিগুলি প্রথমজাতীয় প্রতীতির ন্যায় না হয়, তাহা হইলে কিরূপ দাঁড়ায়, দেখা যাউক। প্রথম স্বতঃসিদ্ধ মতে আমাদের কতকগুলি প্রতীতি হইতেছে। মনে করুন, আমার দুটি প্রতীতি হইতেছে, একটি লালবর্ণ, একটি কৃষ্ণবর্ণ। এ দুইটি প্রতীতি হইবার সময় তাহাদের ভেদবোধক একটা প্রতীতিও অবশ্যই হইতেছে, নতুবা এটা লাল ওটা কাল ইহা বুঝিব কিরূপে। এ পর্য্যন্ত বেশ বুঝিলাম, তার পরেই গোল। এই ভেদ-

বোধক প্রতীতিটি ঐ লাল ও কৃষ্ণবর্ণ বোধক প্রতীতির ন্যায় কি? অবশ্যই নহে। লালবর্ণের কোন বস্তু চক্ষুর নিকট ধরিলে যতক্ষণ দর্শনশক্তির কার্য্য হইবে, ততক্ষণ একটা লালবর্ণের প্রতীতি হইবে। কৃষ্ণবর্ণের বেলাতেও ঐরূপ। কিন্তু এইটা লাল, ঐটা কাল, এই দুয়ের মধ্যে ভেদ-জ্ঞানটা ঠিক ঐ সঙ্গে সঙ্গেই হইতেছে কি? অনেকে বলিতে পারেন, না হইলে এই দুইটা বিভিন্ন প্রতীতি, ইহা জানিলাম কিরূপে? মনে করুন, যে দুইটি বর্ণের প্রতীতি হইতেছে, সে দুটিই লাল—উভয়ের মধ্যে তারতম্য অতি সামান্য। এমন স্থলে অবশ্যই কেহ বলিতে পারেন না যে, দুটি প্রতীতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের মধ্যে ভেদবোধক একটি অন্য প্রকার প্রতীতি হইতেছে, কারণ এই দুটি বর্ণের মধ্যে কোন ভেদ আছে কি না, তাহা নির্দ্ধারণ করিতেও সময়ের আবশ্যক। দুইটি দ্রব্যের মধ্যে সাদৃশ্য যতই বেশী হইবে—তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে প্রভেদনির্দ্ধারণ করা ততই কঠিন। যে সকল দ্রব্যের মধ্যে প্রভেদ অত্যন্ত অধিক, তাহাদিগের মধ্যে কোন সাদৃশ্য থাকিলে, তাহা নির্দ্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠে। ইহার কারণ কি? এই সাদৃশ্য ও ভেদ-প্রতীতি এই সকল অবস্থায় স্বতঃই হয় না কেন? আবার দেখিতে পাওয়া যায়, এই সাদৃশ্য ও ভেদজ্ঞান সকল মানুষের সমান পরিমাণে থাকে না। আমি দুইটি পদার্থ দেখিলাম, অন্য এক ব্যক্তিও সেই দুইটি পদার্থ দেখিল। আমার যেমন প্রতীতি, তাহারও সেইরূপ প্রতীতি হইতেছে, কিন্তু সে তাহাদের মধ্যে যে সাদৃশ্য ও প্রভেদ বুঝিল, আমি তাহা পারিলাম না, ইহার কারণ কি? ঐ ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তি, চিন্তাশক্তি ইত্যাদি আমার অপেক্ষা বেশী, সেই জন্যই ঐ ব্যক্তি যেরূপ সাদৃশ্য ও ভেদ বুঝিতে পারে, আমি সেরূপ পারি না। এই সাদৃশ্য ও ভেদজ্ঞান হইতে হইলে চিন্তাশক্তির পরিচালনা আবশ্যক। কিন্তু রামেন্দ্র বাবুর মতে "আত্মা" খণ্ডজ্ঞানগুলির সমষ্টিমাত্র। যাহা প্রতীতির সমষ্টিমাত্র, তাহা ঐ প্রতীতিগুলির মধ্যে ভেদাভেদনির্ণয় করে কিরূপে? রামেন্দ্র বাবু বলিতেছেন, এই ভেদাভেদের প্রতীতিগুলিও স্বতঃসিদ্ধ, স্বীকার্য্য। কিন্তু এই জাতীয় প্রতীতিগুলিকে পূর্ব্বজাতীয় প্রতীতির ন্যায় স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে কিরূপে? প্রতীতি হইলেই তাহাদিগের মধ্যে ভেদাভেদ-বোধ হয় না। দুইটি বর্ণ দেখিলাম, কিন্তু দুইটি বর্ণের প্রভেদ আমাকে দেড় ঘণ্টা ভাবিয়া ঠিক করিতে হয় কেন? এই ভেদজ্ঞানটা দুইটি বর্ণ দেখিবামাত্রই হইল না কেন? সেই জন্য বলিতেছিলাম, দ্বিতীয়

জাতীয় প্রতীতিগুলিকে ঠিক প্রথমজাতীয় প্রতীতির ন্যায় স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

তবেই দাঁড়াইল, সাদৃশ্য বা ভেদজ্ঞান হইতে হইলে চিন্তাশক্তির চালনা আবশ্যক। কিন্তু এই চিন্তাশক্তির চালনা করিবে কে ? "আমি" তো প্রতীতির সমষ্টিমাত্র ; প্রতীতির আবার চিন্তাশক্তি কোথায় ? যদি "আমার" চিন্তাশক্তি না থাকে, তবে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সাদৃশ্য ও পার্থক্যের অনুভব করি কিরূপে ? যদি "আমার" চিন্তা করিবার ক্ষমতা থাকে, তবে আমি জ্ঞানসমূহের সমষ্টিমাত্র নহি, "আমাতে" আরও কিছু আছে।

এইখানে একটা উৎকট প্রশ্ন উঠিবার সম্ভাবনা। সে প্রশ্ন রামেন্দ্র বাবু তুলিয়াছেন এবং তাহার উত্তরও দিয়াছেন। প্রশ্নটি এই, "জ্ঞান থাকিলেই জ্ঞাতা থাকিবে এবং ভোগ থাকিলেই ভোগী থাকিবে। এই জ্ঞাতা ও এই ভোগী যে সেই 'আত্মা'।"

রামেন্দ্র বাবু উত্তরে বলিতেছেন "জ্ঞান থাকিলেই জ্ঞাতা থাকিবে কে বলিল ? * * * যাহাকে প্রতিপন্ন করিতে হইবে, তাহাকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া গোড়ায় ধরিলে চলিবে না।" "আমরা যে একটা ভোক্তা ও জ্ঞাতার অস্তিত্ব মানিয়া লই, "সে একটা ভাষার কায়দা আমাদের সুবিধার জন্য" ইত্যাদি।

রামেন্দ্র বাবু বলিতেছেন, জ্ঞান থাকিলেই জ্ঞাতা থাকিবে, ইহার প্রমাণ নাই, যুক্তি নাই। আমাদিগের বোধ হয়, ইহার প্রমাণ এবং যুক্তি আছে। জ্ঞান থাকিলেই জ্ঞাতা থাকিবে আমরা বলিয়া থাকি, ইহার কারণ কি ? জ্ঞান বলিলে আমরা একটা বিশেষরূপ ক্রিয়া বুঝিয়া থাকি। যেখানে ক্রিয়া আছে, সেইখানেই ক্রিয়ার কর্ত্তা আছে। বলিতে পারেন, ইহার প্রমাণ কি ? কর্ত্তাহীন ক্রিয়া নাই, কে বলিল ?

কর্ত্তাহীন ক্রিয়া থাকিতে পারে কি না, জানি না, অন্ততঃ কর্ত্তাহীন ক্রিয়া মনুষ্যবুদ্ধির অতীত। আমরা যেখানে ক্রিয়া দেখিয়াছি, কর্ত্তাহীন ক্রিয়া কোথাও দেখি নাই ; তাই যেখানে ক্রিয়া আছে, সেইখানেই তাহার একটা কর্ত্তা ধরিয়া লই। কর্ত্তা সকল সময়েই দেখিতে পাই না, কিন্তু দেখিতে পাই বা না পাই, কেহ কর্ত্তা না থাকিলে কোন ক্রিয়া হইতে পারে না, ইহা নিশ্চিত জানি। যে যে স্থলে ক্রিয়া দেখিয়াছি, কোথাও কর্ত্তাহীন দেখি নাই ; সুতরাং কর্ত্তাহীন ক্রিয়া মনুষ্যবুদ্ধির অতীত। যাহা আমাদের সাধারণ জ্ঞানের বহির্ভূত, আমরা এরূপ কোন বিষয়েই ধারণা করিতে পারি না। যে অলংঘনীয় নিয়মের বশ-

বর্ত্তী হইয়া জগৎ সংসার চলিতেছে, সে নিয়মের ব্যতিক্রম হঠাৎ ঘটিতে পারে, ইহা সম্ভব নহে। অন্ততঃ মনুষ্যের চিন্তাশক্তি যে চিরন্তন প্রথার অনুবর্ত্তী, তদ্বিপরীত কিছু মনুষ্যের ধারণাতীত। তাই যেখানে কোন কর্ত্তার বর্ত্তমান অস্তিত্ব দেখিতে পাই না, সেখানেও একটা অলক্ষিত কর্ত্তার অস্তিত্ব মানিয়া লই। গমন বলিলে, কোন একটা পদার্থ যাইতেছে; এইরূপ বুঝি ; ভোজন বলিলে একটা কেহ ভোজন করিতেছে, এইরূপ বুঝি। গমনকার্য্য চলিতেছে, কিন্তু কেহ যাইতেছে না, এরূপ ধারণা কাহারও সম্ভব কি ? যাহা মনুষ্য কল্পনাতেই আনিতে পারে না, তাহা সম্ভব বলা যাইতে পারে কিরূপে ? যাহা না ধরিলে মনুষ্যবুদ্ধি এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না, তাহাকে "একটা কল্পনামাত্র" বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে কেন ?

রামেন্দ্র বাবুর মতে "আত্মা" অনুভূতির সমষ্টিমাত্র। অনুভূতি ছাড়া তাহার বাহিরে তাহার অনুরূপ কিছু আছে, ইহা তিনি স্বীকার করেন না। পাঁচ রকম বোধ হইতেছে, এবং তাহাদের মধ্যে সাদৃশ্য-ভেদ-সম্বন্ধ এই সংজ্ঞাবিশিষ্ট একটা বোধও হইতেছে। এই পাঁচ রকম বোধ ছাড়া আরও দুই রকম বোধ হইতেছে, যথা দেশবোধ ও কালবোধ। দেশ ও কাল, ইহাদের আত্মা ছাড়িয়া পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। দেশবুদ্ধি ও কালবুদ্ধি আমারই চৈতন্যের উপাধি, আমার আত্মার উপাদান বা অংশ।

দেশবুদ্ধি ও কালবুদ্ধি আমার অন্তর্গত হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া আমার বাহিরে এইরূপ বুদ্ধির কারণভূত কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই, ইহার প্রমাণ কোথায় ? রামেন্দ্র বাবু বলিতেছেন, "এই সম্মুখে এই কুকুর দেখিতেছি, সেই কুকুরই আবার পার্শ্বে আসিল। সম্মুখে দেখিতেছি ও পার্শ্বে দেখিতেছি, এই দুইটি পৃথক জ্ঞান। * * * সেই পার্থক্যের সংজ্ঞা দিয়াছি স্থানগত বা দেশগত ভেদ।" "দেশের পর কাল। এক্ষণে যে কুকুর সম্মুখে দেখিতেছি, কল্য সেই কুকুর সেই স্থানে দেখিয়াছিলাম। এই স্থলেও এই দুইটা কুকুর দর্শনরূপ জ্ঞানের মধ্যে অন্য কোন বিভেদ না দেখি, অন্ততঃ একটা বিভেদ দেখিতেছি, সেই বিভেদের সংজ্ঞা কালগত বিভেদ।"

পাঠক, ইহা দ্বারা দেশ ও কালের পার্থক্য বেশ বুঝিলেন কি ? সম্মুখে ঐ কুকুর দেখিতেছি, একটা প্রতীতি হইল (মনে করুন ক)। কুকুরটা পার্শ্বে আসিল, আর একটা প্রতীতি হইল (মনে করুন খ)। দাঁড়াইল কি ? দুইটা প্রতীতি হইল "ক" ও "খ", এবং বুঝিলাম "খ" "ক"য়ের পরবর্ত্তী। "ক"

"খ"; এই দুই প্রতীতির মধ্যে পরবর্ত্তী ছাড়া অন্য কোন পার্থক্য বুঝিতে পারি না। এই পার্থক্যের নাম দেশভেদ।

আবার দেখুন, এখন একটা কুকুর সম্মুখে দেখিতেছি—একটা প্রতীতি হইল "ক"। ঐ কুকুরকে কল্য ঐ স্থানে দেখিয়াছিলাম, একটা প্রতীতি হইল "খ"। এ স্থলে আমার কিরূপ জ্ঞান হইল? এই মাত্র বুঝিলাম, পূর্ব্বে একটা প্রতীতি হইয়াছিল "খ", তাহার পর একটা প্রতীতি হইতেছে "ক"; "খ" "ক"-য়ের পূর্ব্ববর্ত্তী। এই পার্থক্য ছাড়া অন্য কোন পার্থক্য আমার বুদ্ধির অতীত। কিন্তু এই পার্থক্য বুঝিতেছি কিসে? এই পার্থক্যের একমাত্র লক্ষণ 'পরবর্ত্তিতা'। এটাও কুকুর দেখা, ওটাও কুকুর দেখা; কিন্তু এই দুইটি কুকুর দেখা যে পৃথক কার্য্য, তাহার লক্ষণ একটি আর একটির পরবর্ত্তী। প্রথম উদাহরণেও দেখাইয়াছি, দুই কুকুর দেখার প্রতীতির মধ্যে পরবর্ত্তিতা ছাড়া অন্য কোন ভেদ নাই। রামেন্দ্র বাবু দ্বিতীয়জাতীয় পার্থক্যের সংজ্ঞা দিয়াছেন 'কালভেদ'। কিন্তু প্রথম উদাহরণে আমার যে প্রতীতি হইতেছে, দ্বিতীয় উদাহরণে সেই প্রতীতি ছাড়া অন্য কিছু হইতেছে কি? রামেন্দ্র বাবু যে পার্থক্যের সংজ্ঞা দিয়াছেন 'দেশভেদ', তাহার সহিত 'কালভেদ'-সংজ্ঞাবিশিষ্ট পার্থক্যের কোনও বিভেদ নাই। প্রথম ক্ষেত্রেও যে পরবর্ত্তিতা, দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও সেই পরবর্ত্তিতা। তবে দেশ ও কালের বিভেদ করিব কিরূপে? এমন কি লক্ষণ আছে, যাহা দ্বারা দেশ ও কাল ইহাদের পার্থক্য বুঝিতে পারি? এমন কোন লক্ষণ থাকুক বা না থাকুক, অন্ততঃ রামেন্দ্র বাবু যে উদাহরণ দিয়াছেন, তাহাতে ঐরূপ কোন লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, প্রতীতির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইলে তাহার অনুরূপ তদতিরিক্ত তৎকারণভূত পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। না করিলে ভিন্ন ভিন্ন প্রতীতির কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। অন্যান্য প্রতীতির বেলায় যেরূপ, দেশ ও কালবোধের বেলাতেও সেইরূপ না হওয়ার কোন কারণ দেখি না।

রামেন্দ্র বাবুর মতে অনুভূতি ছাড়া অন্য কিছু স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে বাহ্য জগৎ বলিয়া আমরা যে একটা বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করি, সেটা কি? রামেন্দ্র বাবুর যুক্তি-অনুসারে বাহ্য জগৎটা বাস্তবিক আমার বাহিরে থাকিতে পারে না। ইহা আমার আত্মার অংশ মাত্র। তবে ইহার পরিচয় কি? আত্মার কোন্ অংশটাকে "বাহ্য" ও কোন্ অংশটাকে "অন্তর"

বলিব ? রামেন্দ্র বাবু বলিতেছেন, মনোজগতের খণ্ডগুলির মধ্যে কালভেদ দেখা যায়, দেশগত ভেদ বুঝিতে পারা যায় না। বাহ্যজগৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানসমূহে আমরা দেশগত ভেদ উপলব্ধি করিয়া থাকি। এই লক্ষণ বা পরিচয় দ্বারাই বাহ্য ও অন্তর্জ্জগতের সংজ্ঞা দিতে পারা যায়।

কিন্তু আমরা এই মাত্র দেখিয়াছি, দেশ ও কাল ভেদ নির্ণয় করিবার কোন লক্ষণ রামেন্দ্র বাবুর যুক্তি-অনুসারে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। যেখানে দেশ ও কালের পার্থক্য অনুভব করিবার উপায় নাই, সে স্থলে দেশভেদ ও কালভেদ লক্ষণ দ্বারায় বাহ্য ও অন্তর্জ্জগৎ বুঝিব কিরূপে ? যুক্তির খাতিরে দেশ ও কাল বিভেদ বুঝিতে পারি, এরূপ স্বীকার করিলেও, এ লক্ষণ দ্বারা এ স্থলে আমাদের কোন উপকার হইতেছে বলিয়া বোধ হয় না। এই লক্ষণ দ্বারা আমার অনুভূতিগুলিকে দুই অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা হইলেও যাহাকে "বাহ্য জগৎ" এই সংজ্ঞা দিতেছি, সেটা আমারই অংশ বৈ আর কিছুই নহে। এমন স্থলে "বাহ্য" শব্দের কোন সার্থকতাই রহিল না। সংজ্ঞা দিলাম বাহ্য জগৎ, কিন্তু ইহার অস্তিত্ব আমার ভিতরে। বাহ্য বলিলে আমা হইতে পৃথক্ আমার বাহিরে, এইরূপ বুঝি। যাহা আমার ভিতরে, তাহা বাহ্য হইল কিরূপে ?

রামেন্দ্র বাবু বলিতেছেন, "শরীর হইতে বাহিরে অথবা বাহির হইতে শরীরে শক্তি সমাগমে অন্তর্জ্জগতে স্বাদ, ঘ্রাণ, স্পর্শ, শ্রবণ ও দর্শন।" এ কথার অর্থ কি ? যেটাকে বাহ্য জগৎ বলি, সেটা যদি আমার অংশ আমারই ভিতরে হয়, তবে "বাহির" শব্দের অর্থ কি ? "বাহিরের" অস্তিত্ব কোথায় ?

ফলে অনুভূতির অধিক অন্য কিছুর অস্তিত্ব না স্বীকার করিলে বড়ই গণ্ডগোলে পড়িতে হয়। কোন্‌টাকে ভিতর বলিতে হইবে, কোন্‌টাকে বাহির বলিতে হইবে, নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। রাস্তা, ঘাট, পুকুর, নদী, পর্ব্বত, বাড়ী, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সমস্তই আমার ভিতরে। রহস্য এই যে, সব আমার ভিতরে হইলেও ব্যাঘ্র দেখিলে প্রাণভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে থাকি। ব্যাঘ্র আমারই ভিতরে আছে, ইহার কোন বাহ্য অস্তিত্ব নাই, এ প্রবোধবাক্য মন মানে না।

রামেন্দ্র বাবুর প্রতিপাদ্য বিষয় আত্মার স্বরূপনির্ণয়। তাঁহার মতে "আত্মা" অনুভূতির সমষ্টিমাত্র। কিন্তু তিনি আবার এক স্থানে বলিতেছেন, "যাহাকে 'আত্মা' বলি, তাহার প্রধান পরিচয় এই যে, সে অন্তর্ভূত ও অতীভূত খণ্ড

জ্ঞানগুলির সম্বন্ধ বুঝিয়া তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ চিনিয়া লইতে পারে ও আপনার বলিয়া বুঝিতে পারে। আত্মার এই সংজ্ঞা।"

প্রথম সংজ্ঞার সহিত এই সংজ্ঞার সামঞ্জস্য আছে কি? "আত্মা" যদি জ্ঞানসমূহের সমষ্টিমাত্র হয়, তবে আবার সেই সমষ্টি পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞানগুলির সম্বন্ধ বুঝিতে পারিবে কেমন করিয়া? জ্ঞান বলিলে কোন পদার্থ বা কোন শক্তি বুঝায় না। "জ্ঞান" একটা অবস্থাবিশেষ, মনের একটা বিকারমাত্র। যাহা মানসিক অবস্থামাত্র, তাহা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সম্বন্ধ বুঝিবে কিরূপে? "খণ্ডজ্ঞানগুলির সম্বন্ধ বুঝিয়া তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে চিনিয়া লইতে পারে এবং আপনার বলিয়া বুঝিতে পারে"—এমন কোন বস্তুর নাম যদি আত্মা হয়, তবে "আত্মা" বলিলে আমরা জ্ঞানাতিরিক্ত "জ্ঞাতা" ছাড়া আর কিছু বুঝিতে পারি কি? অনুভূতিগুলির পরস্পর সাদৃশ্য-ভেদ-বোধ হইতেছে, তাহাদিগকে সেই সাদৃশ্যভেদ অনুযায়ী সাজান হইতেছে, তাহাদের সম্বন্ধ বিচার হইতেছে; এতগুলি কার্য্য হইতেছে, কিন্তু এ কার্য্যগুলির কোন কর্ত্তা নাই, ইহা মনুষ্যবুদ্ধির অতীত। নিরবচ্ছিন্নভাবে চিরন্তন নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া যাহা চিরকাল ঘটিতেছে, তদ্বিপরীত কিছু মনুষ্য ধারণা করিতে পারে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই কারণে কর্ত্তাহীন ক্রিয়া মনুষ্যবুদ্ধির অতীত।

রামেন্দ্র বাবু বলিতেছেন, "আত্মা বিনাশী, কি অবিনাশী এ প্রশ্ন অর্থশূন্য, কারণ আত্মা ছাড়িয়া কাল নাই।" "আত্মার ধ্বংস হইবে অমুক সময়ে, অথবা আত্মার ধ্বংস হইবে না কোন সময়ে, এইরূপ বাক্যের অর্থ হয় না।"

হয় কি না, একটু বুঝিয়া দেখা যাউক। স্বীকার করিলাম, আত্মা জ্ঞান-সমূহের সমষ্টিমাত্র। কিন্তু জ্ঞানসমূহের সৃষ্টি হইতেছে কিরূপে? অন্তর্জগৎ ও বাহ্যজগতের মধ্যে শক্তির গতায়াতেই জ্ঞানের উৎপত্তি। এই জড়শরীর শক্তি-সমাগমের পন্থা বা শক্তির বাহকমাত্র। জড়শরীর না থাকিলে অন্তঃশক্তি ও বাহ্যশক্তির মিলন হইতে পারিত না, সুতরাং প্রতীতিও হইতে পারিত না। তবেই দেখা যাইতেছে, প্রতীতির অস্তিত্ব জড়শরীরের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করিতেছে। জড়শরীর না থাকিলে জ্ঞানের সম্ভাবনা থাকে না, সুতরাং জ্ঞান-সমূহের সমষ্টি যে 'আত্মা,' তাহারও অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু এই জড়শরীরের ধ্বংস আছে, দেখা যাইতেছে। জড়ের ধ্বংস না থাকিতে পারে, কিন্তু এই জড়-শরীরের "শরীরত্বের" ধ্বংস অবশ্যই আছে। জড়শরীরের ধ্বংস আছে কি না, এ প্রশ্ন অর্থশূন্য বোধ হয় না। ধ্বংস থাকুক বা না থাকুক, সকলেই অন্ততঃ এ

কথা স্বীকার করিবেন যে, কোন সময়ে এই জড় শরীরের কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়, এবং বাহিরের শক্তি ভিতরে এবং ভিতরের শক্তি বাহিরে বহন করিয়া লইয়া যাইবার ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায়। যখন জড়শরীর এই দশা প্রাপ্ত হয়, তখন জ্ঞানের ধারাবাহিকতা নষ্ট হয় কি না, এ প্রশ্ন অর্থশূন্য কিসে ?

আত্মা ছাড়িয়া কাল না থাকিতে পারে, তাহাতে আত্মা বিনাশী কি অবিনাশী, এ প্রশ্ন অর্থশূন্য হয় কিসে? জড়শরীর বা অন্যান্য পদার্থ বিনাশী কিং অবিনাশী, অন্ততঃ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় কি না, এ প্রশ্ন যদি সম্ভব হয়, তবে আত্মা বিনাশী, কি না, এ প্রশ্ন নিরর্থক হইবে কেন ? যখন যদুর জড়শরীর ধ্বংস হইল (অথবা তাহার শরীরের শরীরত্বের ধ্বংস হইল) তখন তাহার আত্মা সেই সঙ্গে লয় প্রাপ্ত হইল, কি অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইল, এ কথা নিরর্থক হইবে কেন, বুঝিতে পারি না। তিন বৎসর হইল, যদুর জন্ম হইয়াছে। তাহার জড়শরীরের সৃষ্টির পূর্ব্বে তাহার আত্মার অস্তিত্ব অবশ্য বুদ্ধির অগম্য। কেন না, জড়শরীর না থাকিলে ইন্দ্রিয়ানুভূত প্রতীতির অস্তিত্বের সম্ভাবনা থাকে না, সুতরাং আত্মারও (প্রতীতিসমষ্টির) অস্তিত্ব থাকে না। গত কল্য যদুর জড়শরীর ধ্বংস হইয়াছে। "আত্মা" যাহাকে আশ্রয় করিয়াছিল, যাহা না থাকিলে আত্মা থাকিতে পারে না, তাহার ধ্বংস হইল ; "আত্মার" ধ্বংস হইল কি না, এ প্রশ্ন অর্থশূন্য কিসে ?

আরও একটা বিষয়ে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। রামেন্দ্র বাবু বলিতেছেন, "জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞাতা আমাদের অনুমান বা কল্পনামাত্র, তাহা কোন রূপ যুক্তি দ্বারা সিদ্ধ হয় না। সেরূপ একটা কিছু থাকিতে পারে ; তবে তাহার সম্বন্ধে কিছুই জানি না।"

জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞাতা আমাদের কল্পনা কিম্বা তাহার স্বপক্ষে কোন যুক্তি আছে, তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। রামেন্দ্র বাবুর "আত্মার" উল্লিখিত দ্বিতীয় সংজ্ঞাতে এই জ্ঞাতার অস্তিত্বের প্রমাণ পাইতেছি। জ্ঞাতা কেহ না থাকিলে "খণ্ডজ্ঞানগুলির সম্বন্ধবিচার, তাহাদিগের পার্থক্যানুসারে সাজান এবং আপনার বলিয়া চিনিয়া লওয়া" প্রভৃতি কার্য্য হইতে পারে না।

রামেন্দ্র বাবু বলিতেছেন, "জ্ঞাতা কেহ থাকিলেও আমরা তাহার সম্বন্ধে কিছুই জানি না।" "কিছুই জানি না" এ কেমন কথা ? জ্ঞাতার কেহ আছে, তাহা জানি ; তাহার কার্য্য কি, তাহাও জানি ; ইহা স্বভাবতঃ জ্ঞানাতিরিক্ত কোন পদার্থ, তাহাও জানি ; কোথায় থাকিয়া কি ভাবে কার্য্য করিতেছে,

তাহাও জানি; ইহার ধ্বংস আছে কি না, তাহাও জানি না। যে পদার্থের বিষয় এত দূর জানি, তাহার সম্বন্ধে "কিছুই জানি না" বলা যাইতে পারে কিরূপে? এইমাত্র বলা যাইতে পারে, তাহার স্বরূপ জানি না। কারণ, ইহা বাক্য, মন, বুদ্ধির অতীত; ইহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। কিন্তু কোন পদার্থকে সম্পূর্ণরূপে জানি না, এবং তাহার সম্বন্ধে কিছুই জানি না, দুইটি এক কথা কি? সম্পূর্ণরূপে অনেক পদার্থই জানি না। মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে আমি সম্পূর্ণরূপে জানি না; তাঁহাকে কখনও দেখি নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই জানি না, এ কথা বলিতে পারি না। অবশ্য মহারাণীকে জানা এবং আত্মাকে জানা, এই দুইটি কার্য্যের মধ্যে সাধারণ চক্ষে অনেক প্রভেদ আছে। কেহ বলিতে পারেন, ইংলণ্ডে গেলেই মহারাণীকে দেখা যাইতে পারে, এবং তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে জানা যাইতে পারে—কিন্তু আত্মাকে কোন অবস্থাতেই জানা যাইতে পারে না। আমরা এ কথা ঠিক স্বীকার করিতে পারি না। "আত্মা" সকল অবস্থাতেই জ্ঞানাতীত, ইহা স্বীকার্য্য নহে। অধ্যবসায়, চিত্তশুদ্ধি এবং সাধনা দ্বারা "আত্মাকে" অনেক মহাপুরুষ জানিতে পারেন, ইহা সম্ভব মনে করি। আত্মার স্বরূপ কেহ বর্ণনা করিতে পারেন না, অর্থাৎ আত্মা বর্ণনাতীত; ইহার অধিক স্বীকার করিতে পারি না। স্বীকার করিতে পারি না, কারণ ইহার অধিক স্বীকার করিবার কোন কারণ দেখি না। যাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে কিছুই বুঝিতে পারি না, আমাদিগের বর্ত্তমান অনুভূতির গ্রাহ্য নহে, কেবলমাত্র ইহাই ইহার নাস্তিত্বের যথেষ্ট কারণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

আমরা স্বাধীন ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া যে সকল কার্য্য করি, তাহা প্রতীতি দ্বারা কিরূপে বুঝান যাইতে পারে, জানি না। যাহার প্রতীতি কখনও হয় নাই, যাহা ভবিষ্যতে হইবে, এরূপ কোন বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা হয় কেন? প্রতীতি দ্বারা ইহার কি যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে?

শ্রীযোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

কেশের বর্ণ-বৈচিত্র্য।

প্রাকৃতিক ব্যাপারগুলির মধ্যে কেশ ও পালকাদির বর্ণ-বৈচিত্র্য বিষয়টি লইয়া অনেকগুলি খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক বহু দিন হইতে নানা গবেষণায় নিযুক্ত আছেন, এবং বর্ণ-বৈচিত্র্যের কারণ উল্লেখ করিয়া সুযুক্তিপূর্ণ কয়েকটি প্রবন্ধও প্রকাশিত করিয়াছেন। এই বিষয়টির প্রচলিত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করিবার সময় চিরপ্রথানুসারে সিদ্ধান্তটি উড়াইয়া দিবার জন্য নানা দিক্ হইতে মহা আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, প্রতিদ্বন্দিগণের চেষ্টা, সিদ্ধান্তীগণের সুন্দর যুক্তি দ্বারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে।

কেশের বর্ণপরিবর্ত্তনকালে, পুরাতন কেশ সকল ক্রমে বর্ণান্তর প্রাপ্ত হয়, —অথবা গলিত কেশের স্থানে নূতন কেশ উদ্গত হইয়া অবস্থান্তরিত হয়,— বৈজ্ঞানিকগণ প্রথমতঃ এই প্রশ্নটির মীমাংসায় নিযুক্ত হন। প্রাচীন শারীরশাস্ত্রবিৎগণের মধ্যে হেব্রা ও ক্যাসপি প্রভৃতি কয়েকজন পণ্ডিত, কেশের সহিত শারীরিক যন্ত্রাদির কোনও সাক্ষাৎসম্বন্ধ নাই দেখিয়া, পুরাতন কেশ শরীরচ্যুত হইলে ভ্রষ্টকেশস্থানে রঞ্জিত কেশ উদ্গত হয়, এবং কেশ সকল অধিক কাল শরীরস্থ থাকিলেও কখনও কখনও তাহাদের ক্রমিক বর্ণ-বিপর্য্যয় ঘটে, এই স্থির করেন। কিন্তু আজকাল এই সিদ্ধান্তটি অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে না; কেশের বর্ণ-বৈচিত্র্য যে শারীরিক যন্ত্রাদির পরিবর্ত্তনের সহিত সম্বদ্ধ, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ তাহা বেশ প্রমাণ করিয়াছেন। বয়সাধিক্য প্রযুক্ত ও স্থানীয় জল বায়ু ইত্যাদি দ্বারা কেশাদির বর্ণ-বৈলক্ষণ্য হওয়া ব্যতীত, চিকিৎসাগ্রন্থাদিতে বর্ণ-বৈচিত্র্যের আরও অনেক বিস্ময়কর উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। এক রাত্রে ভ্রমরকৃষ্ণ কেশ তুষারধবল হইয়া গিয়াছে, এরূপ অনেক গল্প প্রচলিত আছে; কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট এই গুলি আজ কাল বড় অমূলক গল্প নয়,—ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই যে বাস্তবিক ঘটনা, এবং আকস্মিক শোকহর্ষাদি যে এই অদ্ভুত অবস্থান্তরের একটি কারণ, তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। ইতিহাস ও সাহিত্যাদিতে কেশের এই প্রকার আকস্মিক বর্ণপরিবর্ত্তনের অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়;—কথিত আছে, রাণী মেরি ফ্রান্সের সুপ্রসিদ্ধ রাষ্ট্র-বিপ্লবের সময়, প্রজাদিগের বিদ্রোহাচরণে ও নির্দ্দয় ব্যবহারে এত উৎকণ্ঠিতা ও ভীতা হইয়াছিলেন যে, তাঁহার মস্তকস্থ সমস্ত

কেশই অতি অল্প কালের মধ্যে শুক্লতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ইংরাজ কবি লর্ড বায়রণ, তাঁহার একটি কবিতায় এই প্রকার ঘটনার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, বিজ্ঞানবিৎগণের মধ্যে অনেকেই এই সকল ঘটনা বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু অল্প দিন গত হইল, কয়েকটি আধুনিক বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসালয়ের কার্য্যবিবরণী হইতে এই প্রকার অদ্ভুত ঘটনার অনেক বিবরণ সংগ্রহ করিয়া ও তাহার কারণ উল্লেখ করিয়া, এক খানি সুযুক্তিপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া, সকল সন্দেহ অপনীত করিয়াছেন। সংগৃহীত ঘটনাবলীর দুই একটি অতীব বিস্ময়কর,—ডাক্তার উইলিয়ম ডিইস, তাঁহার চিকিৎসাধীন একটি রোগীর শরীর হইতে অত্যধিক শোণিতস্রাব হওয়ায়, রোগীর মস্তকস্থ সমগ্র কেশ কয়েক মুহূর্ত্তমধ্যে সম্পূর্ণ শুভ্র হইতে, স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এবং এই ঘটনার পরবর্ত্তী তিন দিবসের মধ্যে কেশের পূর্ব্ববর্ণ পুনঃপ্রাপ্ত হইতে দেখিয়া আরও বিস্মিত হইয়াছিলেন। ৪৮ বৎসর বয়স্ক ভারতবর্ষস্থ একটি ইংরাজসৈনিক বহুকাল পীড়িত থাকায়, তাহার শরীরস্থ সমগ্র কেশই পক্ক হইয়া যায়; কিন্তু স্বদেশে গিয়া স্বাস্থ্যলাভ করিবার পর, সৈনিকের পলিত কেশ অচিরাৎ পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত এক খানি চিকিৎসাপত্রে * আরও কয়েকটি অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের কথা লিখিত আছে।—দ্বাবিংশবর্ষীয় একটি যুবক, জুয়াখেলায় অনেকগুলি টাকা লাভ করিয়া, মহা হৃষ্ট হইয়াছিল; এই আকস্মিক উত্তেজনার ফলে, যুবকটির মসী কৃষ্ণ কেশরাশি মুহূর্ত্তে শ্বেতবর্ণ হইয়াছিল; আকস্মিক বর্ণবৈচিত্র্যসংঘটন প্রসঙ্গে এই পত্রে আরও লিখিত আছে যে, প্রশান্তসাগরীয় দ্বীপস্থ অধিবাসীবর্গের কেশ, বয়োবৃদ্ধির সহিত ধীরে ধীরে পক্ক হয় না, বৃদ্ধাবস্থায় কোনও প্রকার মানসিক উত্তেজনা উপস্থিত হইলেই হঠাৎ সমগ্র কেশ শুভ্র হইয়া যায়।

কেশাদির এই প্রকার বর্ণ-বৈচিত্র্য দেখিয়া ইহার প্রকৃত কারণান্বেষণে কেহই বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন না। স্বনামপ্রসিদ্ধ ব্রাউন সিকোয়ার্ড প্রথমতঃ এ বিষয়ের গবেষণায় প্রথম নিযুক্ত হন। কথিত আছে, এক দিন স্বীয় কৃষ্ণ শ্মশ্রুতে একটি পক্ক কেশ দেখিতে পাইয়া, তাহা সমূলে উৎপাটন করেন; কয়েক দিনের মধ্যে পক্ক কেশের সংখ্যা অতি শীঘ্র বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া কেশপক্কতার কারণ অনুসন্ধানে মনোনিবেশ করেন। ইনিই স্বীয় কেশের পক্কতাবৃদ্ধি পরীক্ষা করিয়া প্রচার করেন যে, কেশের পরিবর্ত্তনকালে, পুরাতন কেশ

* Boston Medical and Surgical journal. 1851.

শরীরভ্রষ্ট হয় না, শরীরস্থ কেশ সকলই বিকৃতবর্ণ হইয়া যায়। লিকোরার্ড অনুবীক্ষণযন্ত্রাদি দ্বারা গলিত কেশ পরীক্ষা করিয়া, কেশমূলস্থ গ্রন্থির অস্বাভাবিক সঙ্কোচন ও গ্রন্থি বায়বীয় পদার্থ দ্বারা পূর্ণ দেখিয়া, এই অবস্থান্তরই বর্ণবৈচিত্র্যের কারণ বলিয়া স্থির করেন। এতদ্ব্যতীত বর্ণপরিবর্ত্তনের আরও কয়েকটি অভিনব ঘটনা আবিষ্কার করিয়া, পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকগণের অনুসন্ধানবিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিয়া গিয়াছেন, এবং কয়েক ব্যক্তির কেশের বর্ণ ঋতুপরিবর্ত্তনের সহিত নানা বর্ণে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখিয়া, বর্ণ-বৈচিত্র্যে ঋতুর কতকটা প্রভাব আছে স্থির করেন। প্রথমতঃ, অনেকেই এই বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কারের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন, কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণ উৎকৃষ্ট যন্ত্রাদির সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া ইঁহার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

ইহার পর, এলিবার্ট সাহেব কিছু দিন এই বর্ণবৈচিত্র বিষয়টি লইয়া নিযুক্ত ছিলেন, এবং তাঁহার গবেষণার ফল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধাকারে সময়ে সময়ে সাধারণে প্রকাশিতও করিয়াছেন; তাহার মধ্যে দুই একটি ঘটনা বিশেষ কৌতূহলজনক ও উল্লেখযোগ্য। সাহেবের পরিচিত একটি যুবকের সাংঘাতিক পীড়া হইয়া তাহার মস্তক এককালে কেশশূন্য হইয়া যায়; কিন্তু রোগী সুস্থ হইলে কেশের পূর্ব্ববর্ণ আর ফিরিল না,—উহা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া লোহিত কেশে মস্তক পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। আর একটি উন্মত্তা বালিকার সুচিক্কণ কৃষ্ণ কেশের পরিবর্ত্তনের কথাও তাঁহার গ্রন্থে লিখিত আছে; বালিকাটি সম্পূর্ণ উন্মত্তা ছিল না, মধ্যে মধ্যে সংজ্ঞা লাভ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, উন্মাদ অবস্থায় বালিকার কেশ লোহিতবর্ণ হইয়া যাইত, এবং সসংজ্ঞাবস্থায় কেশের কোনরূপ বর্ণবৈলক্ষণ্য হইত না। *

বোধ হয়, অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, মানব-দেহস্থ কেশের বর্ণ-বৈচিত্র্য অপেক্ষা পক্ষী ও অন্যান্য ইতর প্রাণীর পালক ও লোমাদির বর্ণ-বৈচিত্র্য অতি শীঘ্র ঘটিয়া থাকে, এবং ইহা একটি সহজদৃশ্য ব্যাপার। ইহাদের গাত্রাবরণের

---

* অল্প দিন হইল, আমার একটি বন্ধু গল্প করিয়াছিলেন যে, তিনি একটি পরিচিত ও সহাধ্যায়ী যুবকের কেশের অত্যাশ্চর্য্য বর্ণপরিবর্ত্তন হইতে দেখিয়াছিলেন;—বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার দিন নিকটবর্ত্তী হইলেই যুবকটির কেশ দুই একটি করিয়া পাকিতে আরম্ভ হইত, পরে পরীক্ষাসময়ে অর্দ্ধাধিক কেশ শুভ্র হইয়া যাইত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, পরীক্ষান্তে কিছু দিনের মধ্যেই কেশ সকল পুনরায় স্বাভাবিক বর্ণ প্রাপ্ত হইত।

বর্ণ-বৈলক্ষণ্য প্রায়ই ঋতুপরিবর্ত্তনের সহিত সংঘটিত হইতে দেখা যায়। পুরাতন পালকাদি অভিনব বর্ণ প্রাপ্ত হয়, অথবা পালক গলিত হইলে শূন্য স্থানে রঞ্জিত পালক উদ্গত হয়, এই পুরাতন কথাটির মীমাংসার জন্য প্রাণিতত্ত্ববিৎগণও কিছু দিন মহা সমস্যায় পড়িয়াছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ পণ্ডিতগণ অবিসম্বাদে একমত হইয়া, পূর্ব্বোল্লিখিত উভয় উপায়ই বর্ণ-বৈচিত্র্যের কারণ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। শারীরতত্ত্ববিৎগণ বলেন, ঋতুপরিবর্ত্তনকালে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের চর্ম্মের কিঞ্চিৎ অবস্থান্তর হয়, এবং ইহা দ্বারাই পশুগাত্রস্থ লোমাদিরও বর্ণবিপর্য্যয় ঘটে। হিমপ্রধান দেশে টিট্টিভজাতীয় এক প্রকার পক্ষীর পালক গ্রীষ্মকালে কৃষ্ণবর্ণ থাকে, কিন্তু শীতাগমে শ্বেতবর্ণ হইয়া যায়। গল নামক একজাতীয় সমুদ্রচর পক্ষীর পালকও উক্তপ্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই সকল পক্ষীর বর্ণপরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে, ইহাদের চর্ম্মের অবস্থান্তর হয় বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত ভুক্তখাদ্যের দ্বারা ইতর প্রাণিদের গাত্রাবরণের বর্ণ-বৈলক্ষণ্য হইতে দেখা যায়। ক্যানারি পক্ষিগণকে অন্যান্য খাদ্যের সহিত কিছু দিন নিয়মিতরূপে ঝাল খাইত দিলে, তাহাদের শাবকগণের বর্ণ ক্যানারির জাতীয় বর্ণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া, প্রথম হইতেই লোহিত পালক উদ্গত হইতে থাকে। আমেজান নদীর তীরবর্ত্তী অসভ্যজাতিগণ এই প্রকারে পক্ষিগণের খাদ্যপরিবর্ত্তন করিয়া নানাবিধ বিচিত্রবর্ণের পক্ষী উৎপাদন করিয়া থাকে। একজাতীয় পক্ষীর মধ্যে নানাবর্ণের পক্ষী জন্মাইয়া বিক্রয় করা এই জাতির মধ্যে একটি বিশেষ লাভজনক উপজীবিকা। একজাতীয় মৎস্যের বসা আহার করাইয়া হরিৎবর্ণ শুকগণকে ইহারা অনায়াসেই সুদৃশ্য পীত ও লোহিত বর্ণের পক্ষী করিয়া তোলে। অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, বন্যপক্ষী পিঞ্জরাবদ্ধ হইলে কিয়ৎ দিনের মধ্যেই ইহার পূর্ব্ব বর্ণের ব্যতিক্রম হইতে আরম্ভ হয়। প্রাণিতত্ত্ববিৎগণ স্থির করিয়াছেন, পক্ষী স্বচ্ছন্দাবস্থায় বনে যে সকল খাদ্য আহার করিত, পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া সেই সকল আহার্য্য না পাওয়ায়, এই বর্ণপরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। পশুশালাস্থ বিদেশীয় পক্ষিগণের মধ্যে এই ঘটনা প্রায়ই লক্ষিত হয়, এই জন্য য়ুরোপীয় পশুশালাসমূহে, বর্ণবৈলক্ষণ্য হইলে স্বাভাবিক বর্ণ পুনঃপ্রাপনের জন্য, বিকৃতবর্ণ পক্ষিগণকে কিছু দিনের জন্য তাহাদের জন্মভূমিতে রাখা হইত; কিন্তু আজ কাল পশুশালায় আর এ নিয়ম নাই, বিকৃতবর্ণ পক্ষীকে এখন প্রায়ই ইহার প্রকৃতবর্ণরক্ষণশীল খাদ্যের অনু-

রূপ কৃত্রিম খাদ্য প্রদত্ত হইয়া থাকে। নিয়মিতরূপে এই খাদ্য কিছু দিন ভুক্ত হইলে, পক্ষিগণ পূর্ব্ব বর্ণ শীঘ্র পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। মিঃ ওয়েষ্টম্যান নামক জনৈক পশুপালক, আজ কাল নানাপ্রকারে পূর্ব্বোক্ত কৃত্রিম খাদ্য প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এবং ইহা দ্বারা পশুগণের বর্ণোদ্ধারেও কৃতকার্য্য হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সকল খাদ্যের প্রস্তুতক্রিয়া আজও সাধারণে প্রকাশ করেন নাই। খাদ্য দ্বারা কেশের বর্ণবৈচিত্র্য ব্যতীত, অনেক সময় জীব-শরীরের অন্যান্য অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়া থাকে। কয়েক জাতীয় রঙ্গিন্ গুল্ম আহার করিলে শূকরাদি জন্তুদিগের অস্থি লোহিত-বর্ণ হইয়া যায়; শারীরতত্ত্ববিৎগণ জীবদেহের অস্থি-সংস্থানক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিবার জন্য, শূকরকে কিছু দিন উক্ত গুল্ম আহার করাইয়া, পরে তাহার অস্থির রঞ্জিতাংশ শ্বেতবর্ণ স্বাভাবিক অস্থি হইতে পৃথক্ রাখিয়া, নানা পরীক্ষাদি করিয়া থাকেন।

হেনসিন্জার নামক জনৈক খ্যাতনামা পণ্ডিত বর্ণ-বৈচিত্র্য বিষয়ের অনুসন্ধানে অনেক দিন নিযুক্ত থাকিয়া কয়েকটি নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাঁর মতে, জীবদেহের বহিরাবরণের বর্ণ-বৈচিত্র্য কেবলমাত্র শোভার্থে হয় নাই; একই জাতীয় জীবের মধ্যে বর্ণ-বৈচিত্র্য থাকিলে, বর্ণানুসারে ইহাদের প্রতিকূল বাততাপ ও অন্যান্য কঠোরতা সহ্য করিবার ক্ষমতারও ন্যূনাধিক্য হইতে দেখা যায়। শ্বেত মেষ ও শূকরাদি পশুগণ একজাতীয় গুল্মমূল আহার করিলে অত্যন্ত পীড়িত হয়, কিন্তু সেই মূলই কৃষ্ণলোম মেষ কর্ত্তৃক পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভুক্ত হইলেও কোনও অসুস্থতা উৎপাদন করে না। হেনসিন্জার সাহেব তাঁহার এক খানি গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ভার্জ্জিয়ানায় ভ্রমণকালে তৎপ্রদেশে কেবলমাত্র কৃষ্ণ শূকরের পাল দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন, এবং জনৈক শূকরব্যবসায়ীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলেন যে, অন্য বর্ণের শূকর ভার্জ্জিয়ানাতে আনীত হইলেই, দুই এক দিবসের মধ্যে তাহাদের এক সাংঘাতিক রোগ জন্মিয়া থাকে, এবং সেই রোগের কবল হইতে পশুগণকে কোনও ক্রমেই রক্ষা করিতে পারা যায় না।

মৎস্য প্রভৃতি জলচর জীব ও অনেক স্থলচর প্রাণিগণের মধ্যে, বহিরাবরণের বর্ণপরিবর্ত্তন অনেকটা ঐ সকল জীবগণের ইচ্ছাধীন ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। পচেট সাহেব তাঁহার এক খানি গ্রন্থে * বর্ণবৈচিত্র্যপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,

* "Mech anism of change of color in fishes and crustaceans."

যে, চর্ম্মস্থ সঙ্কোচনশীল বর্ণকোষ দ্বারা, ইহাদের বর্ণপরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। এই সকল বর্ণকোষ পৃথক স্নায়ু দ্বারা শারীরিক অন্যান্য যন্ত্রাদির সহিত সংবদ্ধ থাকে, এবং প্রাণিগণের ইচ্ছানুসারে, কোষ সকলের সঙ্কোচন ও প্রসারণে, বর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়। সাহেবটি বহু চেষ্টা ও যত্নে, কয়েক জাতীয় মৎস্যের শরীরের কোন্ স্থানে উক্ত বর্ণস্নায়ু থাকে, তাহাও নির্দ্ধারিত করিয়া গিয়াছেন, এবং মৎস্যশরীরের ঐ সকল স্নায়ু কোনও উপায়ে কাটিয়া দিলে, ইহাদের বর্ণপরিবর্ত্তনক্ষমতা যে এককালে লুপ্ত হয়, তাহাও দেখাইয়াছেন।

"জগতের কোনও পদার্থ জগদীশ্বর কর্ত্তৃক বৃথা সৃষ্ট হয় নাই," এই প্রাচীন বাক্যটির প্রত্যেক অক্ষরই সত্য। চন্দ্র সূর্য্যের নিয়মিত উদয়াস্ত হইতে, প্রাণিহীন শৈলশিখরস্থ একটি আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদাণুর ক্রমিক উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও ধ্বংস প্রভৃতি, অতি ক্ষুদ্র প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর মধ্যে, একই মহৎ সত্য নিহিত রহিয়াছে। প্রাণিতত্ত্ববিৎগণ বর্ণবৈচিত্র্যের কারণান্বেষণে বহুকাল নিযুক্ত থাকিয়া, শত্রুকবল হইতে লুক্কায়িত থাকিয়া বংশসংরক্ষণ করা ও যৌন-নির্ব্বাচন, এই দুইটিই ইতর প্রাণিদের বর্ণবৈচিত্র্যের প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শীতপ্রধান দেশে পক্ষী ও অন্যান্য জীবগণের গাত্রাবরণ স্বভাবতঃ শ্বেতবর্ণ হয় বলিয়াই, এই প্রাণিগণ শুভ্র তুষাররাশির বর্ণের সহিত মিশিয়া গিয়া, শত্রুর অলক্ষিতভাবে স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে পারে; প্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্ববিৎ ডারুইন বলেন, সৃষ্টিকাল হইতে এই সকল জীবগণের বর্ণ শ্বেত ছিল না; কোনও আকস্মিক ঘটনাক্রমে ইহাদের মধ্যে কতকগুলির বর্ণ শ্বেত হইয়া গিয়াছিল, এবং এই শ্বেত প্রাণিগণ, ইহাদের বর্ণপরিবর্ত্তনের জন্য, শ্বেত তুষাররাশির মধ্যে অনায়াসেই লুক্কায়িত থাকিয়া প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের নিয়মানুসারে স্ব স্ব বংশ ক্রমেই বিস্তৃত করিয়াছে। ডারুইন সাহেব আরও বলেন, জীবগণের বর্ণ-বৈচিত্র্য যৌননির্ব্বাচনের বিশেষ সহায়তা করে, এবং এইটিই বর্ণপরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ। মনুষ্যের ন্যায় উচ্চবৃত্তিসম্পন্ন জীবের মত অন্যান্য প্রাণিগণের মধ্যে সৌন্দর্য্যানুভূতি শক্তি আছে; এই শক্তি দ্বারা স্ত্রীজাতি পুরুষ বাছিয়া লয়, এবং সম্মিলন দ্বারা বংশপরম্পরায় সৌন্দর্য্যের ক্রমবিকাশ হইয়া পড়ে। ডারুইনের এই যৌননির্ব্বাচন সিদ্ধান্তটি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে, বর্ণবৈচিত্র্য ব্যাপারের উদ্দেশ্যটা কিঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম হয় বটে, কিন্তু ইতর প্রাণিদের মধ্যে সুতীক্ষ্ণ সৌন্দর্য্যানুভূতিক্ষমতার অস্তিত্ব হঠাৎ কল্পনা করাটাও বড় অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। ময়ূরের সুন্দর পুচ্ছ এবং তাহাতে বিচিত্র বর্ণের অজ্ঞা-

শর্যা সংযোগ ও পক্ষবিন্যাসের কারিগরি যে কেবল মাত্র গর্ব্বিতা ময়ুরীকে ভুলাইবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা বলিতে স্বতঃই কেমন একটা সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয়।

পূর্ব্বে কেশের বর্ণপরিবর্ত্তন ও ইতর প্রাণিদের লোমাদির বর্ণ-বৈচিত্র্যের যে সকল উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে, কি উপায়ে এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হয়, বৈজ্ঞানিকগণ তাহার বিজ্ঞানসম্মত কারণ আবিষ্কারের জন্য অনেক চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু আজও বিশেষ সন্তোষজনক কারণ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। ইঁহারা স্থির করিয়াছেন, কেশাদির মূলদেশে এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি থাকে; এই সকল গ্রন্থিতে জীব-শোণিত হইতে এক প্রকার বর্ণরস সঞ্চিত হয়, স্বাভাবিক অবস্থায় কেশবৃদ্ধিসময়ে, কেশস্থ কোষ সকল উক্ত সঞ্চিতবর্ণে পরিপূর্ণ থাকিয়া, কেশ রঞ্জিত করিয়া তুলে; কেশাদির স্বাভাবিক বর্ণের গাঢ়তা, এই গ্রন্থিস্থ বর্ণের পরিমাণ দ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকে। যে প্রাণিশরীরে কেশগ্রন্থি অতি স্থূল, এবং অল্প সময়ের মধ্যে অধিকপরিমিত বর্ণ-রস সঞ্চিত হয়, তাহাদের কেশ প্রায়ই কর্কশ ও বর্দ্ধনশীল হইতে দেখা যায়।

মানসিক উদ্বেগাদি দ্বারা আকস্মিক বর্ণবৈকল্যের বৈজ্ঞানিক কারণও আজ কাল এই কেশগ্রন্থির অবস্থাভেদ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। কেশ উদ্গত হইলে, শারীরিক কোনও যন্ত্রাদির সহিত যদিও ইহার কোনও স্নায়বিক বা অন্য কোনও প্রকার প্রত্যক্ষ সংযোগ থাকে না বটে, কিন্তু পৃথক গুরুত্ব-বিশিষ্ট তরল পদার্থ সকলের একত্র সংমিশ্রণ গুণ দ্বারা কেশগ্রন্থিস্থ সঞ্চিত বর্ণের সহিত, ইহার বর্দ্ধিতাংশের কোষস্থ বর্ণের কিঞ্চিৎ যোগ থাকে। ইহা দ্বারাই কেশগ্রন্থিস্থ বর্ণের কোনও পরিবর্ত্তন ঘটিলে, সমগ্র কেশের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। প্রাণীশরীর পীড়া ও বয়সের আধিক্যে বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, শরীরাবরণস্থ সমগ্র কেশ রঞ্জিত করিবার জন্য যে পরিমাণ বর্ণরস আবশ্যক, তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প কেশগ্রন্থিতে সঞ্চিত হইতে থাকে; কাজেই গ্রন্থি সকল রসাভাবে ক্রমেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, এবং কেশও বিকৃতবর্ণ হইয়া যায়।

এই বিকৃতবর্ণ কেশসকল অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে, ইহাদের গ্রন্থিতে বর্ণরসের স্থানে এক প্রকার বায়বীয় পদার্থ দৃষ্ট হয়। ইহা কি প্রকারে কেশগ্রন্থিতে উৎপন্ন হয়, তাহা আজও বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিতে পারেন নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন, বর্ণরস বিশ্লিষ্ট হইয়া উক্ত বায়বীয় পদার্থ উৎপন্ন হয়।

শরীরস্থ উত্তেজক পেশী সকল কেশের বর্ণবৈচিত্র্যসম্পাদনে অনেক সহায়তা করে। এই সূক্ষ্ম পেশীসকল কেশগ্রন্থিমধ্যে বিস্তৃত থাকে; কোনও কারণে এ গুলি সঙ্কুচিত হইলে, গ্রন্থি সকলও সঙ্কুচিত হইয়া তৎসংলগ্ন কেশগুলিকে স্ফুরিত করিয়া তুলে। আকস্মিক শোকহর্ষাদি দ্বারা পূর্ব্বোক্ত পেশীসাহায্যে রোমস্ফুরণ হইয়া থাকে, সুতরাং তদ্দ্বারা গ্রন্থিসঙ্কোচনজনিত, লোমের বর্ণ-বৈচিত্র্য সংঘটিত হওয়া, কিছুই বিচিত্র নয়।

শীতাতপাদি প্রাকৃতিক অবস্থা দ্বারা প্রাণিশরীরের বর্ণ-বৈচিত্র্যের কয়েকটি উদাহরণ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে; এই সকল অদ্ভুত ঘটনার কারণ বলিতে গিয়া অনেকে নানা কথা বলিয়াছেন। তন্মধ্যে অধিকাংশ পণ্ডিতই বলেন যে, শীতপ্রধান দেশে শৈত্য প্রযুক্ত প্রাণিদিগের চর্ম্ম স্বতঃই সঙ্কুচিত হইয়া যায়, এবং এই সঙ্গে কেশগ্রন্থিসকলও সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। এই প্রকারে গ্রন্থিসকল ক্ষুদ্রায়তন হইয়া পড়ায়, কেশের স্বাভাবিক বর্ণ-সংরক্ষণার্থ আবশ্যক রস উপযুক্ত পরিমাণে সঞ্চিত থাকে না, কাজেই কেশসকল স্বাভাবিক বর্ণ-রসহীন হইয়া, প্রায়ই শ্বেতবর্ণ হইয়া যায়।

আমরা বিভিন্ন মানবজাতির মধ্যে, কেশের নানা বর্ণ-বৈচিত্র্য প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, এবং পৃথক পৃথক জাতির মধ্যে এই বর্ণবৈচিত্র্য এত অধিক যে, কেশ পরীক্ষা দ্বারা কে কোন জাতির অন্তর্গত, তাহা অনায়াসেই স্থির করিতে পারা যায়। এই জাতীয় বর্ণপার্থক্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আজও কেহ প্রচার করেন নাই; তবে কেহ কেহ অনুমান করেন, খাদ্যভেদ ইহার একটি কারণ। যাহা হউক, বিজ্ঞানের যে প্রকার ক্রমিক উন্নতি দেখা যাইতেছে, তাহাতে আশা করা যায়, ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই ইহার যথার্থ কারণ আবিষ্কৃত হইবে, এবং কেশাদির জাতিগত স্বাভাবিক বর্ণপরিবর্ত্তনরহস্য মনুষ্যের সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইবে।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

মীরকাশেম।

তৃতীয় প্রস্তাব।

মীরকাশেম, সুদূর মুঙ্গেরে বসিয়া আত্মরক্ষার্থ ও পদমর্য্যাদার গৌরব রক্ষার জন্য যে আয়োজন করিতেছিলেন, তাহার কতকগুলি বিশেষ কারণ উপ-

স্থিত হইয়াছিল। সে কারণগুলির উল্লেখ না করিলে তাঁহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পাঠকবর্গের অন্যায় সন্দেহ জন্মিতে পারে।

পূর্ব্ব প্রস্তাবে আমরা দেখাইয়াছি, কলিকাতা কৌন্সিল সেই সময়ে যথেচ্ছাচারের উচ্চ সীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। অর্থগৃধ্নুতা তাঁহাদের সমস্ত সৎপ্রবৃত্তির লোপ করিয়া দিয়াছিল। কোম্পানীর নিকট তাঁহারা যে বেতন পাইতেন, তাহা ছাড়া ব্যবসা বাণিজ্য তাঁহাদের অর্থাগমের একটি প্রধান উপায় ছিল। দেশের মধ্যে ও বাহিরে তাঁহারা নৌকা করিয়া মাল চালান দিয়া ব্যবসা করিতেন। তাহাতে বিলক্ষণ লাভও ছিল।

কতকগুলি পণ্যদ্রব্যে তাঁহাদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। এতদ্ব্যতীত ইংরাজ কোম্পানীর নিশান বা সিপাহী যে বাণিজ্য-নৌকার উপর থাকিত, তাহার আমদানী রপ্তানী শুল্ক ছিল না। দেশীয় বণিকেরা দেখিল, ইংরাজের সহায়তা পাইলে তাহারাও শুল্ক হইতে অব্যাহতি পায়। তাহারা উচ্চমূল্যে ইংরাজের নিকট হইতে ছাড় ও নৌকা ভাড়া করিতে লাগিল। নিজেদের নৌকায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চিহ্নিত পতাকা তুলিয়া বা সিপাহী খাড়া করিয়া, তাহারা নবাবের রাজস্বের মুণ্ডপাত করিতে লাগিল।"

প্রথমতঃ কোম্পানীর উচ্চপদস্থ দুই চারি জন কর্ম্মচারী একচেটিয়া বাণিজ্য করিবার উদ্দেশে, নবাবের নিকট এই ছাড় পাইয়াছিলেন। তাহার পর বাণিজ্যরোগ সংক্রামক হইয়া উঠিলে, কোম্পানীর ছোট বড় সকল কর্ম্মচারীই ব্যবসা ধরিলেন। তাঁহাদের নৌকায় কোম্পানীর নিশান ও সিপাহী থাকে,— সুতরাং নবাবের ঘাটোয়াল কিছুই বলিতে পারে না। দেশীয় বণিকেরা যখন আবার তাহাদের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া ছাড় ভাড়া লইতে লাগিল, তখন কুঠিঘরগুলির কার্য্য প্রায় নিশ্চল হইয়া উঠিল। নবাবের কর্ম্মচারীরা সাহস করিয়া দুই এক খানা জাল নৌকা ধরিয়া দিতে লাগিল, কিন্তু নিকটস্থ ইংরাজ ফ্যাক্টরীর কর্ম্মচারীরা নবাবের নিরীহ কর্ম্মচারীদিগকে সিপাহী দিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহাদের উপর অত্যাচার করিতে লাগিলেন।

ইহার পরিণাম এই হইল যে, সম্ভ্রান্ত দেশীয় বণিকেরা অপমান ও লাঞ্ছনার ভয়ে বাণিজ্যবৃত্তি ত্যাগ করিলেন। ব্যবসার অবনতির সঙ্গে সঙ্গে নবাবের রাজস্ব কমিতে লাগিল, দেশের ধনাগমের পথ রুদ্ধ হইল, দেশ দরিদ্র হইতে লাগিল; আর নানাবিধ অত্যাচারের পথ শত মুখে প্রসারিত হইয়া দেশে ঘোরতর অরাজকতা উপস্থিত করিল।

নবাব, ভান্সিটার্ট সাহেবকে পুনঃপুনঃ সমস্ত কথা জানাইতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। কলিকাতা কৌন্সিলে এক জন মাত্র সদস্য তাঁহার পক্ষাবলম্বী। ইহাঁর সহায়তায় তিনি কৌন্সিলে কিছুই করিতে পারেন না। শেষ ক্রমাগত উত্তেজনায়, সদস্যেরা এ সম্বন্ধে একটা রফা করিবার জন্য ভান্সিটার্ট সাহেবকে মীরকাশেমের নিকট পাঠাইলেন।

ভান্সিটার্ট মুঙ্গেরে নবাবের সহিত দেখা করিলেন। কয়েক দিন ধরিয়া কথাবার্ত্তা চলিল। পরিণাম যাহা দাঁড়াইল, তাহাতে ইংরাজেরই সুবিধা হইল। ইচ্ছা থাকিলেও ভান্সিটার্ট কলিকাতা কৌন্সিলের মন্তব্যের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে পারিলেন না। এই প্রকার অবাধ ও অযথা স্বাধীনতায় উভয় পক্ষেরই কিরূপ ক্ষতি, তাহা বুঝিতে পারিয়াও তিনি নবাবের পক্ষ সমর্থন করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের রফানামায় এই স্থির হইল,—বাণিজ্যদ্রব্যের উপর ইংরাজেরা শতকরা নয় টাকা, ও দেশীয় বণিকেরা শতকরা পঁচিশ টাকা শুল্ক প্রদান করিবেন। নবাবের রাজত্বের মধ্যে যে সমস্ত বাণিজ্যনৌকা চলাচল করিবে, তাহাদের ছাড়গুলি ইংরাজ-কোম্পানীর ও নবাবের কর্ম্মচারীদিগের যুক্ত স্বাক্ষরে স্বাক্ষরিত হইবে। মীরকাশেম নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা প্রকৃত ও স্থায়ী উপকার সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ সন্দেহ রহিল। প্রস্থানকালে নবাব, ভান্সিটার্টকে বলিয়া দিলেন, "আমি জানিতেছি, ইহাতে বিশেষ কোন ফল হইবে না, তথাপি আপনার অনুরোধে এই প্রকার প্রস্তাবে সম্মত হইতেছি। কয়েক মাস পরীক্ষার পর, যদি এরূপ দেখা যায় যে, আপনারা নিয়মগুলির যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেছেন, তাহা হইলে আমি আমার প্রজাগণকে ইংরাজদিগের ন্যায় পূর্ণ বাণিজ্যস্বত্ব প্রদান করিব।"

ভান্সিটার্ট যাহা করিয়া আসিলেন, কলিকাতা কৌন্সিল তাহার বিপরীত কার্য্য আরম্ভ করিলেন। এরূপ প্রস্তাবে তাঁহাদের স্বার্থের ও অযথা অর্থাগমের সম্পূর্ণ ক্ষতি। তাঁহারা ভান্সিটার্টের রফানামায় রাজি হইলেন না। কেবলমাত্র লবণের উপর তাঁহারা নবাবকে শুল্ক দিবেন, এবং অন্য প্রকার বাণিজ্যদ্রব্য সম্পূর্ণরূপে শুল্ক হইতে মুক্ত থাকিবে, এইরূপ প্রস্তাব করিলেন। ইংরাজ ও নবাবের কর্ম্মচারীর মধ্যে এই বাণিজ্যব্যাপার সম্বন্ধে যে সমস্ত বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইবে, তাহাও ইংরাজদিগের দ্বারা মীমাংসিত হইবে। নবাবের কর্ম্মচারীরা তাহাতে কোনও হস্তক্ষেপ করিবেন না, এ কথাও তাঁহারা বলিয়া বসিলেন।

কথাগুলি সমস্তই নবাবের কাণে উঠিল। দৃঢ়চেতা মীরকাসেম সমস্তই বুঝিলেন। ইহার পরিণাম যাহা হইবে, তাহা তিনি ভান্সিটার্টকে পূর্ব্বেই বলিয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণে নিজ প্রজার রক্ষার জন্য রাজ্য হইতে আমদানী শুল্ক উঠাইয়া দিবার ঘোষণা দিলেন। আবার দেশীয় বণিকদিগের অগণ্য বাণিজ্য-নৌকা বাঙ্গলার নদীবক্ষ পূর্ণ করিল।

কলিকাতা কৌন্সিল যখন এই সংবাদ পাইলেন, তখন তাঁহারা স্থির করিলেন, নবাবের এরূপ আদেশ তাঁহাদের স্বার্থের সম্পূর্ণ বিরোধী; এবং ইহাও প্রকারান্তরে তাঁহাদের বিরুদ্ধে নবাবের যুদ্ধঘোষণামাত্র। কলিকাতা কৌন্সিল যুদ্ধের আয়োজনে ব্যস্ত রহিলেন।

এই সময়ে কলিকাতা কৌন্সিলে ইলিস্, আমিয়ট, হে, স্মিথ প্রভৃতি মহাত্মারা বিরাজ করিতেছিলেন। ভান্সিটার্ট ইহাদের যুক্ত ক্ষমতার বিরুদ্ধে কিছুই নহেন। ইলিস্ সাহেব কিছু উষ্ণমস্তিষ্ক; তিনি আবার পাটনায় ইংরাজের এজেণ্ট স্বরূপে কার্য্য করিতেছিলেন। নবাব, তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করেন নাই, তাঁহাদের স্বার্থে বাধা দিতে সচেষ্ট হইয়াছেন, নিজের প্রজারক্ষার জন্য কোম্পানীর স্বার্থে বাধা দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; এরূপ স্থলে নবাব ইংরাজের শত্রু। এবং যুদ্ধই এ স্থলে স্বত্বমীমাংসার একমাত্র উপকরণ।

ইংরাজ কৌন্সিলে মন্ত্রণা চলিল। সকলে একমত হইয়া স্থির করিলেন,—যুদ্ধ করিবার পূর্ব্বে অন্ততঃ একবার নবাবের নিকট একটা শেষ বন্দোবস্তের জন্য লোক প্রেরণ করা উচিত। হে ও আমিয়াট সাহেব এই উদ্দেশ্যে কলিকাতা হইতে মুঙ্গের যাত্রা করিলেন। নবাবের সহিত সাক্ষাৎ হইল; নবাব বলিলেন, "আমি যে হুকুম প্রচার করিয়াছি, তাহা কেবল আমার রাজ্যে শিল্প ব্যবসা ও প্রজারক্ষার জন্য। তাহার পরিবর্ত্তন আমি কোনওক্রমেই করিতে পারি না; তবে এরূপ আমার ইচ্ছা নহে যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত কোনও সংঘর্ষণ ঘটে।"

এই সময়ে আর একটি ঘটনা ঘটিল। ইংরাজদিগের সহিত মিটমাটের যাহা কিছু সম্ভাবনা ছিল, ইহার সূত্রপাতেই তাহার লোপ হইল। নবাব শুনিলেন, পাটনার কুঠীর অধ্যক্ষ ইলিস সাহেব পাটনা অবরোধ করিবার জন্য গোপনে কয়েক নৌকা হাতিয়ার ও গোলাগুলি পাটনায় চালান দিতেছেন। সে নৌকাগুলি মুঙ্গেরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ঘৃতে অগ্নিসেক হইল, নবাব ইংরাজের এ স্পর্দ্ধা সহ্য করিতে পারিলেন না; তখনই তরকারী বাহির

হইল, "মুঙ্গেরে যে হাস্তিয়ারের নৌকা আসিয়া পৌছিয়াছে, তাহা আটক করা হউক।" ইংরাজ যে কোনও অসদ্ব্যবহার করিবেন না, তাহার প্রতিভূ-স্বরূপ, আমিয়ট ও হে মুঙ্গেরে থাকিবেন, এবং নবাবের হুকুম ব্যতীত তাঁহারা মুঙ্গের ত্যাগ করিতে পারিবেন না। পাটনায় ইংরাজদের যে একদল সেনা আছে, তাহারা হুকুম পাইবামাত্র পাটনা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে।"

মীরকাশেম এরূপ অবস্থাতেও সন্ধির জন্য লালায়িত হইলেন। ইংরাজের সহিত অস্ত্রবল পরীক্ষা করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। প্রজারক্ষা ও নিজের স্বাধীনতারক্ষাই তাঁহার আন্তরিক উদ্দেশ্য। কলিকাতা কৌন্সিল হে ও আমিয়টকে ইতিপূর্ব্বেই অবস্থা ও সুযোগ বুঝিয়া, মুঙ্গের পরিত্যাগ করিয়া, পাটনা বা কলিকাতা অভিমুখে চলিয়া আসিতে বলিয়াছিলেন। সেই সময়ে নবাবের কতকগুলি কর্ম্মচারী কলিকাতায় ছিলেন; তাঁহাদের নিরাপদতার জন্য এবং তখনও যদি মিট্‌মাটের কোনও সম্ভাবনা থাকে, এই আশায়, নবাব আমিয়টকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিয়া কলিকাতায় পাঠাইলেন। প্রতিভূস্বরূপ কেবলমাত্র হে সাহেব ও তাঁহার সহচরবর্গ মুঙ্গেরে রহিলেন। নবাব ইহাদের মহাসমাদরে রাখিলেন।

মীরকাশেমের সহিত ভবিষ্যতে ইংরাজের যে সংঘর্ষণ উপস্থিত হয়, তাহাতে নবাব সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। যাহা কিছু ঘটিবার, তাহা ইলিস সাহেবের হঠকারিতায় ঘটিয়াছিল। মীরকাশেম তখনও সন্ধির জন্য লালায়িত, কিন্তু উষ্ণমস্তিষ্ক কর্ত্তব্য-জ্ঞানহীন ইলিস, সমরবাসনায় উত্তেজিত। ইংরাজ ইতিহাসলেখকেরাও এ সম্বন্ধে মীরকাশেমের সরল প্রকৃতি ও নির্দ্দোষিতার কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

আমিয়ট চলিয়া গেলে ইলিষ ভাবিলেন, হে সাহেবও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছেন। তিনি স্থির করিলেন, নবাবের সহিত মিটমাটের কোনও সম্ভাবনা নাই। কৌশলে হাতিয়ারের নৌকা বাহির করিয়া দিয়া পাটনায় পৌছিলেন। এত কাণ্ড ঘটিয়াছে, পাটনার নবাবপক্ষ তাহার কিছুই জানেন না। গভীর রজনী; সকলেই নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে শান্তিভোগ করিতেছে। বীরপুঙ্গব ইলিষ এই মহা সুযোগ পাইয়া পাটনা অবরোধ করিলেন। অনেকগুলি বড় বড় প্রাসাদ ও সহরের আবশ্যক স্থানগুলি তাঁহার করায়ত্ত হইল। সহজে জয়লাভ করিয়া ইংরাজ সৈন্য আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সেই অসহায় নিরীহ সুখসুপ্ত নগরবাসীদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ও গৃহদাহ আরম্ভ হইল। সকলেই সেই গভীর

নিশীথে মহাব্যস্ততা ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তার মধ্যে জাগরিত হইয়া দেখিল, ইংরাজ-সেনা আসিয়া পাটনা অধিকার করিয়াছে। প্রভাতে প্রাতরাশ সম্পন্ন করিয়া ইলিষ সাহেব নিজের অদ্ভুত বীরত্বকাহিনী অদ্ভুত ভাষায় বিবৃত করিয়া, জয়গর্ব্বে প্রফুল্ল হইয়া কলিকাতায় এক বৃহৎ Despatch পাঠাইলেন।

অতর্কিতরূপে আক্রান্ত হইয়া নবাবের কর্ম্মচারীরা প্রথমতঃ কি-এক-রকম হইয়া গিয়াছিল। পরে যখন প্রকৃত ঘটনা বুঝিল, তখন মীর মেহেদি খাঁ স্বয়ং নবাবকে সমস্ত ঘটনা বলিবার জন্য মুঙ্গেরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

পাটনা হইতে ফতুয়া চারি ক্রোশ। মীর কাশেম ইতিপূর্ব্বে পাটনার সাহায্যের জন্য যে সমস্ত সেনা পাঠাইয়াছিলেন, তাহারা এখন ফতুয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল। মীর মেহেদি তখন নবাবের নিকট আসিবার সংকল্প ত্যাগ করিয়া, সেই সৈন্যদল লইয়া পাটনায় ফিরিলেন।

স্বয়ং গ্রেগরি মারকার (গুরগণ খাঁ) সেই নবাবসেনা লইয়া মহা বীরত্বের সহিত অগ্রসর হইলেন। মীরকাশেম পাটনায় অসারমস্তিষ্ক ও জড়বুদ্ধি কর্ম্মচারী রাখেন নাই। মীর মেহেদি দেখিলেন, মুঙ্গেরে গিয়া নবাবের সহিত পরামর্শ করা অপেক্ষা উপস্থিত সেনাদল লইয়া পাটনা হইতে ইংরাজদের তাড়াইতে পারিলে নবাবের বিশেষ সন্তোষকর হইবে। গুরগণ খাঁ, তাঁহার মহাসাহসী ও কর্ত্তব্যবুদ্ধিপরায়ণ গোলন্দাজ সেনা লইয়া যখন পাটনা বেষ্টন করিলেন, বজ্রনাদী কামান যখন অনলশিখা উদ্গীরণ করিতে লাগিল, নবাবের সেনারা যখন উচ্চ জয়নাদে পাটনা নগরী কম্পিত করিল, তখন বিনা যুদ্ধে যুদ্ধজয়ী বীরপুঙ্গব ইলিষ ভাবিলেন, এ সকল কাণ্ড নিভৃত নৈশ আক্রমণ বা দীর্ঘ ডেস্পাচের উপযুক্ত ঘটনা নহে। নিরীহ সুপ্ত নগরবাসীর পরিবর্ত্তে নবাবের সুশিক্ষিত সৈন্যদল এবার তাঁহার ক্রীড়ার বস্তু হইয়াছে।

গুরগণ খাঁ পাটনা নগর অধিকার করিয়া ইংরাজের ফ্যাক্টরী অবরোধ করিলেন। ইলিষ্ ও তাঁহার সহকারী কার্সটেয়ার্স (Curstairs) তখন ফ্যাক্টরির মধ্যে সেনাদলসহ আশ্রয় লইয়াছিলেন। কয়েক দিনব্যাপী যুদ্ধের পর ইলিস্ দেখিলেন, ব্যাপার বড় সহজ নহে; পলায়ন ভিন্ন আত্মরক্ষা এরূপ স্থলে অসম্ভবের অপেক্ষাও অসম্ভব। তাঁহারা ২৯শে জুনের উষায় গোপনে নৌকাযোগে পাটনা হইতে পলাইলেন। সেনাদলও তাঁহাদের সঙ্গে চলিল। ইংরাজসৈন্য এখন ছাপরায় পথ ধরিল। ইংরেজসেনার উদ্দেশ্য, তাহারা অযোধ্যাভিমুখে অগ্রসর হইবে।

পাটনার পুনরধিকারবার্ত্তা নবাবের কর্ণগোচর হইবামাত্রই, তিনি পুনর্ব্বার এক দল সুশিক্ষিত সেনা বক্সারের ইংরাজসেনার পথরোধের জন্য সমরু সেনানায়ককে পাঠাইলেন। ইহার উপর আবার পর দিন প্রাতে গুরগণ খাঁ সুসজ্জিত [illegible] আনিতে লাগিয়া, ইংরাজসৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন আরম্ভ করিলেন।

তখন বর্ষা পড়িয়াছে। পথ ঘাট সমস্ত জল কাদায় পরিপূর্ণ। গোলন্দাজ পক্ষের তাহাতে সম্পূর্ণ অসুবিধা। রসদ যোগাড়ও ভালরূপ হয় না। তাহার উপর আবার বক্সার হইতে সমরু ও পাটনা হইতে মার্কার, তাহাদিগকে দুই দিক হইতে বেষ্টন করিতে আসিতেছে; এ স্থলে ইংরাজসেনানায়ক ইলিস্ ও কারস্টেয়ার্স সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন। সম্মুখযুদ্ধ তখন সম্পূর্ণ অসম্ভব। পলায়ন যদিও সম্ভব বটে, কিন্তু তাহাতে সেনাদলের সকলই ধ্বংস হইবে; কিন্তু তাহার পরিণাম কি হয়, কে বলিতে পারে?

কিন্তু ভাবিলে তখন আর কোনও উপায় নাই, ভবিতব্য তখন একবারে পৃষ্ঠদেশে আসিয়া পহুঁছিয়াছে। নবাবসেনার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, ইংরাজপক্ষ প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। পরিণাম এই হইল, সহস্রাধিক ইংরাজ সেনার সহিত কারস্টেয়ার্স সাহেব নিহত, এবং ইলিশ ও অশিক্ষিত সৈন্যদল নবাবসেনার হস্তে বন্দী হইয়া মুঙ্গেরে প্রেরিত হইলেন।*

নবাব পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন যে, ইংরাজেরা এই যুদ্ধে পরাজিত হইবেন। কলিকাতা কৌন্সিলে প্রকৃত ঘটনা জ্ঞাপন করিবার জন্য তিনি পূর্ব্ব হইতেই একখানি "প্রতিবাদপত্র" প্রস্তুত করেন। ইংরাজেরা পরাজিত হইয়াছে, এই সংবাদ পাইবামাত্রই তিনি সেই পত্রখানি কলিকাতা কৌন্সিলে প্রেরণ করেন। কিরূপ স্বাধীনভাবে এই পত্র খানি লিখিত হইয়াছিল, তাহা নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতেই বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইবে।

নবাব লিখিতেছেন,—"ইলিস সাহেব গভীর নিশীথে চোরের ন্যায়, দস্যুর ন্যায় পাটনা আক্রমণ করিয়াছেন। তিনি বাজার লুঠ করিয়াছেন, নির্দ্দোষী নগরবাসীদের অকারণে যন্ত্রণা দিয়াছেন, সওদাগরদের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ

* সুপ্রসিদ্ধ Colonel Broome বলেন,—"judging from two official returns of the force shortly prior to its destruction it appears that nearly 500 europeans and upwards of natives must have been killed or surendered on this occassion, and that seven officers of Artillery and twentynine officers of Infantry were slain on the field, died of their wounds or were made prisoners or subsequently prisoned."

করিয়াছেন। তবে ইলিসের এইরূপ ব্যবহারে আমার অনেকটা উপকার হইয়াছে; কারণ, আমার কতকগুলি অস্ত্রশস্ত্রের বারুদ বন্দুকের বিশেষ প্রয়োজন ছিল, ইলিস সাহেব এরূপ বিগ্রহপ্রবৃত্তি না দেখাইলে সেগুলি আমার হস্তগত হইত না। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে আপনারা সেরাজউদ্দৌলার নিকট কলিকাতা-আক্রমণের যেরূপ ক্ষতিপূরণ করিয়া লইয়াছিলেন, এক্ষণে আমি তাহাই চাহিতেছি। আপনারা যীশুখৃষ্টের নাম লইয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন, সন্ধিতে বাধ্য হইয়া আমি আপনাদিগকে সৈন্যপ্রতিপালনের জন্য বৎসর বৎসর যে অর্থ প্রদান করিতেছি ও তাহাতে যে সৈন্যবল আমার ঐ অন্নে দিন দিন পরিপুষ্ট হইতেছে, সেই সেনাগুলিই আপনারা আমার ধ্বংসের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। আমি আপনাদিগকে যে তিনটি বিভাগ ছাড়িয়া দিয়াছি, তিন বৎসর সন্ধির সত্যানুসারে যে সমস্ত খাজনা দিয়াছি, তাহা আমায় প্রত্যর্পণ করুন, এবং আপনাদের স্থানীয় ইংরাজ প্রতিনিধিরা আমার প্রজাবর্গের উপর এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত অত্যাচার করিয়াছেন, তাহারও প্রতিবিধান করুন।"

৭ই জুলাই কলিকাতায় এই প্রতিবাদপত্র পঁহুছিল। পত্র পঁহুছিবার পূর্ব্বেই কলিকাতায় সদস্যগণের মধ্যে ইংরাজপক্ষে যে একটা মহা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, এরূপ ধারণা হইয়াছিল। ইলিসসম্বন্ধীয় ঘটনা তাঁহাদের এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় করিল। কলিকাতা কৌন্সিল পূর্ব্বেই মতলব আঁটিয়া রাখিয়াছিলেন, এবার তাঁহারা মীরজাফরকেই গদী প্রদান করিবেন। মীরকাশেমের তেজঃপূর্ণ পত্র পাইবার পর তাহারই প্রকৃত চেষ্টা আরম্ভ হইল। তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই মীরকাশেমের সহিত বিবাদের ছল খুঁজিতেছিলেন। নবাবের সহিত একটা প্রকাশ্যে কিছু না ঘটিলে তাঁহারা সিংহাসন লইয়া নিলামের ডাক দিতে পারেন না। এ সম্বন্ধে তাঁহারা এত দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, হে ও আমিয়ট যখন মুঙ্গেরে মীরকাশেমের সহিত সন্ধিব্যাপার লইয়া বিব্রত, তখন কলিকাতা কৌন্সিল মীরজাফরের সহিত কাজ প্রায় শেষ করিয়া ফেলিয়াছেন।

মীরজাফর চিৎপুরের ইংরাজপ্রদত্ত প্রাসাদে অহিফেনসেবনে উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হইয়া সুকোমল শয্যায় অঙ্গ ঢালিয়া যখন অতীত অবস্থার চিন্তায় মগ্ন, তখন ইংরাজের নূতন প্রস্তাব তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তৃষ্ণার জল নিকটে আসিয়াছে; জাফর আলি আবার নবাবী করিবার আশায় ভগ্নহৃদয়ে একটু তাড়িত শক্তি সঞ্চারিত করিলেন। চড়াদামে সন্ধি করিতে তিনি সিদ্ধহস্ত; কাজেই অতি অসম্ভব হইলেও, তিনি ইংরাজকৌন্সিলের অন্যায্য প্রস্তাবে

সম্মতি প্রদান করিলেন। এবারকার সর্ত্তে লেখা রহিল,—"মীরকাশেম ইংরাজকে যে তিনটি প্রদেশ দিয়াছেন, তাহা পুনর্গ্রহণ করিবেন না। ইংরাজ বণিক ছাড়া আর সকলেই আমদানী রপ্তানীর শুল্ক দিতে বাধ্য থাকিবেন, কেবল ইংরাজ সওদাগরেরা লিমকের উপর শতকরা আড়াই টাকা কর দিবেন; তিনি বার হাজার পদাতিক ও বার হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের ব্যয়ভার বহন করিবেন, যুদ্ধের খরচ স্বরূপ ৩০ লক্ষ টাকা দিবেন;—২৫ লক্ষ টাকা ইংরাজসেনার বৃদ্ধিকল্পে ও সাড়ে বার লক্ষ তাঁহাদের নৌসেনাবৃদ্ধির সৌকর্য্যার্থে প্রদান করিবেন।" কামদুঘাকে কি প্রকারে দোহন করিতে হয়, কলিকাতা কৌন্সিল তাহার উপায় বেশ জানিতেন। বুদ্ধিহীন মীরজাফর যে তাঁহাদের অর্থাগমের প্রধান যন্ত্র, তাহা বুঝিয়াই তাঁহারা পুনরায় সেই বৃদ্ধকে নবাবী প্রদান করিবার বিষয়ে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন।

সেই ৭ই জুলাই, যে দিন তাঁহারা মীরজাফরের সহিত সমস্ত কথাবার্ত্তা শেষ করিয়াছেন, সেই দিনই, মীরকাশেমের পূর্ব্বোল্লিখিত পত্র তাঁহাদের হস্তগত হয়। পত্র পাইয়াই তাঁহারা মীরকাশেমের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিলেন। উভয় পক্ষের ক্ষমতাসংরক্ষণ লইয়া এবার যে যুদ্ধ বাধিল, তাহাই এক্ষণে আমরা বিবৃত করিব।

যুদ্ধের পূর্ব্বে মীরকাশেমের অবস্থা ইংরাজপক্ষ অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উন্নত। তিনি নিজের রাজ্য ও সিংহাসনরক্ষার জন্য লড়িতেছেন; অপর পক্ষে, ইংরাজ নিজেদের জেদরক্ষার জন্য। এক পক্ষে নবাবের ইউরোপীয় ধরণে ৪০০০০ হাজার সুশিক্ষিত দেশী সৈন্য; অপর পক্ষে ইংরাজদের ৮৫০ জন ইউরোপীয় ও ১৫০০ দেশীয় পদাতিক। এক পক্ষে তিনটি সুবার আয়ে পরিপূর্ণ রাজকোষ, অপর পক্ষে ইংরাজের শূন্য ভাণ্ডার। * এক পক্ষে স্থিরবুদ্ধি, দৃঢ়চেতা বঙ্গেশ্বর। অপর পক্ষে হঠকারিতায় পরিপূর্ণ; আত্মম্ভরী, দায়িত্বহীন ইংরাজ-কৌন্সিলের সদস্যগণ। এরূপ স্থলে জয়লক্ষ্মী কাহাকে আলিঙ্গন করিবেন, তাহা একটি বিষম সমস্যা। ক্রমশঃ।

---

* এমন কি, এই যুদ্ধের প্রাক্কালে সাড়ে চার লক্ষ সহস্র টাকার জন্য ইংরাজ কৌন্সিলকে বেগ পাইতে হইয়াছিল।

প্রতিশোধ।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কন্যাভারগ্রস্ত ব্রাহ্মণ ঠাকুর বিশ্বনাথের কাছে বিদায় হইয়া গেলেন বটে, কিন্তু যেখানে গেলেন, সেটা ঠিক তাঁর বাড়ী নহে। পিতৃভিটা সাধারণতঃ মনুষ্য-মাত্রেরই গৃহ বটে, কিন্তু বাঙ্গালা দেশে কুলীন ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের পক্ষে সচরাচর তাহা ব্যতিক্রমস্থল। ঠাকুরটি ফুলের মুখুটী বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান, পিতৃভূমি জগতি গ্রামের বড় ধার ধারেন না। চূর্ণীগঙ্গানদের অদূরবর্ত্তী মথুরাপুরে তাঁহার মাতুলালয়, মাতামহের অনেকগুলি লাখেরাজ জমী এবং কোঠা বাড়ীর উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি জগতির মেটে ঘর এবং বিঘা দশেক নিষ্কর ভূমির মায়া অনেক কাল হইল একরূপ কাটাইয়া ফেলিয়াছিলেন। এখানে তাঁহার বৃদ্ধা বিধবা পিসি এবং নামমাত্র পরিণীতা ভগিনীদ্বয় জ্ঞাতিগণপরিবৃত হইয়া বাস করিতেন। ঠাকুর বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় কার্য্যোপলক্ষে যাতায়াতের পথে মাঝে মাঝে বুড়ো পিসি প্রভৃতিকে দেখা দিয়া যাইতেন।

বিনোদবিহারীর বয়ঃক্রম পঁয়ত্রিশের অধিক নহে, কিন্তু এই বয়সেই অকাল বার্দ্ধক্য কিয়ৎপরিমাণে তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছিল। ইহার প্রধান কারণ লোকে বলে, তাঁহার শৈশবে পরিণীতা গৃহিণীযুগল। উভয়ে সহোদরা এবং খাস মথুরাপুরের কন্যা। ঠিক্ বলা যায় না, কিন্তু শুনিতে পাই, দুজনেই স্বামীর চেয়ে বয়সে কিছু বড়। ইহার উপর কনিষ্ঠা আজ কয় বছর হইল একটি কন্যা উপহার দিয়া নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণ করিয়াছিলেন, ভার্য্যার মধ্যে তিনিই ভর্ত্তার প্রেয়সী। ফলতঃ, দুই বোনের কলহের জ্বালায় ঠাকুরকে সশঙ্কিত থাকিতে হইত। বিবাহব্যবসায় এবং স্বজাতিক কুলরক্ষাকার্য্য মহা-কুলীনের সনাতন ধর্ম্ম। পত্নীরা সুতরাং স্বামীর যদৃচ্ছা বিবাহপ্রবৃত্তির প্রতি-রোধ করিতেন না। অতএব এ পর্য্যন্ত ত্রয়োদশটি সপত্নীকণ্টক যোজনা করার পর, প্রভু যখন চতুর্দ্দশের পাণিপীড়নার্থ সাদর নিমন্ত্রণপত্র পাইলেন, উভয় ভগ্নী স্মিতমুখে দিন কতকের জন্য তাঁহাকে রেহাই দিতে আপত্তি করিলেন না। বড় ভাবিলেন, অনেক দিন ধরে বাড়ী বসে থেকে মিন্সেটা একেবারে বয়ে গেল—আন্তরিক যত টান ছোটর উপর। দিন কতক বাইরে বাইরে থাকে সে ভাল। ছোট বোন স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ আঁটিয়াছিলেন, একমাত্র কন্যাকে

যার তার হাতে দেওয়া হবে না। সে বীজ এখন থেকে উদ্যোগ চাই। বিবাহ করিবার অছিলায় তিনি পাত্র এবং অর্থ দুয়েরই ফিকিরে ঘুরিবেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় অতঃপর চতুর্দশ বার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন কি না, সে খবর আমরা রাখি না। কিন্তু তিনি কন্যাদ্বয়ের ভাবনায় যে উদাসীন ছিলেন না, সে পরিচয় ইতিপূর্ব্বে দিয়াছি।

আহারান্তে বিনোদবিহারী শয্যাগ্রহণ করিলে পর, তাঁর পিসি ঠাকরুণ শিয়রে বসিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। প্রদীপ মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছিল, এবং বৃদ্ধার দর্শনশক্তি ছিল না বলিলেও হয়। তথাপি অভ্যাসগুণে তিনি নিজের ঈশ্বর ও তাঁহাদের ভাবী বংশধরদের মঙ্গলকামনা করিতেছিলেন। মুখে নানা গল্প চলিতেছিল। ভ্রাতুষ্পুত্র কতক শুনিতেছিলেন, কতক বা শুনিতেছিলেন না—তিনি অধিকাংশ কাল সন্ধ্যাকালের ঘটনা স্মরণ করিয়া অন্যমনস্ক হইতেছিলেন। পাঁচশ' টাকার কথা মনে হইলে আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছিলেন, এবং তখন ছোট বউর হাসি মুখখানি চোকের সামনে ভাসিয়া উঠিতেছিল। এমন সময়ে পিসি বলিয়া উঠিলেন, "বিনোদ! তোর দেবীপুরের শাশুড়ী মো'ল, শুনিতে পাই তার অনেক টাকা ছিল। কত টাকা পেলি বাবা?"

বিনোদ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় উঠিয়া বসিলেন। সাগ্রহে শুধাইলেন, কবে শাশুড়ীর মৃত্যু হইয়াছে?

পিসি। শুন্‌ছি এই সে দিন মরেছে—মাস খানেকও হবে না। সে কি, কিছুই তুই জানিস্‌নে?

বিনোদ কেবল বলিলেন, "কেমন করে জানবো পিসিমা, তিন মাস হলো আমি বিদেশে ঘুর্‌ছি।" বিনোদের হৃদয়ে ঝটিকা বহিতেছিল। সে রাতে তাঁর ভাল নিদ্রা হইল না। নয় বছরের আগের সেই নয় বছরের ফুট্‌ফুটে কনেটির কথা মনে পড়িতেছিল কি? বলিতে পারি না।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

[illegible] হইতে দেবীপুর পুরা এক দিনের পথ। প্রত্যুষে মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্বশুরবাড়ী মুখে ছুটিয়াছেন। তাঁহার জানা ছিল, শ্বশ্রূঠাকুরাণী অনেক টাকার কারবার করিতেন; সুতরাং তাঁহার স্বর্গারোহণের পর এক্ষণে সে সমস্ত ধন-সম্পত্তির অধিকারী তাঁহারই। বিনোদবিহারী নয় বৎসর আগে সেই যে

এক দিন বিবাহ করিতে দেবীপুর গিয়াছিলেন, তার পর আর কখন সে-মুখো হন নাই। একেই কুলীন জামাতাদের শ্বশুরালয়ে যাতায়াত কালে ভদ্রে ঘটে, তার উপর এ ক্ষেত্রে একটু কথা ছিল। শাশুড়ী বছর কয় পরে একবার জামাতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। বিনোদ বুঝিলেন, ধনশালিনী শ্বশ্রূঠাকুরাণীর কাছ থেকে যথেষ্ট টাকা আদায়ের সে এক দাঁও বটে। বিস্তর টাকার দাবি শুনিয়া শাশুড়ী লিখিয়া পাঠাইলেন, "বাবা, আমার আর কে আছে? যা কিছু সামান্য আমার আছে, সে সব তোমারই। কিন্তু অত টাকা তোমায় দিব কোথা হইতে? তুমি যদি এসে মাঝে মাঝে তোমার শ্বশুরালয়ে থাক, আমার অবস্থা বুঝিতে পারিবে।" এই চিঠির ভঙ্গিতে বিনোদ চটিয়া লাল হইলেন। তাঁহার সন্দেহ মাত্র রহিল না যে, শাশুড়ী তাঁহাকে ঘরজামায়ে হইতে অনুরোধ করিতেছেন। সেই অবধি বিনোদবিহারী দেবীপুরের শাশুড়ীর ও শ্বশুরকন্যার আর কোন খোঁজ খবর করেন নাই।

কিন্তু এখন? এখন আর সে রাগ অভিমান ছিল না। ছেলে এবং বুড়ায় তফাৎ এই যে, একে রাগদ্বেষাদির প্রয়োগস্থলে জড়শরীরের ভেদাভেদ জ্ঞান করে না, অন্যে—যুবায় বা বৃদ্ধে—সে উদারতা নাই। শিশু হইলে বিনোদ শাশুড়ী এবং তাঁর ধনসম্পত্তি, দুইয়েরই উপর সমান বিরক্ত হইতেন, একতে অন্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিতেন না। এবারে কিন্তু সে জ্বালা ছিল না। বিনোদ পরম হৃষ্টমনে স্বর্গীয় শ্বশ্রূঠাকুরাণীর গুপ্ত এবং ব্যক্ত অগাধ ধনের স্বামিত্ব কল্পনা করিয়া পথ চলিতেছেন। কিন্তু যে এই সবের মূল, তার কথা কয় বার মনে হইতেছিল? বলিতে পারি না।

সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে মুখোপাধ্যায় মহাশয় দেবীপুরে পৌঁছিলেন। গ্রামের কাহারও কাছে সাক্ষাৎসম্বন্ধে তিনি পরিচিত ছিলেন না; বিনা পরিচয়ে কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। শ্বশুরালয়ের প্রতিবেশীমণ্ডলী তাঁহাকে শ্বশুরালয়ের চণ্ডীমণ্ডপে বসাইয়া সকল কথা শুনাইয়া দিল। তাহারা জনরবে শুনিয়াছিল, সরলা পথে ডাকাইতের হাতে পড়িয়াছে। অনেকে সে গল্পও করিল। এ সকলই যে সরলার ভাদ্রমাসে কাহারও কথা না শুনিয়া গৃহ-ত্যাগের ফল, ইহা বক্তাদের মত শ্রোতা বিনোদবিহারীও একবাক্যে স্বীকার করিলেন, স্ত্রীর উপর তাঁর সন্দেহ ও ক্রোধের সীমা রহিল না।

কিন্তু এই সন্দেহ ও ক্রোধ ঠিক ব্যাহত শার্দ্দূলের আক্রোশের মত—মনুষ্যোচিত পতিপত্নীর ক্ষুণ্ণ দাম্পত্যসঞ্জাত নহে। সরলার গৃহত্যাগের নিন্দু

নিশীথে, যে বন্ধু মহাশয় তাঁহার গৃহহর্ম্ম্যতল খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া গুপ্তধনলাভে অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তিনিই মুখোপাধ্যায়কে সর্ব্বপ্রথমে জানাইয়া আপ্যায়িত করিলেন যে, সরলা মেয়েটি নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়া না হইলে মাতার ত্যক্ত সমস্ত ধন সঙ্গে লইয়া গিয়া ডাকাইতের হাতে সমর্পণ করিত না। বিনোদবিহারী হৃদয়ে অমিত ধনলাভআশা পোষণ করিয়াছিলেন, সহসা ব্যর্থমনোরথ হওয়ায় অবসন্ন হইলেন। এবং পত্নীই তাঁহার হতাশ্বাসের একমাত্র কারণ জানিয়া, তাহার উপর জাতক্রোধ হইলেন।

প্রভাত হইতে না হইতে বিনোদবিহারী আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। নৌকাপথে গোবরডাঙ্গার হাট যত দীর্ঘ, পদব্রজে তাহার অর্দ্ধেক নহে। মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হইয়া গেলে সেখানে পৌছিয়া স্নান করিলেন। ইচ্ছা, জলযোগ করিয়াই গৃহাভিমুখে ছুটিবেন। দেরি মাত্র সহিতেছিল না। সম্ভবতঃ লক্ষ্মীছাড়া বউটা মথুরাপুর গিয়াছে,—গিয়াই তাহাকে তাড়াইয়া দিতে হইবে। দুশ্চিন্তায় ঠাকুরের মুখটা মলিন ও ভার ভার দেখাইতেছিল। তিনি জলপানের জন্য ভগবানের দোকানে গিয়া বসিলেন।

ভগবান মদক আহারাদি শেষ করিয়া চসমা-চক্ষে চৈতন্যচরিতামৃত পড়িতেছিল। ঠাকুরকে দেখিয়া গড় হইয়া প্রণাম করিল। বিনোদবিহারী জলযোগ করিয়া তখনি যাত্রা করিবেন শুনিয়া ভগবান তাঁহাকে অনুরোধ করিল, "দেবতার যখন পায় ধুলা পড়িয়াছে, দুটি অন্ন সেবা করিতেই হইবে। নই'লে মধ্যাহ্নে অতিথি বৈমুখের দারুণ পাপ তাহাকে স্পর্শ করিবে।" বিস্তর জেদাজেদির পর ঠাকুর কি করেন, সম্মত হইলেন। মুখুয্যে মহাশয়ের বাড়ী মথুরাপুরে শুনিয়া, ভগবানের কৌতুহল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিনোদবিহারী স্বভাবতঃ অর্থপিশাচ ছিলেন না। কিন্তু সে কালে কুলীন মহাশয়েরা শ্বশুরবাড়ীকে জমীদারী ছাড়া আর বড় কিছু ভাবিয়া উঠিতে পারিতেন না। কাজেই সরলার উপর তাঁহার রাগটা নিতান্ত অহেতুক বলিলে চলিতেছে না।

ভগবান সরলার জন্য উদ্বিগ্ন ছিল। কথাচ্ছলে মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে মহা কুলীন ও বহুদার বলিয়া জানিয়াছিল। একটু একটু সন্দেহ করিল, তিনিই সেই দুঃখিনী ব্রাহ্মণ-কন্যার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হইবেন। কিন্তু প্রতীতি হইতে-

ছিল না। তাই ভগবান নিজে ঠাকুরের আহারাদির উদ্‌যোগ করিয়া দিয়া তাঁর কাছে একটু বসাইয়া রহিল।

বিনোদবিহারী বেশ কাজের লোক ছিলেন না,—বাক্যসংযমের মহিমা তিনি কখন বুঝিতেন না। ভগবানের মিষ্টান্ন ও মিষ্ট কথার উপহার দুই দণ্ডের ভিতর তাঁহার চিত্তমলা কতকটা দূর করিয়াছিল। নিরাশা আসিয়া মাঝে মাঝে হৃদয়-দংশন করিতেছিল বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার মনস্ত-স্রোত বন্ধ হয় নাই। ঠাকুর অন্যান্য নানা কথার মধ্যে অম্লানবদনে ভগবানকে জানাইয়া দিলেন যে, তাঁহার দেবীপুরের বিবাহ তিনি আদৌ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। সে স্ত্রী তাঁহার বাটী গিয়াছে শুনিয়া তিনি তাড়াতাড়ি গৃহে চলিয়াছেন। এবং তাঁহার আদেশে তাঁর গৃহবাসিনী পত্নীযুগল তাহাকে ঝাঁটা মারিয়া তাড়াইবে, তবে তাঁহার রাগ যাবে!

আহারান্তে ঠাকুর চলিয়া গেলেন। এ দিকে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইবামাত্র ভগবান কন্যাটিকে ভুলাইয়া ভুলাইয়া ঘুম পাড়াইল, এবং দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করিয়া দিল। বিশ্বনাথদত্ত রূপা জোড়াটি সৌভাগ্যক্রমে দোকানেই ছিল। ভগবান অন্ধকারে ছুটিয়া চলিল।

*　　　*　　　*　　　*

পরদিন প্রাতে মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাটী পৌঁছিলেন। দেখিলেন, তিনি যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহার কোন ভিত্তি নাই। নববধূর উপর ঝাল ঝাড়িবার সুবিধা না হওয়ায় মুখটা তাঁহার তেমন প্রসন্ন দেখাইতেছিল না। জ্যেষ্ঠাপত্নী দেখিয়া বলিলেন,—"মরণ আর কি! মিন্সের রকম দ্যাখ, তিন মাস পরে বাড়ী এলেন, হাঁড়িপানা মুখ কোরে! ছোটকে না দেখ্‌লে হাসি বেরুবে না। এর পরে হাসি দেখলে ঝাঁটা দিয়ে ঝাড়িয়ে দেব।"

এদিকে ভগবান সেই রাতে প্রথমতঃ পরিহার গ্রামে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিল, সরলার নৌকা প্রাতে রওনা হইয়া গিয়াছে। তখন ভগবান পরিপূর্ণা চূর্ণীর কূলে কূলে বেগে ছুটিয়া চলিল, যদি নৌকা ধরিতে পারে। বদনের নামটি ভগবানের মনে ছিল। অন্ধকারে নদীবক্ষে একটা কিছু দেখিলেই ভগবান উচ্চকণ্ঠে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া নিশীথনীরবতা ভঙ্গ করিতেছিল। শেষে সত্য সত্যই বদন উত্তর দিল।

ভগবান সরলাকে সকল কথা বলিয়া অনুরোধ করিল, তিনি অপমানিত হইবার জন্য স্বামীগৃহে না যান।

স্বামীর পরুষ প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া সরলা মর্ম্মাহত হইল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আপন কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল। স্বর্গীয় মাতাকে মনে পড়িয়া এক ফোঁটা জল চক্ষে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু ক্ষীণ দীপালোকে পর্দ্দার আড়ালে আর কেহ তাহা দেখিতে পাইল না। বিষাদের হাসি হাসিয়া সরলা উত্তর করিল, "তা আমার মান বল, অপমান বল, সেই ঠাঁই ছাড়া আর গতি নেই। সেখানে গিয়ে দাসীপনা কর্‌তেও কি পাব না।" ভগবানের চক্ষে সরদরিত ধারা পড়িতেছিল। সে বলিল, "মা, ছেলের যা কাজ, আমি তা কর্‌লাম। বিশুর কথা মনে করো। যদি কখন বিপদে পড়, আমাদের একবার খবর দিও। কিন্তু তুমি সাধ্বী সতী, তোমার কোন অমঙ্গল হবে না।"

ভগবান চলিয়া গেল। পরদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে সরলার নৌকা মথুরাপুরের ঘাটে পৌছিল। আকালের মা রাত্রের কোন খবর রাখিত না—বারম্বার মদনকে নাতজামায়ের কাছে পাঠাইবার জন্য সরলাকে অনুরোধ করিল। সরলা বলিল, "আরি বুড়ি, সন্ধ্যা হয়ে এলো, তাদের বাড়ীও কাছে। পাল্কী কোরে শ্বশুরবাড়ী যাওয়া কুলীন বাম্‌নীদের রীতি নয়!" বুড়ী অসন্তুষ্ট হইয়া চুপ করিয়া রহিল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে একমাত্র পরিচারিকা সঙ্গে সরলা স্বামীগৃহে উপস্থিত হইল। একবস্ত্রে, সম্বলমাত্রশূন্যা—এর চেয়ে নিঃসহায় অবস্থা আর কি হইতে পারে? যাঁর হাতে সমর্পণ করিয়া মাতা কন্যার নারীজন্ম সফল হইল ভাবিয়াছিলেন, এই দুর্দ্দিনে তিনি সত্য সত্যই কি চরণে ঠাঁই দিবেন না? সন্ধ্যায় স্তিমিত প্রকৃতি মুখে মানুষ জীবনের চিরপোষিত আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দেয়—কিন্তু সরলা জোর করিয়া নিরাশাকে হৃদয় হইতে দূর করিতেছিল; কেন না, বালিকা এই সবে প্রথম সংসারসাগরে ঝাঁপ দিয়াছিল,—আশার আবার নৈরাশ্য আছে, তাহা সে কখন জানিত না।

সরলা যখন গৃহে পৌছিল, তাহার সপত্নীকন্যা "পুঁটি" তখন রান্নাঘরে খাইতে বসিয়া মহা "খোট্ট" লাগাইয়াছিল, এবং তার বয়স আট বছরের কম না হইলেও মাতা তাহাকে নিতান্ত শিশুর মত ভুলাইতেছিলেন। মা বলিতেছিলেন, "শীগ্‌গির যদি না খাবি, পেত্নীকে আর জুজুবুড়ীকে ডেকে ধরিয়ে দেব!" বাটীতে প্রবেশ করিয়া সরলার পা উঠিতেছিল না; ভারি লজ্জা লজ্জা করিতেছিল। কি করিয়া আত্মপরিচয় দিবে? কিন্তু মাতাকন্যার এই

আলাপে একটা সুযোগ উপস্থিত হইল। সরলা সাহস করিয়া কুঁজো আরি বুড়ী সঙ্গে রসুই ঘরের দ্বারপথে উঠিয়া দাঁড়াইল। অপ্রতিভের মৃদু হাসি হাসিয়া বলিল, "দিদি, পেত্নীকে তুমি ডাক্‌ছিলে, তাই আমি জুজুবুড়ীকে নিয়ে এসেছি!"

ক্ষীণ মৃণ্ময় প্রদীপালোকে সরলার সুকুমার দেহ দেবী-প্রতিমার মত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। দেখিয়া কন্যার মত মাতাও বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। সরলা সেই ভাবে কাছে গিয়া বসিল, আকালের মা পূর্ব্ববৎ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নাতিনীর আচরণ লক্ষ্য করিতেছিল।

সরলা বলিল, "দিদি, আমায় চিন্‌তে পার কি? কেমন কোরে পারবে, কখন ত দেখনি। আমি দেবীপুর থেকে আস্‌চি। সেখানে তোমার একটি বোন আছে, তা বোধ করি তুমি জান।"

ছোট বউর ধড়ে প্রাণ আসিল, কিন্তু মুখে হাসি [illegible]আসিল না। হাসির কথাও নহে। নবযৌবনপ্রফুল্ল, প্রভাতকমলের মত সুন্দরী সপত্নী আসিয়া জাঁকিয়া বসিতেছে। মেয়েমানুষের প্রাণে হাসি কি বেরোয় গা? তবে ছোট বউ বড়র মত সর্পিণী ছিলেন না, খলকপট বড় জানিতেন না। কিন্তু সরলার মুখে চোখে হাস্যের বিরাম ছিল না। পথে সে মনঃস্থির করিয়া আসিয়াছিল।

ছোট বউ পুঁটিকে ভাত খাওয়াইয়া দিতে দিতে বলিলেন, "তা হাঁ বোন, বলি ভরা ভাদ্দর মাসে, খবর না পাঠিয়ে তুমি এলে কেমন করে? কুলীন বামুনের খশুরবাড়ীতে কি সুখ, যে মা বাপ ছেড়ে এ ভাবে তুমি এসেছো! আমাদের গাঁয়ে বাপের বাড়ী, বাপের বংশে কেউ নেই, কাজেই থাক্‌তে হয়েছে। দুটি বোনে আছি, তবু দিনরাত চালে কাক বস্‌তে পায় না। সতীনের সম্বন্ধ এমনি ছাই!"

পথে এ কথাটা দুই একবার সরলারও মনে হইয়াছিল। কিন্তু অন্যের মুখে কিছু তীব্র শুনাইল। সরলা নতনয়নে বলিল, "দিদি, এক মা ছিলেন, তিনিও চলে গেলেন। এ বয়সে কার কাছে থাকি বল? তাই দিনক্ষণের অপেক্ষা করি নি। কিন্তু হাতে হাতে তার ফল পেয়েছি। পথে ডাকাতের হাতে পড়ে সর্ব্বস্ব খুয়িয়ে এলাম।"

ছোট বউ বড় গল্পপ্রিয়। ডাকাতের কথা শুনিয়া সাগ্রহে সে গল্প শুনিতে চাহিলেন। আকালের মাকে বলিলেন, "বস্ বাছা, ঐখানে বস্, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?" সরলা বলিল, "ও একটু কম শুনতে পায়!" ছোট বউ উচ্চ-

ঘরে বসিবার অনুরোধটি পুনরুক্ত করিলেন। তাহাতে বুড়ী বসিল বটে, কিন্তু আর এক জন উঠিয়া দাঁড়াইল। বড় বউ ঠাকুরাণী ইহারই মধ্যে শয্যা গ্রহণ করিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, কোন ছলে ছোটর সঙ্গে একটা ঝগড়া তুলিয়া স্বামীকে আজ রাতে জালাতন করেন। ছোটর উচ্চকণ্ঠ শুনিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

বড় বউ ঠাকুরাণীর আসন যদি টলিল, তবে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। পা টিপিয়া টিপিয়া ছোট বউর রান্নাঘরের দিকে গিয়া তিনি স্পষ্ট দুই জনের কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইলেন। একবার সন্দেহ হইল, তাঁহাকে লুকাইয়া ভর্ত্তা তাঁহার প্রেয়সী ভার্য্যার সঙ্গে নিরিবিলি প্রেমালাপ জুড়িয়া দিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তটা সমূলক হইলে বড় গিন্নির ব্যাঘ্রীর মত সেই প্রেমিক-যুগলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবার ভারি সুবিধা হইত, এবং একটা তুমুল কলহেরও সুযোগাভাব ঘটিত না। কিন্তু অপর কণ্ঠ ত বিনোদবিহারীর নহে। স্বর অপরিচিত, কিন্তু বড় মধুর। মথুরাপুর গাঁয়ের বউঝি সবারই সঙ্গে বড় বউ-ঠাকুরাণীর স্বরপরীক্ষা হইয়া গিয়াছে,—কই, তাদের কাহারও স্বরে ত এমন সুর বাজে না। বিস্মিত, কৌতুহলপরবশ হইয়া দিদি বোনের পাকশালায় উঁকি মারিলেন। বলিলেন, "কার সঙ্গে কথা কচ্চিস্ লা গিরি?"

ছোট বউর নাম গিরিবালা। বড় গিন্নি ছোটর সঙ্গে পূর্ব্ব সম্বন্ধটা মনে পড়িলে তাহাকে একবার একবার নাম ধরিয়া ডাকিতেন,—নহিলে নহে। গিরিবালা এবং সরলা উভয়ে যুগপৎ দ্বারাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিলেন। বড় বউ যার কণ্ঠ শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, দেখিলেন, মূর্ত্তিতেও সে মনোমোহিনী। আবার সুধাইলেন, "মেয়েটি কে লা গিরি?"

গিরিবালা গম্ভীর হইয়া বলিল, "সতীন!" সে গাম্ভীর্য্য একটু একটু ব্যঙ্গ-মিশ্রিত। "দেবীপুরের সতীন! বোন, উনিই বাড়ীর গিন্নি, শুভদৃষ্টি করে নাও এই বেলা!" তখন ছোট বউ সরলাকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বড়কে দেখাইয়া দিল।

সরলা উঠিয়া বড়কে প্রণাম করিল। কিন্তু আশীর্ব্বাদের পরিবর্ত্তে ছুটিয়া পলায়নপরা জ্যেষ্ঠা সতিনীর অজস্র গালি তাহার ও ছোট বউয়ের উদ্দেশে অবিশ্রান্ত বর্ষিত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তাটির অংশও বাদ যাইতেছিল না।

এই মুহূর্ত্তে বিনোদ গৃহে আসিলেন। বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এই জন্যে ঘরে আস্‌তে ইচ্ছে করে না। তিন মাস বিদেশে ছিলাম, সে বেশ ছিলাম। গলা ত নয়, যেন কাঁসর!"

সরলার মোহিনীকণ্ঠ বড় বউর মনে জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল। ছুটিয়া আসিয়া তিনি স্বামীর পায়ের উপর পড়িলেন, এবং গণিয়া গণিয়া বিশ বার জোরে জোরে মাথা কুটিলেন। মুখেরও বিরাম ছিল না। "কাঁসরের মতন গলাই বটে! যাই যেমটী এনেছিস্, এখন মিষ্টি মিষ্টি গলা শোন্। ছোটর সঙ্গে পরামর্শ করে দেবীপুর থেকে আন্ধেরে বউটাকে এনেছেন—আমাকে তাড়াবার জন্যে। ওলো শতেকখোয়ারীরে, আমাকে তাড়াবি তোরা! মোলেও আমি পেত্নী হয়ে তোদের জ্বালাব! এই চল্লাম গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌তে!" তখন বড় গিন্নি ছুটিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরের ঘরে গেলেন, এবং দ্বার জান্‌লা সব বন্ধ করিতে লাগিলেন। শব্দে পাড়া প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

বিনোদবিহারী পাকশালের দিকে গেলেন! তাঁহাকে দেখিয়া আকালের মা সরিয়া দাঁড়াইল, সরলাও কোণের দিকে সরিয়া গেল। বিনোদ ছোট বউর উদ্দেশে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সন্ধ্যা হতে না হতে কি এ ব্যাপার? এরা সব কে?"

গিরিবালা সকল কথা খুলিয়া বলিল। ততক্ষণ আকালের মা বুড়ী নাতজামাইকে দুটো সরসসম্ভাষণের জন্য বাক্যরসসঞ্চারের চেষ্টা করিতেছিল।

বিনোদবিহারী সরলার আগমনবার্ত্তায় ক্রোধে অধীর হইলেন। বলিলেন, "স্ত্রীলোকটাকে এখনও তোমরা ঝাঁটা মেরে তাড়াও নেই? বড় বউ রেগেছে, বেশ করেচে। ও একটা বিষম মেয়েমানুষ, ওর কথা শুনে আমি অবাক্ হয়েছি। হিন্দুর ঘরে, বিশেষ বামুনের ঘরে এমন মেয়েও জন্মায়! ভাদ্দরমাসে সর্ব্বস্ব নিয়ে বাড়ী থেকে কে কবে বেরোয়? লক্ষ্মীছাড়ি, ডাকাতের হাতে পড়ে সর্ব্বস্ব ঘুচিয়ে পথের ভিকিরী হয়ে আমার কাছে মর্‌তে এসেচে!"

ছোট বউ বলিলেন, "ছি, অত কটু কথা কি তোমার বলা সাজে? মা মরে গেছে, এই সোমত্ত বয়সে কোথায় দাঁড়ায় তা বল?"

রাগের মুখে যথার্থ কথায় মুখোপাধ্যায় মহাশয় আরও রাগিয়া গেলেন। বিশেষ স্ত্রীলোকের মুখে ন্যায়ের কথা! বিনোদ কহিলেন, "অত সাহস যে মেয়ের, সে কখন ভাল নয়। পথে আজ ৭।৮ দিন ওর কোথায় কাট্‌লো? কোথায় কি ভাবে ছিল, কে জানে?"

এবার সরলা কথা কহিল। কেন না, তাহার সতীত্বগর্ব্বে আঘাত লাগিয়াছিল। ধীরে ধীরে সংক্ষিপ্ত কথায় সে পথের দৈনিক বিবরণ বিবৃত করিল। কথা বলিতে বলিতে চোকের জল মুছিতেছিল।

স্বামী বলিলেন, "ও সব মিছে কথা! একটিও আমি বিশ্বাস করিনে! যে স্ত্রীলোক কুলের বার হয়ে এসেছে, আমি তাকে গ্রহণ করিতে পারি নে।"

সরলা মাতাকে স্মরণ করিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে রোদন করিয়া উঠিল। বলিল, "ওগো, আমার আর কেউ নেই। সত্যি সত্যি আমি আজ পথের ভিখারিণী। তোমরা আমায় না নাও, বাড়ীতে থাক্‌তে দাও। দাসীপনা করে কাটাব।"

মুখোপাধ্যায় টলিলেন না। অভ্রান্ত ভাষায় বলিয়া উঠিলেন—"কুলত্যাগিনীকে আমি আশ্রয় দিতে পারি নে। ছোট বউ! তুমি বুঝিয়ে দাও।"

গিরিবালা বলিলেন, "ছি ছি, তুমি মানুষ না রাক্ষস! বোন, তুমি শোন কেন, বিয়ে করে, ভার নেবার বেলা কুলীন বামুনগুলোর মাথায় বাজ পড়ে। দুর্ব্বাক্য ছাড়া আর উপায় কি?"

সরলা স্বামিকৃত অপমানে জ্বলিয়া উঠিল। আপন মনে ঘৃণায় নাসা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "এই স্বামী? এই অধার্ম্মিক আমার দেবতা?"

সে কথা বিনোদবিহারীর কানে গেল। ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—"দ্যাখ, ছোট বউ, তুমি ওকে ভালোয় ভালোয় বিদায় না কর্‌তে পার ত বল, আমি বড় বৌকে বলি, ঝাঁটা মেরে তাড়াবে এখুনি!"

বিনোদ আর দাঁড়াইলেন না। ওদিকে সরলা মেঘমধ্যে বিদ্যুৎবৎ অন্ধকারে অন্তর্হিত হইল। আকালের মা সব বুঝিতে না পারিলেও আসল কথা বুঝিল। সে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সরলার অনুসরণ করিল।

এই সময়ে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বহির্ব্বাটীতে একটা বিকট কণ্ঠরব শোনা গেল। আগন্তুক ডাকিল, "মুখুয্যে মোশাই ঘরে আছ?"

সহযোগী সাহিত্য।

নূতন পুস্তক।

ফরাসী ভ্রমণকারী ও লেখক ম্যাক্স্ওরেলের নাম পাঠকদিগের অপরিচিত নহে। তাঁহার "জনবুল ও তাহার দ্বীপ" নামক পুস্তক বোধ হয় অনেকেই পাঠ করিয়াছেন। কয়েক বৎসর গত হইল, বঙ্গের কোনও সংবাদপত্র-সম্পাদক মহাশয়, এই পুস্তকের অনুবাদ করিয়া, "টাট্কা বিলাতের পত্র" রূপে ছাপাইয়া, বাঙ্গালী পাঠককে কিরূপ প্রতারিত করিয়াছিলেন, তাহাও বোধ হয় অনেকের মনে আছে। সংপ্রতি ম্যাক্স্ওরেলের নূতন একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকের নাম "জন বুল এবং কোম্পানি"। ইহাতে ম্যাক্স্ওরেল আখ্যাধারী মুসোঁ পল্ ব্লোএ মহাশয় ইংরাজের উপনিবেশ ও তন্নিবাসী সম্বন্ধে আপনার মতামত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা মিঃ ষ্টেড্ সাহেবের অনুসরণ করিয়া এই পুস্তকের কতকটা পরিচয় দিতেছি।

ম্যাক্স্ওরেল্;—
তাঁহার নূতন গ্রন্থ।

গ্রন্থের নামটার উপর পাঠক একটু লক্ষ্য করিবেন। ফরাসী-লেখকের চক্ষে সমগ্র ইংরাজজাতি একটা ব্যবসায়ী সম্প্রদায় মাত্র। সুতরাং ইংরাজের উপনিবেশগুলি শাখা-দোকান (Branch Shop) ভিন্ন আর কিছুই নহে। ম্যাক্স্ওরেল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে একটা বিশাল শাসনযন্ত্র স্বরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই শাসনযন্ত্রের প্রভাব ক্রমশঃ পৃথিবীময় প্রসারিত হইয়া পড়িতেছে। ফরাসী লেখক ইংরাজশাসনের বিলক্ষণ সুখ্যাতি করিয়াছেন। তিনি বলেন—

জন-বুল কোম্পানী।

"আমি পৃথিবীর অনেকাংশে ভ্রমণ করিয়াছি, প্রজাতন্ত্রপ্রণালীর কেন্দ্রস্বরূপ ফ্রান্স ও আমেরিকায় বহুকাল বাস করিয়াছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, এই বসুধাবক্ষে, কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, সর্ব্ববিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন কেবল একমাত্র জাতি বিদ্যমান। সে জাতি ইংরাজ। ইংরাজ অপূর্ব্ব মেধা, অথবা তীক্ষ্ণ মানসিকশক্তিবলে এই বৃহৎ সাম্রাজ্য সংস্থাপিত করেন নাই। জন বুলের প্রধান সহায়, তাহার চরিত্রবল।

জনবুলের চরিত্রবল।

"টমাস্ কারলাইল্ যথার্থই বলিয়াছেন যে, ইংরাজ কথায় একেবারে হস্তিমূর্খ, কিন্তু কাজে মহাপণ্ডিত। জন-বুল সহজে কোনও বিষয় বুঝিতে না পারুন, কিন্তু একবার বুঝিয়া উহার কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে তিনি আর কিছুতেই নিরস্ত হইবার নহেন। যাঁহারা তিনটি মাত্র গুণের অধিকারী, এ সংসারে তাঁহাদেরই জয়। জনবুলের সেই ত্রিবিধ গুণই আছে।—তিনি কোনও কার্য্যেই পরাঙ্মুখ নহেন; তাঁহার অধ্যবসায় অতি প্রগাঢ়; এবং ছোট খাটো দুই একটা পরাজয় হইলেও তিনি উহাদিগকে নৈতিক বিজয়রূপেই অবলোকন করিয়া থাকেন। জন বুলকে কেহ কখনও হার মানাইতে পারে নাই। সাধনার সিদ্ধি বিষয়ে তিনি তিলমাত্রও সন্দিহান নহেন। আর যে ব্যক্তি বিজয়লাভে কৃতনিশ্চয়, সে যে ইতিমধ্যেই অর্দ্ধবিজয়ী, তাহাতে সন্দেহ নাই।

জনবুল হস্তিমূর্খ।

"বসুধাব্যাপ্ত, চল্লিশ কোটীরও অধিক লোকের অধ্যুষিত এই বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ইংরাজ যেরূপে শাসন করিতেছেন, তাহা অতীব বিস্ময়কর। এই সুবিশাল সাম্রাজ্যের আয়তন আবার দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজরাজের কোনও উপনিবেশ হইতে তাঁহার যে কিছুমাত্র ভয়ের কারণ নাই, এ কথা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিয়া আমি তাঁহাকে সাহস দিতে পারি।

ব্রিটিশ অধিকার।

"ফ্রান্সের পাঁচ ছয়টা প্রদেশ একত্রিত করিলে যত বড় হয়, ইংরাজ তাহার ন্যায় বিস্তৃত ভূভাগ সমূহের একমাত্র ম্যাজিষ্ট্রেট ও দ্বাদশ জন মাত্র পুলিস কর্মচারীর দ্বারা শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। স্বজাতি ও বিজাতি, ইংরাজের চক্ষে উভয়েই সমান। আমেরিকার ন্যায় ইংরাজ-রাজ্যে Lynch Lawএর প্রাদুর্ভাব নাই। গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইয়াও নেটিবেরা ন্যায় বিচারের প্রত্যাশা করিয়া থাকে। স্বজাতীয় জুরীদিগের সাহায্যেই তাহাদের দোষাদোষ সাব্যস্ত হয়।

"আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কেন্দ্রস্বরূপ এই সকল প্রদেশ ইংরাজ কেবল নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখেন নাই। বিজাতীয় লোকেরাও এই সকল স্থলে গমন করিয়া অবাধে বসবাস করিতে পারেন। তাঁহারা নিজের ভাষা, নিজের ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া নাগরিকের সমগ্র স্বত্বের অধিকারী হইতে পারেন। আর শিখিবার বয়স থাকিলে, অথবা অত্যধিক অহঙ্কারে পূর্ণ না হইলে, স্বাধীনতার শৈশব-গৃহসদৃশ এই সকল প্রদেশ হইতে অনেক সুশিক্ষাও লাভ করিতে পারেন।

জনবুলের স্বাধীন ভাব।

"ইংরাজ জাতির সহস্র ভ্রমপ্রমাদ ও দৌর্ব্বল্য থাকিলেও বিশাল বসুধাবক্ষে কেবল তাঁহারাই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া থাকেন। এ কথা যদি প্রমাণ করিতে না পারিয়া থাকি, তবে হে পাঠক, তোমার ও আমার এতখানি সময় বৃথায় ব্যয়িত করিলাম।"

কথাগুলি অনেকাংশে সত্য বলিয়া আমরা আদ্যন্ত অনুবাদ করিলাম। ইংরাজ যে সর্ব্ববিষয়েই সম্পূর্ণ স্বাধীন, ইহাতে দ্বিরুক্তি করি না। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, ইংরাজের এবং অল্পবিস্তর পাশ্চাত্য জাতিমাত্রেরই এই স্বাধীনতা অনেক স্থলে একবারে মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। "অপরের স্বাধীনতার ব্যাঘাত না করিয়া স্বকীয় স্বাধীনেচ্ছার যথেচ্ছ ব্যবহার করিও"—ইংরাজের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ইহা অপেক্ষা উচ্চতর নীতি আর খুঁজিয়া পাইলেন না। কিন্তু কি স্বকীয়, কি পরকীয়, সকলের ইচ্ছার উপর স্বয়ং ভগবানের যে একটা সর্ব্বাতিশায়িনী ইচ্ছা বিশ্বের শিয়রে কালদণ্ডস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে, ইংরাজ তাঁহার সহস্র উন্নতি সত্ত্বেও এ পর্য্যন্ত তাহার সন্ধান করিতে পারেন নাই। সুতরাং ফরাসী সমালোচকের কথায় সায় দিয়া আমরা এ বিষয়ে ইংরাজের তাদৃশ গৌরব গাহিতে পারিলাম না। আর এ সকল বিষয়ে সংপ্রতি তাঁহার চৈতন্যোৎপাদনের চেষ্টাও নিতান্ত নিষ্ফল বলিয়া মনে হয়। কারণ, এই ঊনবিংশ শতাব্দীর আলোচনায় তিনি যে নীতিতত্ত্বটুকুর উদ্ভাবন করিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত তাহারই সম্যক পরিচালন করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ফরাসী সাহেবের আর একটা কথা—"There is the same justice for the natives as for the colonists."—আমরা ইংরাজ উপনিবেশসমূহের আভ্যন্তরিক ব্যাপার বড় অবগত নহি। তবে এ কথা বলিতে পারি, ম্যাক্‌স্‌ওয়েল মহোদয় তাঁহার গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিবার পূর্ব্বে একবার এই ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষে পদার্পণ করিলে, ছত্রটুকু কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিতে বোধ হয় অসম্মত হইবেন না।

স্বাধীনতার মাত্রা।

ম্যাক্‌স্‌ওয়েল বলেন, এই সব বিবিধ উপনিবেশের মধ্যে পরস্পরের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান সম্পর্ক ও বন্ধন কেবল ইংরাজী ভাষা লইয়া। এই ভাষাবন্ধনের সাহায্যে জনবুল কোম্পানী তাঁহাদের শাখা-দোকানগুলি চালাইতেছেন। ইংরাজী ভাষার বিস্তৃতি ও আধিপত্য সম্বন্ধে সমালোচক বলিতেছেন,—

ভাষার বন্ধন।

"প্রধানতঃ দিনেমার জাতীয় লোকে পরিপূরিত, কেপ-কলোনির অন্তর্গত একটা নগরের পুস্তকালয়ে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ইংরাজী বহির সংখ্যা দুই সহস্র, আর দিনেমার ভাষার গ্রন্থ চল্লিশখানি মাত্র।

"ইংরাজী শিক্ষার কেমন একটা মোহিনী শক্তি আছে যে, উহা সর্ব্বজাতীয় যুবকবৃন্দের ভিতর প্রবেশ করিয়া উহাদিগকে একবারে ইংরাজীভাবাপন্ন করিয়া ফেলে। এই ইংরাজী-শিক্ষাই ইংরেজের দল বাড়াইয়া দিতেছে। লণ্ডননিবাসী অনেক ফরাসী ভদ্রলোক আমার কাছে বিষণ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বলিয়াছেন, 'এই ইংরাজী স্কুলগুলা আমার বালকগণকে একবারে বিকৃত করিয়া দিতেছে; উহাদের জাতীয় ফরাসীভাব যে কিরূপে বজায় রাখিব, ভাবিয়া পাইতেছি না।'

"কেপ-কলোনির দিনেমার বালকেরা ইংরাজী স্কুলে অধ্যয়ন করে, ফুটবল আর ক্রিকেট খেলে, এবং পরিণামে প্রকৃত এক একটি জনবুল হইয়া দাঁড়ায়।"

ম্যাক্‌স্‌ওরেল মহোদয়ের এই কথাগুলিতে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সায় দিতেছি। "English education, that is what makes proselytes for England"—এ উক্তিটি সম্পূর্ণ সত্য। এই ভারতবর্ষ, বিশেষতঃ এই বঙ্গদেশ, ইহার দৃষ্টান্তস্থল।

ইংরেজিয়ানা।

বঙ্গের ইংরাজী-শিক্ষিত প্রধান পুরুষদিগের মধ্যে অনেকেই ষোল আনা না হউন, পোনের আনা সাহেব। সাহেবী বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের গৃহে গৃহে সাহেবিয়ানা অনুপ্রবিষ্ট। ইহার জন্য প্রধানতঃ ইংরাজী স্কুলগুলিই দায়ী। সাহেবিয়ানার প্রলেপ গায়ে না মাখিলে ইংরাজী শেখা যায় না, এমন নহে। কিন্তু ইংরাজী বিদ্যা হইতে ইংরাজী ভাবের পার্থক্য রক্ষা করা যে অনেকের পক্ষেই অসম্ভব, সেই কথাই বলিতেছি।

ম্যাক্‌স্‌ওরেল তাঁহার গ্রন্থের বৃহত্তরাংশ অষ্ট্রেলিয়ার কথায় পূর্ণ করিয়াছেন। অপরাপর বিষয়ে প্রশংসা করিয়া ফরাসী-লেখক অষ্ট্রেলিয়দিগের নৈতিক চরিত্রের বড়ই নিন্দা করিয়াছেন। তিনি বলেন, ইংরাজী-ভাষাভাষী দেশসমূহের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মদ্যপ্রিয়। এই দেশে প্রধান প্রধান পুরুষ ও রাজ-

অষ্ট্রেলিয়ার চরিত্র।

কর্ম্মচারীদিগের মধ্যেও চরিত্রবন্ধ পানদোষ দোষ বলিয়া গণ্য নহে। উচ্চপদস্থ ভদ্রলোকেরা অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়া পশুবৎ ব্যবহার করিতেছেন, ইহা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ জনগণের ভিতরেও এই পাপের বিস্তৃতি দেখিয়া হৃদয়ে আশঙ্কার উদয় হয়; এ বিষয়ে আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়াপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। আমরা সাহেবের নিজের কথাগুলি উদ্ধৃত করিতেছি,—

"অষ্ট্রেলিয়াবাসীর পক্ষে সুরা জীবন-ব্যাধির ঔষধস্বরূপ। পানাসক্তি উহাদের জাতীয় মহাপাপ। ইহা সমাজের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়া তাহার মূলক্ষয় করিতেছে। ইহা কেবল বিলাস-লালসার উপাদানমাত্র নহে; প্রত্যুত ইহা অষ্ট্রেলিয়দিগের প্রকৃতিগত একটা দুশ্চিকিৎস্য রোগে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। যিনি

সুরাই সুধা।

যে পদেই অধিষ্ঠিত থাকুন, পানাসক্তির নিমিত্ত তাঁহার কোনওরূপ লজ্জা নাই।

"আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, লোকে টলিতে টলিতে স্ত্রীকন্যাদিগকে লইয়া থিয়েটার অথবা কনসার্ট-গৃহে প্রবেশ করিতেছে। তার পর কেহ কেহ বিকট চীৎকার করিয়া পার্শ্বস্থিত ব্যক্তিবৃন্দের বিষম বিরক্তি উৎপাদন করি-

মদমত্তের আধিক্য।

তেছে। আর কেহ বা গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইয়া অপেক্ষাকৃত শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিতেছে।

"ভিক্টোরিয়া সহরে আমি একবার মেয়র সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম, তাঁহার দেহ টলিতেছে। তা'র পর টাউন ক্লার্কের আফিসে গিয়া তাঁহাকেও তদবস্থ দেখিলাম। অতঃপর এথানকার প্রধান ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার সাহেবের নিকট গিয়া বুঝিলাম, তাঁহারও অবস্থা বড় ভাল নহে। আমি যে

কর্ম্মচারী মদে চুর।

হোটেলে বাস করিতেছিলাম, তাহার স্বত্বাধিকারী মহাশয় মদ্যপানজনিত বিষম বিকারো-

জ্বরে পীড়িত হইয়া শয্যাগত ছিলেন। সেইদিনকারই রাত্রে আমার বক্তৃতার সময় সম্মুখের আসন হইতে দুইটি মহাপুরুষকে পুলিসের সাহায্যে সরাইয়া দিতে হইয়াছিল। দুই জন মাত্র পুরুষপুঙ্গবের জ্বালায় শ্রোতৃবৃন্দ আমার কথাগুলির আদৌ অনুসরণ করিতে পারিতেছিলেন না। ইঁহাদের একজন সহরের মধ্যে বিশেষ পদস্থ ও বিখ্যাত; অপর মহাত্মা সেই প্রদেশের মহাসভায় অন্যতম প্রতিনিধি।"

ব্যাপার যেরূপ, তাহাতে অষ্ট্রেলিয়েরা যে আজিও বাঁচিয়া আছে, ইহাই আশ্চর্য্য। কিন্তু সুরার এত অধিক অপব্যবহারেও একাল পর্য্যন্ত ইহাদের যে বিশেষ মারাত্মক কোনও অনিষ্ট হয় নাই, তাহার একটা কারণ বোধ হয় এই যে, ইহারা পানের ন্যায় আহারেও বেশ মজবুত। এ বিষয়ে ম্যাক্স্ওয়েলের কথা এই,—

উদরই সর্ব্বস্ব।

"অষ্ট্রেলিয়দিগের অধিকাংশ সময়ই ভোজনকার্য্যে অতিবাহিত হয়। সকাল বেলা সাতটার সময় চা, মাখম ও পাঁউরুটি। সাড়ে আটটার সময় আবার চা; অধিকন্তু চপ্, ষ্টিক্, ডিম্ব প্রভৃতি। এগারটার সময় বিয়ার এবং বিস্কুট; অথবা চা, মাখম ও রুটী। বেলা একটা কি দেড়টার সময় মধ্যাহ্নভোজন; এ সময়েও চায়ের পেয়ালার অব্যাহতি নাই। তা'র পর তিনটার সময় আবার অপরাহ্নকালীন চা। অতঃপর ছয়টা হইতে সাতটা পর্য্যন্ত সমগ্র অষ্ট্রেলিয়াবাসী তৃতীয় বার মাংসউৎসবে প্রবৃত্ত;— চায়ের বাটী তখনও হাজির। যাঁহারা ওরি মধ্যে একটু বেশী রাত্রে নিদ্রা যান, তাঁহারা দশটার সময় আরও একটা ছোট গোছের জলযোগ করিয়া লন।" সেই দশটা রাত্রেও—

ঢালো, ঢালো, ঢালো চায়ে, ঢালো গো ইয়ার্"—

ইতি রব উত্থিত হয় কি না, সাহেব তাহা বলিয়া দেন নাই। তা না বলুন, ইতিপূর্ব্বেই কিন্তু চা-বেচারীর দুঃখে আমাদের চক্ষে জল আসিয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়ার মাংস খুব সস্তা। মাংসের মূর্ত্তিও নানাবিধ। কখনও সিদ্ধ, কখনও ভর্জ্জিত; কখনও চপ, কখনও ষ্টিক্; আবার কখনও বা অগ্নিসঞ্চারিণী ক্রোকে বা ষ্টু। আমাদের ভোজনবিলাসী বাঙ্গালী বাবুরা এই বর্ণনা শুনিয়া আবার পাছে সমুদ্রযাত্রার আন্দোলনে মাতিয়া উঠেন, আমাদের সেই ভয়ই হইতেছে।

পানাসক্ত, পেটসর্ব্বস্ব অষ্ট্রেলিয় এই মানব জন্মকে যে বড় একটা গুরুতর বিষয় বিবেচনা করিবেন, তাহা সম্ভব নহে। বস্তুতঃ তিনি জীবনটাকে সুখভোগের সহায়মাত্র মনে করিয়া রাত্রিদিন কেবল আমোদ লইয়াই আছেন। "অষ্ট্রেলিয়ার ন্যায় আর কোনও দেশে থিয়েটার, কনসার্ট, একজিবিশন্ প্রভৃতি প্রমোদ-গৃহে এত লোকের সমাগম হয় না। এত উৎসব বা পর্ব্বদিন অপর কোনও জাতির নাই, জাতীয় উৎসব আনন্দে যোগ দিবার এরূপ একান্ত আগ্রহও আর কাহারও নাই। এত নাচ-ভোজের আয়োজন অপর কোনও সমাজে হয় না। অষ্ট্রেলিয়ার থিয়েটারগুলিতে চিত্তবিনোদন মন্দ হয় না;—কিন্তু যে নাটকগুলি অভিনীত হয়, তাহাদের অধিকাংশই সাহিত্যের হিসাবে অপদার্থ। অষ্ট্রেলিয়াবাসীর প্রিয়তর হইতেও প্রিয়তম আমোদ ঘোড়দৌড়। ইহাকে অতিপ্রবল একটা সপ্তম রিপু বলিলেও চলে। অষ্ট্রেলিয়-চরিত্রের এই বৈচিত্র্যই ভ্রমণকারীর চক্ষে সর্ব্বাগ্রে পতিত হয়। মেলবোর্ণ সহরের যেটা "Cup week", সে সপ্তাহে লোকে অপর কোনও কথা কহেও না, মনেও ভাবে না।"

জীবন সখের।

ঘোড়দৌড়ের বিষম দৌড়।

অষ্ট্রেলিয়াবাসীকে হিংসা করিবার একটা বড় ভাল জিনিষ আছে। তাহাদের ইন্দ্রিয়গত সুখশান্তি অপরের চক্ষে যতই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হউক, তাহারা আপনাদিগকে

জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখে সুখী বলিয়া মনে করে। "তাহারা আপন অদৃষ্টে সন্তুষ্ট ; পুরাতন দুঃখের আর কোনও খবর রাখিতে চাহে না।"

দেবীসিংহের অত্যাচার।

সমগ্র ভারতের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি আমরা বঙ্গদেশের কথা চিন্তা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই, এখানে এমন অনেক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহাদের মহত্ব, প্রতিভা এবং পাণ্ডিত্য মনুষ্যনাম সম্মানিত করিয়াছে। কিন্তু বঙ্গভূমির দুর্ভাগ্য—অতি হীনচরিত্র, মনুষ্যত্ববিহীন নরপিশাচের সংখ্যাও এ দেশে অল্প নহে। তাহাদেরই এক জন—দেবীসিংহের অমানুষিক অত্যাচারের কিঞ্চিৎ বর্ণনাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। মানুষ কত দূর নির্দ্দয় হইতে পারে, ঘৃণা, লজ্জা এবং সর্ব্বপ্রকার মানবসুলভ প্রবৃত্তি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক এক জন লোক তাহার স্বদেশীয় নর-নারীকে কিরূপ নিষ্ঠুরভাবে উৎপীড়িত, অপমানিত ও সর্ব্বস্বান্ত করিতে পারে, আমরা এই প্রবন্ধে তাহাই দেখাইব। কিন্তু সে সকল কথা বলিবার পূর্ব্বে দেবীসিংহ কে, কিরূপে তিনি প্রবল ক্ষমতা লাভ করিলেন, ইত্যাদি বিষয় সংক্ষেপে বলা যাউক।

ওয়ারেন্ হেষ্টিংস ভারত সাম্রাজ্যের শাসনকর্ত্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতে, এমন কি যখন মুরসিদাবাদের স্থাপয়িতা মুরসিদ কুলী খাঁ জন্মগ্রহণ করেন নাই, এবং সুপ্রসিদ্ধ সমর-ক্ষেত্র পলাশীর নাম যখন দুই এক জন পথশ্রান্ত, রৌদ্রক্লান্ত পথিক ভিন্ন অন্য কাহারও বিদিত ছিল না, তাহারও অনেক বৎসর পূর্ব্ব হইতে দিনাজপুরে এক অতিপরাক্রান্ত জমীদার পরিবারের বাস ছিল। রঙ্গপুর, দিনাজপুর ও নিকটবর্ত্তী অনেক স্থান তাঁহাদের জমীদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল ; ইহাঁরা 'দিনাজপুরের রাজা' নামে প্রসিদ্ধ। এই প্রাচীন, সুবিখ্যাত এবং উচ্চবংশোদ্ভব রাজপরিবারকে দেশের মুসলমান শাসনকর্ত্তারা প্রজার ন্যায় দেখিতেন না, বন্ধু এবং সহায় বলিয়াই মনে করিতেন। এই রাজপরিবারের মধ্যে কোনও গোলযোগ বা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণ সেই পারিবারিক ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করিতেন না।

কিন্তু চিরকাল সমান যায় না, বঙ্গে মুসলমানের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইল, এবং ইংরেজের দীপ্ত তেজ চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইল। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের বর্ষাকালে

দিনাজপুরের তদানীন্তন রাজা অগাধ সম্পত্তি, এক দত্তক পুত্র এবং একটি বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাখিয়া চির রোগী অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরই পিতৃব্য এবং ভ্রাতুষ্পুত্রের মধ্যে বিষয়ের উত্তরাধিকার লইয়া মহা-বিবাদ উপস্থিত হইল; অবশেষে তাঁহারা সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারলের উপর মীমাংসার ভার অর্পণ করিলেন। এ সময় ওয়ারেন হেষ্টিংস ভারতের গবর্ণর জেনারল। তিনি দত্তক পুত্রকেই দিনাজপুর-রাজ্যের উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিলেন, এবং এই সুযোগে দিনাজপুর রাজ্যের উপর করস্থাপন করি-লেন। এখানেই সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া গেল; কিন্তু হেষ্টিংস সাহেব সেই বালককে পিতৃসিংহাসন দান করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, তাহার উপর বিবিধ অনুগ্রহ বর্ষণ করিলেন; ইহাতে অনেকেরই আশ্চর্য্য বোধ হইল, কারণ হেষ্টিংস এ দেশে আসিয়া আর যাহাই করুন, কোনও রাজা, নবাব বা বেগ-মের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করা তাঁহার কখনই অভ্যাস ছিল না।

কিন্তু ইতিহাসে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় যে, হেষ্টিংসের এই অনুগ্রহ নিতান্ত অর্থশূন্য নহে। তিনি দত্তক পুত্রকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করিয়া এক বৎসরে কয়েক বারে প্রায় চারি লক্ষেরও অধিক টাকা উপহার গ্রহণ করেন; কোনও বন্ধুর সাহায্যেই তিনি পাঁচ বৎসরের একটি বালকের এত গুলি টাকা আত্মসাৎ করেন।

হেষ্টিংসের এই বন্ধুটির নাম গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ। গঙ্গাগোবিন্দ হেষ্টিংসের দেওয়ান, সুতরাং ভারতের দ্বিতীয় লাট। হেষ্টিংস সমস্ত টাকা বুঝিয়া পাইলে, গঙ্গাগোবিন্দ এক অভিনব অভিনয় আরম্ভ করিলেন। তিনি নিজে ষড়যন্ত্রের মধ্যে থাকিয়া হেষ্টিংসকে টাকা দিলেন, কিন্তু টাকা দিবার পরই সেই নাবা-লক রাজার সমস্ত প্রধান কর্ম্মচারিবর্গকে পদচ্যুত করিলেন; যেন তাহারাই রাজার ধনাগার লুণ্ঠন করিতেছে, রাজাকে মন্দ পরামর্শ দিতেছে, এবং রাজ্যের সমস্ত কার্য্যের শৃঙ্খলা নষ্ট করিতেছে! কেবল তাহাই নহে, রাজমাতা ও রাজার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সকলকে রাজার সংস্রব হইতে দূরীভূত করিয়া, গঙ্গাগোবিন্দ একজন নূতন লোকের হস্তে দিনাজপুর রাজ্যের সমস্ত ভার এবং রাজপরি-বারের দায়িত্ব সমর্পণ করিলেন।

এই নবনিযুক্ত ব্যক্তিই দেবীসিংহ। চরিত্রের পৈশাচিকতায় দেবীসিংহ ও গঙ্গাগোবিন্দ উভয়েই অতুলনীয়। এমন মিলন প্রায়ই দেখা যায় না; এরূপ দুই ব্যক্তি যেখানে অতি উচ্চক্ষমতা লাভ করিয়া একই উদ্দেশ্যে মিলিত হয়,

সে দেশের সুখ শান্তি অতি অল্প দিনেই অন্তর্হিত হইয়া যায়, এবং সমস্ত দেশ তাহাদের অত্যাচারে মরুভূমি হইয়া পড়ে। দিনাজপুর রাজ্যেও তাহাই হইয়াছিল। তাই সেই পাপ, সেই ভীষণ অত্যাচার ও ঘৃণিত আচরণের কাহিনী, সহস্র সহস্র গিরি, নদী, সাগর, উপসাগর অতিক্রম করিয়া সুদূর শ্বেতদ্বীপ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। যখন বাগ্মিপ্রবর মহাত্মা বর্ক দুর্ব্বলের সহায় হইয়া অগ্নিময়ী জ্বলন্ত ভাষায় সেই পাপকাহিনী বৃটিশ মহাসভায় বিবৃত করিয়াছিলেন, তখন তাহা স্বাধীনচেতা, সাম্যবাদী, তেজস্বী বৃটনবাসীর হৃদয়ে বিদ্যুৎবেগ উৎপন্ন করিয়াছিল, এবং সেই রোমহর্ষণ কাহিনী শুনিতে শুনিতে অনেক ইংরেজললনা লজ্জায় ঘৃণায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সকল কর্ম্মচারীর অধিকার হরণ করিয়া, দেবীসিংহ দিনাজপুর রাজ্যের প্রধান ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন; 'গুড্‌ল্যাড্' নামক একটি অপরিণতবয়স্ক ইংরেজ যুবক তাঁহার সহকারী জুটিল। এই ব্যক্তির প্রকৃতিও অতি ভয়ানক ছিল। ইঁহারা কয় বন্ধুতে পরামর্শ করিয়া, রাজার মাসহারা হইতে হাজার টাকা কমাইয়া ফেলিলেন। ষোল শত টাকা রাজার মাসহারা নির্দ্দিষ্ট ছিল, ইঁহারা কমাইয়া ছয় শত টাকা রাখিলেন। অনেকে বিবেচনা করেন, হেষ্টিংসকে তখনও অনেক টাকা দিবার কথা ছিল, তাই নানা প্রকার ব্যয়সংক্ষেপ করিয়া সেই টাকা তুলিবার চেষ্টা হইতেছিল; কিন্তু কেহ কেহ ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, দেবীসিংহ দিনাজপুর রাজ্যের প্রধান পদ হেষ্টিংসের নিকট হইতে প্রায় তিন লক্ষ টাকায় ক্রয় করেন, সেই টাকা সংগ্রহের জন্যই তিনি এই সমস্ত ব্যয়সংক্ষেপে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

এখানে দেবীসিংহের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। যে সময় বঙ্গদেশে ইংরেজগণ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিতে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিলেন, সেই সময় যে কয় জন হিন্দু ও মুসলমান কর্ম্মচারী উচ্চপদস্থ ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মহম্মদ রেজা খাঁর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন তিনিই বঙ্গের রাজস্বসংক্রান্ত প্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময় দেবীসিংহ নানাবিধ অসৎ উপায়ে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, মহম্মদ রেজা খাঁর বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হওয়ায়, দেবীসিংহ তাঁহাকে অনেক টাকা ধার দিয়া সাহায্য করেন। এই উপকার পাইয়া মহম্মদ রেজা খাঁ দেবীসিংহের পক্ষপাতী হইলেন, এবং বিশেষ চেষ্টা করিয়া দেবীসিংহকে পূর্ণিয়ার প্রধান রাজস্বকর্ম্মচারিপদে নিযুক্ত করিলেন।

এই সময় পূর্ণিয়া বঙ্গদেশের মধ্যে একটি প্রধান স্থান ছিল। এমন ধনধান্যপূর্ণ প্রদেশ বঙ্গে বড় অধিক ছিল না; কিন্তু দেবীসিংহ এরূপ উৎসাহ ও তৎপরতার সহিত রাজস্ব আদায় করিতে লাগিলেন যে, অতি অল্প কালের মধ্যেই এই "সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা" পূর্ণিয়া অরণ্যে পরিণত হইল। অধিবাসীগণ দেবীসিংহের অত্যাচারে পৈতৃক ভদ্রাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার অধিকারবহির্ভূত স্থানে পলায়ন করিতে বাধ্য হইল।

এ সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই; এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে পূর্ণিয়ার রাজস্ব বার্ষিক নয় লক্ষ টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল, কিন্তু অতি সুজন্মার বৎসরেও ছয় লক্ষ টাকার অধিক রাজস্ব আদায় হইত না; সেই ছয় লক্ষ টাকার পরিবর্ত্তে দেবীসিংহ বার্ষিক ষোল লক্ষ টাকা হিসাবে আদায় করিয়াছিলেন; সুতরাং এই টাকা সংগ্রহ করিতে নিরীহ প্রজার উপর কত অত্যাচার, কত উৎপীড়ন চলিয়াছিল, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। দেবীসিংহের এই কঠোর শাসনে পূর্ণিয়ার সর্ব্বস্বান্ত হইল, এবং তাহার ভবিষ্যৎ রাজস্বের মূল পর্য্যন্ত উন্মূলিত হইয়া গেল।

যাহা হউক, দেবীসিংহের এই অত্যাচারের কথা উচ্চতম শাসনকর্ত্তাদিগের অজ্ঞাত রহিল না। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে হেষ্টিংস দেবীসিংহকে পদচ্যুত করিলেন, কিন্তু তাঁহার অন্য কোনও দণ্ড হইল না। তিনি বিন্দু বিন্দু করিয়া প্রজার হৃদয়শোণিত শোষণপূর্ব্বক নিজের ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছিলেন, পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তাঁহার এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে হইল না। হেষ্টিংস প্রকাশ্যে দেবীসিংহের প্রতি যতই ক্রুদ্ধ হউন, প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হন নাই; কারণ তিনি অসন্তুষ্ট হইলে দিনাজপুরের 'দেওয়ানী' পদ লাভ করা দেবীসিংহের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিত না।

১৭৭৩ সালে হেষ্টিংস সাহেব প্রাদেশিক সমিতি সংগঠিত করিয়া, দেবীসিংহকে মুরশিদাবাদস্থ সমিতির সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করিলেন। দেবীসিংহ নামতঃ সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ হইলেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি কার্য্যাধ্যক্ষের সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। পাঠক শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, এই প্রদেশের বার্ষিক রাজস্ব এক কোটী বিশ লক্ষ টাকা ছিল, যদি হেষ্টিংস দেবীসিংহের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট না থাকিতেন, তবে এই বিপুল রাজস্ব আদায়ের ভার কখনও তাঁহার প্রতি অর্পিত হইত না।

দেবীসিংহ মুরশিদাবাদস্থ প্রাদেশিক সমিতির সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ হইয়া

দেখিলেন, তাঁহাকে কতকগুলি ইংরেজ কর্ম্মচারীর সহিত একযোগে কাজ করিতে হইবে, সুতরাং তিনি তাঁহাদিগকে বশীভূত করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার সৌভাগ্যবশতঃ এই সমস্ত কর্ম্মচারিবর্গের প্রায় সকলেই অপরিণতবয়স্ক, কার্য্যানভিজ্ঞ, আমোদপ্রিয় এবং দুশ্চরিত্র ছিল, সুতরাং তাহাদিগকে আয়ত্তাধীন করা দেবীসিংহের ন্যায় ধূর্ত্তের পক্ষে বড় কঠিন হইল না। অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি তাহাদের অধিনায়ক হইয়া উঠিলেন।

বলিতে লজ্জা হয়, দেবীসিংহ এই সমস্ত অপরিণতবয়স্ক যুবকদিগের মনোরঞ্জনার্থ একটি বেশ্যালয় স্থাপন করিলেন, এবং সেই স্থানে সুন্দরী বেশ্যাদিগকে সযত্নে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তিনি কেবল যে বেশ্যা সংগ্রহ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন, তাহা নহে; শব্দশাস্ত্র মন্থন করিয়া নব নব নামে তাহাদিগকে অভিহিত করিতে লাগিলেন। দেবীসিংহের সেই সকল অল্পবয়স্ক ইন্দ্রিয়পরায়ণ সহযোগিগণ যখন এই বারবনিতাবর্গের কৃষ্ণতারশোভিত নয়নের বিলোল কটাক্ষে বিদ্ধ হইয়া আপনাদের জীবন ধন্য মনে করিতেন, এবং ফরাসীদেশজাত সুস্বাদু উত্তেজক মদ্যের স্রোতে কার্য্যক্ষেত্রের কঠোরতা ও কর্ত্তব্যজ্ঞান ভাসাইয়া দিতেন, তখন দেবীসিংহই কেবল অভীষ্টসিদ্ধির আশায় এই বীভৎস দৃশ্যের মধ্যে স্থিরনেত্রে বসিয়া থাকিতেন, এই সমস্ত প্রলোভন ও বিলাসলালসা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না; মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত তিনি স্বার্থসাধনে অতিবাহিত করিতেন। দেবীসিংহ তাঁহার সহযোগিবর্গকে বারবনিতা জুটাইয়া দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না, আবশ্যক হইলে তাঁহাদিগকে প্রচুর অর্থসাহায্যও প্রদান করিতেন। বলা বাহুল্য, এই উপায়ে তিনি অসীম ক্ষমতা লাভ করিলেন, এবং রাজ্যমধ্যে অদ্বিতীয় ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন; তাঁহার সহযোগিবর্গ ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ তাঁহার হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিকামাত্রে পরিণত হইলেন।

দেবীসিংহের ক্রমেই উন্নতি হইতে লাগিল। তিনি বেনামী করিয়া অল্পমূল্যে অনেক বড় বড় বিষয় ক্রয় করিলেন। এ দিকে রাজস্বের সহস্র সহস্র মুদ্রা তাঁহার ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিতে লাগিল, এবং স্বার্থসাধনের জন্য প্রত্যেক পাপ ও দুষ্কর্ম্মে সিদ্ধকাম হওয়ায় তিনি ক্রমে অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিলেন।

জীবনের এই ঘোর পরিবর্ত্তন ও অসামান্য উন্নতির মধ্যে দেবীসিংহ নিজের বুদ্ধিকৌশলে সকলকে ভুলাইয়া রাখিলেও, তিনি এক জন কূটবুদ্ধি, তীক্ষ্ণদর্শী লোকের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে সক্ষম হন নাই। এ ব্যক্তি আর কেহ নহেন,

স্বয়ং ওয়ারেন্ হেষ্টিংস। হেষ্টিংস বিস্ময়বিহ্বলচিত্তে এই বঙ্গপুরুষের প্রতি তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখিলেন, এবং বুঝিলেন, যদি কাহারও দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে হয়, তবে তাহা দেবীসিংহের দ্বারাই হইবে।

এইরূপে দেবীসিংহ যদিও হেষ্টিংসের প্রীতিভাজন রহিলেন, কিন্তু তাঁহার সহযোগিবর্গ তাঁহার গর্ব্বে ও প্রভুত্বে ক্রমেই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। মানুষের ভ্রম চিরদিন থাকে না; যখন দেবীসিংহের উপরিতন কর্ম্মচারিগণের চৈতন্য হইল, যখন তাঁহারা হীন আমোদ ও জঘন্য রূপলালসার মোহ হইতে মুক্ত হইয়া দেখিলেন,—তাঁহাদিগকে দুর্গন্ধ পঙ্কের মধ্যে ডুবাইয়া দেবীসিংহ তাঁহাদের সমস্ত ক্ষমতা, সমস্ত অধিকার হরণ করিয়া লইয়াছেন; যখন তাঁহারা বুঝিলেন, তাঁহারা দেবীসিংহের ক্রীতদাস মাত্র, প্রাদেশিক সমিতির স্বাধীনতা সম্পূর্ণ-রূপে বিনষ্ট হইয়া তাহার অস্তিত্ব দেবীসিংহের ইচ্ছার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে, কিন্তু দেবীসিংহের কৌশলে তাঁহারা কাপুরুষের ন্যায় কর্ত্তব্যজ্ঞান বিসর্জ্জন দিয়া পাপের স্রোতে দেহ ভাসাইয়াছেন, বীরের সন্তান হইয়া মনুষ্যত্বে পদাঘাত করিয়াছেন; তখন সেই বৃটিশকেশরিগণের সমবেত কোপরাশি উদ্যত বজ্রের ন্যায় দেবীসিংহের মস্তকে পতিত হইল। দেবীসিংহকে বিতাড়িত ও অপমানিত করিবার জন্য তাঁহারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। দেবীসিংহও বুঝিলেন, আর সুন্দরী বেশ্যা, সুস্নিগ্ধ ফরাসী মদ্য, অথবা সুগন্ধ তাম্রকূটে তাঁহাদিগকে ভুলাইয়া রাখা সম্ভবপর নহে। তখন তিনি তাঁহাদিগকে প্রচুর উৎকোচদানে প্রস্তুত হইলেন; কিন্তু তাঁহারা অত্যন্ত ঘৃণাপ্রকাশপূর্ব্বক দেবীসিংহের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। দেবীসিংহকে সেই উচ্চসম্মানপূর্ণ আসন হইতে ভূতলে টানিয়া আনিয়া কীটের ন্যায় পদদলিত করা ভিন্ন তাঁহাদের অন্য উদ্দেশ্য ছিল না।

উপায়ান্তর না দেখিয়া দেবীসিংহ হেষ্টিংসের শরণ লইলেন; হেষ্টিংসও তাঁহাকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। দেবীসিংহের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, তিনি কেবল তাহা অগ্রাহ্য করিলেন, এমন নহে; দেবীসিংহকে সম্পূর্ণ নিরাপদ করিবার জন্য মুরশিদাবাদস্থ প্রাদেশিক সমিতি উঠাইয়া দিলেন, এবং তাঁহাকে অক্ষত অবস্থায় সরাইয়া আনিলেন।

এই ঘটনার পরই হেষ্টিংসের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের আনুকূল্যে দেবীসিংহ হেষ্টিংসের নিকট হইতে দিনাজপুর রাজ্যের দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হইলেন, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

দেবীসিংহ দিনাজপুর রাজ্যে উপস্থিত হইয়া অবিলম্বে অভীষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি পূর্ণিয়ার অধিবাসিগণকে কিরূপ জ্বালাতন করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার অত্যাচারে তাহারা কিরূপে দেশত্যাগ করিয়াছে, তাহা দিনাজপুরের লোকের অজ্ঞাত ছিল না। সুতরাং দেবীসিংহের আগমনে দিনাজপুর রাজ্যে এক মহাভয়ের সঞ্চার হইল। দেবীসিংহও কালবিলম্ব না করিয়া জমীদার হইতে সামান্য কৃষিজীবী পর্য্যন্ত সকলের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহে যত্নবান্ হইলেন, এবং প্রথম হইতেই যথেচ্ছাচার ও অতি কঠোর ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই তিনি কি জমীদার, কি সামান্য ভূস্বামী, সকলের সম্পত্তির উপরই অসম্ভব কর বৃদ্ধি করিয়া দিলেন; নির্দ্দিষ্ট কর প্রদান করা যাহাদের পক্ষে কঠিন, বর্দ্ধিতহারে কর তাহারা কোথা হইতে সংগ্রহ করিবে? সুতরাং এই বর্দ্ধিত করভার বহন করিতে তাঁহারা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন দেবীসিংহ ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে কারাগারে প্রেরণ করিলেন, এবং নানাপ্রকারে অপমানিত করিতে লাগিলেন; অগত্যা তাঁহারা নিরুপায় হইয়া দেবীসিংহের প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন।

এইরূপে সেই সমস্ত জমীদার ও প্রধান ব্যক্তিগণকে করতলগত করিয়া দেবীসিংহ তাঁহাদের প্রতি দিন দিন নূতন নূতন পীড়ন আরম্ভ করিলেন। একটি ছল ধরিয়া কিছু টাকা আদায় করা হইল, আবার আর একটি নূতন ছল ধরিয়া অর্থের জন্য সেই সমস্ত সম্বলহীন ব্যক্তিকে বিব্রত করিয়া তুলিলেন। এই হতভাগ্য ব্যক্তিদিগের কষ্টের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। দেবীসিংহের প্রার্থিত অর্থসংগ্রহের জন্য তাঁহাদের সমস্ত দিন অতিবাহিত হইত, তাঁহারা স্নানাহারের অবসর পাইতেন না। পর দিন আবার কোথা হইতে অর্থ সংগৃহীত হইবে, আবার দেবীসিংহের কোন্ কঠোর আদেশ পালন করিতে হইবে, এই চিন্তায়, উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে বিনিদ্রনয়নে তাঁহাদিগকে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিতে হইত।

অবশেষে যখন জমীদারবর্গ অর্থসংগ্রহে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া উঠিল, অন্নাভাবে প্রজাদের গৃহে গৃহে হাহাকার উঠিল, তখন দেবীসিংহ রাজস্ব-অনাদায়ের ছল ধরিয়া অতি অল্পমূল্যে জমীদারী বিক্রয় করিতে লাগিলেন। লোকে পুরুষানুক্রমে যে সমস্ত লাখরাজ জমী ভোগ করিয়া আসিতেছিল, দুরাত্মা দেবীসিংহ তাহা প্রায় বিনামূল্যে বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। ক্রেতা কে, তাহা বোধ হয় বলা অনাবশ্যক, দেবীসিংহ নিজেই বেনামী করিয়া সেই

সমস্ত জমীদারী ক্রয় করিয়া লইলেন ; তিনি নিজেই মূল্যনির্দ্ধারক, এবং নিজেই বিক্রেতা ও ক্রেতা। আবার যে অর্থে তিনি সেই সমস্ত জমীদারী ক্রয় করিলেন, তাহাও সেই দুর্ভাগা, উৎপীড়িত জমীদারবর্গের নিকট হইতেই আদায় করা হইয়াছিল।

জমীদারী বিক্রয় হওয়াতেই যে হতভাগ্য জমীদারবর্গ নিষ্কৃতি পাইলেন, তাহা নহে। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, সেই সমস্ত জমীদারী অতি অল্প মূল্যে, এমন কি বিনামূল্যে, বিক্রীত হইল ; সুতরাং যে টাকার জন্য জমীদারী বিক্রীত হইল, তাহা দেবীসিংহের দাবীর টাকার অতি সামান্য অংশ মাত্র ; অবশিষ্ট টাকা ত আদায় করিতে হইবে,—কিন্তু তাহা কোথা হইতে সংগ্রহ হয় ? দেবীসিংহের সর্ব্বগ্রাসিনী লুব্ধদৃষ্টি জমীদারবর্গের অস্থাবর সম্পত্তির উপর পতিত হইল। জমীদারগণের চক্ষুর সম্মুখে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের বহুযত্ন-সঞ্চিত মূল্যবান্ দ্রব্যাদি বিক্রীত হইতে লাগিল। দেবীসিংহের হস্ত হইতে কে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে ?

এ ত গেল পুরুষ জমীদারদের কথা। এই সময় দিনাজপুর রাজ্যে অনেক স্ত্রী-জমীদারও ছিলেন ; তাঁহাদের দুর্দ্দশাকাহিনী আরও ভয়ানক। তাঁহাদের গৃহের চতুর্দ্দিকে প্রহরী নিযুক্ত করিয়া, অন্তঃপুর হইতে ধনরত্ন ও অলঙ্কারাদি ক্রোক করা হইত। ক্রমে তাঁহাদের সম্মান ও প্রাণরক্ষা কঠিন হইয়া উঠিল। যে সকল অসূর্য্যম্পশ্যা অন্তঃপুরচারিণী মহিলাদের কোমল পদ কখনও কঠিন মৃত্তিকা স্পর্শ করে নাই, তাঁহারা প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা ও দাসদাসী পরি-ত্যাগপূর্ব্বক, প্রাণ ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য সামান্য পরিচারিকার বেশে অপেক্ষা-কৃত নিরাপদ কৃষককুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, এবং অনাহার, দুশ্চিন্তা ও নানাবিধ দুঃখকষ্টে মৃতকল্প অবস্থায় সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কত জন নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া অকালে মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছিলেন, কে বলিবে ?

এইরূপে জমীদারদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইল। তাহার পর তাঁহারা যে সকল সম্পত্তি দেবসেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে সকল সম্পত্তি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছিলেন, এবং যাহার আয় হইতে প্রত্যহ শত শত অন্ধ ও আতুর, খঞ্জ ও মূক, গৃহহীন অনাথ এবং বহুসংখ্যক পথশ্রান্ত নিঃসম্বল অতিথি নিয়মিতরূপে আহার পাইত,—সেই সমস্ত সম্পত্তিও দেবীসিংহ চাতুর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক অতি অল্প মূল্যে কিনিয়া লইলেন ; প্রাচীন আভি-

জাতগণের ধনসম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের পুরুষানুক্রমিক কীর্ত্তি এবং গৌরব বিনষ্ট হইল, কিন্তু তাহাতে কাহার কি ক্ষতি বৃদ্ধি? দেবীসিংহের স্থির সঙ্কল্প, হতভাগ্য জমীদারবর্গের বিদীর্ণ হৃৎপিণ্ড নিষ্পেষিত করিয়া রুধির সঞ্চয় করিতেই হইবে।

অর্থশালী লোকের প্রতি যেরূপ আচরণ হইতে লাগিল, তাহা আমরা বিবৃত করিলাম। পাঠক মনে করিবেন না, নিম্ন শ্রেণীর লোক, অর্থহীন শ্রমজীবিবর্গ, দেবীসিংহের এই পাশব অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইল। কৃতান্তের নিষ্ঠুর হস্ত যেমন সৌধপ্রাকার ভেদ করিয়া লক্ষপতির ধনরত্নশোভিত প্রাসাদে কিম্বা শ্যামল বৃক্ষ লতার ভিতর দিয়া দরিদ্রের পর্ণাচ্ছাদিত জীর্ণ কুটীরে, একই প্রকার অসঙ্কোচে প্রসারিত হয়, দেবীসিংহের অত্যাচারকলুষিত লোলুপ হস্ত সেইরূপ ধনাঢ্য জমীদারের বিস্তীর্ণ জমীদারী হইতে আরম্ভ করিয়া দীন হীন কৃষকের সামান্য সংস্থানের উপর পর্য্যন্ত সমান আগ্রহের সহিত বিস্তৃত হইল। হায়, অশিক্ষিত কৃষক, মূর্খ শ্রমজীবিগণ—তাহারা জানে না, তাহাদের কি অপরাধ; সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রমের পর স্বচ্ছন্দবনজাত শাক ও সামান্য লবণের সাহায্যে এক মুষ্টি কদর্য্য অন্ন—ইহাই তাহাদের জীবনের একমাত্র উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, ক্ষুদ্র মৃৎকুটীরে স্ত্রীপুত্র লইয়া শান্তিতে রাত্রিযাপন—ইহাই তাহাদের সুখের উচ্চ আদর্শ,—কিন্তু সে সুখ হইতেও তাহারা বঞ্চিত হইল।

দেবীসিংহের অত্যাচারে সেই সমস্ত দরিদ্র ব্যক্তি কিরূপ উৎপীড়িত হইয়াছিল, তাহাদের অবস্থা কত দূর শোচনীয় হইয়াছিল, তাহা দেবীসিংহের নিজের কথাতেই উত্তমরূপ প্রতীয়মান হয়। দরিদ্রের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিয়াও যখন তিনি অর্থসংগ্রহে কৃতকার্য্য হইলেন না, তখন তিনি মনোদুঃখে লিখিয়াছিলেন,—"বড়ই বিড়ম্বনার বিষয় যে, রঙ্গপুরের কৃষকগণের মধ্যে যেরূপ ভয়ানক অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, বোধ হয়, বঙ্গের অন্য কোনও স্থানে সেরূপ হয় নাই; যে সময় তাহাদের ক্ষেত্রে শস্যাদি জন্মে, সে সময় ভিন্ন অন্য কোনও সময়ে তাহাদের গৃহে এক কপর্দ্দক মূল্যের দ্রব্যও দেখিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং তাহারা প্রায় উপবাস করিয়াই দিন কাটায়; আর এই জন্যই দুর্ভিক্ষে অনেক লোক মারা পড়িতেছে। তাহাদের সম্বলের মধ্যে দুই একটি মৃৎপাত্র এবং জীর্ণ পর্ণকুটীর। কুটীরগুলির অবস্থা এতই শোচনীয় যে, তাহার বিশ পঁচিশ খানি বিক্রয় করিলেও দশটি টাকা সংগৃহীত হইবারও কোনও সম্ভাবনা নাই।"

সম্ভাবনা না থাকিলেও চেষ্টার ক্রটী হইল না। নিতান্ত দরিদ্র প্রজা ও নিরন্ন কৃষকগণের প্রতি উৎপীড়ন ক্রমেই প্রবলতর হইতে লাগিল। শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় তাহারা কারাগারে প্রেরিত হইল, বেত্রাঘাতে তাহাদের সর্ব্বশরীর ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল; কিন্তু হায়, অনাহারে যাহারা দিনপাত করে, উৎপীড়কের মনস্তুষ্টির জন্য তাহারা অর্থ কোথায় পাইবে?

দেশ ক্রমে শ্মশানের রূপ ধারণ করিল। পৈতৃক বাসস্থানের প্রতি মমতা-বশতঃ বহু দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়াও যাহারা এত দিন দেশত্যাগ করে নাই, উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহারাও অবশেষে অশ্রুপূর্ণলোচনে আজন্মের সুখ-নিকেতন ও বান্ধববর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল; যাহারা নিতান্ত নিরুপায়, যাহাদের অন্যত্র যাইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই, কেবল তাহারাই মৃতকল্প অবস্থায় পড়িয়া রহিল। যাহারা দেশত্যাগ করিয়া গেল, তাহাদের নিকট যে সমস্ত টাকা বাকি থাকিল, তাহা লুণ্ঠিতসর্ব্বস্ব অবশিষ্ট অধিবাসিবর্গের নিকট হইতেই আদায় করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল।

এই অরাজকতার সময় রঙ্গপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলে দুই পাঁচ জন কুসীদ-জীবীও ছিল, কিন্তু তাহারা কি স্বার্থের আশায় গৃহহীন নিঃসম্বল প্রজাবর্গের উপকার করিবে? যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্পত্তি তখনও দেবীসিংহের কর-তলগত হয় নাই, এমন কি, যাঁহাদের সামান্য জমাজমী ছিল, দেবীসিংহের উৎপীড়নে তাহাই কুসীদজীবিগণের নিকট আবদ্ধ রাখিয়া তাঁহারা কিছু কিছু টাকা কর্জ্জ লইতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু সমস্ত জীবনে কেহ সেই ঋণজাল হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন কি না সন্দেহ; কারণ যে সুদে তাঁহারা টাকা লইয়াছিলেন, সুদের তত অধিক হার পৃথিবীর কোনও দেশে কখনও প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। পৃথিবীর মধ্যে নিষ্ঠুরতম সুদখোর ইহুদী-জাতিও বোধ হয় হৃদয়হীনতায় এই সমস্ত বঙ্গীয় সুদখোরদিগের সমকক্ষ হইতে পারিত না। পাঠক শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, এই বঙ্গীয় সুদখোরগণ সময় পাইয়া সুদের হার বার্ষিক শতকরা ছয় শত টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিয়াছিল। এইরূপে কি জমীদার, কি প্রজা, সকলেই, এক দিকে দেবীসিংহ, অপর দিকে নিষ্ঠুর সুদখোরদিগের অত্যাচারে, অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। প্রজাগণ বহুকষ্টে কঠোর পরিশ্রমে যে শস্য উৎপাদন করিত, তাহা গৃহজাত করিবার পূর্ব্বেই ক্রোক হইয়া বাজারে নীত হইত। কিন্তু সকলেই অর্থহীন, উচিতমূল্যে শস্য ক্রয় করিতে কেহই সমর্থ নহে, সুতরাং একচতুর্থাংশ অপে-

আও কম মূল্যে শস্যরাশি বিক্রীত হইতে লাগিল ; তাহাতে এই ফল হইল যে, ঋণপরিশোধের জন্য প্রজাবর্গের সমস্ত বৎসরের একমাত্র অবলম্বন কাড়িয়া লওয়া হইল, কিন্তু ঋণের অতি সামান্য অংশও পরিশোধিত হইল না।

শস্যবিক্রয় হইলে পর, কৃষকগণের বিদা, মই, লাঙ্গল, বলদ প্রভৃতি কৃষি-যন্ত্র গুলিও বিক্রীত হইয়া গেল। জমাজমী ঋণের জন্য পূর্ব্বেই আবদ্ধ হইয়াছে, লাঙ্গল বলদ ইত্যাদি যাওয়ায় ভবিষ্যতে শস্যোৎপাদনেরও আর উপায় রহিল না, সুতরাং সেই হতভাগ্যদিগের ক্ষুধিত স্ত্রীপুত্র তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া কাতর ক্রন্দনে ও হৃদয়ভেদী দীর্ঘ নিশ্বাসে তাহাদের নিরুপায় চিত্ত ব্যথিত করিতে লাগিল। কিন্তু তখনও যমদূতের ন্যায় পাইকবর্গের হস্ত হইতে তাহাদের রক্ষা নাই। দেবীসিংহের দুর্দ্দান্ত অনুচরেরা তাহাদের হৃতাবশিষ্ট কুটীর লুণ্ঠন করিল ; তাহার পর সেই অসহায় নিপীড়িত পরিবারবর্গকে গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া তাহাদের সম্মুখেই তাহাদের একমাত্র আশ্রয়স্থান ক্ষুদ্র কুটীর-গুলিকে অগ্নিমুখে সমর্পণ করিয়া চলিয়া গেল। ক্ষুদ্র বিহঙ্গম—সেও বৃক্ষচূড়ায় নীড় রচনা করিয়া সুখে বাস করে, অরণ্যের পশু—তাহারও বাসস্থান আছে, কিন্তু পিশাচ দেবীসিংহের কঠোর অত্যাচারে দিনাজপুর রাজ্যের প্রজাবর্গের মস্তক রাখিবার স্থানটুকু পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইল।

এথম পর্য্যন্ত পতিব্রতা পত্নী স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়াও অনাহারক্লেশ সহ্য করিতেছিল, এখনও ক্ষুধায় অবসন্ন বালক বালিকা চিরসান্ত্বনাপূর্ণ মাতৃ-অঙ্কে নির্ভয়ে নিদ্রা যাইতেছিল, এবং হতভাগ্য অধিবাসিবর্গের মনে এই শান্তি ছিল যে, তাহাদের সর্ব্বস্ব অপহৃত বা লুণ্ঠিত হইলেও স্বামীস্ত্রী পিতাপুত্র সকলে একত্রে বৃক্ষতলেও বাস করিতে পারিতেছিল ; কিন্তু হায়, দেবীসিংহের নির্ম্মম হস্ত এত দিন পরে তাহাদের সে সুখও অপহরণ করিল। স্নেহশীল পিতা একমাত্র পুত্রকে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইলেন, দুঃখিনী মাতার গম্ভীর আর্ত্ত-নাদে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সামান্য অর্থের পরিবর্ত্তে পতিপ্রাণা স্ত্রীকে অপরের হস্তে সমর্পণ করিতে হইল। দেবীসিংহের অত্যাচারে পিতা পুত্রের প্রতি কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইলেন, স্বামীস্ত্রীর চিরদিনের পবিত্র বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল।

এই সমস্ত জঘন্য উপায়েও আশানুরূপ অর্থ সংগৃহীত না হওয়ায় দেবীসিংহ অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহার অনুচরবর্গকে যে সকল কঠোরতম নারকীয় আচরণে প্রবৃত্ত করাইলেন, সে সমস্ত কথা লেখা দূরে

থাক, তাহা চিন্তা করিতেও লজ্জা ও ঘৃণায় হৃদয় পূর্ণ হয়; অতি হিংস্র পশুও বোধ হয় সেরূপ নৃশংসাচরণ করিতে পারে না, এবং ঘৃণিত পিশাচেও সেরূপ আচরণে প্রবৃত্ত হইতে সঙ্কুচিত হয়।

দেবীসিংহ মনে করিয়াছিল, জমীদারবর্গ তাঁহাদের ভাণ্ডারে অর্থ লুকাইয়া রাখিয়া তাঁহাকে প্রতারিত করিতেছেন, এবং প্রজাগণ ভবিষ্যতের জন্ম কোনও গুপ্ত স্থানে শস্যাদি সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং তিনি অত্যাচারের চরম সীমায় উপস্থিত হইলেন, এবং অন্যান্য সমস্ত উপায়ে অর্থসংগ্রহে বিফলপ্রযত্ন হইয়া, অবশেষে কি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, কি সামান্য কৃষক, সকলের প্রতি ভীষণ শারীরিক দণ্ড প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই কঠোর অত্যাচার ও নির্দ্দয় ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া মহাত্মা বর্ক বৃটীশ মহাসভায় ওয়ারেন হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপলক্ষে বলিয়াছিলেন, "আমার বিশ্বাস, এরূপ ভয়ানক অত্যাচার ও উৎপীড়নকাহিনী দ্বারা পৃথিবীর ইতিহাস আর কখনও কলঙ্কিত হয় নাই; এমন কি, অসভ্যতম যুগেও কোনও যথেচ্ছাচারী রাজা কিম্বা শোণিতলোলুপ উন্মত্ত ঘাতকবর্গের দ্বারাও এমন নৃশংস কাণ্ডের সূচনা হয় নাই। *

বাগ্মিপ্রবর বর্কই যে কেবল এই কথা বলিয়াছেন, তাহা নহে; তিনি সুদূর ইংলণ্ডে বসিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা কাহারও অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু এই সময় দিনাজপুর রাজ্যের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবার জন্য নিযুক্ত কমিশনর পিটারসন সাহেব স্বচক্ষে সমস্ত কাণ্ড দেখিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে কাহারও সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। তিনি লিখিয়াছেন, "রাজস্ব অনাদায়ের জন্ম রঙ্গপুর ও দিনাজপুরের রায়তবর্গের প্রতি এরূপ কঠোর শাস্তির বিধান করা হইয়াছে যে, সেই সমস্ত লোমহর্ষণ জঘন্ত ব্যাপার জনসমাজের শ্রবণপথের অন্তরালে রাখাই বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আমার নিকট যতই অপ্রীতিকর হউক, ন্যায়, মনুষ্যত্ব ও গবর্মেণ্টের সম্মানের জন্ত, এবং ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ পাশবিক আচরণ না ঘটিতে পারে, তাহার নিমিত্ত, আমাকে সমস্ত ঘটনার যথাযথ বিবরণ প্রকাশ করিতেই হইবে।"

* Vide Speeches on the Impeachment of Warren Hastings by Edmund Burke, Vol I. P. 190. Bohn's Edition.

দেবীসিংহের আদেশ অনুসারে, তাঁহার অনুচরগণ প্রজাবর্গের অঙ্গুলিতে রজ্জু বন্ধন করিয়া সেই রজ্জুতে ক্রমাগত পাক দিত, অত্যন্ত পাক লাগিয়া অঙ্গুলিগুলির পৃথক-অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত হইত, হতভাগ্যেরা যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিত, কিন্তু সে দিকে কটাক্ষপাত না করিয়া পিশাচেরা সেই নিষ্পেষিতপ্রায় অঙ্গুলির ভিতর লৌহশলাকা প্রবেশ করাইয়া তাহার উপর ক্রমাগত হাতুড়ির আঘাত করিত। বলা বাহুল্য, ইহাতে অঙ্গুলিগুলি সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ হইয়া যাইত, এবং সেই সমস্ত নিরপরাধ, দরিদ্র শ্রমজীবীগণের একমাত্র অবলম্বন কর্ম্মক্ষম হস্তগুলি চিরজীবনের জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইত।

অপর দিকে দেবীসিংহের অনুচরেরা গ্রামের মণ্ডল, পঞ্চাইত এবং সম্ভ্রান্ত গৃহস্থবর্গের দুই দুই জনের পদ এক একটি লৌহশৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত করিয়া, সমান্তরাল দণ্ডের উপর তাহাদিগকে নতমস্তকে নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহাদের পদতলে বেত্রাঘাত করিত; প্রবল আঘাতে রুধিরাপ্লুত অঙ্গুলিগুলি স্বস্থানবিচ্যুত হইয়া ছিঁড়িয়া পড়িত। এইরূপে পদদ্বয় সম্পূর্ণ বিকৃতিপ্রাপ্ত হইলে পর, মুখমণ্ডলে প্রহার আরম্ভ হইত, তাহাতে নাসিকা, ওষ্ঠ ও কপোলের মাংস ছিন্ন হইয়া যাইত, এবং শোণিতস্রোত তাহাদের মস্তক বহিয়া ধরাতল সিক্ত করিত।

বেত বা কঞ্চির আঘাতে পাছে যন্ত্রণা অধিক না হয়, এই ভয়ে দেবীসিংহ কণ্টকপূর্ণ বেলের ডাল কাটিয়া তাহাই বেত্ররূপে ব্যবহার করিতে লাগিলেন। এই কণ্টকাকীর্ণ বিল্বশাখার অবিশ্রান্ত আঘাতে আহত ব্যক্তির শরীরের কিরূপ দুর্দ্দশা হইত, তাহা চিন্তা করিতেও হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু ইহাতেও রক্ষা নাই, এরূপ অত্যাচার দেখিলে পাষাণ বিদীর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু দেবীসিংহ ও তাঁহার অনুচরবর্গের হৃদয় পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন—বিদীর্ণ হওয়া দূরের কথা, তাহাদের হৃদয় কিছুমাত্র ব্যথিতও হইত না; তাহারা এই সমস্ত নিপীড়িত মৃতকল্প প্রজার ক্ষতদেহে বিছুটি লতার দ্বারা আঘাত করিত।

রাত্রেও হতভাগ্যগণের নিষ্কৃতি ছিল না। রজনীযোগে তাহারা অন্ধকারময় কারাগৃহে নিক্ষিপ্ত হইত। যে সময় সমস্ত সুপ্তপ্রকৃতি বিশ্রামসুখ উপভোগ করে, মানবের বিধাতৃপ্রদত্ত সেই বিশ্রামকালেও তাহারা দেবীসিংহের পিশাচ-অনুচরগণের হস্তে যমযন্ত্রণা ভোগ করিত। প্রত্যেক রাত্রে তিন বার করিয়া তাহাদিগকে বেত্রাঘাত করা হইত, একবার প্রথম রাত্রে, একবার মধ্য রাত্রে এবং একবার শেষ রাত্রে। প্রথম রাত্রের বেত্রাঘাতের কঠোর যন্ত্রণা কিঞ্চিৎ-মাত্র প্রশমিত না হইতেই, মধ্যরাত্রে দেবীসিংহের অনুচরেরা বেত্রহস্তে পুন

দূতের ন্যায় তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইত। এই নৈশ বেত্রাঘাতের পর তাহারা পৌষমাসের প্রচণ্ড শীতে নগ্নদেহে, অনাবৃত স্থানে অতিবাহিত করিতে বাধ্য হইত; আত্মহত্যা করিয়া যে এই যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইবে, তাহারও সম্ভাবনা ছিল না, সম্মুখে সতর্ক প্রহরী সে পথ অবরোধ করিয়া দণ্ডায়মান।

সূর্য্যোদয় হইতে না হইতে এই সকল দুর্ভাগ্যদিগকে তুষারশীতল জলে অবগাহন করানি হইত। সর্ব্বশরীর বেত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত—সেই ক্ষত অঙ্গে শীতল জল স্পর্শে তাহারা যে কি যন্ত্রণা ভোগ করিত, তাহা কল্পনা করাও কঠিন। জল হইতে উঠাইয়া তাহাদিগকে আবার বেত্রাঘাত করা হইত। বেলা একটু অধিক হইলে তাহাদিগকে গ্রামের ভিতর লইয়া গিয়া তাহাদের লুক্কায়িত অর্থ এবং শস্যাদি বাহির করিয়া দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করা হইত; এত উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও অর্থাদি লুক্কায়িত রাখা যে মানবের পক্ষে অসম্ভব, তাহা দেবীসিংহ বোধ হয় বিশ্বাস করিতেন না। সুতরাং পুনর্ব্বার প্রহার করিতে করিতে প্রহরিবর্গ তাহাদিগকে কারাগারে লইয়া যাইত।

কিন্তু এমন লোকও ছিল, যাহারা এত যন্ত্রণাও অবনতমস্তকে সহ্য করিত, এবং ইহাই বিধিলিপি বলিয়া মনে করিত। এই ঘোর পীড়নেও তাহাদের ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অবিচলিত দেখিয়া দেবীসিংহ উন্মত্তপ্রায় হইলেন; তাহাদের দেহ ছিন্ন করিয়া কোনও ফল হইল না ভাবিয়া, তিনি অতঃপর তাহাদের হৃদয় চূর্ণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহার আদেশে পিতার সম্মুখে নিরপরাধ, সংসারজ্ঞানশূন্য শিশুসন্তান রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় বেত্রাহত হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার কোমল নিষ্কলঙ্ক দেহের শোণিত উচ্ছ্বসিত হইয়া পিতার মুখমণ্ডল প্লাবিত করিল। হতভাগ্য পিতা অনেক সহ্য করিয়াছে, আর পারিল না, তাহার সংজ্ঞাশূন্য দেহ ভূতলে পতিত হইল।

কোথাও পিতাপুত্রকে একত্র রজ্জুবদ্ধ করিয়া বেত্রাঘাত করা হইতে লাগিল; পুত্রের ইচ্ছা, বেত্রের অগ্রভাগ যেন তাহার বৃদ্ধ পিতার জীর্ণদেহে না লাগিয়া তাহারই পৃষ্ঠে পতিত হয়; পিতার ইচ্ছা, যত অত্যাচার তাহার উপর দিয়াই যাউক, তাহার প্রাণাধিক পুত্রের কোমল অঙ্গে যেন বেত্রস্পর্শ না ঘটে। কিন্তু কাহারও রক্ষা নাই, পিতা রক্ষা পাইলে বেত্রের চোট্ পুত্রের পৃষ্ঠে পতিত হয়, পুত্র রক্ষা পাইলে তীক্ষ্ণ আঘাতে পিতার পৃষ্ঠ বিদীর্ণ হইয়া যায়।

এইবার আমরা যে শোচনীয় জঘন্য কাহিনী লিখিতে যাইতেছি, তাহা মনে করিতেও লেখনী কম্পিত হইতেছে। যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল—এইবার

তাহা বিনষ্ট হইল। যে সকল সম্ভ্রান্ত কুলকামিনী অন্তঃপুরের বহিঃসীমায় কখনও পদার্পণও করেন নাই, তাঁহারা দেবীসিংহের অনুচরবর্গের দ্বারা অন্তঃপুর হইতে বিতাড়িতা হইয়া ঘোর অপরাধিনীর ন্যায় প্রকাশ্য বিচারালয়ে নীত হইতে লাগিলেন। হায়, এই কি সেই বিচারালয়, যেখানে অপরাধী দণ্ডিত হয়, এবং নিরপরাধ ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিয়া থাকে, কেহ তাহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারে না?—দেবীসিংহের পাশবিক আচরণে বিচারালয়ের পবিত্রতা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছিল, তাই এই ললনাগণ, দেবীসিংহের মাতা ও ভগিনীতুল্য মহিলাবর্গ, এই বিচারালয়ের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদের সম্মানরক্ষার আশায় বৃথা ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্বামী ও পুত্রগণ তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দুঃখ, কষ্ট ও অপমানে বৃথা দগ্ধ হইতে লাগিলেন। সেই মুক্ত দিবালোকে, প্রকাশ্য বিচারালয়প্রাঙ্গনে, অসংখ্য জনসাধারণের সম্মুখে, দেবীসিংহের নীচকুলোদ্ভব পাষণ্ড অনুচরেরা সেই সমস্ত কুলকামিনীর পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করিতে লাগিল। স্বামীর সম্মুখে, পিতার সম্মুখে, কুলললনার পবিত্রতা অপহৃত হইল! বিধাতার ক্রোধ বজ্রের আকারে এই নরাধমদিগকে দগ্ধ করিল না? সর্ব্বংসহা পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া হতভাগ্য পিতাপুত্র ও স্বামিগণকে এই পাপদৃশ্যের অন্তরালে রাখিবার জন্য তাঁহাদিগকে গ্রাস করিল না?

রমণীগণের পবিত্র অঙ্গ কলঙ্কিত করিয়াও দেবীসিংহের ক্রোধানল নির্ব্বাপিত হইল না। তিনি তাঁহাদিগকে অন্ধকারময় কারাগৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। তাঁহারা কাতর হৃদয়ে, অশ্রুপূর্ণনেত্রে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, যেন এই অন্ধকার হইতে তাঁহাদের কলঙ্কিত দেহ আর আলোকে বাহির করিতে না হয়, এই অন্ধকারেই যেন তাঁহাদের অপবিত্র দেহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু তাহা হইল না, কারাগার হইতে তাঁহাদিগকে মধ্যে মধ্যে প্রকাশ্যস্থানে টানিয়া আনিয়া, তাঁহাদের সমস্ত দেহ অনাবৃত করিয়া বেত্রাঘাত করা হইতে লাগিল। তাহার পর ধনুকের ন্যায় বংশখণ্ড চক্রাকারে নত করিয়া তাহার দুই প্রান্ত যুবতীগণের স্তনবৃন্তে সজোরে বিঁধাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল, মুহূর্ত্তমধ্যে বংশখণ্ডগুলি হতভাগিনীদিগের স্তন ছিন্ন ভিন্ন করিয়া পূর্ব্বাবস্থা ধারণ করিল; মূর্চ্ছিত হইয়া রমণীগণ ভূতলে পতিত হইল, রক্তস্রোত ধরাতল সিক্ত করিতে লাগিল। আমাদের এই লোমহর্ষণ বৃত্তান্ত উপকথা নহে। উপকথায় এমন ভয়ানক কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায় না,

ইহা সত্য ঘটনা ; মহাত্মা বর্ক এই বীভৎস ব্যাপারের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিবার জন্ত ইংলণ্ডের মহাসভায় এইরূপ একখানি বংশদণ্ড দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "Here, in my hand is my authority : for otherwise one would think it incredible."

Vide Burke's speech on the Impeachment of Warren Hastings—Vol. I. Bohn's Edition. P. 190.

তাহার পর দুর্বৃত্তেরা এই নিপীড়িত রমণীগণের ক্ষতবিক্ষত দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশে মশাল ও শুলের আগুণ ধরাইয়া দিতে লাগিল।

এই নিদারুণ কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া অনেক মহিলা অকালে প্রাণত্যাগ করিলেন। অনেকে প্রার্থনা করিয়াও সে সৌভাগ্যলাভে বঞ্চিত রহিলেন। যাঁহারা কলঙ্ক ও ক্ষতচিহ্ন ধারণ করিয়া জীবিত রহিলেন, সমাজের কঠোর শাসনে তাঁহাদের স্বামী কিম্বা পিতাপুত্র তাঁহাদের দিকে ফিরিয়াও চাহিতে পারিলেন না। সংসারে সকল আত্মীয় বর্ত্তমান থাকিতেও তাঁহারা অনাথা হইলেন।

ব্রাহ্মণদিগের জন্ত এক প্রকার নূতন অত্যাচার আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সে কালের হিন্দুসমাজ এ কালের মত ছিল না। তখন অস্পৃশ্য অন্ন ভোজন দূরে থাক—অস্পৃশ্য দ্রব্য স্পর্শ করিলেও সমাজচ্যুতি ঘটিত। দেবীসিংহ ব্রাহ্মণদিগকে আদালতের সম্মুখে ধরিয়া আনাইয়া তাঁহাদিগকে বলদের উপর চাপাইয়া দিতেন, এবং সেই শোচনীয় অবস্থায় ঢাক ঢোল সঙ্গে দিয়া নগর প্রদক্ষিণ করাইতেন। এই দৃশ্য দেখিলে পাপস্পর্শ হইবে ভাবিয়া নগরস্থ সকলে ঢাকের শব্দ শুনিয়াই নগর ছাড়িয়া পলায়ন করিত। অনেকে এইরূপে অপমানিত হওয়া অপেক্ষা প্রাণত্যাগও বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন। অনেকে অপমানিত হইবার ভয়ে দেবীসিংহের অসঙ্গত প্রস্তাবে সম্মত হইতেন, কিন্তু প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে না পারায় অবশেষে এই জঘন্য দণ্ডে দণ্ডিত হইতেন, সুতরাং তাঁহাদের সমাজচ্যুতি অনতিক্রমণীয় হইয়া পড়িত।

এইরূপ অত্যাচারের পর অত্যাচারে সমস্ত লোক জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। যখন তাহাদের যাহা কিছু প্রিয়, যাহা কিছু আদরের, সমস্তই তাহাদের চক্ষুর উপর নষ্ট হইয়া গেল, যখন তাহারা দেখিল, পলায়ন করিয়াও অব্যাহতি নাই, হিংস্রজন্তুপরিপূর্ণ গভীর অরণ্যে লুক্কায়িত হইলে দেবীসিংহের কবল হইতে রক্ষা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ব্যাঘ্রাদির আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়

না, তখন জীবনধারণ বিড়ম্বনামাত্র ভাবিয়া তাহাদের নিপীড়িত হৃতাশ হৃদয় ক্রোধপূর্ণ হইল। এই বর্দ্ধিত অত্যাচারস্রোতের রোধ করিবার জন্য তাহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল; বিদ্রোহের সূত্রপাত দেখিয়া তদ্দেশীয় ইংরেজশাসনকর্ত্তা সুসজ্জিত সৈন্যের সাহায্যে সেই নিরাশাকাতর, মৃত্যুর জন্য কৃতসংকল্প হতভাগ্য প্রজাবর্গের ধ্বংসসাধন করিলেন। দেশে শান্তি সংস্থাপিত হইল!

আমরা ইতিপূর্ব্বে পিটারসন সাহেবের নাম উল্লেখ করিয়াছি। এই পিটারসন সাহেব প্রজাসাধারণের অবস্থাপরিদর্শনের জন্য কমিশনর নিযুক্ত হইয়াছিলেন; তিনি তাৎকালিক অধিকাংশ ইংরেজের ন্যায় হৃদয়হীন, অর্থপিশাচ ছিলেন না, তিনি মনুষ্যত্বের অধিকারী ছিলেন, এবং তাহারই বলে তিনি সহস্র বিপদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াও সত্য বলিতে ও নির্ভীকচিত্তে কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইতেন। পিটারসন সাহেবের অপক্ষপাত বর্ণনার ফলেই দেবীসিংহের অত্যাচারের অনেক কাহিনী আজও ইতিহাসে সন্নিবদ্ধ রহিয়াছে।

পিটারসন সাহেব কমিশনর নিযুক্ত হইয়া দিনাজপুর অঞ্চলে প্রেরিত হইলে, দেবীসিংহ তাঁহাকে হস্তগত করিবার জন্য বিবিধ প্রকারে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি অটল, প্রলোভনের অতীত, দেবীসিংহের তুচ্ছ অর্থ তাঁহাকে মহত্ত্ব ও কর্ত্তব্যের পথ হইতে বিচলিত করিতে পারিল না।

তিনি দিনাজপুরে আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তিনি প্রজার দুরবস্থা, শস্যশ্যামল প্রদেশের মরুময় ভাব, চতুর্দ্দিকের বিষাদপূর্ণ ছায়া ও সমস্ত নরনারীর যন্ত্রণাকাতর ব্যথিত মুখমণ্ডল দেখিয়া বুঝিলেন, তাহারা কি দুঃসহ কষ্ট ভোগ করিতেছে। তিনি একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন, "আমার প্রথম পত্রে প্রজাবর্গের প্রতি কঠোর অত্যাচারের বিবরণ সাধারণভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং এখানে তাহার পুনরুল্লেখ বাহুল্যমাত্র। প্রজাগণের প্রধান অপরাধ এই যে, তাহারা বিদ্রোহী হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের প্রতি উৎপীড়নের যে সমস্ত প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, বিদ্রোহাচরণ ভিন্ন তাহাদের অন্য উপায় ছিল না। প্রজাদের নিকট হইতে যে উপায়ে রাজকর সংগৃহীত হইত, তাহা লুণ্ঠনের নামান্তর মাত্র; আনুষঙ্গিক অত্যাচার ও উৎপীড়নের ত কথাই নাই। এই সমস্ত অত্যাচার দুই পাঁচ জনের উপর নহে, প্রায় সকল লোককেই তাহা সহ্য করিতে হইত। কিন্তু অত্যাচার সহ্য করিবারও একটি নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে, সেই সীমা অতিক্রম করিলেই তাহার প্রতিবিধানের নিমিত্ত চেষ্টা হয়। তখন

এই সমস্ত নিরপরাধ প্রজাবর্গের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইল, তথাপি তাহাদের গুরুতর করভারের অর্দ্ধাংশও পরিশোধিত হইল না, অধিকন্তু তাহারা কঠোর শারীরিক দণ্ড ভোগ করিতে লাগিল, যখন সমাজচ্যুত করিবার জন্য তাহাদিগকে অতি জঘন্যভাবে অপমানিত করা হইল, তাহাদিগের মহিলাবর্গের সম্ভ্রম বিনষ্ট করা হইল, তখন তাহাদের মনের ভাব কিরূপ হইতে পারে, তাহা আপনারা বিবেচনা করিবেন।”

দেবীসিংহ দেখিলেন, তাঁহার অর্থবল পিটারসনের ন্যায়পরতার ছায়াও স্পর্শ করিতে পারিল না; হেষ্টিংস দেখিলেন, এ প্রকার অবস্থায় দেবীসিংহকে সরাইতে না পারিলে তাঁহার বিশেষ বিপদ; সুতরাং দেবীসিংহের প্রতি বাহ্যিক ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে কলিকাতায় আসিবার জন্য লিখিলেন। দেবীসিংহ প্রজাবর্গের শোণিত শোষণপূর্ব্বক প্রায় অশীতি লক্ষ মুদ্রায় আপনার ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া কলিকাতায় আসিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার কি হইল, তাহা বিবৃত করা আমাদের এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, সুতরাং সে সম্বন্ধে অধিক আলোচনা অনাবশ্যক; তবে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, হেষ্টিংসের অনুগ্রহে কেহ তাঁহার একগাছি কেশও স্পর্শ করিতে পারে নাই। মহম্মদ রেজা খাঁর উপর দেবীসিংহের অপরাধের বিচারভার অর্পিত হইল; পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে, মহম্মদ রেজা খাঁই দেবীসিংহের প্রধান সহায়, এবং দেবীসিংহের এই ঐশ্বর্য্য ও উন্নতিও প্রধানতঃ তাঁহারই অনুগ্রহে। দেবীসিংহও মহম্মদ রেজা খাঁকে তাঁহার প্রয়োজনানুযায়ী অর্থাদি সাহায্য দ্বারা কম উপকৃত করেন নাই; অপরাধী ও বিচারকের মধ্যে এরূপ সম্বন্ধ থাকিলে কিরূপ সুবিচার হয়, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র; বর্ত্তমান ব্যাপারেও তাহার অন্যথা হয় নাই।

আর মহৎহৃদয় ন্যায়পর পিটারসন?—সেই হতভাগ্য অসহায়দিগকে রক্ষা করিতে গিয়া তাঁহাকে যেরূপ অপমানিত হইতে হইল, তাহা মনে করিতেও কষ্ট হয়। দেবীসিংহ তাঁহার বিপক্ষতাচরণে ত্রুটী করেন নাই। তাঁহার বিরুদ্ধে অনেক ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল, শেষে ষড়যন্ত্রকারীরা কৃতকার্য্য হইল; পিটারসন অপদস্থ ও অপমানিত হইয়া দিনাজপুর ত্যাগ করিলেন। তখন কোম্পানীর কয়েক জন অনুরাগী কর্ম্মচারী দ্বারা পিটারসনের কমিশনের পরীক্ষার জন্য এক নূতন কমিশন বসান হইল; বলা বাহুল্য, এ কমিশনের মূলে হেষ্টিংস ছিলেন। কমিশনের বিচারে পিটারসন অপরাধী বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন।

এই অন্যায় বিচারে পিটারসনের বীরহৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত লাগিল। তিনি কলিকাতার কাউন্সিলে তেজস্বিনী ভাষায় এক মর্ম্মবেদনাপূর্ণ পত্র প্রেরণ করিলেন। এই পত্র পাঠ করিলে, তাঁহার প্রতি ঘোর অবিচারের নিমিত্ত এক দিকে যেমন দুঃখে হৃদয় বিগলিত হয়, অন্য দিকে তেমনি ন্যায়ের জন্য, কর্ত্তব্য ও সত্য-পালনের নিমিত্ত তাঁহার অসাধারণ চেষ্টার পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। তিনি মনুষ্যত্বের উপর নির্ভর করিয়া বীরের ন্যায় সমস্ত সহ্য করিলেন। হতভাগ্যের করুণ ক্রন্দনে ব্যথিত হইয়া তিনি তাহাদের উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন,—এই তাঁহার অপরাধ; তাঁহার বিচারকগণ তাঁহার এ অপরাধ ক্ষমা করেন নাই, তিনিও ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া কাপুরুষতার পরিচয় দেন নাই।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

সাধনা। মাঘ। "নিশীথে" একটি ক্ষুদ্র গল্প। গল্পটির আখ্যানকৌশল অকিঞ্চিৎকর; কেবল ভাষার সৌন্দর্য্যে ও বর্ণনার ঐশ্বর্য্যে গল্পটির প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এমন ভাষা, এমন অলঙ্কার, নিরর্থক ব্যয়িত হইয়াছে। জমিদার দক্ষিণাচরণ বাবু অর্দ্ধেক রাত্রে ডাক্তারের বাড়ীর দরজায় ঘা দিতে দিতে "ডাক্তার! ডাক্তার!" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে এই গল্পের সূত্রপাত করিলেন। ডাক্তারের ঘুম ভাঙ্গাইয়া অত রাত্রে কেন যে তিনি নিজের কাহিনী কহিতে বসিলেন, তাহার কোনও সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দক্ষিণাবাবু রাত্রি আড়াইটার পর যে ভাষায়, যেরূপ অলঙ্কার দিয়া সাজাইয়া নিজের গল্প বলিতেছিলেন, তাহাও স্বাভাবিক নহে। এক জন লোক পূর্ব্বকাহিনী বলিতে বলিতে, সুকবির কবিতার ভাষায়, বহুপূর্ব্বদৃষ্ট প্রকৃতির প্রত্যেক ছবি, সূর্য্যাস্তের স্বর্ণচ্ছায়া, শুভ্র নির্ম্মল চন্দ্রালোক হইতে অন্ধকার, শব্দ, সৌরভ, নিশ্বাস পর্য্যন্তের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করিতেছেন;—ইহা ঠিক স্বভাবসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। দক্ষিণা বাবু এক জন সেণ্টিমেণ্ট্যাল কবি হইলে বরং কতকটা মানাইয়া যাইত। দুর্ভাগ্যক্রমে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাঁহাকে যাত্রার দলের এক জন স্মরণশক্তিশালী অভিনেতা বলিয়া বোধ হয়। লেখক তাঁহাকে যাহা লিখিয়া দিয়াছেন, সাধনার পাঠকদের গল্পপিপাসাপরিতৃপ্তির জন্য, তিনি রাত্রি আড়াইটার সময় তাহা আবৃত্তি করিয়া যাইতেছেন মাত্র। লেখকের গল্পকৌশলের অভাবে, এবং স্বভাবসঙ্গতির দিকে দৃষ্টি না থাকায়, গল্পটির মুণ্ডপাত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার বর্ণনাভঙ্গী ও সৌন্দর্য্যসৃষ্টির প্রশংসা করিতে হয়। আর এতখানি ভাষাব্যয় কিসের জন্য? মানবজীবনরহস্যের কোন অংশের ছবি আঁকিবার জন্য লেখকের এত প্রয়াস, তাহাও ত স্পষ্ট বোঝা যায়

হইবে না। "সন্ধ্যা" একটি ক্ষুদ্র কবিতা। কবিতাটি অতি সুন্দর। আমরা নিম্নে সমুদায় উদ্ধৃত করিলাম,—

"ক্ষান্ত হও, ধীরে কও কথা। ওরে মন,
নত কর শির। দিবা হল সমাপন,
সন্ধ্যা আসে শান্তিময়ী। তিমিরের তীরে
অসংখ্য-প্রদীপ-জ্বালা' এ বিশ্বমন্দিরে
এল আরতির বেলা। ওই শুন বাজে
নিঃশব্দ গম্ভীর মন্ত্রে অনন্তের মাঝে
শঙ্খঘণ্টাধ্বনি। ধীরে নামাইয়া আন'
বিদ্রোহের উচ্চ কণ্ঠ পুরবীর ম্লান-
মন্দ স্বরে। রাখ রাখ অভিযোগ তব,—
মৌন কর বাসনার নিত্য নব নব
নিষ্ফল বিলাপ। হের, মৌন নভস্তল,
ছায়াচ্ছন্ন মৌন বন, মৌন জলস্থল
স্তম্ভিত বিষাদে নম্র। নির্ব্বাক্ নীরব
দাঁড়াইয়া সন্ধ্যাসতী,—নয়ন পল্লব
নত হয়ে ঢাকে তার নয়ন যুগল,—
অনন্ত আকাশপূর্ণ অশ্রু ছলছল
করিয়া গোপন। বিষাদের মহাশান্তি
ক্লান্ত ভুবনের ভালে করিছে একান্তে
সান্ত্বনা পরশ। আজি এই শুভক্ষণে,
শান্ত মনে, সন্ধি কর অনন্তের সনে
সন্ধ্যার আলোকে। বিন্দু দুই অশ্রুজলে
দাও উপহার—অসীমের পদতলে
জীবনের স্মৃতি। অন্তরের যত কথা
শান্ত হয়ে গিয়ে—মর্ম্মান্তিক নীরবতা
করুক্ বিস্তার।

হের ক্ষুদ্র নদীতীরে
সুপ্তপ্রায় গ্রাম। পক্ষীরা গিয়েছে নীড়ে,
শিশুরা খেলে না; শূন্য মাঠ জনহীন;
ঘরে-ফেরা শ্রান্ত গাভী গুটি দুই তিন
কুটীর অঙ্গনে বাঁধা, ছবির মতন
স্তব্ধপ্রায়। গৃহকার্য্য হল সমাপন,—
কে ওই গ্রামের বধূ ধরি বেড়াখানি
সম্মুখে দেখিছে চাহি, ভাবিছে কি জানি
ধূসর সন্ধ্যায়।

অমনি নিস্তব্ধপ্রাণে
বসুন্ধরা, দিবসের কর্ম্ম অবসানে,
দিনান্তের বেড়াটি ধরিয়া, আছে চাহি
দিগন্তের পানে; ধীরে যেতেছে প্রবাহি
সম্মুখে আলোকস্রোত অনন্ত অম্বরে
নিঃশব্দ চরণে; আকাশের দূরান্তরে
একে একে অন্ধকারে হতেছে বাহির
একেকটি দীপ্ততারা, সুদূর পল্লীর
প্রদীপের মত। ধীরে যেন উঠে ভেসে
ম্লানচ্ছবি ধরণীর নয়ন-নিমেষে
কত যুগযুগান্তের অতীত আভাস,
কত জীব-জীবনের জীর্ণ ইতিহাস।
যেন মনে পড়ে সেই বাল্য নীহারিকা,
তার পরে প্রজ্বলন্ত যৌবনের শিখা,
তার পরে স্নিগ্ধশ্যাম অন্নপূর্ণালয়ে
জীবধাত্রী জননীর কাজ,—বক্ষে লয়ে
লক্ষ কোটি জীব—কত দুঃখ, কত ক্লেশ,
কত যুদ্ধ, কত মৃত্যু, নাহি তার শেষ।

ক্রমে ঘনতর হয়ে নামে অন্ধকার,
গাঢ়তর নীরবতা,—বিশ্ব পরিবার
সুপ্ত নিশ্চেতন। নিঃসঙ্গিনী ধরণীর
বিশাল অন্তর হতে উঠে সুগম্ভীর
একটি ব্যথিত প্রশ্ন—ক্লিষ্ট ক্লান্ত সুর
শূন্যপানে—'আরো কোথা? আরো কতদূর?'"

লেখক, বসুন্ধরার যে মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ অভিনব। ইহাতে উদার সমবেদনা ও করুণার কি সরস উচ্ছ্বাস! "জ্যোতিষ্কগণের দূরত্বনির্দ্ধারণ—প্রাচীন মত" একটি সুলিখিত প্রবন্ধ। "সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে সন্তোষ" আলোচনা করিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন। এই প্রবন্ধে লেখক চিন্তাশীলের ন্যায় তাঁহার বক্তব্য বিষয়ের অনুসরণ করিয়াছেন। "আব-কারের আইন" একটি রাজনৈতিক প্রবন্ধ। কটন ডিউটী দেশের পক্ষে অনিষ্টকর, ইহাই তাঁহার বক্তব্য। প্রবন্ধটি সুবৃহৎ, কিন্তু অনতিক্রমণীয় যুক্তিতর্কের বাহুল্য তাহার কারণ নহে। লেখক যদি অনাবশ্যক রসিকতা, পুনরুক্তি ও অযথাবিস্তৃতির পক্ষপাতী না হইতেন,

তাহা হইলে প্রবন্ধটি সংক্ষিপ্ত হইতে পারিত। তাহার মত জানাই [illegible] আবশ্যক, কিন্তু তদুপলক্ষে কতকটা রসিকতারও আস্বাদ লইতে হয় ত সকলের ভাল লাগিবে না। "পৌষসংক্রান্তি" প্রবন্ধে লেখক শীতকালে বাঙ্গলা দেশের পল্লীগ্রামের একখানি নিখুঁত ছবি আঁকিয়াছেন। লেখকের সৌন্দর্য্যচিত্র অতি চমৎকার। "কৃষ্ণচরিত্র" প্রবন্ধে লেখক স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবুর "কৃষ্ণচরিত্রের" সমালোচনা করিয়াছেন। লেখকের মতে, বঙ্কিম বাবু কৃষ্ণচরিত্রের ঐতিহাসিকতা সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই। প্রবন্ধটি এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। এবারকার সাধনায় আর তিনটি বিষয় আছে,—"নীতির ধর্ম্ম", "ক্ষাত্রচর্য্য" ও "সমালোচনা"।

নব্যভারত। পৌষ। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের "যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাবকাল" একটি প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক সুপাঠ্য প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের "ড্রেনেজবিল" এই সংখ্যায় শেষ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসুর "বাঙ্গালীর অবনতির কারণ" প্রবন্ধে চিন্তাশীলতার পরিচয় আছে। "শ্রীরূপ ও সনাতন" প্রবন্ধে, শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি, উমেশ বাবুর রূপসনাতন প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিতেছেন। প্রবন্ধটি ক্রমশঃপ্রকাশ্য।

ভারতী। পৌষ। শ্রীযুক্ত সিদ্ধমোহন মিত্রের "মুসলমানের অবরোধ" সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও সুপাঠ্য প্রবন্ধ। 'কোরাণ' ও 'হদিস' হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া লেখক এই প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, প্রাচীন কালে মুসলমানদের মধ্যে অবরোধপ্রথা ছিল না। লেখক মধ্যে মধ্যে যে সকল উদাহরণ দিয়াছেন, তদ্দ্বারা প্রবন্ধটি আরও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। কিন্তু এমন সুন্দর প্রবন্ধটি, মুদ্রাকরের দোষে সাধারণ পাঠকের অপাঠ্য হইয়াছিল। এক পাতার কিয়দংশ আর এক পাতায়, সেই পাতার কিয়দংশ অন্যত্র, এইরূপে ওলট্‌-পালট্‌ ভাবে মুদ্রিত হওয়াতে, প্রবন্ধটির অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে। বোধ করি, অধিকাংশ পাঠক, বুঝিতেই পারেন নাই। মাসিকপত্রের পক্ষে এরূপ প্রমাদ নিতান্ত অমার্জ্জনীয়। যাহা হউক, মাঘ মাসের "ভারতীর" সঙ্গে ইহার শুদ্ধিপত্র দেওয়া হইয়াছে, দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের "আকবর সাহের হিন্দুপ্রীতি"—তৃতীয় প্রস্তাব এবার প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটি বেশ হইতেছে। এবার রায়সিংহ ও উদয়সিংহের বিবরণ আছে। লেখকের ঐতিহাসিক অনুসন্ধান সবিশেষ প্রশংসনীয়। এবারকার ভারতীতে আর কোনও উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ নাই।

দাসী। চতুর্থ ভাগ, প্রথম সংখ্যা; জানুয়ারী। দাসী এই বৎসর হইতে বর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত আকারে প্রকাশিত হইতেছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে "দাসীর" ক্রমোন্নতি প্রার্থনা করি। দাসীর প্রথম প্রকাশসময়ে ইহাতে কেবল সেবাব্রতবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত;—সুতরাং দাসীর একটু বিশেষত্ব ছিল। কিন্তু এক্ষণে আর সে বিশেষত্ব রক্ষিত হইতেছে না। দেশে বিবিধবিষয়ক মাসিক পত্রের অভাব নাই, কিন্তু লোকসেবাবিষয়ক সাহিত্যের আমাদের বিশেষ অভাব। এরূপ অবস্থায়, দাসী সাধারণ মাসিকপত্রের দলভুক্ত হইয়া ভাল করিলেন, বলা যায় না। আশা করি, সম্পাদক মহাশয়, সেবাব্রতকেই দাসীর প্রধান আলোচ্য করিয়া দেশের ও সাহিত্যের একটি গুরুতর অভাব মোচন করিবেন। শ্রীমতী বিনয়কুমারী বসুর "নির্ব্বাসিতা" একটি কবিতা। আরম্ভটি বেশ সুন্দর, উপসংহার তেমন

হয় নাই। শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত, "জীবনচরিত" প্রবন্ধে, জীবনচরিত কিরূপে সঙ্কলিত করিতে হয়, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। "সাইবেরিয়ে", "দানব ও মানব" এবং "কীট্‌সের কবিতা", এই তিনটি প্রবন্ধও উল্লেখযোগ্য।

সমীরণ। পৌষ। "সেকালের বড় লোক—মহারাজ নবকৃষ্ণ" প্রবন্ধটি বেশ হইয়াছে। এই রূপেই দেশের প্রকৃত ইতিহাস সংগৃহীত হইতে পারে। লেখকের উদ্দেশ্য সফল হইলে, বাঙ্গালার ইতিহাসের অনেক উপাদান সঙ্কলিত হইবে।

জন্মভূমি। পৌষ। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দের "নানা সাহেব" এখনও চলিতেছে। শ্রীযুক্ত রসিকলাল ঘোষের "গড়িয়ার যুদ্ধ" একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি পাঠযোগ্য। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্নের "বিদ্যাপতিমঙ্গল" ব্রজভাষায় লিখিত একটি কবিতা। কবিতাটি পড়িয়া আমরা হাস্য সংবরণ করিতে পারি নাই। "পেরিক্লিস্" সেক্সপীয়রের নাটক হইতে সংগৃহীত একটি সচিত্র গল্প। শ্রীযুক্ত চুনীলাল গুপ্তের "আঁখি তুলে" একটি কবিতা। কবিতাটির আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সাধনসপ্তকম্।—এই গ্রন্থে জয়দেবের দশ অবতারের স্তোত্র, শঙ্করাচার্য্যের যতিপঞ্চক, সাধনপঞ্চক, অপরাধভঞ্জন স্তোত্র ও মোহমুদ্গর, কুলশেখরের মুকুন্দমালা এবং গীতার বিশ্বরূপ স্তবের মূল, পদ্য অনুবাদের সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। এণ্ড্র ল্যাং ও পল্ সিল্‌ভেষ্টার, উভয়ে কতকগুলি ফরাসী গল্পের ইংরাজী অনুবাদ করিয়া মুখবন্ধে বলিয়াছেন,—Some arts have been lost; the art of translation has never been discovered. All translators labour after it; we seek it like hidden treasure; we never find it. You cannot pour the wine without spilling "from the golden cup to the Silver." এ কথা যথার্থ। ভাষান্তরিত করিলেই মূলের সৌন্দর্য্য কতকটা নষ্ট হইয়া যায়। বিশেষতঃ, সংস্কৃত ভাষার ধ্বনি, এবং ছন্দের মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্য বাঙ্গালা ভাষায় দুর্লভ। সুতরাং, সংস্কৃত-ভাষার কাঞ্চনপানপাত্র হইতে বাঙ্গলার রজতাধারে মধু ঢালিতে গেলে, কতকটা অপচয় অবশ্যম্ভাবী। অতএব, সংস্কৃত কবিতার বঙ্গানুবাদ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে, কেহ এমন আশা করিতে পারেন না। আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, সাধনসপ্তকের অনুবাদে দক্ষতার পরিচয় আছে; এবং অনুবাদক এ বিষয়ে যথাসম্ভব কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

হাসি ও খেলা।—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার কর্ত্তৃক প্রণীত। এই পুস্তকখানি শিশুদের উপহারপুস্তকরূপে কল্পিত; ইহার ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর, পুস্তকখানির আদ্যন্ত মনোহর চিত্রে সুশোভিত। এরূপ পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত হইল। এ দেশে শিশু-পাঠ্য পুস্তকের একান্ত অসদ্ভাব। গ্রন্থকার সেই অভাবের মোচনে অগ্রসর হইয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। ইহার ছবিগুলি যেরূপ মনোরম হইয়াছে, পুস্তক খানির রচনা

যেরূপ হয় নাই। শিশুপাঠ্য পুস্তকের ভাষা সর্ব্বতোভাবে বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল হওয়া উচিত; কিন্তু ভাষার বিশুদ্ধি এই পুস্তকের সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ, পুস্তকখানির ভাষা সর্ব্বত্র সমান নহে;—তাহা কোথাও নিতান্ত শিশুদের উপযোগী, আবার অন্যত্র, বয়স্ক বালকগণের উপযুক্ত। বিষয়নির্ব্বাচনেও এইরূপ অসমতা দেখা যায়। আশা করি, গ্রন্থকার, "হাসি ও খেলার" দ্বিতীয় সংস্করণে এই সকল দোষের পরিহার করিবেন।

আর একটি কথা,—চিত্রগুলি অতি সুন্দর হইয়াছে বটে, কিন্তু সবগুলি নূতন নহে। "হাসি ও খেলার" অনেক চিত্র ইতিপূর্ব্বে "সখায়" প্রকাশিত হইয়াছে। স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন, সর্ব্বপ্রথমে এইরূপ উত্তম চিত্র সখায় প্রচারিত করেন। এখন যে আমরা দুই চারি খানি সচিত্র পুস্তক দেখিতে পাইতেছি, বলিতে গেলে, প্রমদাবাবুই তাহার মূল। "হাসি ও খেলার" গ্রন্থকার প্রমদাবাবুর সখায় প্রকাশিত ছবিগুলি নিজের গ্রন্থে ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার উল্লেখ করেন নাই। অথচ তিনি প্রমদাবাবু, নবকৃষ্ণ বাবু প্রভৃতির রচনা গ্রহণ করিয়া তাহা স্বীকার করিয়াছেন। চিত্র সম্বন্ধেও এই পথ অবলম্বন করিলে কি ক্ষতি হইত?

ফৌজদারী আইন সংগ্রহ; প্রথম ভাগ।—শ্রীবিজয়কেশব মিত্র, বি-এল প্রণীত। ইতিপূর্ব্বে বিজয় বাবু "মোক্তারী পরীক্ষাসোপান" প্রভৃতি পুস্তকের প্রচার করিয়া পরীক্ষার্থীদের অনেক উপকার করিয়াছেন। "ফৌজদারী আইন সংগ্রহের" প্রথম ভাগে "ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন" প্রকাশিত হইয়াছে। এত দিন বাঙ্গলা আইনবহি বটতলার অত্যাচারে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া ছিল,—কিন্তু একণে তাহার উদ্ধার হইতেছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। আমরা আইনের বিশেষজ্ঞ নহি,—সাধারণভাবে বলিতে পারি, পুস্তকখানির ভাষা ও আকার প্রকার দেখিলে বাঙ্গলা আইনবহি সম্বন্ধে আশার সঞ্চার হয়।

ফলিত-রসায়ন।—শ্রীচুনীলাল বসু, এম্. বি, এফ্. সি. এস্ প্রণীত। আজ কাল বিজ্ঞান, দর্শন, প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক গ্রন্থের প্রচার দেখিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ বলিয়া বোধ হয়। আর একটি কথা, এখন যিনি যে বিষয়ের বিশেষজ্ঞ, তিনি প্রায় সেই বিষয়ের রচনাতেই প্রবৃত্ত হইতেছেন। ফলিত রসায়নের গ্রন্থকার 'গবর্ণমেণ্টের অন্যতর রাসায়নিক পরীক্ষক এবং কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের রসায়ন-বিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক'। অতএব, রসায়নশাস্ত্রবিষয়ে ইঁহার উপদেশ আমরা অসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারি। প্রচলিত অন্য দুই এক খানি রসায়নপুস্তকের তুলনায়, এই গ্রন্থের ভাষাও সহজবোধ্য হইয়াছে। আমরা আশা করি, ফলিত-রসায়ন সর্ব্বত্র সাদরে পরিগৃহীত হইবে।

ভক্তচরিতামৃত অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আদিগুরু শ্রীমৎ রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামীর জীবনচরিত।—শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামীর জীবনচরিত প্রচারিত করিয়া অঘোর বাবু বাঙ্গলা সাহিত্যের উপকার করিয়াছেন। বৈষ্ণবশাস্ত্র হইতে এইরূপ অন্যান্য ভক্ত সাধকগণের জীবনচরিত সঙ্কলিত হইলে বাঙ্গলা ভাষার বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইবে। ভক্তচরিতামৃত গ্রন্থখানির রচনা প্রাঞ্জল ও মধুর হইয়াছে। বৈষ্ণবশাস্ত্র ও ইতিহাসের সত্যানুসন্ধানে গ্রন্থকারের যথেষ্ট অনুরাগ ও দক্ষতা আছে, ভক্তচরিতামৃতে তাহার প্রমাণ ও পরিচয় পাওয়া যায়।

হর্ম্মান হেল্‌ম্‌হোল্‌ট্‌জ্‌।

চারি মাস মাত্র হইল, হেলম হোল্‌ট্‌জের মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু আমাদের মধ্যে কয় জন জানে যে, পৃথিবী হইতে একটা দিক্‌প্রান্ত অন্তর্হিত হইয়াছে। হেলম্‌হোল্‌ট্‌জের জন্য শোক করিবার অবস্থা আমাদের এখনও হয় নাই। কখনও হইবে কি?

জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ মদ্বিধাঃ ক্ষুদ্রজন্তবঃ, কিন্তু হেল্‌ম্‌হোল্‌ট্‌জের মত লোক ধরাধামে কয়টা জন্মিয়াছে? হেল্‌ম্‌হোল্‌ট্‌জ্‌ মরিয়াছেন সত্য, কিন্তু মনুষ্য যতটুকু অমরতার দাওয়া করিতে পারে, তাহা তাঁহার প্রাপ্য।

ছোট খাট পাহাড় পর্ব্বত যথেষ্ট সংখ্যায় বর্ত্তমান থাকিয়া ধরাতলের বন্ধুরতা সম্পাদন করিতেছে। কিন্তু গৌরবে ও মহিমায় ধবলগিরি অধিক স্থানে স্পর্দ্ধিত হয় না। হেল্‌ম্‌হোল্‌ট্‌জ্‌ নরসমাজে এইরূপ একটা ধবলগিরি ছিলেন।

ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে যদি অবতারের আবশ্যকতা স্বীকার করা যায়, এবং জ্ঞানের বিস্তার যদি ধর্ম্মসংস্থাপনের প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে হেল্‌ম্‌হোল্‌ট্‌জ্‌ নরসমাজে 'অবতীর্ণ' হইয়াছিলেন।

হেল্‌ম্‌হোল্‌ট্‌জ্‌ জ্ঞানের পরিধি কত দূর প্রসারিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা যথাযথ বিবৃত করিতে পারি, এমন স্পর্দ্ধা করি না। সৌভাগ্যক্রমে 'লণ্ডন রয়াল সোসাইটির' গত অধিবেশনে, স্বয়ং লর্ড কেলবিন্‌ এ বিষয়ে আপনার অক্ষমতা স্বীকার করিয়া, সম্প্রতি ভূপৃষ্ঠে বর্ত্তমান অন্যান্য প্রাণীকে তজ্জন্য লজ্জার দায়ে অব্যাহতি দিয়াছেন। মহাজনের নামকীর্ত্তনে যদি কিছু পুণ্য থাকে, কিঞ্চিন্মাত্রায় সেই সুলভ পুণ্যসঞ্চয়ের প্রয়াসে এই প্রবন্ধের অবতারণা।

জর্ম্মনির পটসডাম নগরে ১৮২১ সালে হেল্‌ম্‌হোল্‌ট্‌জের জন্ম হয়। ১৮৯৪ সালের নবেম্বরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ভবিষ্যতে যিনি মানবের বিজ্ঞানেতিহাস লিপিবদ্ধ করিবেন, এই তেয়াত্তর বৎসর বিস্মৃত হইলে তাঁহার চলিবে না।

আমাদের দেশে বালকগণের প্রবল বমনোদ্রেক সত্ত্বেও, ইংরাজি ব্যাকরণ, ইংরাজি ভূগোল, ইংরাজি ইতিহাস, কিছুমাত্র দন্তস্ফুট করিবার সম্ভাবনা ব্যতিরেকেও, গলাধঃকরণ করিবার সনাতন নিয়ম প্রচলিত আছে। আমনুপ্রচলিত নিয়মচক্রের নেমি ভারতবর্ষেও ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, এমন কি, জগৎচক্রের নিয়মগ্রন্থিও দুই একটা শিথিল হইবার সম্ভব, কিন্তু আমাদের পাঠশালামধ্যে এই প্রাচীন নিয়মগুলির বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রমের কোনও সম্ভাবনা নাই। তবে একটা

ভরসা, আমাদের ভারতবর্ষে ইংরাজি সম্বন্ধে যে নিয়ম প্রচলিত, ইউরোপেও গ্রীক, লাটিন সম্বন্ধে অদ্যাপি তাহা বর্ত্তমান। সুতরাং আমাদের ক্ষোভের কারণ নাই; যেহেতু, 'মহাজনো যেন গতঃ' ইত্যাদি।

যাহা হউক, সনাতন নিয়মানুসারে হেল্ম্‌হোল্‌ট্‌জ্‌কেও ক্লাসে বসিয়া গ্রীক, লাটিন গলাধঃকরণ করিতে হইয়াছিল। শুনা যায়, প্রহ্লাদ ক-অক্ষরেই কৃষ্ণনামস্মরণে কাঁদিয়া উঠিয়াছিলেন, এবং ষণ্ডামার্কের প্রচণ্ড শাসনও সরস্বতীর নিকট তাঁহার মাথা নোয়াইতে সমর্থ হয় নাই। হেল্ম্‌হোল্‌ট্‌জের সম্বন্ধে সেরূপ কোনও নিন্দাবাদ প্রচলিত নাই। তবে তিনি যে ক্লাসে বসিয়া ক্লাসিকের মাষ্টারকে ফাঁকি দিয়া জ্যামিতির আঁক কষিতেন, তাহা স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। এই নীতিবিরুদ্ধ অশিষ্ট অপব্যবহারের জন্য কখনও তাঁহাকে মাষ্টারের বেত্রাঘাত লাভ করিতে হইয়াছিল কি না, জানি না। জানিলে, অন্ততঃ আমরা কিছু সান্ত্বনা লাভ করিতাম।

পাঠাবস্থায় পদার্থবিদ্যার প্রতি তাঁহার একটু অনুরাগ ও ঝোঁক ছিল; এমন কি, জ্যামিতি ও বীজগণিতের অপেক্ষাও জড় ও জড়ের গুণ লইয়া নাড়াচাড়া করিতে ভাল বাসিতেন। সাংসারিক অবস্থার অনুরোধে পিতার আদেশে তাঁহাকে ডাক্তারি শিখিতে হয়। 'ফ্রেডরিক উইলিয়ম ইন্‌ষ্টিটিউটে' ডাক্তারি শিখিয়া সৈনিক বিভাগে কর্ম্ম লইয়া তিনি সংসারে প্রবেশ করেন। তবে ডাক্তারি ব্যবসায়ে সেই জীবন নষ্ট হয় নাই। ডাক্তারি হইতে জীববিদ্যা, তাহা হইতে পদার্থবিদ্যা, তাহা হইতে গণিতবিদ্যা, তাহা হইতে মনোবিজ্ঞান ও দর্শন, এইরূপে ক্রমে মনুষ্যজাতির জ্ঞানমহার্ণবের এ পার হইতে ও পার পর্য্যন্ত সাঁতার দিয়া প্রবাহিত হইয়া যাইতে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। কি পরাক্রম!

ডাক্তারি ছাড়িয়া তাঁহাকে নানাস্থানে অধ্যাপকতা করিতে হয়। প্রথমে সহকারিত্ব, পরে অধ্যাপকতা; কনিগস্‌বর্গ, হেডিলবর্গ, বন, এই তিন বিশ্ববিদ্যালয়ে জীববিদ্যা, শরীরবিদ্যার অধ্যাপনা করিয়া, পরে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েন। ১৮৭১ সাল হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

আর সম্মানের কথা? রাজগোষ্ঠী, পণ্ডিতসমাজ ও জনসমাজ, দেশী ও বিদেশী, যার যত দূর সাধ্য, তাঁহাকে সম্মান দেখাইয়া, আপনাকে গৌরবান্বিত করিতে ত্রুটী করে নাই। এরূপ স্থলে সম্মানপ্রদর্শনের অর্থ কৃতজ্ঞতাস্বীকার ও ঋণশোধের চেষ্টা; কিন্তু এ ঋণ কি শোধিবার?

শরীরবিদ্যাবিষয়ে হেল্‌ম্‌হোল্‌ট্‌জ্ জোহান মূলরের ছাত্র ছিলেন; যেমন গুরু, তেমনি শিষ্য। কাহাকে দেখিবে বল? আমাদিগকে দৃষ্টিমাত্রেই তুষ্ট থাকিতে হইবে। আমাদের স্বদেশে গুরুও নাই, শিষ্যও নাই; এখানে কাহাকে দেখিব? হায় আমাদের অদৃষ্ট! চিরদিনই কি আমাদের এমনি ছিল! এমন দিন কি আসিবে না যে, শিষ্যের মত গুরু ও গুরুর মত শিষ্য এই ভারতবর্ষেও আবার দেখা যাইবে?

গুরুর প্রবর্ত্তনায় হেল্‌মহোল্‌টজ্ অজ্ঞানের তামস রাজ্যে দিগ্বিজয়ার্থ প্রবেশে সাহসী হন। সে পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব্বের কথা; তার পর সেই তামস রাজ্যের কতটা তাঁহারই অধ্যবসায়ে আলোকিত, আবিষ্কৃত ও অধিকৃত হইয়াছে, তাহা কিরূপে জানাইব?

সেই সময়ে হেলম্‌হোল্‌টজ্ টাইফস্ জ্বরে আক্রান্ত হয়েন। জ্বর হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, কিঞ্চিৎ যাহা সঞ্চয় ছিল, তাহার দ্বারা একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র ক্রয় করেন। আজ কাল শিক্ষার্থীর ঘরে ঘরে অনুবীক্ষণ রহিয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর আগে জর্ম্মণিতেও তাহা ছিল না। অণুবীক্ষণ অনেকের ঘরে দেখা যায় বটে, কিন্তু হেল্‌মহোল্‌টজ্ তাহার মধ্যে কয় জন?

যাহাই হউক, সেই অণুবীক্ষণ খরিদের পর তাঁহার হাতে যে দুই একটা প্রকাণ্ড কাজ হইয়াছে, তাহার যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

বাক্‌টিরিয়ার নাম আজ লোকের মুখে মুখে; বিশেষ সম্প্রতি কলিকাতা সহরে ওলাউঠা ও বসন্তের এই প্রকোপকালে। সম্প্রতি কলিকাতার অর্দ্ধেক লোক বসন্তের টীকা লইল; বাকী অর্দ্ধেক হয় ত দুই দিন পরে ওলাউঠার টীকা লইবে। এবং দেশী জৈন সম্প্রদায়ের ও নরিসপ্রমুখ বিলাতী জৈনবর্গের উৎকট অধ্যবসায় সত্ত্বেও, কিছু দিন পরে কুকুরদংশনেও টীকা লইতে হইবে, ইহা বোধ করি বিধাতার বিধান, ভবিতব্য। বস্তুতঃ শ্বাপদসমাকুল অরণ্যানী আর মানুষের ভয়বিধায়িনী নহে, শয্যাতলে লুক্কায়িতা কালভুজঙ্গিনীও আর যমদূতী নহে; এখন স্থূলদৃষ্টির অগোচর 'কমা বাসিলাস' অথবা 'দাঁড়ি ভিব্রিও' কখন্ কোন অলক্ষিতে দেহমধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া অকস্মাৎ অন্তরাত্মাকে তাহার প্রিয়তম আধার হইতে বিচ্যুত করিয়া ফেলিবে, এই আশঙ্কাতেই অন্তরাত্মা এক রকম পূর্ব্ব হইতেই ওষ্ঠপ্রান্তে অবস্থিত। প্রকৃতই আজ কাল 'শঙ্কাভিঃ সর্ব্বমাক্রান্তম্'। জীবিতব্য কিরূপে ভাবিবার দরকার নাই, জীবন যে এ পর্য্যন্ত রহিয়াছে—কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্।

জীবতত্ত্বঘটিত এই নূতন তত্ত্বের সহিত মহাত্মা পাস্তুরের নাম চিরকালের জন্য গ্রথিত রহিয়াছে; কিন্তু সকলে হয় ত জানেন না যে, এই নূতন মন্ত্রের হেলম্‌হোল্‌ট্‌জই পুরাতন ঋষি।

জৈব পদার্থ কিরূপে পচিয়া যায়, ইহা একটা রসায়নশাস্ত্রের সমস্যা। পচিবার সময় জৈব পদার্থের অঙ্গারভাগ বায়ুস্থিত অম্লজানের সমবায়ে ধীরে ধীরে পুড়িয়া যায়, ইহা অবশ্য রাসায়নিকগণের পুরাতন আবিষ্কার। কিন্তু কতকগুলি ক্ষুদ্র ও প্রায় অতীন্দ্রিয় জীবাণু যে এই অবকাশে অপ্রতিহতপ্রভাবে আপনাদের শরীরপুষ্টি ও বংশবৃদ্ধি সাধিত করিয়া লয়, এই গুপ্ত বার্ত্তাটুকু কিছু দিন পূর্ব্বে কেহই জানিতেন না। আজ কাল অবশ্য টিণ্ডাল সাহেবের প্রসাদে এ সকল কথা দুই চারিটার সংবাদ রাখা বড়ই সুকর হইয়াছে; এবং যে জানে না, সে কতকটা ত্রেতাযুগের জীব বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। কিন্তু ফলে হেলম্‌হোলট্‌জ্‌ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার নূতন ক্রীত অনুবীক্ষণ সাহায্যে পচনশীল দ্রব্যে এই জীবাণুর অস্তিত্ব প্রথম আবিষ্কার করেন। শুধু অস্তিত্বের আবিষ্কার নহে; এই জীবাণুর অবস্থিতিই যে পচনক্রিয়ার একমাত্র কারণ; যেখানে জীবাণুপ্রবেশের পথ রুদ্ধ, সেখানে জৈব পদার্থ সহস্র বৎসর অম্লজানের সমবায়ে রক্ষিত হইলেও পচিবে না; শর্করায় মাদকত্বের উৎপত্তি ঠিক্‌ এই পচনক্রিয়ারই অনুরূপ; ইহাতেও জীবাণুবিশেষের অবস্থিতি আবশ্যক; এ সমুদয়ই হেলম্‌হোল্‌ট্‌জ্‌ প্রমাণ করেন। একটা আপত্তি উঠিবার সম্ভাবনা ছিল। হয় ত সেই সেই জীবাণুর শরীর হইতে এরূপ কোনও রস বা বিষ নিঃসৃত হয়, যাহা শুদ্ধ রাসায়নিক ক্রিয়াবলে জৈব পদার্থকে বিকৃত করে ও শর্করাকে সুরায় পরিণত করিয়া থাকে। হেলম্‌হোলটজ্‌ শর্করা ও জীবাণুর মাঝে একখানি সূক্ষ্ম পরদা রাখিয়া দেখাইলেন যে, পরদাখানি নিঃসৃত রসের সঞ্চার রোধ করিতে পারে না, জীবাণুগণেরই সঞ্চার রোধ করে মাত্র; কিন্তু এরূপ স্থলে চিনিরও মদ্যে পরিণতি ঘটে না। সিদ্ধান্ত হইল, এই ব্যাপারটা জৈব প্রক্রিয়া, সামান্য রাসায়নিক প্রক্রিয়া নহে।

এই সিদ্ধান্তের ফলে মনুষ্যের চিন্তাপ্রণালী কিরূপ বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা সকলে না জানিতে পারেন; এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার উল্লেখও অসম্ভব। পাস্তুরের মহিমান্বিত আবিষ্ক্রিয়াপরম্পরার ইতিবৃত্ত লিখিতে বসিয়া হেলম্‌হোল্‌ট্‌জের নাম উল্লেখ না করিলে চলিবে না।

জীব হইতেই জীবের উৎপত্তি হয়; নির্জীব জড় হইতে কখনও জীব জন্মিতে

দেখা যায় নাই, এই মহা তথ্যের আবিষ্কার উল্লিখিত সিদ্ধান্ত হইতেই আসিয়াছে। যাঁহারা বানর হইতে মানুষ উৎপন্ন হইয়াছে মনে আনিতেও একটা নৈতিক মহাপ্রলয়ের আশঙ্কা করিয়া স্তম্ভিত হয়েন, তাঁহাদের অনেকেই অবলীলাক্রমে নির্জীব জড় পদার্থ হইতে অকস্মাৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গযুক্ত শরীরী জীবের উদ্ভব স্বীকার করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন না। স্বেদ, মল, আবর্জ্জনা হইতে বিধাতার মরজিতে বড় বড় কীটের বা পতঙ্গের উৎপত্তি আপনা হইতে হয়, ইহা ত আমাদের দেশে বড় বড় পণ্ডিতেরও ধ্রুব বিশ্বাস। তবে শুধু আমাদের দেশেই নহে।

শরীরবিদ্যায় স্নায়ুযন্ত্রের গঠন ও ক্রিয়াসম্বন্ধে হেল্‌ম্‌হোল্‌ট্‌জ্‌ যাহা করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। তাঁহার পরাক্রমশালী প্রতিভা ও উদ্ভাবনী শক্তি কিরূপে জটিল সমস্যার তথ্যোদ্ভেদে সমর্থ হইত, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

জীবদেহে স্নায়ুসূত্রগুলি টেলিগ্রাফের তারের সহিত তুলনীয় হইয়া থাকে। তাহারা বাহিরের খবর ভিতরে পৌঁছাইয়া দেয় ও ভিতরের আদেশ বাহিরে আনে। সংবাদ বহন তাহাদের কাজ; তাড়িত শক্তি যেমন কয়েকটি সঙ্কেত আশ্রয় করিয়া এক প্রান্তের বার্ত্তা অন্য প্রান্তে উপস্থিত করে, ইহারাও সেইরূপ সঙ্কেতের আশ্রয় করিয়া, বাহিরের বার্ত্তা ভিতরে প্রেরণ করে। মস্তিষ্ক অর্থাৎ হেড আপিস্‌ কতকগুলি সঙ্কেত পাইয়া তাহার অর্থ আবিষ্কার করিতে ব্যাপৃত থাকে।

স্নায়ুসূত্রের কার্য্য সংবাদপ্রেরণ; তবে এই সংবাদপ্রেরণে সময় আবশ্যক কি না? তাড়িত প্রবাহে বার্ত্তাপ্রেরণেও কিছু না কিছু সময় দরকার, আলোকেরও সুদূর নক্ষত্র হইতে পৃথিবীতে পৌঁছিতে সময় দরকার হয়। স্নায়ুসূত্রের ভিতরে এই স্রোত কি বেগে প্রবাহিত হয়? হেল্‌ম্‌হোল্‌ট্‌জ্‌ প্রথমে দেখান, এই স্রোতের বেগ সেকণ্ডে ষাটি হাত মাত্র; তাড়িত প্রবাহ বা আলোকপ্রবাহের তুলনায় নগণ্য।

অর্থাৎ কি না, একটা ষাটি হাত লম্বা তিমিমাছের লেজে বিঁধিলে মস্তিষ্কে তাহার খবর পৌঁছিতে অন্ততঃ এক সেকণ্ড সময় লাগিবে, অথবা এক সেকণ্ড পরে সে বুঝিবে যে, এত বড় একটা প্রাণসংহারক ব্যাপার উপস্থিত। এবং আঘাতের পরে মস্তিষ্ক হইতে আদেশ আসিয়া তাহার লেজ সরাইয়া লইতে অন্ততঃ আর এক সেকণ্ড সময় অতিবাহিত হইবে।

শুনা যায়, ত্রেতাযুগের কুম্ভকর্ণের মস্তিষ্ক হইতে শ্রবণেন্দ্রিয় ক্রোশ দুই

তফাতে অবস্থিত ছিল। হে ত্রৈরাশিকজ্ঞ মানবক, বল দেখি, কপিরাজ সুগ্রীব কর্ত্তৃক উক্ত রক্ষঃপ্রবীরের কর্ণচ্ছেদন ব্যাপার সংঘটনের কতক্ষণ পরে তিনি তাহা টের পান ?

বলিতে গেলে আধুনিক শব্দবিজ্ঞান হেল্‌ম্‌হোল্‌ট্‌জেরই গঠিত ; তাঁহারই 'হাতে-মানুষ-করা' ছেলে। হেল্‌ম্‌হোল্‌ট্‌জের পূর্ব্বে শব্দবিজ্ঞান ও সঙ্গীতবিজ্ঞান সম্বন্ধে গোটা কতক মোটা কথা আবিষ্কৃত হইয়াছিল মাত্র। তিনিই সঙ্গীত বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা। কিরূপে একটি বিশুদ্ধ স্বরের সহকারে তাহার ঊর্দ্ধতন গ্রামবর্ত্তী স্বরাবলী সমবেত ও জড়িত হইয়া ঐ মূল স্বরটিকে বিবিধ নাদে ধ্বনি করে ; কখন্ সুরের সহিত সুরের মিল ঘটিয়া প্রীতি জন্মে, কখন মিলের অভাবে প্রীতির ব্যাঘাত হয় ; নরকণ্ঠনিঃসৃত বিবিধ স্বরকে বিশ্লিষ্ট করিয়া কি কি মৌলিক সুর বাহির করা যায় ; কিরূপে কতিপয় মৌলিক সুরকে সংশ্লিষ্ট করিয়া বিভিন্ন কণ্ঠস্বর উৎপাদন করিতে পারা যায় ; ইত্যাদি ইত্যাদি নানা কথা ; এই সকল শব্দব্যাপারের সময়ে শব্দসঞ্চালক বায়ুমধ্যে ও শব্দোৎপাদক কঠিন দ্রব্যে ও দ্রবদ্রব্যে কিরূপ আণবিক গতি সংঘটিত হয় ; হেল্‌ম্‌হোল্‌ট্‌-জের শব্দবিজ্ঞানসম্বন্ধীয় মহাগ্রন্থ প্রচারের পূর্ব্বে এ সমুদয়ই আঁধার ছিল। শ্রবণেন্দ্রিয়ের সংগঠনপ্রণালী, কিরূপে বায়ুসঞ্চারী ঊর্ম্মিগুলি শ্রবণেন্দ্রিয়ের কোন্ অঙ্গে কিরূপে প্রতিহত হইয়া কিরূপ কাণ্ড ঘটাইয়া দেয় ; এ সমুদয় তথ্যের সূক্ষ্ম বিচার পূর্ব্বে ছিল না। স্বরবিজ্ঞান ও সঙ্গীতবিজ্ঞানের সহকারে যে যে মনোবিজ্ঞানঘটিত গভীর সমস্যা আপনা হইতে উপস্থিত হয়, হেল্‌ম্‌-হোল্‌ট্‌জের পূর্ব্বে কে তাহার মীমাংসায় সাহসী হইত ?

শব্দবিজ্ঞানের পর দৃষ্টিবিজ্ঞান। বস্তুতঃ, হেল্‌ম্‌হোল্‌ট্‌জের আবিষ্কৃত দৃষ্টি-বিজ্ঞানগঠিত তথ্যগুলির মাহাত্ম্য উপলব্ধি করাই কঠিন। তাঁহার আবিষ্কৃত চক্ষুরীক্ষণ (ophthalmoscope) যন্ত্রের উল্লেখ বোধ করি অনাবশ্যক। চক্ষুর অভ্যন্তরপরীক্ষার জন্য আজ কাল এই যন্ত্র ডাক্তারদের একমাত্র অবলম্বন।

দৃষ্টিসম্বন্ধে অনেক রহস্য, যাহা সচরাচর আমাদের মনোযোগের ভিতর আইসে না, তাহা হেল্‌ম্‌হোল্‌ট্‌জ্ প্রথমে দেখাইয়া দেন। রেটিনা নামক স্নায়-বিক পরদার গঠন কিরূপ, চোখের পরকলার কোথায় কতটা বক্রতা, দর্শনে-ন্দ্রিয়ের গঠনে কি কি নানাবিধ সাধারণ ও অসাধারণ দোষ বর্ত্তমান রহিয়াছে, দূরদৃষ্টির ও নিকট দৃষ্টির সময়ে কিরূপে দর্শনেন্দ্রিয়ের বিভিন্ন অংশ ঘুরাইতে ফিরাইতে হয় ; কিরূপে বিভিন্ন পদার্থের দূরত্বের উপলব্ধি হয়, কিরূপে পদার্থ-

মাত্রকে দীর্ঘ, প্রস্থ, বেধ, তিন গুণবিশিষ্ট বলিয়া বোধ জন্মে, বর্ণের উজ্জ্বলতায় কিরূপে ছোট জিনিসকে বড় দেখায়, কিরূপে তিনটি মূল বর্ণের বোধ ধরিয়া লই-লেই সেই তিনটি মৌলিক অনুভূতিরই বিবিধ বিধানে সংমিশ্রণে অসংখ্য বিচিত্র বর্ণজ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে, কিরূপে ইহারই মধ্যে একটি মৌলিক অনু-ভূতির অভাব ঘটিলে মানুষে রঙ্‌কাণা হইয়া যায়; দৃষ্টিগোচর পদার্থমাত্রেরই কোন্ অংশটা বস্তুতঃ আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর, আর কোন্ অংশটাই মানস-গোচরমাত্র, অর্থাৎ কতটা আমরা বাস্তবিক দেখিতে পাই, আর কতটাই বা মনে মনে কল্পনা দ্বারা গড়িয়া লই, ইত্যাদি ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে হেল্‌ম্‌-হোল্‌ট্‌জ্‌ যে সকল রহস্যের উদ্‌ঘাটন করেন, তাহার বিবরণ দেওয়া অসম্ভব।

ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ, অতি প্রাচীনকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি; কিন্তু জ্ঞান কিরূপে বাহির হইতে এই দ্বারপথে প্রবেশলাভ করে, তাহার সম্বন্ধে আমাদের পরিচয় এ পর্য্যন্ত নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ও পরিমিত ছিল। বাহিরে জড়প্রকৃতিতে নানাবিধ আনাগোনা আন্দোলনের তরঙ্গ উঠিতেছে; ইন্দ্রিয়গণ সেই সকলের বার্ত্তা কোনও মতে মস্তিষ্কের হেড আফিসে পৌঁছিয়া দেয়, এবং আমাদের অন্তঃকরণ সেই সঙ্কেতগুলি বাছিয়া গোছাইয়া সাজাইয়া নানাবিধ প্রণালীতে নানাবিধ গঠন প্রস্তুত করে, এবং কতক সুন্দর ও আবশ্যক বোধে গ্রহণ করে ও কতক অসুন্দর ও অনাবশ্যক বোধে ত্যাগ করিয়া জীবনের স্থিতি, গতি, পুষ্টি ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিধানে নিরত থাকে। বাহিরে কিরূপ আনা-গোনা আন্দোলন চলিতেছে, ইহা জড়বিজ্ঞান বা পদার্থবিদ্যার বিষয়; ইন্দ্রিয়-গণ কিরূপে এই সকল আন্দোলনের বার্ত্তা মস্তিষ্কে হাজির করে, ইহা জীবন-বিদ্যা ও শরীরবিদ্যার বিষয়, এবং অন্তঃকরণ সেই বার্ত্তাগুলি বা সঙ্কেতগুলিকে কিরূপে গোছাইয়া ও সাজাইয়া সেই উপাদান সকলে বিশ্বজগৎ নির্ম্মাণ করিতে বসে, তাহা মনোবিজ্ঞানের বিষয়। স্থূলতঃ, এই তিন ছাড়িয়া আর কোনও বিজ্ঞান নাই। পণ্ডিতগণের মধ্যে সচরাচর এক এক ব্যক্তি ইহার একটি মাত্র অথবা একটিরই কোন সঙ্কীর্ণ অংশমাত্র লইয়া ব্যাপৃত থাকেন। জ্ঞানসাম্রা-জ্যের তিন মহাদেশে এক সময়ে দিগ্বিজয়ে বাহির হইতে পারেন, এরূপ কৃতকর্ম্মা প্রায় দেখা যায় না। হেল্‌ম্‌হোল্‌ট্‌জ্‌ এইরূপ কৃতকর্ম্মা পুরুষ ছিলেন; এবং বোধ করি, এ বিষয়ে তিনি মনুষ্যমধ্যে অদ্বিতীয়।

শ্রুতি ও দৃষ্টি ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান; সূক্ষ্মতায় অথবা প্রসারে অন্য ইন্দ্রিয় এই উভয়ের সমকক্ষ নহে। প্রধানতঃ শ্রুতি ও দৃষ্টি অবলম্বন করিয়াই

আমরা এই বিচিত্র সুন্দর জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া লইয়াছি। অন্যান্য ইন্দ্রিয় ইহাদের সাহায্য করে মাত্র। এই দুই ইন্দ্রিয়, ইহাদের গঠন, ইহাদের বিষয় ও ইহাদের ক্রিয়া, এ সম্বন্ধে আলোচনায় তিনি একা যাহা করিয়াছেন, তাহা অপর কেহ করে নাই।

জড়জগতের সহিত আমাদের অন্তর্জগতের এমন কি সম্বন্ধ আছে যে, কতকগুলি জিনিসকে আমরা সুন্দর দেখি, কতকগুলিকে কুৎসিত দেখি? আমাদের এই সৌন্দর্য্যবোধের মূল কি? ইহা কোথা হইতে আইসে? এই গভীর তত্ত্বের মীমাংসার জন্য মানব বহুদিন হইতে লালায়িত। সৌন্দর্য্যতত্ত্বের মীমাংসা একা হেল্‌ম্‌হোল্‌ট্‌জ্‌ হইতে যত দূর হইয়াছে, অন্য হইতে তাহা হয় নাই। বস্তুতঃই হেল্‌ম্‌হোল্‌ট্‌জ্‌ আধুনিক মনস্তত্ত্বের ও অধ্যাত্মবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা। জড়ের সহিত মনের কি সম্বন্ধ, ভূতের সহিত আত্মার কি সম্বন্ধ, এই গভীরতর সমস্যার মীমাংসার জন্য দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি ও বিকাশ। যে পথে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে, হেল্‌ম্‌হোল্‌ট্‌জ্‌ই তাহা দেখাইয়াছেন।

১৮৪৭ সালে ভৌতিক শক্তির অনশ্বরতা সম্বন্ধে হেল্‌ম্‌হোল্‌ট্‌জের প্রবন্ধ প্রকটিত হয়। তাহার পর পদার্থবিদ্যা রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে। একটা কৌশলময় যন্ত্র বানাইয়া দিলে উহা বিনা শ্রমে বিনা ব্যয়ে চিরদিন ধরিয়া চলিতে পারিবে ও কাজ দিবে, সেকালের লোকের এইরূপ বিশ্বাস ছিল। এখনও যে এই বিশ্বাস অন্তঃসলিল প্রবাহের ন্যায় বহিতেছে না, এমন নহে। জড়ের সৃষ্টি নাই, বিনাশও নাই, এই তত্ত্ব কিছুদিন পূর্ব্বে নির্ণীত হইয়াছিল; কিন্তু শক্তিরও যে সৃষ্টি নাই, বিনাশও নাই, এ তত্ত্ব তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয় না, সৎ অসতে পরিণত হয় না, এইরূপ একটা বাক্য দার্শনিকগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল বটে; কিন্তু ইহার পক্ষে বা বিপক্ষে কোনও প্রমাণ ছিল না; এবং এই স্বতঃসিদ্ধ হইতে কি সিদ্ধান্ত হয় বা না হয়, তাহারও কেহ ধ্রুবনির্দ্দেশে সাহস করিতেন না। শক্তির বহুরূপিতা হেল্‌ম্‌হোল্‌ট্‌জের কিছুদিন পূর্ব্বেই বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে স্বীকৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু শক্তির অনশ্বরতাকে একটি দার্শনিক সূত্ররূপে প্রতিপাদনের কার্য্য, হেল্‌ম্‌হোল্‌ট্‌জেরই প্রতিভার অপেক্ষায় ছিল।

এক হিসাবে মনুষ্যশরীরকে যন্ত্র হিসাবে দেখা যায়। তবে সেকালে অন্য যন্ত্রের সহিত দেহযন্ত্রের কোনরূপ তুলনা সম্ভবিত না। বাষ্পযন্ত্রে কয়লা পোড়াইতে হয়, ঘটিকা যন্ত্রে মাঝে মাঝে দম দিতে হয়, কিন্তু দেহযন্ত্রে জীবনরূপ

একটা কি-জানি-কি অতিপ্রাকৃত শক্তি বিনা ব্যয়ে বিনা শ্রমে কার্য্য চালাইতেছে, এইরূপ একটা বিশ্বাস সকলেরই ছিল। হেলম্‌হোল্‌ট্‌জের প্রবন্ধের পর হইতে স্বীকৃত হইয়াছে; জীবন একটা কবিজনোচিত কল্পনামাত্র, একটা আভিধানিক শব্দমাত্র; কতকগুলি ক্রিয়াসমষ্টির অভিধানমাত্র। কয়লা না পোড়াইলে যেমন বাষ্পযন্ত্র চলে না, কয়লা না পোড়াইলে সেইরূপ দেহযন্ত্রও চলে না। এবং এই উভয় কয়লাই আমাদের চিরপরিচিত কৃষ্ণকায় অঙ্গার।

আমাদের সৌরজগৎ আর একটা প্রকাণ্ডতর যন্ত্র। সূর্য্যমণ্ডল হইতে রাশি রাশি শক্তি উৎপন্ন হইয়া তাপরূপে ও আলোকরূপে দিগ্‌দিগন্তে আকীর্ণ হইতেছে, ও তাহারই কণিকামাত্র পাইয়া গ্রহে উপগ্রহে নানাবিধ ভৌতিক ক্রিয়া চলিতেছে। এই পৃথিবীতেই যে বায়ু বহে, জল পড়ে, মেঘ ডাকে, বৃক্ষলতা কীট পতঙ্গ হইতে মানুষ পর্য্যন্ত জন্মে ও মরে, হাসে ও কাঁদে, খেলা করে ও নাচিয়া বেড়ায়, সূর্য্যমণ্ডল হইতে সমাগত কণিকাপ্রমাণ শক্তিই এই সমস্তের কারণ। কিন্তু সূর্য্যের এই অমিতপ্রমাণ শক্তি আসিল কোথা হইতে?

হেলম্‌হোল্‌ট্‌জ্‌ দেখাইয়াছিলেন, সূর্য্যমণ্ডলের এই শক্তির ভাণ্ডার অমেয় নহে; ইহারও পরিমাণ আছে ও ক্ষয় আছে। কোথা হইতে এই ভাণ্ডার সংগৃহীত হইল, এবং এই অজস্র ব্যয়েরই বা পরিণাম কি, হেলম্‌হোল্‌ট্‌জ্‌ তাহারও হিসাব দিলেন। বলা বাহুল্য, সেই হিসাব সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছে। সৌরজগৎরূপ মহাযন্ত্র কিরূপে কত দিন হইতে চলিতেছে, হেলম্‌হোল্‌ট্‌জের নিকটেই মানবজাতি শিখিয়াছে। স্থানান্তরে ইহার সবিস্তার উল্লেখ করিয়াছি। *

গণিতশাস্ত্রে হেলম্‌হোল্‌ট্‌জ্‌ কি করিয়াছেন, কিরূপে বুঝাইব? দীনা বঙ্গভাষা ও দীন বঙ্গসাহিত্য; অন্য দেশে যাহা সম্পাদিত হইয়াছে, এ দেশে তাহার বর্ণনারও উপায় নাই।

বিখ্যাত সর উইলিয়ম টম্‌সনের বিখ্যাত vortex theoryর কথা অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। জগদ্ব্যাপী আকাশে বা ঈথরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্ত্তের নাম জড়পরমাণু। হেলম্‌হোল্‌ট্‌জের প্রতিভা এই পরমাণুতত্ত্বের বীজ রোপণ করিয়াছিল।

হেলম্‌হোল্‌ট্‌জ্‌ অনেক নূতন গড়িয়াছেন, আবার অনেক পুরাতন ভাঙ্গিয়াছেন। ইউক্লিড হইতে আজ পর্য্যন্ত মানব জাতি কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ লইয়া জ্যামিতিশাস্ত্র অথবা দেশতত্ত্ব নির্ম্মাণ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিল। আজ কাল সেই

---

* সাহিত্যে প্রাকৃত সৃষ্টি প্রবন্ধ।

স্বতঃসিদ্ধগুলির মূল ভিত্তি লইয়া টানাটানি আরম্ভ হইয়াছে। কে বলিল, আমাদের দেশের (অর্থাৎ আকাশের) সীমা নাই? কে বলিল, আমাদের দেশ সর্ব্বত্রই সমাকার? দুইটা দ্রব্য দৈর্ঘ্যে তৃতীয় দ্রব্যের সমান হইলে তাহারাও পরস্পর সমান, কে বলিল, ইহা একটি অখণ্ডনীয় স্বতঃসিদ্ধ? মনুষ্য জাতি আবহমান কাল হইতে কতকগুলি বাক্যকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। সেগুলি সত্য, সেগুলি স্বতঃসিদ্ধ। মানুষের সংস্কার, যেন সেগুলিকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া না ধরিলে জীবনযাত্রা চলে না, যেন জগৎ প্রণালী উল্‌টাইয়া যায়, যেন জগৎযন্ত্র বিপর্য্যস্ত হয়। বিখ্যাত দার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্ট এইরূপ অধিকাংশ সত্যের স্বতঃসিদ্ধতার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন, যাহা প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট, প্রকৃতিবিহিত সত্য বলিয়া মানিতেছ, তাহা প্রকৃত পক্ষে মানুষেরই সুবিধার জন্য মনুষ্যকর্ত্তৃকই সৃষ্ট বা কল্পিত; মানুষেরই হাত-গড়া পুত্তলী। জ্যামিতিশাস্ত্রের মূল সত্যগুলির স্বতঃসিদ্ধতায় সন্দেহ করিতে ইমানুয়েল কাণ্টও সাহসী হয়েন নাই। হেল্‌ম্‌হোল্‌ট্‌জ্‌ই জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেন। তিনিই প্রথমে দেখান, মনুষ্যের অন্তঃকরণের বাহিরে সত্যও কিছুই নাই, স্বতঃসিদ্ধও কিছুই নাই। বিষয়টি বড় গুরুতর; এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে উল্লেখ মাত্র করিয়াই নিরস্ত থাকিতে হইল। স্থানান্তরে এ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছিল। *

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

প্রবাসযাত্রা।

বঙ্গদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকে যে দেশান্তরে যাইতে হইবে, এ চিন্তা কখনও আমার মনে স্থান পায় নাই, এবং অন্য কেহ কখনও বিশ্বাস করিতে পারে নাই যে, আমার ন্যায় অলস, শান্তিপ্রিয় একটা লোক দুর্গম হিমালয়ের বড় বড় 'চড়াই' ও 'উৎরাই' পার হইয়া পদব্রজে সাধুসন্ন্যাসিগণের সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইবে। কিন্তু অদৃষ্টের লেখা কে খণ্ডন করিতে পারে? দেশত্যাগ করিয়া আমাকে বহু দূর ঘুরিতে হইয়াছিল; চাকরীর উদ্দেশে নয়,—শান্তির অন্বেষণে। শোক-

* সাহিত্য ও বিজ্ঞান 'ক্লিফোর্ডের কীট' শীর্ষক প্রবন্ধ।

সন্তপ্ত, অধীর চিত্তকে সংযত করিবার জন্য জন্মভূমি ছাড়িয়া এক অনির্দিষ্ট দেশে যাত্রা করিলাম।

প্রথম যে দিন হাবড়া ষ্টেশনে গাড়ীতে উঠিলাম,—সে অনেক দিনের কথা,—কিন্তু এখনও সে কথা বেশ মনে আছে; দুঃখের দিনের কথা বড় মনে থাকে। সব চেয়ে আমার মনে এই ভাবটি বেশী জাগিতেছিল যে, বাঙ্গলা দেশে আর কখনও ফিরিব না, এবং যাহারা আমার আপনার, তাহাদের স্নেহপূর্ণ মুখ আর একবার দেখিবার সম্ভাবনাও বিলুপ্ত হইয়াছে। আমার একটি বন্ধু আমাকে বিদায় দিবার জন্য ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন, তাঁহার মুখ খানি ভার; গাড়ী ছাড়িবার শেষ ঘণ্টা পড়িলে, তিনি গাড়ীর দরজা দিয়া দুই হাত বাড়াইয়া আমার হাত দুখানি চাপিয়া ধরিলেন; তখন অধিক কথা কহিবার অবকাশ ছিল না, এবং কথা কহিয়া মনের আবেগ দূর করা তখনকার পক্ষে অসম্ভব। গাড়ী ছাড়িয়া দিল; বন্ধুর দিকে শেষবার চাহিলাম, তাঁহার কাতর চক্ষু জলে পুরিয়া উঠিয়াছিল, আমার চক্ষুও বোধ করি শুষ্ক ছিল না;—একবার মনে হইল, কোন্ অনির্দ্দিষ্ট পথে, কোন্ দূর দেশে শান্তির কুহকে কেন ছুটিয়া চলিয়াছি; আর যাইব না, নামিয়া পড়ি। তখনই মনে হইল—সকলই মায়া, জীবন বিড়ম্বনাময়,—যদি বন্ধন ছিঁড়িয়াছি, তবে আর কেন?—তখন মনে হইয়াছিল, বন্ধন ছেঁড়া বড়ই সহজ।

অনেক দূরের টিকিট লইয়াছিলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিলে গাড়ীতে বসিয়া আমি সেই সুদূরবর্ত্তী পশ্চিম দেশের পর্ব্বতবেষ্টিত নির্জ্জন গ্রামের চিত্র কল্পনা করিতেছিলাম। নানাদেশের যাত্রিতে গাড়ীখানি পূর্ণ, কিন্তু সেই সমাগত মনুষ্যমণ্ডলীর মধ্যে আমি একাকী; আড্ডায় আড্ডায় গাড়ী থামে, লোক উঠে এবং নামে; কিন্তু কেহই আমাকে জিজ্ঞাসা করে না,—"বাপু, তুমি কোথায় যাইবে," আমারও কাহাকেও কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিবার ছিল না। শুধু চিন্তা ভাল লাগে না, এক এক বার একটু আলাপ করিতে ইচ্ছা হইতেছিল, কিন্তু সেই জনকোলাহলের মধ্যে একখানিও পরিচিত মুখ দেখিতে পাইলাম না। অপরিচিত লোকের সঙ্গে আলাপ করিবার উৎসাহও ছিল না।

এই সময় কর্ড লাইনে মধুপুরের কাছে একটা পুল ভাঙ্গিয়া পথ খারাপ হইয়াছিল, ডাকগাড়ী ছাড়া অন্য কোনও গাড়ী সে পথে চলিত না। ডাকগাড়ী ভগ্ন সেতুর এ পারে আসিয়া থামিত, ডাক পার হইলে আবার অপর পার হইতে দ্বিতীয় গাড়ী ছাড়া হইত। আমি মিক্সড্ ট্রেণের আরোহী, আমাদের

গাড়ী কানুজংসন হইতে দক্ষিণ পথ অবলম্বন করিল। বামে বা দক্ষিণে কোন দিকেই আমার কিছু আপত্তি ছিল না, এবং এক দিনের স্থানে দুই চারি দিন লাগিলেও আমি নিশ্চিন্ত; কোনও রকমে দিনপাত করা ছাড়া তখন আমার জীবনের অন্য উদ্দেশ্য ছিল না।

গাড়ী যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, লোকজনের ভিড়ও তত বাড়িয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে কথা, গল্প, হাস্য, পরিহাস, গণ্ডগোল—সে সকলের আর ইয়ত্তা রহিল না। এক জন তাঁহার ভ্রাতার সঙ্গে পৃথক হওয়ার গল্প বলিতেছিলেন; শুনিলাম, তাঁহার সহোদর কিঞ্চিৎ অতিরিক্তপরিমাণে স্ত্রৈণ, এবং তাহাই তাঁহাদের এই পারিবারিক বিপত্তির কারণ। আর এক জন লোক তাহার অংশীদারকে কিরূপে ফাঁকি দিবে, এক জন সুহৃদের সঙ্গে সেই সম্বন্ধে ষড়যন্ত্র আঁটিতেছিল। এক জন বেঞ্চিতে হেলান দিয়া গান গাহিতেছিল, হঠাৎ অর্দ্ধপথে গান ছাড়িয়া পার্শ্ববর্ত্তী আর এক জনকে জিজ্ঞাসা করিল, "মশায়! কল্কেটা একবার দেবেন?" নিকটে আর একটি তাম্রকূটপায়ী কল্কেটাতে একটা দম দিবার জন্য অনেকক্ষণ হইতে উমেদার ছিল, সে তাহার অধিকারহানির সম্ভাবনা দেখিয়া একটু রাগিয়া চোখ গরম করিয়া উঠিল; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত গায়কবর তাহাতে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া দুইটি উৎকট দমে কলিকাসঞ্চিত তামাকটুকু নিঃশেষ করিয়া সেই গরম লোকটার হাতে দিল, এবং পূর্ব্ববৎ গাহিতে লাগিল—

"ঘোরা তিমিরা রজনী, সজনি,
না জানি কোথায় শ্যাম গুণমণি,
পৃষ্ঠে দুলিছে লম্বিত বেণী।"—ইত্যাদি।

পৃষ্ঠে লম্বিত বেণী দুলার কথা মিথ্যা, তবে মস্তকে একটা অনতিদীর্ঘ শিখা দুলিতেছিল বটে, এবং গায়কবর শ্যামদরশনের জন্য কিরূপ কাতর হইয়াছিলেন, শুধু গান শুনিয়া তাহা ঠাহর করা যায় না; কিন্তু সেটি যে 'ঘোরা তিমিরা রজনী', তাহাতে আর সন্দেহ ছিল না। গ্রীষ্মকাল, কৃষ্ণপক্ষের একাদশী কি দ্বাদশী, এবং তখন রাত্রি ১২টা, আকাশে অল্প অল্প মেঘ করিয়াছিল, সুতরাং ভাল করিয়া নক্ষত্র দেখা যাইতেছিল না, শুধু শুষ্ক প্রান্তরের বক্ষঃ ভেদ করিয়া আমাদের গাড়ী উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছিল।

একটু ঘুম আসিল। ঘুমের বেশী অপরাধ ছিল না। সেই বেলা ১১টার সময় গাড়ীতে চড়িয়াছি, রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত সমভাবে বসিয়া লোকের নামা উঠা দেখিতেছি, আর কোলাহল শুনিতেছি; আহারও নাই, নিদ্রাও

নাই ; এতক্ষণে নিদ্রাকর্ষণ হওয়াতে যাত্রীদের গাঁঠুরীগুলো একটু সরাইয়া জড়সড় ভাবে শুইয়া পড়িলাম। রাত্রি প্রায় ২টা কি দেড়টার সময়ে, নাম মনে নাই এমন একটা ষ্টেশনে মাথার কাছে খট্‌খট্ শব্দ হওয়াতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, মাথা তুলিয়া দেখি, আমার কামরার দ্বার ধরিয়া একটা লোক টানা-টানি করিতেছে। কামরাটি এখন নিস্তব্ধ, যে ভদ্রলোকটি শ্যামদরশনের আশায় হতাশ হইয়া, বেহাগ গাহিয়া বিরহজ্বালা মিটাইতেছিলেন, দেখিলাম, আর একটা বেঞ্চিতে তাঁর মুণ্ডটা লুটাইতেছে, যুদ্ধশেষে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত বীরের ন্যায় যাত্রীদল গাড়ীতে নানারকম ভঙ্গী করিয়া শুইয়া পড়িয়াছে, থার্ডক্ল্যাসের গাড়ী, আলো বেশী নাই, এক কোণে উপরে একটা লণ্ঠন টিপটিপ করিয়া জ্বলিতেছিল, তাহাতে সমস্ত গাড়ী আলোকিত হয় নাই।

গাড়ীর দরজায় চাবি দেওয়া ছিল, কিন্তু যে দরজা ধরিয়া টানাটানি করিতে-ছিল, সে একটা ছাতুখোর মেড়ুয়া, কিছুতে গাড়ী খুলিতে না পারায় সোর গোল করাতে একজন পুলিষম্যান আসিয়া গাড়ীর দরজাটা খুলিয়া দিল। উঠিয়া বসিলাম, বাতায়নপথে চাহিয়া দেখিলাম, ষ্টেশনটা অতি ছোট, আমা-দের গাড়ী ষ্টেশন হইতে অনেক দূরে প্ল্যাটফরমের এক প্রান্তে আসিয়া লাগিয়াছে।

দ্বার খোলা হইলে দেখিলাম, সেই মেড়ুয়াবাদী একটি যুবতীকে গাড়ীর মধ্যে তুলিয়া দিয়া তাহাকে একটু বসিবার যায়গা দিবার জন্য সবিনয়ে আমাকে অনুরোধ করিল। একটি ছোট ছেলে কোলে লইয়া যুবতী গাড়ীর মধ্যে আসিয়া বসিলে, সেই লোকটি তাহার লটবহর আনিবার জন্য ষ্টেশনের দিকে ছুটিয়া গেল ; ছোট ষ্টেশন, গাড়ী বোধ হয় এখানে দুই এক মিনিটের বেশী থামিবার নিয়ম নাই, সুতরাং তাহার অপেক্ষা না করিয়াই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। দেখিলাম, গাড়ী ছাড়িবামাত্র সে লোকটি আমাদের গাড়ীর দিকে দৌড়িয়া আসিতেছে, কিন্তু পাঁচ সাত হাত না আসিতেই ষ্টেশনের লোকে তাহাকে আটকাইয়া ফেলিল। বেচারা যদি এ দিকে দৌড়িয়া না আসিয়া নিকটের কোনও একটা গাড়ীতে উঠিয়া পড়িত, তাহা হইলে তাহার কোনও অসুবিধাই হইত না, পরের ষ্টেশনে নামিয়া অনায়াসেই আমাদের গাড়ীতে আসিতে পারিত। কিন্তু বিপদকালে অনেক বুদ্ধিমানের বুদ্ধি লোপ পায় ; এক জন নিরক্ষর হিন্দুস্থানী যে এই বিপদে হতভম্ব হইয়া পড়িবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি ?

এদিকে গাড়ী ছাড়িল দেখিয়া স্ত্রীলোকটি সেই শিশুপুত্রকে কোলে লইয়া গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িবার ইচ্ছায় তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া ফেলিল। গাড়ীর মধ্যে আর সকলেই নিদ্রিত, এখন আমার কি করা উচিত, তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না। গৃহস্থের মেয়ে, হঠাৎ তাহাকে হাত ধরিয়া ফিরানও আমার পক্ষে সহজ নহে, অথচ আমি হিন্দুস্থানীভাষায় যে রকম সুপণ্ডিত, তাহাতে লাফাইয়া পড়িলে তাহার কিরূপ বিপদের সম্ভাবনা, তাহা বুঝাইয়া তাহাকে নিরস্ত করাও আমার সাধ্যায়ত্ত নহে, সুতরাং অগত্যা "কুচ ভয় নেহি," "নেহি নামো" ইত্যাদি দুই চারিটা স্বরচিত হিন্দুস্থানী কথায় তাহাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলাম, সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর দরজাটা সজোরে ধরিয়া রহিলাম। স্ত্রীলোকটি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল, আমাদের ও আমাদের পাশের কামরায় দুই চারি জন হিন্দুস্থানী ঘুমাইতেছিল, স্ত্রীলোকের ক্রন্দনশব্দে তাহারা উঠিয়া পড়িল; সকল কথা শুনিয়া তাহারা কিংকর্ত্তব্যসম্বন্ধে নানাপ্রকার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে লাগিল, এক জন একটা অভদ্রোচিত রসিকতা করিতেও ক্রটী করিল না; যদিও তাহার সমস্ত রসিকতা টুকুর অর্থ আবিষ্কার করা আমার সাধ্য হয় নাই, তথাপি যতটুকু বুঝিলাম, তাহাতেই আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া গেল; কিন্তু উপায় নাই, সুতরাং প্রশান্তভাবে সেই নীচরসিকতা টুকু পরিপাক করিতে হইল। মনকে প্রবোধ দিলাম যে, ছোটলোকের কাছে ইহা অপেক্ষা আর কি বেশী আশা করা যায়? "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী," সুতরাং ধর্ম্মজ্ঞানসঙ্গত দুই একটা উপদেশবাক্য প্রয়োগ করাও বাহুল্য বোধ করিলাম।

অনেক কষ্টে স্ত্রীলোকটিকে শান্ত করিয়া বসাইলাম; সে কাঁদিতে লাগিল। একেই আমি হিন্দুস্থানী ভাষা বুঝি না, তাহার উপর সে কাঁদিতে কাঁদিতে জড়াইয়া জড়াইয়া যে সকল কথা বলিতে লাগিল, তাহার একবর্ণও আমি বুঝিতে পারিলাম না। এইমাত্র বুঝিলাম যে, সে ভাগলপুরের ও পাশে বরিয়ারপুর ষ্টেশনে নামিবে। বরিয়ারপুরের নিকটে তাহার বাপের বাড়ী, যে পুরুষটি গাড়ীতে উঠিতে পারে নাই, সে তাহার বড় ভাই। আমি তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলাম, তাহাকে বরিয়ারপুরে নামাইয়া রাখিয়া যাইব। আমার সকল কথা বুঝিতে না পারিলেও যুবতী এটুকু বুঝিল যে, আমি তাহার শুভানুধ্যায়ী। যুবতীর কোলের ছেলেটি তিন চারি মাসের বেশী হইবে না। স্ত্রীলোকটিকে অতিশয় ব্যাকুল দেখিয়া তাহার ছেলেটিকে আমি কোলে লইলাম;

বসিলাম ; তাহাকে দেখিয়া আর একটি ক্ষুদ্র সুন্দর শিশু ও তাহার স্নেহময়ী মাতার কথা আমার মনে পড়িয়া গেল—তাহারা আর এ পৃথিবীতে নাই। আমার ক্রোড়ে আসিয়া শিশুটি হাত পা নাড়িয়া খেলা করিতে লাগিল, শেষে ঘুমাইয়া পড়িলে, তাহার মাতার ক্রোড়ে তাহাকে অর্পণ করিলাম।

এ দিকে প্রত্যেক ষ্টেশনে গাড়ী আসে, আর আমি মুখ বাড়াইয়া দিই, যদি সেই লোকটি টেলিগ্রাম করিয়া থাকে। ভাগলপুর পার হইয়া গেলাম, তবু কোনও সংবাদ পাওয়া গেল না। ক্রমে গাড়ী বরিয়ারপুর ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী হইল, আমার মনে নানান্ রকম ভাবনা আসিতে লাগিল। এই সুন্দরী যুবতীকে একাকিনী ষ্টেশনে নামাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য কি না, এই রাত্রে যদি সে পথ চিনিয়া যাইতে না পারে, ষ্টেশনের লোকেরা যদি এই অসহায়া যুবতীর উপর কোনও প্রকার অত্যাচার করে, তাহা হইলে উপায় কি? অনেক চিন্তার পর স্থির করিলাম, আমি বরিয়ারপুর ষ্টেশনেই নামিব ; চিরদিন নিজের সুখ সচ্ছন্দতা খুঁজিয়া আসিয়াছি, সে সমস্ত শেষ হইয়াছে, এখন আর সে জন্য চিন্তা নাই ; এখন এক বার দেখা যাক্, পরকে একটু সুখী করা যায় কি না।

স্ত্রীলোকটির কাছে আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম। সে আশ্বস্ত এবং সানন্দ মনে আমার পা ধরিয়া কৃতজ্ঞতা দেখাইতে গেল। আমি তাহাকে নিবৃত্ত করিলাম।

বরিয়ারপুর ষ্টেশনে গাড়ী থামিল। ষ্টেশনটি ছোট। স্ত্রীলোকটির ভাই এখানে টেলিগ্রাম করিয়াছিল, কিন্তু ষ্টেশনের লোকেরা ব্রেকভ্যানের দিক হইতে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিল, কাজেই তাহারা আসিতে আসিতে আমি গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম, এবং যুবতীকেও নামাইলাম। ষ্টেশনমাষ্টার আসিয়া আমাদের তারের খবরের কথা বলিল।

ষ্টেশনমাষ্টার লোকটার একটু ইংরাজী বলিবার সখ ছিল, কিন্তু কথা-বার্ত্তায় তাহার যেরূপ বিদ্যার দৌড় দেখিলাম, তাহাতে তাহার এ সখটুকু না থাকিলেই ভাল হইত। কিন্তু অনেক লোকই আপনাকে সামান্য বলিয়া মনে করে না, সুতরাং এ বেচারীরও দোষ দেওয়া যায় না ; সে ইংরাজীতে আমাকে বলিল, "Don't fear, Babu, you go Babu, we are here, let her alone Babu"—আমি বলিলাম, যখন এখানে নামিয়াছি, তখন আজ আর যাইব না।

ষ্টেশনে কর্ম্মচারীর মধ্যে এক ষ্টেশনমাষ্টার, এবং এক জন লোক, সে

একাই পুলিষম্যান, মশালচি, টিকিটসংগ্রাহক, কুলি এবং ষ্টেশনমাষ্টারের আরদালী, একাধারে সমস্ত। আমার সঙ্গে একটা চামড়ার পোর্টম্যাণ্টো, পুলিষ-ম্যান ওরফে কুলিশ্রেষ্ঠ সেটি ষ্টেশনের ভিতর লইয়া আসিল। আমি ও ষ্টেশন-মাষ্টার আগে, রমণীটি পশ্চাতে, আমরা ষ্টেশন ঘরে প্রবেশ করিলাম।

ষ্টেশনে আসিয়া তারের খবরটা দেখিতে পাইলাম। মাষ্টারজির সঙ্গে একটু আলাপ হইল, তিনি লোক নিতান্ত মন্দ নন; আমরা সেই রাত্রি ষ্টেশনে থাকিতে অনুরুদ্ধ হইলাম। এই স্ত্রীলোকটিকে অপরিচিত স্থানে ছাড়িয়া দিতে সাহস হইল না, অথচ উভয়ে ষ্টেশনের ক্ষুদ্র একটি কক্ষে রাত্রি কাটানও অক-র্ত্তব্য বোধ করিলাম। যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাহার বাপের বাড়ী ষ্টেশন হইতে এক ক্রোশ দূরে; এ দিকে ভাগলপুর হইতে গাড়ী পরদিন বেলা এগারটার আগে আসিবে না। রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী; শুনিলাম, পথে কোনও ভয় নাই। বাঁধা রাস্তা নাই বটে, কিন্তু ক্ষেতের আইলের উপর দিয়া বেশ যাওয়া যায়। ষ্টেশনের পুলিষম্যানটিকে সঙ্গে যাইতে বলিলাম, কিন্তু সে ষ্টেশনমাষ্টারের "সবে ধন নীলমণি"—তাহাকে ছাড়িয়া ষ্টেশন মাষ্টারের একদণ্ড চলিবার যো নাই। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছিল, সুতরাং আমি ইচ্ছা করিলাম, ষ্টেশনে বসিয়াই অবশিষ্ট রাত্রিটুকু কাটাইয়া দিই, সকালবেলা যুবতীকে তাহার পিত্রালয়ে পঁহুছাইয়া দিব। কিন্তু স্ত্রীলোকটি আমার অভিপ্রায় শুনিয়া কাঁদা-কাটি আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার শিশুটিও কান্না যুড়িয়া দিল। অগত্যা আমি আমার পোর্টম্যাণ্টোটি ষ্টেশনমাষ্টার মহাশয়ের জিম্মায় রাখিয়া তাহাদের সঙ্গে রওনা হইলাম। এবার যুবতী আমাকে পথ দেখাইয়া চলিল। অনেক রাত্রে জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল, পাতলা মেঘের ভিতর দিয়া সেই জ্যোৎস্না ঘুমন্ত মাঠের বুকে আসিয়া পড়িয়াছে, দূর বনে অল্প অল্প কি নড়িতেছে, দুই একটা পাখী মধ্যে মধ্যে ডাকিয়া উঠিতেছে, এবং পূর্ব্বাকাশ পরিষ্কার হইয়া আসি-য়াছে। আমরা দুইটি প্রাণী গ্রাম লক্ষ্য করিয়া দ্রুতপদে চলিতে লাগিলাম; শুনিয়াছিলাম, রাস্তা প্রায় এক ক্রোশ; কিন্তু চলিতে চলিতে পা ব্যথা করিতে লাগিল, তবু রাস্তা শেষ হয় না। আমার সন্দেহ হইল, যুবতী বুঝি পথ ভুলি-য়াছে। তাহাকে সে কথা বলিলাম; সে হাসিয়া বলিল, "লড়কি কি কখন বাপের বাড়ীর পথ ভোলে?"—এত ক্ষণ পরে তাহার মুখে হাসি দেখিয়া আমার মনে আনন্দ হইল।

আমরা যখন যুবতীর পিত্রালয়ে পঁহুছিলাম, তখন ভোর হইয়াছে, তবে

চারি দিক বেশ পরিষ্কার হয় নাই। ডাকাডাকি করিতে সকলে উঠিয়া পড়িল। একজন অপরিচিত বাঙ্গালি বাবুর সঙ্গে মেয়েকে আসিতে দেখিয়া তাহারা অবাক্ হইয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর মেয়েটি যখন সংক্ষেপে আমার পরিচয় প্রদান করিল, তখন, তাহাদের উপকারের জন্য আমি নিজের কাজ ক্ষতি করিয়া এতটা কষ্ট স্বীকার করিয়াছি শুনিয়া, তাহারা প্রাণ খুলিয়া আমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল। যুবতীর বাপ এক জন অশীতিপর বৃদ্ধ, কৃতজ্ঞতাভরে সে আমার হাত জড়াইয়া ধরিল। আমি আমার সেই সৃষ্টিছাড়া হিন্দুস্থানী ভাষায় তাহাদিগকে পরিতুষ্ট করিলাম; বলিলাম, আমার কোন ক্ষতি হয় নাই, তোমাদের যে একটু উপকার করিতে পারিয়াছি, তাহাতেই আনন্দিত হইয়াছি। ভদ্রলোকে যে এ রকম উপকার করে, তাহা তাহাদের বিশ্বাস ছিল না। ভদ্রলোকের ভদ্রতাতেও লোকের অবিশ্বাস, এ কতকটা বিস্ময়ের কথা বটে! আমি বড় ক্লান্ত হইয়াছিলাম, সমস্ত রাত্রি জাগরণ, তাহার উপর এই পথশ্রম, বিশ্রামের জন্য একটা বিছানা চাহিলাম; তাহারা তাড়াতাড়ি আমার জন্য একটা শয্যা রচনা করিয়া দিল, তাহার পর, বিনা বাক্যব্যয়ে আমার শয়ন ও নিদ্রা।

জাগিয়া দেখি, রোদে সমস্ত আঙ্গিনা ভরিয়া গিয়াছে, বেলা তখন প্রায় দশটা। আমি যেখানে শুইয়াছিলাম, সেখানে আর কেহ ছিল না, কিন্তু এত বেলা পর্য্যন্ত এই অপরিচিত স্থানে নিদ্রা যাওয়াতে কিছু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম; উঠিয়া সসঙ্কোচে বাহিরে আসিয়া দেখি, বারান্দায় সকলে বসিয়া আছে। আমাকে দেখিয়া পরিবারস্থ সকলে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি আর বিলম্ব না করিয়া স্নান করিয়া আসিলাম। স্নান শেষ হইলে দেখিলাম, যুবতীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অসিয়া পঁহুছিয়াছে। বেচারা ষ্টেশনে আসিয়া সকল কথা শুনিয়াছিল, কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ সে আমার পোর্টম্যাণ্টোটাও বহিয়া আনিয়াছে।

সে দিন তাহারা আমাকে কিছুতে ছাড়িয়া দিল না। তাহাদের মধ্যে অন্ততঃ আর এক দিনও বাস করিবার জন্য আমার হাত পা ধরিয়া অনুরোধ করিতে লাগিল, তাহাদের বিনয়পূর্ণ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে আমার কিছুতেই প্রবৃত্তি হইল-না। দেখিলাম, তাহারা গরীব বটে, কিন্তু হৃদয়হীন নহে। তাহাদের সংসারে অনেক অভাব থাকিলেও সেখানে শান্তির অপ্রতুল ছিল না; আমার শান্তিহীন হৃদয় এই সন্তোষ ও শান্তিপূর্ণ পরিবারের মধ্যে আসিয়া যেন অনেকটা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। বৃদ্ধের পাঁচটি ছেলে, আর এই যুবতীই একমাত্র

কন্যা। ছেলেগুলি সকলেই পিতার আজ্ঞাবহ, তিনটি ছেলের বিবাহ হইয়াছে; বৃদ্ধা গৃহিণী আছেন। বড় ছেলের সন্তানাদি কিছু হয় নাই, দ্বিতীয় পুত্রের দুইটি সন্তান। মোটের উপর বেশ সুখের সংসার।

আহারাদির পর তাহাদের সঙ্গে একত্র বসিয়া তাহাদের সুখ দুঃখের গল্প শুনিতে লাগিলাম। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমি ইহাদের নিতান্ত আপনার হইয়া পড়িলাম। মেয়েরা সকলে আমার সম্মুখে আসিতে কোনও আপত্তি করিল না। এখানে মায়ের স্নেহ, ভায়ের সম্মান, ভগ্নীর আদর, কিছুরই অভাব দেখিলাম না। এক এক বার মনে হইল, এই নিরক্ষর চাষার পরিবারেই দিন কত কাটাইয়া যাই; কিন্তু থাকা হইল না, সেই রাত্রেই আমি তাহাদের গৃহ ত্যাগ করিলাম; মেয়ে ও বধূরা আমার সঙ্গে অনেক দূর পর্য্যন্ত আসিল, তখনও আর দুদিন থাকিবার জন্য অনুরোধ! গৃহস্বামীর দুই পুত্র আমার সঙ্গে ষ্টেশন পর্য্যন্ত আসিল।

শীঘ্রই লৌহরথ ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে প্লাটফরমের উপর আসিয়া থামিল। গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া আমার নবপরিচিত বন্ধুগণের কথা ভাবিতে লাগিলাম।

শ্রীজলধর সেন।

অপরাধনিদান।

শেষ।

অপরাধীদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। সাময়িক ও স্বাভাবিক। সাময়িক উত্তেজনায় সাধুলোকও সমাজশাসনের বিরুদ্ধ আচরণ করিতে পারে। ধর্ম্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, বা রাজ-বিধি সমাজরক্ষার জন্য নিয়োজিত। যখন কতকগুলি লোক বা পরিবার একত্র প্রতিবেশে বাস করে, তখন তাহাদিগকে আপন স্বেচ্ছাচারিতা বা স্বার্থপরতা, কিয়ৎপরিমাণে খর্ব্ব করিতে হয়। আপন সুখের সীমা অন্যের অসুখের সীমায় সঙ্কুচিত। যাহাতে অন্যের অসুখ হয়, এমন কর্ম্ম করিলে সমাজের শান্তিভঙ্গ হয়। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করিলে যেমন সমাজ রক্ষা হয়, তেমনি আত্মসংযমের শিক্ষা হইলে অপবর্গ লাভ হয়। কিন্তু স্বেচ্ছাচারিতা স্বার্থপ্রবণতা এত বলবতী যে, তাহা-

দিগের সংযমন হেতু প্রত্যেকের সদসৎবিচারশক্তির উপর নির্ভর করিলে কার্য্য-সিদ্ধি হয় না। বিচারশক্তি সকলের সমান নহে; বিশেষতঃ রিপুর উত্তেজনায় সে শক্তি কখনও কখনও এত আবিল হইয়া যায় যে, কর্ত্তব্যতার আদর্শ অনেক সময় প্রতিভাত হয় না। এ জন্য নরকভয়, রাজদণ্ড, লোকনিন্দা প্রভৃতির দ্বারা মনুষ্যকে কর্ত্তব্যপথে সংযত রাখিতে হয়।

এত বিধানসত্ত্বেও সাময়িক উত্তেজনায় মনুষ্য কর্ত্তব্যপথ হইতে স্খলিত হয়। নিজের বিরুদ্ধে অপরাধ শাসন করিবার ভার লইলে, স্বার্থপরতা ও ভাবপ্রবণতায় মনুষ্য সুবিচার করিতে অক্ষম হইতে পারে। এ জন্য বিচারভার নিরপেক্ষ ব্যক্তির প্রতি অর্পিত হয়। সুতরাং, সাময়িক উত্তেজনায় কর্ত্তব্য পালন করিতে গিয়াও সাধু ব্যক্তি সমাজের আদেশ উল্লঙ্ঘন করিতে পারে। সাধুদিগের যখন এত প্রলোভন, দুর্ব্বলচিত্ত লোকের পদস্খলন হইবার কতই সম্ভাবনা। সামাজিক প্রবৃত্তির অতি প্রাবল্য এবং ক্ষীণ প্রভাব, উভয়ই সাময়িক অপরাধের কারণ।

অনাহারে মুমূর্ষু পুত্রের প্রাণরক্ষা করিতে মাতা যখন আহার্য্য চুরি করে, তখন সে মাতাকে অপরাধিনী জানিয়াও লোকে হতভাগিনীর জন্য নিশ্বাস ফেলে। অবস্থার কঠোরতায় দুর্ব্বলচিত্ত লোক অপরাধ করে। প্রথম প্রবন্ধে ইহাদের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহারা অপরাধী, দণ্ডনীয়। কিন্তু ইহারা হিতাহিতজ্ঞানশূন্য নহে। মলিন ক্ষীণপ্রভ হইলেও, ইহাদের হৃদয়ের এক পার্শ্বে বিবেকশক্তি নিহিত আছে। পতিত হইলেও ইহারা মনুষ্যজাতীয়, ইহারা তোমার নিশ্বাসের পাত্র। ইহাদের দণ্ড কোমলতা অপেক্ষা করে।

যাহাদিগকে আমরা স্বাভাবিক অপরাধী বলিয়া উল্লেখ করিলাম, তাহারা একেবারে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য, নররাক্ষস। তাহাদের আকার মনুষ্যের মত হইলেও, তাহারা মনুষ্য নহে। অথবা তাহাদিগকে আদিম বর্ব্বরজাতীয় মনুষ্য বলা যাইতে পারে। মানব প্রকৃতির ক্রমবিকাশে তাহারা জন্মগ্রহণ করিলেও, কোনও কারণে তাহাদের মানসিক বৃত্তির বিকাশ বন্ধ হওয়াতে, তাহারা জাতিতে বর্ব্বরশ্রেণীয়। ইহাদের মতি গতি পশুর সমান। শৃঙ্গীকে তুমি যেমন বিশ্বাস করিতে পার না, কখন সে কি কারণে তোমাকে আক্রমণ করিবে, কোনও হিসাবে তুমি তাহা আয়ত্ত করিতে পার না, তেমনি এই শ্রেণীর মনুষ্যের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিলে সে তোমার আয়ত্ত থাকিবে, তুমি বলিতে পার না। সত্য, ইহাদেরও সাময়িক উত্তেজনার আবশ্যক করে। কিন্তু সে উত্তেজনা কি

প্রকারের হইতে পারে, ইহা অনুমান করিবার তোমার সাধ্য নাই। যে সকল কারণ দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তিকে উত্তেজিত করিতে পারে, তুমি হিসাব করিতে পার; কিন্তু এই হীনবিবেকদিগের সম্বন্ধে সে হিসাব দূরে থাকুক, অনুমান করিবারও তোমার সামর্থ্য নাই। দুর্ব্বলবিবেকদিগের উত্তেজনার কারণ তুমি অনুমান করিতে পার; সুতরাং তাহাদিগের শাসন করিবার উপায় ও ভাল করিবার পথও তুমি আবিষ্কার করিতে পার। কিন্তু হীনবিবেকদিগকে ভাল করিবার, নিবারণ করিবার, বা শাসন করিবার উপায় নাই। শিক্ষা বা শাসনে তাহাদের মঙ্গল হয় না। হত্যা করিয়া তাহাদিগকে পৃথিবী হইতে নির্ব্বাসিত করাই একমাত্র উপায়। ইহাদিগের অপরাধের তারতম্যানুসারে দণ্ডের তারতম্য করিয়া লাভ নাই। দণ্ড ভবিষ্যৎ অপরাধনিবারণের উপায়। কিন্তু না সে দণ্ডে নিরস্ত হইবে, না অন্য হীনবিবেক তাহার দণ্ডে ভীত হইবে। হীনবিবেক অন্যের আদর্শে অপরাধী হয় না; অন্যের আদর্শ দণ্ড দেখিয়া নিরস্ত হয় না। কিন্তু বানরকেও নরাকার দেখিয়া ব্যাধ হত্যা করিতে কাতর হয়। এই নররাক্ষসদিগকে হত্যা না করিয়া দ্বীপান্তরে চিরবন্দী করিয়া রাখাই শ্রেয়ঃ। অপরাধের তারতম্যে এখন দ্বীপান্তরবিধানের ব্যবস্থা হইয়াছে। এটি ভুল, অপরাধীর প্রকৃতি-অনুসারে দণ্ডবিধান হওয়া আবশ্যক। কিন্তু অপরাধনিদান ভালরূপ জানা না থাকিলে, বিচারপতির পক্ষে অপরাধীর প্রকৃতি স্থির করা কঠিন। অপরাধনিদান এখনও সম্পূর্ণ আবিষ্কৃত হয় নাই। এ জন্য যেরূপ দণ্ড দিলে উপস্থিত ক্ষেত্রে সুবিচার হইতে পারে, দণ্ডবিধানে তাহাই বিধিবদ্ধ হইয়াছে। দণ্ডবিধান শাস্ত্র অভিজ্ঞতার সহিত যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এখন অপরাধের প্রকৃতি-অনুসারে দণ্ড দিতে হয়। ভবিষ্যতে অপরাধীর প্রকৃতি-অনুসারে দণ্ড দিতে হইবে।

এ প্রবন্ধে হীনবিবেক অপরাধীর প্রকৃতি—দৈহিক ও মানসিক প্রকৃতি—আমি আলোচনা করিব। যে কয়টি কথা লিখিব, সেগুলি কিয়ৎপরিমাণে আমার অভিজ্ঞতার অনুমোদিত হইলেও, একটিও আমার নিজের কথা নহে। অপরাধনিদানবিৎ মনীষিগণ, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, বাঙ্গালী পাঠকের সুবিধার জন্য আমি কেবল তাহার সংগ্রহ মাত্র করিলাম।

প্রথম, বিবেকহীনতার উৎপত্তি কোথায়, দেখিতে হইবে। সাধারণতঃ দেখা যায়, বিবেকহীন অপরাধীরা শারীরিক বা মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত। উন্মত্ত-

তার প্রকৃতি নানা প্রকার। মডেস্‌লি বিবেকহীন অপরাধীদিগের সকলকেই কোন-না-কোন প্রকারের উন্মত্ততাপরিচালিত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও, বিবেকহীন অপরাধীদিগের অনেকের মধ্যে যে উন্মত্ততা, অপস্মার ও অন্যান্য যে সকল ব্যাধি রক্তের সহিত পিতৃপিতামহের নিকট হইতে উত্তরাধিকার করে, সে সকল ব্যাধি দেখিতে পাওয়া যায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মদ্যপায়ীর সন্তান অনেকে এই সকল রোগগ্রস্ত। ডাক্তার মারো বলেন, অধিক বয়সে যে সকল সন্তান হয়, তাহাদের অনেকে এইরূপ হীনতাগ্রস্ত। মারো বিবেকহীন অপরাধীদিগের মধ্যে শতকরা ৪১ জন মদ্যপায়ীর সন্তান পাইয়াছেন। সুতরাং মানসিক বা শারীরিক অবনতি নৈতিক অবনতির কারণ, সাধারণভাবে ইহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

বর্ব্বর ও বিবেকহীনদিগের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতির সাদৃশ্য বিস্ময়জনক। সাধারণ লোকের বিশ্বাস, নাটা, মাকুন্দে, কাণা, খোঁড়া ও কদাকার সচ্চরিত্র নহে। এ বিশ্বাস দেশবিশেষে বা জাতিবিশেষে আবদ্ধ নহে। য়ুরোপ, আমেরিকা, আসিয়া, সর্ব্বত্র এই বিশ্বাসের নিদর্শন পাওয়া যায়। সে যাহা হউক, বর্ব্বরেরা যেমন অনতিদীর্ঘ, বিরলশ্মশ্রু ও কদাকার, বিবেকহীনদিগের অনেকেই সেইরূপ। কেহ কেহ বলেন, বিরলশ্মশ্রু চোরের লক্ষণ। দেহে কেশবহুলতা কামাতুরের লক্ষণ। সুডোল মস্তক বিবেকহীনদিগের মধ্যে অতি বিরল। কিন্তু অনেকেরই চিবুক অতিব্যাবৃত। বর্ব্বরদিগের শতকরা ৮১ জনের (আক্কেল দাঁত) জ্ঞানদন্ত দেখা যায়। উন্মত্ত জাতির শতকরা ৪২ জনের দেখা যায় না। জড়, মূক ও অপরাধী এ সম্বন্ধে বর্ব্বরদিগের সমতুল্য; কিন্তু এ সকল লক্ষণে সাধারণের আস্থা হইবার নহে।

বর্ব্বরেরা বড় আলস্যপ্রিয়। তাহারা মাঝে মাঝে কাজ করে, অধিকাংশ সময় আলস্যে অতিবাহিত করে। কাজ করিবার সময় খুব স্ফূর্ত্তি ও তৎপরতা দেখায়, কিন্তু খড়ের আগুণের মত শীঘ্রই তাহা নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। এ জন্য তাহাদের স্বাভাবিক কার্য্যতৎপরতা সাময়িক। অপরাধীদিগের প্রকৃতি ঠিক এইরূপ। আলস্যপ্রিয়তা তাহাদের এত স্বাভাবিক যে, তাহাদিগকে ভাল করিবার জন্য নিয়মিত কর্ম্ম করিতে তাহাদিগকে সকল কারাগারেই শিখাইবার চেষ্টা করা হয়।

দৌড়িতে, লাফাইতে ও যে সকল কার্য্যে মাংসপেশীর বিকাশ আবশ্যক, অপরাধীরা সে সকল কার্য্যে বানর ও বর্ব্বরদিগের সমতুল্য। সভ্য লোকদের

মধ্যে শতকরা কেবল ছয় জন, দুই হাত বা বাম হাত ব্যবহার করিতে পারে। বর্ব্বরদিগের দুই হাত ব্যবহার করিবার শক্তি প্রসিদ্ধ। কিন্তু অপরাধীদিগের মধ্যে এই ক্ষমতা শতকরা ২১ জনে দেখা যায়।

বর্ব্বরের সহিষ্ণুতা অসামান্য। বিলাতি জুতা পায়ে ছোট হইলে, নেগ্রোরী-দিগকে পায়ের দুই একটা আঙ্গুল কাটিয়া ফেলিয়া জুতা পায়ে দিতে দেখা গিয়াছে। অপরাধীরাও সাধ করিয়া আপন দেহ দগ্ধ, বিকলাঙ্গ বা কদাকার, করিয়া থাকে। উপবাস বা প্রহারের যাতনা, অপরাধী ও বর্ব্বরের নিকট সমরূপ হীনতীব্র। সূচ ফুটাইয়া, তাড়িৎ চালাইয়া দেখা গিয়াছে, স্বাভাবিক মনুষ্য অপেক্ষা অনেক অধিকপরিমাণে তাড়িৎ না হইলে তাহাদের কষ্ট বোধ হয় না। পিঠের ফোঁড়া কাটিতে অর্দ্ধেক পিঠ কাটিয়া ফেলিতে, তাহাদের ক্লোরোফারম দিয়া আরোগ্য করিতে হয় না। যখন মূর্চ্ছার ভাণ করিয়া শুইয়া থাকে, তখন নাকে এমোনিয়া দিয়া, গা পোড়াইয়া বা চিরিয়া ফেলিলেও, তাহারা সজ্ঞানতার পরিচয় দেয় না। পক্ষান্তরে, পশু, পক্ষী ও বর্ব্বরের ন্যায়, সামান্য চিকিৎসায় অতি অল্প সময়ে বিষম ক্ষত হইতে আরোগ্য লাভ করে।

বর্ব্বরের দৃষ্টিশক্তি অতি প্রখর। এ সম্বন্ধে মানবপ্রকৃতি নামক গ্রন্থে অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। যেখানে তুমি, আমি সহজ চক্ষে কিছুই দেখিতে পাই না, এমন তৃণাবৃত শ্যামল ক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া বর্ব্বরেরা বলিয়া দিতে পারে, কোন্ জাতীয় কত জন লোক সেই পথে চলিয়া গিয়াছে। অপরাধী-দিগের দৃষ্টিশক্তি সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা অনেকগুণ অধিক। কিন্তু তাহাদের শ্রবণশক্তি হীনতর। মত্ততার সহিত শ্রবণব্যাধির সম্পর্কের কথা যাঁহারা জ্ঞাত আছেন, বিবেকহীনের শ্রবণশক্তির হীনতায় তাঁহারা আশ্চর্য্য হইবেন না। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিকাশ যে সভ্যতার লক্ষণ, অন্যান্য ইন্দ্রিয় অপেক্ষা যে বিলম্বে ব্যাবৃত হয়, পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থে ইহা বিশেষরূপে দেখান গিয়াছে।

কাঁচা পচা কিছুতেই বর্ব্বরের অরুচি নাই। মদভ্রমে কেরোসিন পান, চর্ব্বির লোভে দু চারি ডজন বাতি ভক্ষণ, বর্ব্বরের পক্ষে সামান্য। অটোলঙ্গী পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, অপরাধীদিগের অধিকাংশ নুণ ও কুচিলার স্বাদের বিভিন্নতা অনুভব করিতে পারে না। তাহারা নির্লজ্জতায় বর্ব্বর ও বিবেকহীনের সমতুল্য।

আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই। বিবেকহীন অপরাধী যে হীনতর মনুষ্য, তাহার শারীরিক ও মানসিক ব্যাবৃতি যে জন্মদোষে প্রতিহত হইয়াছে,

সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। সাময়িক অপরাধী সাধারণ মানুষের মত, কিন্তু ইহারা নররূপে রাক্ষস। শিক্ষায় বা শাসনে ইহাদের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। সাপ ও ব্যাঘ্রের মত ইহাদিগকে নির্ব্বংশ করাই শ্রেয়ঃ। নতুবা দ্বীপান্তরে বা গিরিগহ্বরে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

বাদপ্রতিবাদ।

কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকরনন্দীর মহাভারত।

শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে যুগান্তর উপস্থিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাঁহার প্রণীত "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস" মুদ্রিত হইলে বাঙ্গালা-ভাষার একটি অমূল্য রত্ন স্বরূপ গণ্য হইবে। ত্রিপুরা, নওয়াখালী, ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলা সমূহের অন্তর্গত বিবিধ স্থান হইতে তিনি হস্তলিখিত অনেকগুলি প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। তন্মধ্যে কয়েকখানি গ্রন্থ পশ্চিম বঙ্গ হইতে আগত, অবশিষ্ট গুলি খাঁটি পূর্ব্ব-বঙ্গের রচনা। কবীন্দ্র পরমেশ্বরের কৃত মহাভারত একখানি প্রকাণ্ড প্রাচীন গ্রন্থ। চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা পরাগল খাঁর অনুমত্যনুসারে, কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়াছিলেন। এ জন্য পরমেশ্বরের মহাভারত "পরাগলী মহাভারত" আখ্যা দ্বারা পরিচিত।

পরাগলী মহাভারত সম্বন্ধে দীনেশ বাবু শ্রাবণের সাহিত্যে একটি ক্ষুদ্র কিন্তু উপাদেয় প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে, দীনেশ বাবু ইহার স্থূল মর্ম্ম আমাকে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তৎকালে আমার এরূপ সংস্কার হইয়াছিল যে, উক্ত প্রবন্ধে ঐতিহাসিক ভ্রম রহিয়াছে। সম্প্রতি সাহিত্য পত্রে প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া আমার সেই অনুমান সত্য বলিয়া বোধ হইয়াছে। প্রিয়বন্ধু দীনেশ বাবু তাঁহার মূলগ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণকালে সেই ভ্রম সংশোধন করিতে পারিবেন, এই অভিপ্রায়ে এই প্রবন্ধটি লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তৎ-পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে দীনেশ বাবু আমাকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা এ স্থলে প্রকাশ করা সঙ্গত বোধে উদ্ধৃত করিলাম।

"কুমিল্লা।

"২৩ শ্রাবণ ১৩০১ বঙ্গাব্দ।

"প্রিয় কৈলাস বাবু!

"অক্রুর বাবু 'মায়াতিমির চন্দ্রিকা' ও 'হরিভক্তিবিলাস' নামক দুইখানা হস্তলিখিত পুস্তক আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন, গ্রন্থ দুইখানা পূর্ব্ববঙ্গের রচনা ও কবিত্বপূর্ণ। আপনি পুনর্ব্বার এখানে আসিলে দেখিতে পারিবেন।

শ্রাবণের সাহিত্যে 'পরাগলী মহাভারত' শীর্ষক প্রবন্ধ অত্যন্ত ত্রস্ততার সহিত লিখিত হয়, আমার বিশ্বাস ছিল, আমি মূলে নসরত খানকে পরাগলের খুল্লতাত বলিয়াই পড়িয়াছিলাম; এ বিষয়ে আপনি প্রবন্ধ রচনার পর আমাকে ভাল করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক মূল দৃষ্টে দেখিতে পাইলাম, ইহা আমার ভ্রম; মূলে শুধু এই দুইটি কথা আছে,

'শ্রীযুক্তনায়ক সে যে নসরত খান।
রচাইল পঞ্চালী যে গুণের নিদান।'

"বস্তুতঃ পিতার নাম রাস্তি খানের পরেই নসরত খানের নাম দেখিয়া আমার এইরূপ ভুল হইয়াছিল, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি লিখিয়া আমি পুনর্ব্বার সংশোধন করিতে অবকাশ পাই নাই।

"ঐ প্রবন্ধে আর একটা বড় ভুল আছে। ২৫১ পৃষ্ঠায় ফুটনোটে বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছি;—

'ছায়াশূন্য রবিশশী পরিমিত শক,
সনাতন হুসেন সাহ নৃপতিতিলক।'

প্রথম পংক্তির 'রবি' স্থলে মূলে 'বেদ' আছে। প্রকৃত পক্ষে তাহা না হইলে কিছু অর্থই হয় না। এই শ্লোকের 'ছায়' শব্দের অর্থ আপনি কি করেন? *

"পূর্ব্ববঙ্গের কবিদিগকে যথাযোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব কি না, এই ভাবনায় রাত্রে আমার ঘুম হয় না। ইতি "আপনার স্নেহের

দীনেশ।"

"পুঃ—এই ভ্রমসঙ্কুল প্রবন্ধটিতে আর একটি প্রমাদ করিয়াছি, ২৫২ পৃষ্ঠায় 'শ্রীকরনন্দী' স্থলে শ্রীসুরনন্দী হইয়াছে। আপনি আমার ঐতিহাসিক গুরু। এতগুলি পাপের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিবেন।"

নসরত খাঁর সহিত পরাগলের সম্বন্ধপ্রদর্শনের পূর্ব্বে, বাঙ্গালার একটি পরাক্রমশালী রাজবংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করা সঙ্গত বোধ হইতেছে। ইতিহাসে উক্ত রাজকুল "হুসনিবংশ" আখ্যা দ্বারা পরিচিত।

মক্কার জনৈক সেরিফের বংশধর তুর্কীস্থানের অন্তর্গত তিরমিজ নিবাসী সৈয়দ আসরফ হুসনী, ঘটনাবশতঃ বাঙ্গালায় আগমনপূর্ব্বক রাঢ় প্রদেশের অন্তর্গত চাঁদপুরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার দুইটি পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ হুসন, কনিষ্ঠ ইউসোফ। বালকদ্বয় চাঁদপুরের কাজির নিকট বিদ্যাভ্যাস করিয়া সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। কাজি সৈয়দবংশের শ্রেষ্ঠত্ব অবগত হইয়া হুসেনের হস্তে স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করেন। তিনি স্বীয় জামাতাকে লইয়া গৌড়ে গমন করিলেন। তৎকালে সিদ্ধিবদর দেওয়ানা সামসুদ্দিন আবুলনসর মুজাফর সাহ গৌড়ের রাজাসনে বিরাজ করিতেছিলেন। তিনি অল্পকালের মধ্যে সৈয়দ হুসনের গুণগ্রামের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাকে উজিরের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মুজাফর সাহ এক জন রক্তপিপাসু অত্যাচারী নরপতি ছিলেন। তিনি তিন বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া সর্ব্বসাধারণ প্রকৃতিবর্গ এবং সৈন্যসামন্তগণের এরূপ ঘৃণাভাজন হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা সুলতানের রুধিরধারায় আপনাদের প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে সমুদ্যত হইলেন। প্রকৃতিবর্গ অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক গৌড়নগরী অবরোধ করিল। মুজাফর সাহ স্বজাতীয় (হাবসী) পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী এবং পঞ্চবিংশতি সহস্র আফগান পদাতির সাহায্যে, চারি মাস কাল আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অবশেষে তিনি তাঁহার সৈন্যগণকে প্রকৃতিবর্গ অপেক্ষা সমধিক বলশালী বিবেচনায়, স্বয়ং নগর হইতে বহির্গত হইয়া প্রকৃতিবর্গকে আক্রমণ করিলেন। ২৬০০০ অনুচরের সহিত মুজাফর সাহ সংগ্রামক্ষেত্রে শয়ন করিয়াছিলেন।

সর্ব্বসাধারণের সম্মতিক্রমে উজীর সৈয়দ হুসন, ৮৯৯ হিং সালে আলাউদ্দিন আবুলমুজাফর হুসন সাহ আখ্যা ধারণ পূর্ব্বক গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ক্ষোদিত লিপি ও মুদ্রার সাহায্যে প্রফেসার ব্লকমান সাহেব হুসনীবংশের নিম্নলিখিতরূপ বংশাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন।

---

* ছায়া অর্থ আমার বিবেচনায় শূন্য।—শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

১। সুলতান আলাউদ্দিন হুসন সাহ
(সৈয়দ আসরফ উল হুসনির পুত্র)

কুমার দানায়ল — ২। সুলতান নাসরুদ্দিন নসরত সাহ — ৪। সুলতান গিয়াস্উদ্দীন মহম্মদ সাহ

৩। সুলতান আলাউদ্দিন ফিরোজ সাহ (নাসরুদ্দিন নসরত সাহের পুত্র)

হুসন সাহ ৮৯৯ হিজরী সালে (১৪১৫—১৬ শকাব্দে) গৌড়ের রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রবল বিক্রমে ৩১ বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া, ৯২৯ হিজরী সালে লোকান্তরিত হন। তিনি এরূপ পরাক্রমশালী নরপতি ছিলেন যে, তাঁহার শাসনপ্রভাবে বাঙ্গালায় দীর্ঘকালব্যাপিনী আভ্যন্তরীণ শান্তি বিরাজ করিতেছিল। বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ রাজবিপ্লবকারী "পাইক" সৈন্যগণকে পদচ্যুত করিয়া তিনি আত্মরক্ষার জন্য "সেরুং" সৈন্যদল গঠন করিয়াছিলেন। বিশ্বাসঘাতক রাজদ্রোহী হাবসিদিগকে দূরীভূত করিয়া, তিনি বাঙ্গালায় শান্তিস্থাপন করিয়াছিলেন। স্বয়ং সদ্বংশজ ছিলেন বলিয়া, তিনি সদ্বংশজ ব্যক্তিবর্গকেই রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। কি হিন্দু, কি মুসলমান, সদ্বংশজাত বিজ্ঞ ব্যক্তিগণকেই তিনি যথাযোগ্য সম্মান দ্বারা স্বীয় রাজদণ্ডের স্থায়িত্ব বিধান করিয়াছিলেন। ফলতঃ, তাঁহার শাসনকালে বাঙ্গালি নবজীবন লাভ করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল। তাঁহার শাসনকালে বাঙ্গালায় ধর্ম্ম ও সমাজবিপ্লবের সূত্রপাত হইয়া বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হইয়াছিল। মধ্যবর্ত্তী সময়ের বাঙ্গালির যাহা কিছু গৌরবের বিষয় আছে, তৎসমস্তই হুসনীবংশের আভ্যন্তরীণ শান্তিময় শাসনের সুফল। সেই সকল কথা বিশেষভাবে প্রদর্শন করিবার ভার, আমরা দীনেশ বাবুর হস্তে সমর্পণ করিলাম। সুযোগ্য সুলতান হুসন সাহ দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার অভিপ্রায়েই, তাঁহার পরাক্রমশালী সৈন্যগণকে পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যসমূহের রক্ষায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

হুসন সাহ কমতা রাজ্য বিনষ্ট করিয়া ও কামরূপে বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়া, "কামরূপ ও কমতা বিজয়ী" উপাধি ধারণ করেন। তদনন্তর ত্রিপুরার পালা উপস্থিত হয়। ত্রিপুরা ধ্বংস ও চট্টগ্রাম অধিকার করিবার জন্য, হুসন সাহ বারংবার স্বীয় শক্তি প্রয়োগ করিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু ত্রিপুরবংশাবতংশ মহারাজ ধন্যমাণিক্য ও তাঁহার বিখ্যাত সেনাপতি রায় চয়চাগের বাহুবলে হুসন সাহার অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই। সেই সকল বিবরণ "রাজমালা" গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। * হুসন সাহের মৃত্যুর পর তাঁহার উপযুক্ত পুত্র সুলতান নসরুদ্দিন নসরত সাহ স্বর্গগত পিতার পরিতোষসাধনের জন্য চট্টগ্রাম আক্রমণ করেন। এই ঘটনার পূর্ব্বে মহারাজ ধন্যমাণিক্য ও তাঁহার সেনাপতি মহাবীর চয়চাগ লোকান্তরিত হইয়াছিলেন। সুতরাং নসরত পিতার প্রেতাত্মার পরিতোষসাধন করিতে সক্ষম হন। চট্টগ্রামে মুসলমানের বিজয়পতাকা উড্ডীন হয়।

ফেনী নদীর নিকটবর্ত্তী স্থানে পরাগল খাঁ নামক জনৈক মুসলমান বাস করিতেন। তিনি এবং তদীয় পুত্র ছুটি খাঁ, চট্টগ্রামে মুসলমান-পতাকা উড্ডীন করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সাহায্যে নসরত সাহ চট্টগ্রাম অধিকার করিয়া পরাগল খাঁকে নববিজিত প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃত্বে নিয়োগ করেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকরনন্দী

---

* এই গ্রন্থ যন্ত্রস্থ; শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

বাধ্য হইয়া উক্ত শাসনকর্ত্তার সভায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ জন্য কবীন্দ্র পরমেশ্বর বারংবার স্বীয় গ্রন্থে হুসন সাহার পুত্র নসরত সাহ, এবং পরাগল খাঁ ও তৎপুত্র ছুটিখাঁর নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

ছুটি খাঁর সুভাসদ শ্রীকরনন্দীকৃত মহাভারতের কেবলমাত্র অশ্বমেধ পর্ব্ব পাওয়া গিয়াছে। দীনেশ বাবু গত অগ্রহায়ণ মাসের "সাহিত্যে" এই মহাভারত সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তৎপাঠে আমরা কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইয়াছি। কারণ, তিনি ৫২১ পৃষ্ঠায় চারিটি * চিহ্ন দিয়া যে অংশ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা ঐতিহাসিকদিগের নিকট বিশেষ মূল্যবান। এই গ্রন্থের যদি কিছু ঐতিহাসিক মূল্য থাকে, তবে তাহা সেই পরিত্যক্ত অংশেই রহিয়াছে। দীনেশ বাবু সর্ব্বদাই আমাদের নিকট প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্ব জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করেন। আমরাও বন্ধুভাবে তাঁহাকে সর্ব্বদা উপদেশ প্রদান করিয়া থাকি। এ জন্যই অদ্য এই সকল কথা লিখিতে বাধ্য হইয়াছি। ভরসা করি, দীনেশ বাবু বন্ধুভাবে আমাদের উপদেশ গ্রহণ করিবেন। ব্যক্তিবিশেষের প্রীতি কিম্বা অপ্রীতির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া তিনি নির্ভীক চিত্তে ঐতিহাসিক সত্য প্রচার করিবেন।

সাহিত্যের ৫২০ এবং ৫২১ পৃষ্ঠায় দীনেশ বাবু শ্রীকরনন্দীর মহাভারতের যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার স্থানে স্থানে নিতান্ত গণ্ডগোল বাঁধিয়াছে। এ জন্য আমরা সেই সকল ও দীনেশ বাবুর পরিত্যক্ত অংশ, এ স্থলে ধারাবাহিকরূপে উদ্ধৃত করিব। আমরা যে হস্তলিখিত পুঁথি হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিলাম, তাহা ১৫৭৬ শকাব্দের লিখিত। সুতরাং ইহার বয়ক্রম ২৩০ বৎসর হইতেছে।

নসরত সাহা তাত অতি মহারাজা।
রামবৎ নিত্য পালে সব প্রজা॥
নৃপতি হুসন সাহ হয় ক্ষিতিপতি।
সাম দান দণ্ডভেদে পালে বসুমতী॥
তান এক সেনাপতি লস্কর ছুটি খান।
ত্রিপুরার উপরে করিল সন্নিধান॥
চাটিগ্রাম নগরের নিকট উত্তরে।
চন্দ্রশেখর পর্ব্বত কন্দরে॥
চারলোল গিরি তার পৈতৃক বসতি।
বিধি এ নির্ম্মিল তাকে কি কহিব অতি॥
চারি বর্ণ বসে লোক সেনা সন্নিহিত।
নানা গুণে প্রজা সব বসয়ে তথাত।
ফণী নামে নদী এ বেষ্টিত চারিধার।
পূর্ব্বদিগে মহাগিরি পার নাহি তার॥
লস্কর পরাগল খানের তনয়।
সমরে নির্ভয় ছুটি খান মহাশয়॥
আজানুলম্বিত বাহু কমল লোচন।
বিলসে হৃদয়ে মত্ত গজেন্দ্র গমন॥
চতুঃষষ্টি কলা বসতি গুণের নিধি।
পৃথিবী বিখ্যাত সে যে নির্ম্মাইল বিধি॥
দাতা বলি, কর্ণ সম অপার মহিমা।
শৌর্য্যে বীর্য্যে গাম্ভীর্য্যে নাহিক উপমা॥
কপট নাহিক যে তার প্রসন্ন হৃদয়।
রামসম পিতৃভক্ত খান মহাশয়॥
তাহার যত গুণ শুনিয়া নরপতি।
সম্বাদিয়া আনিলেক কুতূহলমতি॥
নৃপতি অগ্রেতে তার বহুল সম্মান।
ঘোটক প্রসাদ পাইল ছুটি খান॥
লস্করি বিষয় পাইয়া মহামতি।
সাম দণ্ড ভেদে পালে বসুমতী॥
* ত্রিপুর নৃপতি যার ডরে এড়ে দেশ।
* পর্ব্বতগহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ॥
* গজবাজি কর দিয়া করিল সম্মান।
* মহাবন মধ্যে তার পুরীর নির্ম্মাণ॥
* অদ্যাপি ভয় না দিল মহামতি।
* তথাপি আতঙ্কে বৈসে ত্রিপুরনৃপতি॥
* আপন নৃপতি সন্তর্পিয়া বিশেষে।
* সুখে বসে লস্কর আপনার দেশে॥
* দিনে দিনে বাড়ে তার রাজসম্মান।
* যাবত পৃথিবী থাকে সন্ততী তাহান॥
পণ্ডিতে পণ্ডিত সভা খণ্ড মহামতি।
একদিন বসিলেক বান্ধব সংহতি॥

শুনহ ভারত ভবে অতি পুণ্য কথা।
মহামুনি জৈমিনি কহিল সংহিতা॥
অশ্বমেধ কথা শুনি প্রসন্ন হৃদয়।
সভাখণ্ডে আদেশিল খানমহাশয়॥
দেশ ভাষায় এহি কথা রচিল পয়ার।
সঞ্চারৌক কীর্তি মোর জগত সংসার॥
তাহান আদেশ মাল্য মস্তকে ধরিয়া।
শ্রীকরনন্দী কহিলেক পয়ার রচিয়া॥

ষ্টার (*) চিহ্নসংযুক্ত পদগুলি দীনেশ বাবু গোপন করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল পদ গোপন করিবার কোনও ন্যায়সঙ্গত কারণ আমরা দেখিতে পাইলাম না। কারণ, নন্দী কবি যে তাঁহার আশ্রয়দাতা ছুটি খাঁর গুণ কিছু অতিরিক্তমাত্রায় বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা আমরা রাজমালা গ্রন্থে প্রদর্শিত করিয়াছি। নসরত সাহা কর্তৃক ত্রিপুর সৈন্য জয় ও চট্টগ্রাম অধিকার, ইহাই ঐতিহাসিক সত্য। ছুটি খাঁর ভয়ে তদানীন্তন ত্রিপুরেশ্বর অরণ্যমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া "গজ বাজি কর" প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার পাদপূজা করিয়াছিলেন, এই সকল বর্ণনা, তোষামোদকারী কবির প্রলাপবাক্য; আমরা ইহা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অক্ষম।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

মীরকাশেম।

শেষ।

মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান বিভাগে তখন কোম্পানীর ছাউনি ছিল। মেজর আডাম্‌স্ কৌন্সিলের আদেশক্রমে, এই দুই স্থান হইতে সেনাদল সংগ্রহ করিয়া, মুরশীদাবাদ কেন্দ্রস্থল করিবার মনস্থ করিলেন। মুরশীদাবাদে ইংরাজের এক ফ্যাক্টরি ছিল; ইংরাজসেনা, সেখানে পঁহুছিবার অনেক পূর্ব্বে, মীরকাশেম ফ্যাক্টরি দখল করিয়া লইলেন। এ দিকে তকি খাঁ, সেনাদল লইয়া, চিরপ্রসিদ্ধ পলাশীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, ইংরাজসেনার গন্তব্য পথে বাধা দিবার জন্য সচেষ্ট রহিলেন।

১৬ই জুলাই মেজার আডাম্‌স্ কাটোয়ায় পঁহুছিলেন। পর দিন তিনি ভাগিরথী পার হইয়া, অগ্রদ্বীপে ছাউনি করিলেন। এখানে দুই এক দিন অপেক্ষা করিবার পর, বৃদ্ধ মীরজাফর আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগদান করিলেন। লেফ্‌টেনান্ট গ্লেন নামক আর এক জন ইংরেজসেনানী রসদ ও সরকারী তহবিল লইয়া, আডাম্‌সের সহিত অগ্রদ্বীপে মিলিত হইলেন।

অজয়তীরে ইংরাজ একত্রিত হইতেছে, এই সংবাদ পাইয়া, সুচতুর তকি খাঁ এক দল সেনা প্রেরণ করিলেন। এত দিনের পর প্রকৃত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। গ্লেন সাহেব রসদপত্র, সরকারী তহবিল ও ভারবাহী পশুগুলি লইয়া কাটোয়া পার হইতেছিলেন। ১৭ই প্রাতে মহম্মদ তকির প্রেরিত সেনাগণ তাঁহার পথ

রোধ করিল। সৈয়র মুতাক্ষরীনের মতে, এই সৈন্যসংখ্যা সপ্তদশ সহস্রেরও উপর। ইংরাজ পক্ষে গুটিকতক কামান ছিল, কিন্তু বিপক্ষ পক্ষে সে সুযোগ ছিল না। চারি ঘণ্টাব্যাপী যুদ্ধের পর, কেবল কামানের জোরে ইংরাজ পক্ষ জয়ী হইলেন। গ্রেন যাইবার মুখে কাটোয়া হইতে এই ক্ষুদ্র যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ অনেক রসদ সংগ্রহ করিয়া Adamsএর সহিত সম্মিলিত হইলেন।

মহম্মদ তকি খাঁ সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন; তিনি পলাশীর দিক হইতে অগ্রদ্বীপে আসিলেন, কাটোয়ার অপর দিকে শিবিরসন্নিবেশ করিলেন। মহম্মদ তকি বাছা বাছা আফ্গান ও রোহিল্লা সেনা সঙ্গে আনিয়াছিলেন। প্রথম যুদ্ধে নবাব পক্ষ বিশেষ বলীয়ান্ হইয়া উঠিলেন। তকি দুর্দ্ধর্ষ সাহসে ও মহা কৌশলে লড়িতে লাগিলেন। আডাম্‌স্ সমস্ত আশা ভরসা বিসর্জ্জন দিয়া, কেবল আত্মরক্ষার্থ লড়িতে লাগিলেন। কিন্তু ঘটনাস্রোত নবাবের দুর্ভাগ্যবশে সহসা অন্য দিকে পরিবর্ত্তিত হইল। গ্রেন সাহেবের দল আসিয়া আডাম্‌সের সহিত যোগ দেওয়াতে, মহম্মদ তকি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া কাটোয়া ত্যাগ করিলেন।

কাটোয়ায় শত্রুপক্ষের পরিত্যক্ত রসদ ও কামানগুলি দখল করিয়া আডাম্‌স্ আরও বলীয়ান হইলেন। তিন দিন সেখানে অপেক্ষা করিয়া, তিনি, ক্লাইব কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যে পথে মুরশীদাবাদ যাত্রা করিয়াছিলেন, সেই পথ ধরিয়া মুরশীদাবাদে চলিলেন।

মুরশীদাবাদ সহরের দক্ষিণে তকি খাঁ আবার সেনাদল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সম্মুখে মতিঝিল, পশ্চাতে তকি খাঁর পরাজিতাবশেষ নিরুৎসাহ সৈন্যবৃন্দ—এবারও নবাবপক্ষ হারিলেন। নবাবের ভগ্নপ্রায় সেনাদল ধীরে ধীরে সুতীতে উপস্থিত হইয়া নূতন যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিল। এ দিকে আডাম্‌স্ মহা সম্মানে রাজোচিত মর্য্যাদার সহিত মীরজাফরকে লইয়া সহরে প্রবেশ করিলেন।

মুরশীদাবাদ হইতে সুতীর দূরত্ব ১৮ ক্রোশ। প্রাকৃতিক নিয়মে এই স্থানটি মীরকাশেমের সৈন্যসমাবেশের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক বলিয়া বোধ হইল। পূর্ব্ব হইতেই এইখানে গড়খাই প্রস্তুত হইয়াছিল। এক্ষণে মীরকাশেম তাঁহার ইউরোপীয় ধরণে শিক্ষিত সেনাদল লইয়া, এই স্থানে নিবেশিত করিলেন। গুরগণ খাঁ, মার্কার, আসাদ উল্লা প্রভৃতি নামজাদা সেনাপতিগণ স্ব স্ব কর্ত্তৃত্বাধীনে বিশ হাজার পদাতিক ও আট হাজার অশ্বারোহী লইয়া, এই স্থানে

অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বলিতে পারা যায় না, কোন অব্যক্ত কারণে মীরকাশেম স্বয়ং এই যুদ্ধসেনা পরিচালন না করিয়া, মুঙ্গেরে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

সহস্রাধিক ইংরাজ সৈন্য ও চারি সহস্র দেশীয় পদাতিক লইয়া, ২রা আগষ্ট তারিখে, ভাগিরথী ও অজয়ের সঙ্গমস্থলে, বাঁশলী নামক স্থানে ইংরাজ সেনানায়ক নবাবের সেনার সম্মুখীন হইলেন। এই স্থানকে গড়িয়ার মাঠ বলিত। এইখানে যে মহা যুদ্ধ হইল, তাহাতে জয়লক্ষ্মী ইংরাজপক্ষকেই আলিঙ্গন করিলেন। কিন্তু মীরকাশেমের সৈন্যদল যেরূপ অসমসাহসিক বীরত্ব ও অদম্য তেজের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাতে কেন যে তাহাদের পরাজয় হইল, তাহা সম্পূর্ণ সন্দেহস্থল। ইংরাজলেখকেরাও নবাবসৈন্যদলের অদ্ভুত বীরত্বকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অনেকের মত, সমরু ও গুরগণ খাঁর স্বার্থপ্রণোদিত প্রবৃত্তির বশে, মীরকাশেম আলি এবার জয়ী হইয়াও পরাজিত হইলেন।

নবাবপক্ষ পরাজিত হইয়া গড়িয়ার মাঠ ত্যাগ করিল, কিন্তু বিশৃঙ্খলভাবে নহে। সমস্ত সৈন্যদল গিয়া উদয়নালায় আশ্রয় লইল। গড়িয়ার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নবাব অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই জানিতেন, গড়িয়ায় তিনিই জয়ী হইবেন। কিন্তু পরাজয় হইলেও, মীরকাশেম ভগ্নমনোরথ হইলেন না। তিনি শেষ বার ভাগ্যপরীক্ষার্থ প্রস্তুত হইলেন।

উদয়নালা রাজমহলে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ে ইহার চারি দিক বেষ্টিত। একটি ক্ষুদ্র নদী—যাহার নাম হইতে "উদয়নালা" নাম হইয়াছে,—সেই সময় বর্ষার প্রবল স্রোতে সম্পূর্ণ স্ফীত। উদয়নালা সকল দিকেই তাঁহার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক স্থান বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তিনি পরিবারবর্গকে রোটাস গড়ে পাঠাইলেন, নিজে মুঙ্গেরে থাকিয়া উদয়নালার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল, হয় এই বারের যুদ্ধের পর তিনি বাঙ্গালার সিংহাসন ছাড়িয়া দিবেন, না হয়, ক্লাইবের পলাশীযুদ্ধের ফল বিফলীকৃত হইয়া যাইবে।

মুঙ্গের হইতে সেনাদল আসিয়া, উদয়নালায় সজ্জিত ও শ্রেণীবদ্ধ হইতে লাগিল। গড়িয়ার ফেরত সৈন্য এই সঙ্গে যোগ দিল। উদয়নালা হইতে দুই ক্রোশ দূরে পালকীপুর গ্রাম; আডাম্‌স্‌ আসিয়া এইখানে ইংরাজের ছাউনি গাড়িলেন।

এবারে একেবারে আক্রমণ করিতে আডাম্‌স্ সাহেবের সাহস হইল না। তিনি সাধ্যমত সুবিধাকর স্থানে ব্যূহ রচনা করিতে লাগিলেন। চারি দিকে কামান সাজাইলেন। এক দিন শত্রু-শিবির লক্ষ্য করিয়া গোলা গুলি চালান হইল, কিন্তু তাহার ফল—ইংরাজপক্ষের পক্ষে ভয়ানক নিরাশাময়। মীরকাশেমের গড়খাই—এবার এতদূর সুন্দর ও সুরক্ষিত যে, গোলা গুলির দ্বারা তাহার কোনও অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। ইংরাজ-শিবিরের সম্মুখেই একটি বিস্তৃত জলা; একে বর্ষা—কাজেই তাহা আগাগোড়া জলে পরিপূর্ণ। ইংরাজ-সেনানায়ক আডাম্‌স্ এবার আপনাদের অবস্থা ভাবিয়া অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন। এবার যেন পরাজয় মূর্ত্তিমান হইয়া তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল।

বাঙ্গলার ইতিহাস বিশেষ সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছে যে, বিশ্বাসঘাতকতা না ঘটিলে, বাঙ্গলার নবাবেরা কখনও কোনও যুদ্ধে পরাজিত হইতেন না। মীরজাফর যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করিতেন, তাহা হইলে পলাশীর যুদ্ধে কখনই ইংরাজ জাতি বিজয়শ্রী লাভ করিতে পারিতেন না। এবারেও আবার সেইরূপ কাণ্ডের দ্বিতীয় অভিনয় হইল। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে তাহা অন্য ধরণের।

এক জন ইংরাজ গোরা,—বলিতে পারা যায় না—কোন অব্যক্ত কারণে এই যুদ্ধের অনেক পূর্ব্বে সেনাদল পরিত্যাগ করিয়া যায়। তাহাকে ধরিবার হুকুম হয়। কিন্তু সে ব্যক্তি নবাব মীরকাশেমের অধীনে চাকরী স্বীকার করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে কাটাইতে লাগিল। এত দিন পরে তাহার মনে পুনরায় স্বপক্ষে প্রত্যাবর্ত্তনের বাসনা জন্মিল। সে ব্যক্তি এক দিন গভীর নিশীথে আডাম্‌স্ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, "আপনি যদি আমার পূর্ব্ব অপরাধ মার্জ্জনা করেন, আমায় কোনও প্রকারে পীড়ন না করিয়া পুনরায় আমায় সৈনিক ব্রতে ব্রতী করেন, তবে আমি আপনাদের একটি মহোপকার সাধন করি। জলার দিকে একটি নিরাপদ ও অরক্ষিত পরিখা-অংশ আছে, আমি আপনাদের সেই স্থানটি দেখাইয়া দিতে পারি।"

সেনাপতি আডাম্‌স্ হাতে স্বর্গ পাইলেন! তিনি বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া বুঝিলেন,—এই ইংরাজ-সৈনিক * আর যাহাই হউক না কেন, মিথ্যা-

---

* এই ইংরাজ সেনাদলপরিত্যাগী বিশ্বাসঘাতক কে তাহা নামে প্রকাশ নাই। এটি ইংরাজ ইতিহাস-লেখকদের চাতুরী। কোনও প্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখক ইহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন— "This man originally in the service of the Company had for some un-

বাদী নহে। সেনাদলকে তিনি তিন অংশে বিভক্ত করিলেন। এক দল সেই পূর্ব্বকথিত ঝিলের দিকে গেল, অপর দল আর একটু পশ্চাতে থাকিয়া অন্য স্থান আক্রমণ ছলনায় ও শেষ দল বিশেষ প্রয়োজনীয় সময়ে সাহায্য করিবার জন্য, তিনটি ভিন্ন স্থানে সন্নিবেশিত হইল।

অতি ধীরে, অতি সন্তর্পণে, অতি কৌশলে, ইংরাজ-সেনা নিঃশব্দে বন্দুক মাথায় করিয়া সেই ঝিল পার হইল। আরও নিঃশব্দে তাহারা গড়খাইএর সীমার পাশে আসিয়া পৌঁছিল। আর্ভিং নামক এক সুচতুর সেনানী এই দলের পরিচালক। আর্ভিং পূর্ব্বেই সকলকে মুখ বন্ধ করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। বন্দুকের আওয়াজ করিবার হুকুম পর্য্যন্ত ছিল না, খালি কিরীচ চালাইয়া যত দূর হইতে পারে—তাহাই যথেষ্ট।

প্রাচীরের পার্শ্বে মীরকাশেমের দুই জন প্রহরী নৈশ নিস্তব্ধতার মধ্যে অচেতনে ঘুমাইতেছিল—আর্ভিংএর দুই জন সেনানী সঙ্গীনের আঘাতে তাহাদের চিরকালের জন্য চলৎশক্তিহীন করিয়া দিলেন। উন্নভ ভিত্তির গাত্রে মই লাগান হইল, তাহা বাহিয়া লোক সেই ক্ষুদ্রতম পর্ব্বতশিখরে উঠিল—কয়েক মুহূর্ত্তও ইহার জন্য প্রয়োজনে লাগিল না। সহসা ইংরাজ-সেনাকে প্রাচীরের উপর দেখিয়া, নবাবের সৈনিকেরা কিছু দিশাহারা হইয়া পড়িল। কিন্তু তাহারা পূর্ণ সম্বিত পাইবার পূর্ব্বে, ইংরাজপক্ষ বলীয়ান হইয়া সেই উন্নত স্থানে আপনাদিগকে দৃঢ়সন্নিবিষ্ট করিয়া লইলেন।

সহসা অপর পার্শ্ব হইতে ইংরাজের মশালের আলো জ্বলিয়া উঠিল—তাহার সঙ্গে সঙ্গে যেন মীরকাশেমের সেনাদলের প্রদীপ্ত তেজ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। আর্ভিংএর দলের পশ্চাতে ছিল মোরাসের দল। তাহারা আক্রমণের ভান দেখাইবার জন্য সেই স্থানে থাকিলেও, এবার অবসর বুঝিয়া প্রকৃত আক্রমণ করিল। জন কয়েক লোক জীবন পণ করিয়া ভিতরে গিয়া পড়িয়া দ্বার খুলিয়া দিল। তাহারা মরিল বটে, কিন্তু রন্ধ্রপথে উচ্ছলিত অর্ণবপ্রবাহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া অগণ্য ইংরাজ-সেনা দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল।

আর্ভিং ও মোরাস্ দুর্গমধ্যে পরস্পরের সহিত মহানন্দে হস্তমর্দ্দন করিলেন। আবার তাঁহারা দুই দল একত্রিত হইয়া নবাবসেনার উপর পুন-

---

known reason deserted to Mirkasim, and now, either from a desire to re-ingratiate himself with his old masters or from a love of treachery for its own sake he prepared to betray him." ইহাকে বঙ্কিম বাবুর চন্দ্রশেখরের "লরেন্স ফষ্টর" বলিয়া ভ্রম হয়।

আক্রমণ করিলেন। এ দেশীয় সেনার এক দোষ এই, তাহারা যতই সাহসী ও দুর্দ্ধর্ষ হউক না কেন, সহসা আক্রান্ত হইলে যেন তাহাদের সাহস, বল, বুদ্ধি কোথায় অন্তর্হিত হয়। এই অদ্ভুত কারণে নবাবের সেনা হারিতে লাগিল। অনেকে পলাইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু তাহাতে সফল-কাম হইতে পারিল না।

সমরু ও মার্কার অত্যন্ত বিপদ দেখিয়া এক হুকুম প্রচার করিলেন, যে পৃষ্ঠভঙ্গ দিবে, তাহারই জীবন যাইবে। এক দিকে ইংরাজসেনা, অপর দিকে সমরুর ভয়ানক আদেশ, যুদ্ধে যত না হউক, পলায়নের মুখে অনেক মুসলমান সেনা স্বদলের বন্দুকের গুলিতেই মরিতে লাগিল। শবের উপর শব জমিয়া সৈন্য-চলাচলের পথ বন্ধ হইয়া গেল।

মীরকাশেমের বহুকষ্টে সুশিক্ষিত সেনা এইরূপে স্বপক্ষ ও বিপক্ষ উভয়ের দ্বারা নিহত হইয়া এক মহা হত্যাকাণ্ডের বিভীষিকাময় দৃশ্য উৎপাদন করিল। সেনাবল-অপচয়ের সহিত, হতভাগ্য নবাবের ভাগ্যপরিবর্ত্তন আরব্ধ হইল। বিশ্বাসঘাতকতা ও বিশৃঙ্খলতাতেই তাঁহার পতন অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। মীরকাশেম এই দুই জন বিদেশীয়ের হস্তে সৈন্যচালনার ভার না দিয়া যদি এ সময় কার্য্যক্ষেত্রে নিজে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে এইরূপ শোচ-নীয় দৃশ্য হয় ত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় শোণিতাক্ষরে লিখিত হইত না।

হায়! উদয়নালা যুদ্ধের এই পরিণাম হইল; আশা এইরূপে নিরাশায় পরিণত হইল। বিজয়শ্রী এইরূপে পরাজয়ের জন্য শূন্য আসন রাখিয়া গেলেন। বিশৃঙ্খলতা এইরূপে সুশৃঙ্খলতার নিকট পরাজয় স্বীকার করিল। মীরকাশেম যাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই, তাঁহার বিপক্ষ পক্ষ যাহা কল্পনায় আনেন নাই, ভবিতব্য যাহা ঘটাইতে পারিত না, শেষে তাহাই ঘটিয়া মীরকাশেমের আশা ভরসা, অভ্যুত্থান, রাজশক্তির বিনাশসাধন করিল। আডাম্‌সের পাঁচ হাজার সৈন্যের মুখে মীরকাশেমের পঞ্চাশ হাজার সেনা ছায়াবাজির ন্যায় উড়িয়া গেল।

নবাবের সেনাদল এবার পলায়ন আরম্ভ করিল। রাজমহল্‌ তখনও সুর-ক্ষিত, কিন্তু সেখানে তাহারা আশ্রয় লইল না। নিরুৎসাহ তাহাদের সৈনিক হৃদয়ের তেজ হরণ করিয়া তাহাদিগকে নিতান্ত অপদার্থ করিয়া তুলিয়াছে। 'শিক্রীগলি' ও 'ভিরিয়াগুলি' নামে দুইটি গিরিসঙ্কট ছিল, তাহাও তাহারা রক্ষা করিতে পারিল না।

আডাম্‌স্ ৬ই সেপ্টেম্বর অতি সহজেই রাজমহল অধিকার করিলেন। মুঙ্গের সুরক্ষিত থাকিলেও কোনও প্রকার প্রতিবন্ধকতা করিল না। ১লা অক্টোবর মুঙ্গের ও ৬ই পাটনা তাঁহার দখলে আসিল। ক্লাইব পলাশীর জয়ের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গলা দখল করিতে পারেন নাই। আডাম্‌স্ পাটনা জয় করিয়া সমগ্র বাঙ্গলা প্রকৃতপ্রস্তাবে ইংরাজের অধিকারভুক্ত করিলেন। পলাশীর অসম্পূর্ণ কার্য্য এইরূপে উদয়নালায় সম্পূর্ণ হইল। মীরকাশেম, পাটনায় ইংরাজ বন্দীদের হত্যা করিতে হুকুম দিয়া অযোধ্যায় পলায়ন করিলেন।

মীরকাশেমের জীবন-নাটকের যবনিকা এইখানেই পতিত হয় নাই। ইহার পর অযোধ্যার নবাব উজীর সুজা-উদ্দৌলার সহায়তায় তিনি ইংরাজের সহিত আর একবার লড়িয়াছিলেন। অদৃষ্ট যখন ভাঙ্গিয়া পড়ে, তখন মানবের চেষ্টা কখনই সফল হয় না। বাঙ্গলার শেষ হিন্দুনৃপতি রাজ্য ত্যাগ করিয়া পুরুষোত্তমের যাত্রী হইয়াছিলেন,—বিধাতার কি অপূর্ব্ব লিপি !—বাঙ্গলার শেষ মুসলমান ভূপতিও বক্সারে পরাজিত হইয়া ফকিরি আশ্রয় করিয়াছিলেন!

উদয়নালার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মীরকাশেম দ্বিতীয় অন্ধকূপ ব্যাপারের অভিনয় করেন। "পাটনার হত্যাকাণ্ড" ইতিহাসের পবিত্র পৃষ্ঠায় তাঁহার নামে কলঙ্কের গাথা গাঁথিয়া দিয়াছে। সে কলঙ্ক ও প্রতিহিংসার শোণিতময়ী কাহিনী আমরা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে বিবৃত করিব।

বাঙ্গলা সাহিত্যে এ পর্য্যন্ত মীরকাশেমের বিষয়ে ভালরূপ আলোচনা হয় নাই। আমরা যাহা বলিলাম, তাহাও সম্পূর্ণ নহে। আমাদের যাহা বলিবার অবশিষ্ট রহিল, তাহা "পাটনার হত্যাকাণ্ড" শীর্ষক বিভিন্ন প্রস্তাবে লিপিবদ্ধ হইবে।

মীরকাশেম বাঙ্গলা ত্যাগ করিলে, ইংরাজের ক্রীড়াপুত্তলী মীরজাফর চতুর্গুণ মূল্যে সিংহাসনের দর হাঁকিয়া তাহা কিনিয়া লইলেন। এবার প্রকৃতপ্রস্তাবে বাঙ্গলা দেশে ইংরাজশাসনের সূত্রপাত হইল। ব্রিটানিয়ার সিংহচিহ্নিত পতাকা সেই দিন হইতে শস্যশ্যামলা ফলজলপূর্ণা বাঙ্গলার কোমল মৃত্তিকায় প্রোথিত হইয়া সমগ্র ভারতভূমি ইংরাজের করতলস্থ হইবার ভবিষ্য ঘোষণা প্রচার করিল।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

অদল-বদল।

ব্যারিষ্টার বনাম উকিল।

প্রথম প্রস্তাব।

১

গোপীনাথ দাস—গোমুটায় বাস,—
বয়স ২১-এতে পড়েছেন গেল বর্ষা ;
মুখ ছাঁচে ঢালা ; রং ফিটফিটে ফরসা ;
একহারা দেহ ;—করেনিক কেহ
এ পর্য্যন্ত তাঁহার সুচরিত্রে সন্দেহ ;
অতি সাধু শিষ্ট ;—তবে এইটুকু জানি—
মাঝে মাঝে ছিপি-আঁটা বিলাতি আমদানী
লাল লাল ঝাল ঝাল নানাবিধ পানি
খেত মিলে সে, আর দু'চারিটি এয়ার ;
তাতে বড় কাহাকেও করিত না 'কেয়ার'।
—বোন কি ভাই একটিও নাই ;
মা মরিল সঁপি (বৃদ্ধ) বাপের হাতে গোপী ;—
বাপও তার সুসঙ্গতি ছিল সবিশেষই ;
পড়া শুনাও গোপীর তাই হয়নিক বেশী।
ক্রমে তার পুন্নরক হ'তে ত্রাণজন্য
বিবাহ হইয়া গেল নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন।

২

যায় গোপী ক্রমে স্ত্রীকে—(সবে মাত্র বিয়ে)—
শ্বশুর-বাড়ি হ'তে গোপীর বাড়ি নিয়ে,
সাধিতে স্বামীর সব সমুচিত ক্রিয়া ;
বলেও রাখি—কাদম্বিনী দ্বাদশবর্ষীয়া।

৩

স্ত্রীর অঙ্গে চেলি, খুব ফুলটুল আঁকা ;—
পায়ে মল ; ঘোমটায় বিধুমুখ ঢাকা ;—
বোধ হয় রূপের 'তরাসে'
পাছে কারো জ্বর আসে,
কিম্বা রূপানলে হঠাৎ কেহ মরে পুড়ে,
—ধন্য বিবেচনা—তাই নিয়ে যায় মুড়ে ;
ঝি আছে জোরে, আঁচল তাঁর ধোরে,
পাখা খুলে পরী হয়ে পাছে যান উড়ে।
—জানি না চেহারা খানি মন্দ কি ভালো,
তবে হাত পা দেখে বোধ—ঘুটঘুটে কালো ;
গহনার ধ্বনি—শুনে অনুমানি
তার জোরেই স্বামীর ঘর করিবেন আলো।

৪

হেন স্ত্রীকে নিয়ে, হাবড়ায় গিয়ে ;—
কোঁচান ঢাকাই পরা, জোড়াবুট পায়ে ;
কোঁচান চাদরে বাঁধা কালো কোট গায়ে ;
—(চাদরখানি বুকে বাঁধা, পরা হয়নি খুলে
কি জানি কেউ পাছে,
তাঁর যে সোনার চেন আছে
মোটা ষ্টার প্যাটার্ন, তা দেখতে যায় ভুলে)
হেন গোপী দেখে, তিনটে কুলী ডেকে,
নিজের জিনিষ 'ইণ্টার মিডিয়েট
কেলাশেতে' রেখে,
স্ত্রীকে নিয়ে গিয়ে—(ভিড়ে কিছু নাহি দমে)
দিল তুলে স্ত্রীগাড়িতে অবলীলাক্রমে।

৫

এখন সে গাড়িতে ছিল বলিতে না পারি
ছোট, বুড়ী, গোরা, কালো কতগুলি নারী।
কিন্তু জানি—আর একটি ঘোমটাময়ী মেয়ে,
কাদম্বিনীর বয়সী, তবে ফরসা তার চেয়ে,
পরা একই চেলি—(যেন বিধির খেলই)
ছিল সে গাড়িতে ; পরে শুনেছিও আমি—
ছোট আদালতের এক জজ তার স্বামী।
শুনিলাম যাচ্ছিলেন জজ বদলি হয়ে,
মুঙ্গেরে (নম্বর ৩ নবোঢ়া) স্ত্রী লয়ে'।
ইতিহাস তাঁর করিয়া প্রচার
ঘরের কথা বা'র করে' কাজ নাই আর ;
—এক কথা বলে' রাখি শুধু সংগোপনে,
জজবাবু গিয়ে সেই কন্যা দরশনে
দিতে পুত্রের বিয়ে, দেখি কন্যাটি এ
অপ্সরা, নিজেই বিয়ে করে এলেন নিয়ে।
মৃত তাঁর দুসংসার—তৃতীয় সংসার এ ;
এ পর্য্যন্ত স্ত্রীটি ভালো জেনেছিও তাঁরে।

৬

এখন পাঠক সভ্য ও পাঠিকা নব্য !
যদি এখানেতে ভাবেন আমার কর্ত্তব্য,—
যে জজটির নাম, এবং তাঁর ধাম,
ব্যক্ত করে' পূরাইব তাঁদের মনস্কাম,

যত্নেতে তাঁরা গিয়ে, জজটিকে নিয়ে,
দিতে পারেন "উত্তম মধ্যম" অনায়াসে ধরে,'
তাহা হলে ক্ষমা তাঁরা করিবেন মোরে ;
এবং দিবেন মেপে ; এরূপ সংক্ষেপে
দেওয়া নীতিশিক্ষা যে ভালো পরীক্ষা,—
সে বিষয়ে করে দীন মত ভেদ ভিক্ষা।

৭

চলে 'লুপ' মেল—ইংরেজের খেল—
ঠিক যেন উড়ে—ধোঁয়ারাশি ছুড়ে,—
দূরের জিনিষ কাছে আনি,
কাছের ফেলি দূরে ;—
যেন তার খেলা ;—'ছোট ষ্টেশন' মেলা
ছাড়াইয়া অবিলম্ব এল শ্রীরামপুরে ;
সেখানে একটু থামিয়ে,যাত্রী তুলে,নামিয়ে,
চলিল হুচোঁচা ফের বেগে দ্রুতগামী এ।
জ্ঞান নেই দাদার
আলো কি আঁধার—
করেনাও দৃষ্টি
ঝড় কি বৃষ্টি—
উর্দ্ধশ্বাসে উড়ে মাঠ বন ফুঁড়ে—
টরাটট্ টরাটট্ টরাটট্ ধ্বনিতে
ছাড়াল যে কত ষ্টেশন পারি নাই গণিতে।

৮

থামিল সে গাড়ি ক্রমে মেমারি গ্রামে,
গোমুটার যাত্রীরা সব যেখানেতে নামে ;—
অন্ধকার ঘুরঘুট্টি—অতি তাড়াতাড়ি
গেল গোপী কুলি ডাকি, জিনিষপত্র ছাড়ি,
নামাইতে স্ত্রীকে খুঁজিয়ে, সেদিকে
দৌড়াইল যেইদিকে স্ত্রীলোকদের গাড়ি।

৯

এখন হোক গোপীনাথের কপালের জোর,
নয় ত সে কুচরিত্র, অথবা সে চোর,
কিম্বা অন্ধকারে নিজের স্ত্রীই অনুমানি,
নিল গোপী চেলি-পরা' জজের স্ত্রীকেই টানি।

১০

চলে ট্রেন জোরে, জামালপুরে ভোরে
এল ক্রমে ; উঠি জজ আধ ঘুমের ঘোরে,
স্ত্রীগাড়িতে গিয়ে গোপীর স্ত্রীকে নিয়ে,
(বেচারী সে বৃদ্ধ জজ) হুনীলাই এই ভুলে,
মুঙ্গেরের গাড়িতেত দিলেন চোঁচা তুলে।

১১

১০ মিনিট পরে জজের পথহারা দাসী
মুঙ্গেরের গাড়িতে ত উত্তরিল আসি।
আর লুপ মেলও সটাং চলে' গেল
ছাড়ি ষ্টেশন উদ্গারিয়া ধূম রাশি রাশি।

১২

হ'ল গোপীর স্ত্রীর কামরায় কেউ নাহি দেখি
ঘোমটা দুঃসহ
(তাঁর যেমন গ্রহ)
ঘোমটাটি তুলে
চাহিলেন ভুলে ;—
অমনই ঝি চীৎকারিল, "এ কি বাবু একি ?
কে এ ? কাকে নিয়ে এলেন"—
"তাই ত রে এ কে ?
এ যে কালো।"—বজ্রাহত জজ ত তা দেখে।

১৩

ঘোড়দৌড় ; ছুটাছুটী ;—বিকট চীৎকার ;
"ঝি—ও মোধো—টেলিগ্রাফ—ষ্টেশনমাষ্টার।"
ক্রমে জজ চেঁচাইয়া ঘোর শোকভরে,
উপনীত সে ষ্টেশন-মাষ্টারের ঘরে।
কহিলেন চীৎকারিয়া ঘরে এসে তাঁর
হাঁপাতে হাঁপাতে, "দোহাই ষ্টেশন-মাষ্টার,
—ভয়ানক কাণ্ড—আঁধার ব্রহ্মাণ্ড—
দোহাই তোমার, ধর্ম্ম-অবতার
তুমিই ; যা বলুক সব হিন্দু ধর্ম্মকার ;—
রক্ষা কর ধর্ম্ম ;—এমন কুকর্ম্ম
কখনও করিব না, স্ত্রী ছাড়িয়া এসে
স্ত্রীগাড়িতে একা—হোল এই অবশেষে।
অহো ভগবান্ একি হোল!—হা হতাশ।"
"কেয়া হুয়া বাবু?"—"আর কেয়া! সর্ব্বনাশ
স্ত্রীচুরী—তার উপর এ কোথ্‌থেকে এসে—
চাপিল এক অন্ধকার মেয়ে স্কন্ধদেশে ;
স্বামীর নাম বলেনাক—বলে বাপের নাম
কোথাকার পাঁচগাছির এক পঞ্চুরাম।
—উপায়! হা হরি—
এখন কি করি।"
বসিয়া পড়িল জজ বেঞ্চের উপরি।

১৪

ষ্টেশন-মাষ্টার দেখি এ ব্যাপার—
নিজের স্ত্রী হারিয়ে এ নিয়ে এল কার,
এই কথা ভেবে—হাসি রাখা চেপে
হইল ছুকর ; প্রায় যান তিনি ক্ষেপে ;
ধৈর্য্যের বা গোড়া, গোঁফে দিয়ে মোড়া,—
বলিলেন, "সে কি বাবু ফেলিলেন স্ত্রী হারিয়ে ?
বড় খারাপ কটা ; আর দুঃখের বিষয় ভারি এ।
কিণ্টু, এ বিষয়ে ডায়ী
রেলওয়ের লোক নাহি,
রসিড নিয়ে মাল গাড়িটে ডিলে টবে মানি,
হোট ডায়ী এ সম্বণ্ডে রেলওয়ে কোম্পানী ;
টা'লে পঁহুছিটি স্ত্রীও নিঃসণ্ডেহ এসে।"
বোলে ফেল্লেন ষ্টেশনমাষ্টার ইংরাজিতে হেসে।

১৫

জজ ত অবাক লাগিল তাক্
শুনে এই কথা সব, মুখ কোরে ফাঁক।
ষ্টেশন-মাষ্টার শেষে দিলেন উপদেশ এ—
"এ স্ত্রীলোক আপাটট এ ষ্টেশনে ঠাক,
পুলিশে খবর দিন আপনার স্ত্রীর জন্য,
এ ভিন্ন সদুপায় ডেখিনাত অন্য ;
টারা বুঝে সুঝে ডেখ্‌বে সব খুঁজে ;
আপনি গিয়ে বসে ঠাকুন নাক মুখ গুঁজে।"

১৬

জজ দেখিলেন যায় দুই কুলই তাতে ;
এটা তবু-আপাতত থাকুক ত হাতে ;—
পাওয়া গেলে সেটা ছেড়ে দেব এটা ;
পেলে তারে হাতছাড়া আর করে কোন বেটা,
বলিলেন, "না না চলুক এটা মোর সাথে ;
নির্দ্দাবী মাল এ দিব পুলিশের হাতে।"
বলি কষ্টে শ্রমে, হতাশ হ'য়ে দমে',
পঁহুছিলেন জজদেব মুঙ্গেরেতে ক্রমে।

১৭

গোপী ত এদিকে নিয়ে জজ স্ত্রীকে
চলে যায় বাড়ি, আর পরম কৌতুকে,
করেন যাপন দিবা বিভাবরী সুখে।
একদিন গিয়ে গোপীনাথ, "প্রিয়ে
সুশীলে" সম্ভাষি তারে কহিলেন চুমি',
"নাহি জানিতাম এত সুন্দরী যে তুমি ;
আরও শুনেছিলাম—প্রিয়ে করিও না রোষ—
তোমার বাপের নাম শ্রীগজুনাথ ঘোষ ;"
স্ত্রীও বলিলেন "আর তুমি এত যুবা
সুন্দর যে বলেনি কেউ আমায়ে ; নতুবা
কাঁদতাম কি আমি, বল্লেন যখন স্বামী
মাকে 'বড়ই বুড় হোল সুশীলার স্বামী ?'
আরও শুনেছিলাম তোমার বর্দ্ধমানে সাকিম,
আরও যেন তুমি এক কোথাকার হাকিম।"
বলিলেন গোপী—"হাঁ হাঁ কাছাকাছি তাই,
এক ডেপুটির শালার আমি পিস্‌তুত ভাই।"

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

১

এজলাস বড় ; মেলা লোক জড়—
মারিছে পেয়াদা তাদের কিল ঘুসী চড়ও ;
ভয়ঙ্কর গোল, যেন শত ঢোল
ঢাক, কাঁশি শঙ্খ মিলে করিতেছে রোল।
জিজ্ঞাসিলাম তাদের, "আজ এখানে কি হবে ?
চীৎকারিছ কেন হেন ষাঁড়ের মত সবে ?
এখানেতে ছুটে এসে সবাই জুঠে
কচ্ছ কি, নেবে নাকি আদালত লুঠে ?"
—"স্ত্রীচুরীর মোকদ্দমা" সবাই বল্লে উঠে।

২

শুনে আমি তাই ভিতরেতে যাই,
দেখিলাম যাহা হোল বুদ্ধিশুদ্ধি লোপই ;—
একদিকে জজবাবু, একদিকে গোপী ;
ব্যারিষ্টার দাদা—মোটে নহেন সাদা—
ডেপুটি বাবুকে নিয়ে বোঝাচ্ছেন গাধা।
যা শুনিলাম বক্তৃতার লিখিলাম খাঁটি—
পাইনি শুন্তে আমি তাঁর সব বক্তৃতাটি।

৩

"হিন্দু শাস্ত্রমতে হুজুর! স্ত্রীধন মহৎ,
ইহা সকলেই জানে—মুনিদের মত ;
হীরা জহর এর কাছে লাগেনাক কিছু ;
ছাগ, মেষ, গো, মহিষ এর চেয়ে নীচু ;—
স্ত্রী বাড়ির গিন্নী, স্ত্রী বাড়ির দাসী ;
স্ত্রী স্বামীর জমিদারি, তালুকদারী, চাষী ;
স্ত্রী স্বামীর বাহার ; স্ত্রী স্বামীর আহার ;
—এক কথায় নাহি ধন সমতুল্য তাহার।

শুধু এই কালের নয়, পরকালের গতি ;
পুন্নরক ত্রাণ জজও স্ত্রী দরকার অতি।
স্বর্গের যা সূত্র, অমূল্য যে পুত্র,
জজ বাবুর স্ত্রী ভিন্ন আশা তার কুত্র ?”
বলিলেন গোপীর উকিল এইখানে চটি'—
“প্রমাণে ত জজ বাবুর পুত্র কন্যা নটি।”
“তা বটে তা বটে” বলি চুলকাইয়া ভুরু
করিলেন ব্যারিষ্টার পুন বাক্য সুরু।—
“তা—তা যাক্ ; দেখাবার উদ্দেশ্য আমার,
স্ত্রীধন খুব দামী—হুজুরে তা আমি
দেখায়েছি ; পরে হুজুর করুন বিচার ;
এটিও দেখিবেন হুজুর জজ অতি বৃদ্ধ,
মান্য ও গণ্য, এ চুরীর জন্য
কত কষ্টে দিবানিশি হয়েছেন সিদ্ধ ;
বিশেষ তাঁহার স্ত্রীটিও সুন্দরী যুবতী ;
(হেথা চুরীর মতলবও জাজ্বল্যমান অতি ;)
আর হাতি সমান দিয়াছিও প্রমাণ,
গোপীনাথ বয়াটে ও মাতাল বিশেষই,
সে জন্য উচিত হওয়া সাজা তার বেশী।”

৪

উঠিলেন ঝেড়ে গোপীর উকিল পরিশেষে,—
চুল তাঁর কটা মেজাজ ঘোর চটা ;
আরম্ভিলেন বক্তৃতাটি ধীরে ধীরে ; কেশে ;
“এ বিষয় জজ বাবুই দোষী ; তিনি ঘোর
পাপী ও ব্যভিচারী, ভণ্ড ও চোর,—
বলিলাম যাহা প্রমাণ হবে,—তাহা
ঐ ষ্টেশন-মাষ্টারের এজাহারে তাহা।
জানিতেন জজবাবু অপরের স্ত্রী এ
তবু গোপীর স্ত্রীকে সটাং এলেন ঘরে নিয়ে।
নাহি জ্ঞান কাণ্ড—অকাল কুষ্মাণ্ড,
একবারে খালি ওর বিদ্যা বুদ্ধি ভাণ্ড।!!
ষাট বছরের বুড়, হতভাগা, গাধা,
অনায়াসে হোতে পারে তার ঠাকুরদাদা ;
নিয়ে গিয়া তারে জ্ঞাত ব্যভিচারে
বিনাশিল ধর্ম্ম তার নিঃসঙ্কোচে ?—আরে—
তুই একটা জজ ; নাহি লজ্জা তোর ছাই ?
মরে' যাবি টুক্ করে' কবে, ঠিক্ নাই ;
করেছিস বিয়ে তুই শুধু টাকার জোরে,
অপূর্ব্বসুন্দরী এক বালিকাকে ধোরে ;
নিজের ছেলের বিয়ে কোথা দিতে গিয়ে
নিজে এলি বিয়ে কোরে ;
তুই কি একটা মানুষ ?
তুই পশু, কাক, মাছ, লাটিম কি ফানুষ।”
চটিলেন ব্যারিষ্টর, “মহাশয় কেন
মক্কেলকে আমার মিছে গালাগালি দেন ও ?”
“গালাগালি ?—আপনার মক্কেল অতি শুয়োর,
ব্যাং—ওর যাওয়া উচিত ভিতরেতে কুয়োর ;
সেখানেতে লুকিয়ে, না খেয়ে, শুকিয়ে,
শীঘ্র মরে' যাওয়া উচিত—এত স্বভাব কু ওর।
হুজুর ! যখন জজস্ত্রীকে নিয়ে গোপীনাথ
এসেছিল, তখন আঁধার ঘুটঘুটে রাত ;
একই রকম চেলি-পরা', একই বয়স,
দেখে নাই স্ত্রীকে কভু,—গোপীর কি দোষ ?
গোপীনাথ প্রভু জানিত না কভু
সুশীলা যে অন্যের স্ত্রী,—অনিবার্য্য যুক্তি
পেতে পারে গোপীনাথ বেকসুর মুক্তি ;
আর ঐ হাঁড়িমুখো বুড়ো বেটাচ্ছেলে
আজ্ঞা হোক এইক্ষণই পাঠাইতে জেলে ;
উনি জজ ! বদমায়েস, পাজি—আরে খেলে যা
নিজে চুরি করে নালিশ—যা বেটা জেলে যা।”
—“ফের গালাগালি” উঠলেন ব্যারিষ্টার বলে'
উকিল বল্লেন “চুপ্—নইলে বাইরে যাও চলে ;
এ আমার সময় দাদা, দিও নাক বাধা—
যেমন বেটা জজ তেমনি ব্যারিষ্টার গাধা।”
—“কোর্টে অপমান ?—ভাল যদি চান”
বলিলেন ব্যারিষ্টার—“আপনি বেরিয়ে যান।”
“এও কি দাদা হয়—একি ছেলের হাতে মোয়া ?
এমনি মার্ব্ব চড় যে দেখবে সব ধোঁয়া।”
সুরু পরে হাতাহাতি, পরিশেষে লাথালাথি,
পরে চুলোচুলি এবং পরিশেষে 'দাড়াদাড়ি ;'
দেখিলেন হাকিম তখন হোল কিছু বাড়াবাড়ি,
বলিলেন, “আদালত অনেকক্ষণ স'য়েছে ;
আর সইতে পারে না ; বেশ অপমান হয়েছে ;
জান আমি কে ?—আমি সত্য, ন্যায় ও বিধি ;
'ডিস্পেন্স' করি আমি স্বয়ং রাণীর প্রতিনিধি ;
অপমান করার দরুণ আদালত ও আইন,
তোমাদের প্রত্যেকের ২০ টাকা 'ফাইন'।
এরূপ প্রসঙ্গ হোয়ে গেলে ভঙ্গ
দিলেন হাকিম 'রায়' তখন, তার এই মর্ম্ম—
“যাও কর গিয়ে যাও যা'র যা' কর্ম্ম,

বৃদ্ধ জজ! কাদম্বিনীই তোমার যোগ্যা ভার্য্যা,
গোপীনাথ সুশীলাই তোমার স্ত্রী; যা'র যা'
অঙ্গ দাবী—ডিস্‌মিস্—ইচ্ছা হয় কারও
'সিভিল কোর্ট' খোলা আছে,
নালিশ কর্ত্তে পারো।"
জজ অতি ক্লিষ্ট, গোপী অতি হৃষ্ট
হইলেন তা'তে, তাহা হইল সুদৃষ্ট;
সবার মাঝে সাফ গোপী দিলেন লাফ;
সুশীলাকে ধরে' গেলেন গাড়ি কোরে,
বৃদ্ধ জজকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখায়ে সজোরে।

মর্ম্ম।

১। হিন্দু বিবাহটা খুব আধ্যাত্মিক,
শুদ্ধ 'চুক্তি' নয়—সেটা অবশ্যই ঠিক;
কিন্তু, বৃদ্ধ হ'য়ে বালিকাকে বিয়ে করায়,
আধ্যাত্মিকতাটা একটু বেশী দূর গড়ায়।
সেরূপ বিবাহ নিশ্চয়ই আত্মার মোক্ষ সেতু,
কিন্তু হয় প্রায়ই গার্হ অশান্তির হেতু।
২। ঘোমটা জিনিষটা ভালই, তা'ই বলে'
সেটা ঠিক এক গজ না হলেও চলে।
যদিই বা অন্তে, স্ত্রীর চন্দ্রমুখ খানি
দেখে খুসী হয়, তাতে এমনই কি হানি?
৩। রেলে যে'তে হ'লে স্ত্রীগাড়ির মোড়ে
আপনাপন স্ত্রীগুলিকে নিও বুঝে' পড়ে'।
৪। উকিলেই যায় অনেক কায চলে',
মকদ্দমা জেতেই নাক 'ব্যারিষ্টার'ই হ'লে।

প্রতিশোধ।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিনোদবিহারী রন্ধনশালা হইতে দ্রুতপদে শয়নগৃহের দিকে চলিলেন,—কেন না, বড় বউ যে-দিন গলায় দড়ি দিবার ভয় দেখান, সে দিন অন্ততঃ কণ্ঠদেশে অঞ্চল বেষ্টন না করিয়া ছাড়েন না। কিন্তু এমন সময়ে প্রাঙ্গণমধ্যস্থ ধান্য-গোলার উপর হইতে কাল পেচক চীৎকার করিয়া উঠিল,—সঙ্গে সঙ্গে বিকট কণ্ঠে বহির্ব্বাটীতে কে ডাকিল,—"মুখুয্যে মোশাই, বাড়ী আছ?" ইহাতে মুখোপাধ্যায় মহাশয় অশুভ আশঙ্কা করিয়া একটু থমকিয়া দাঁড়াইলেন, উত্তেজিতা রাজহংসীর মত গ্রীবা হেলাইয়া এই মাত্র যে তরুণী দৃঢ় বাক্যে বলিতেছিল, "এই স্বামী?—এই অধার্ম্মিক আমার দেবতা?" ক্ষীণদীপালোক-দৃষ্ট রোষচঞ্চলা তাহার সে মহিমাময়ী মূর্ত্তি মানসচক্ষে ফুটিয়া উঠিল। এমন সময়ে বিকৃতকণ্ঠে আবার কে আওয়াজ দিল—"বলি মুখুয্যে মোশাই বাড়ী আছ কি না?"

বহির্বাটীতে আলো ছিল না।—আগন্তুক বৈঠকখানার নীচে বৃহৎ যষ্টিতে ভর দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার সম্মুখে সোপানের উপর কিছু একটা পড়িয়াছিল, অন্ধকারে বুঝা যাইতেছিল না। বিনোদ সেই অন্ধকারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। লোকটা কে, চিনিতে পারিলেন না। তাহার মাথায় হিন্দুস্থানী ধরণে

দীর্ঘ পাগড়ী বাঁধা ছিল, পরিচিত হইলেও সে ঘোরান্ধকারে চিনিতে পারার সম্ভাবনা ছিল না। বিনোদ শুধাইলেন, "কে তুমি? আমার কাছে কি দরকার?"

পাগড়ীধারী সে কথার উত্তর দিল না। তাহার বদলে শুধাইল—"ঠাকুর, দেবীপুরের জয়দুর্গা ঠাকরুণ আপনার কেউ হতেন কি?"

জয়দুর্গা সরলার স্বর্গীয়া মাতার নাম। কাজেই ঠাকুরের শাশুড়ী। কিন্তু এইমাত্র শ্বশ্রুকন্যাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া আসিয়া শাশুড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ স্বীকার করিতে বিনোদবিহারীর কেমন বাধ-বাধ করিতেছিল। উত্তর দিতে দেরি দেখিয়া আগন্তুক একটু বিদ্রূপের স্বরে বলিল—"ইস্তিরি বুঝি?"

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রাগ তখনও শমিত হয় নাই। গালি খাইয়া আরও চটিলেন। ক্রোধকম্পিতস্বরে বলিলেন, "কে হে তুমি বেয়াদব? কথা বল্‌তে জান না?"

যার উপর রাগ, সে হাসিল। সেই বিদ্রূপের ভাব স্থির রাখিয়া আবার বলিল, "ঠাকুর, আদব কায়দা যদি জান্‌ব,তবে আর মোট মাথায় করে তোমার দুয়ারে এসেছি কেন? কেন, অন্যায় কথাটা কি বলিছি? তুমি কুলীন বামুন, কত বিয়ে করেছ! কোথায় কে তোমার ইস্তিরি কি শাশুড়ী, বেয়াদব লোকেরা জান্‌বে কেমন করে ঠাকুর?"

আগন্তুক একটু একটু বিকৃত কণ্ঠে কথা কহিতেছিল। তথাপি বিনোদের মনে হইতেছিল, স্বর পরিচিত বটে। সে আবার বলিল, "ঠাকুর শুন্‌লাম, জয়-দুর্গা ঠাকরুণের মেয়েটি তোমার বাড়ী এসেছেন। তাঁর একটি পেটারি চুরী গিয়েছিল। সেটি পাওয়া গেছে, আমি তাঁকে তাই দিতে এসেছি! তাঁকে এক-বার ডেকে দাও, আর একটা আলো আন ঠাকুর। গেরস্থর বাড়ীতে সন্ধ্যে হতে না হতে এত অন্ধকার, একটা পিদিম বাইরে রাখতে পার না? মা ঠাকরুণরা ত শুন্‌চি গলা জাহির করতে খুব মজবুত!"

শাশুড়ীর হৃত-ধনগুলির পুনঃপ্রাপ্তির আশায় বিনোদের রাগ জল হইয়া আসিল। আগন্তুক লোকটাকেও পরিচিত মনে হইতেছিল। কিন্তু তিনি একটু সঙ্কটে পড়িলেন। সরলা বাটীর বাহির হইয়া গেল, তাহা তিনি দেখিয়াছিলেন। এ লোকটা তাকে চেনে কি? পেটারি লইয়া যাইবার জন্য সরলাকে বাহিরে আসিতে হবে, তার মানে কি? বিনোদ কৌশল অবলম্বন করিলেন। বলি-লেন, "হাঁ, মৃতা জয়দুর্গা ঠাকরুণের কন্যাকে আমি বিবাহ করি। কুলবধূর

বাহিরে আসার কি দরকার? পেটারি যদি তাঁকে দিতে এসে থাক, আমার কাছে দিলেই হবে!"

পেটারিবাহক তাহাতে সম্মত হইল না। বলিল, "ঠাকুর! তোমায় আমি চিনি নে। তাঁকে চিনি। চুরীর জিনিস, ভয় করে। যার জিনিস, তার হাতেই দেব। তিনি একবার বাইরে এলে, আমার সাম্‌নে জিনিস পত্তর সব মিলিয়ে নেবেন। তাতে দোষ কি? মা ঠাক্‌রুণেরা কি সন্তানদের দেখা দেন না?"

বিনোদ বিপদে পড়িলেন। তাঁর ভরসা হইতেছিল, এই পেটারি স্বর্ণরৌপ্যে পরিপূর্ণ! কেন সরলাকে দুর্ব্বাক্য বলিয়া তাড়াইয়া দিলেন! কিন্তু এখন তাহাকে অন্বেষণ করিয়া আনা ত সহজ কথা নহে। ঠাকুর ইচ্ছা করিয়া আবার একটু গরম হইলেন। কেন না, নরমে কার্য্যোদ্ধারের উপায় দেখিলেন না। বলিলেন, "জিনিস পত্তর বুঝিয়ে দিতে হয়, আমাকেই দিয়ে যাও। ভদ্রলোকের বউ কি করে তোমার সুমুখে বার হবে? কে তুমি? চুরীর জিনিস নিয়ে এসেছ, সুড়্‌সুড়্ করে দিয়ে পালাও। তোমার এত ন্যায়ে কাজ কি?"

আগন্তুক আবার হাসিল। একটু চুপি চুপি বলিল, "ঠাকুর, তিনি বাড়ীর ভেতর সত্যি সত্যি আছেন ত? না তাড়িয়ে দিয়েছ?"

এ লোকটা কি অন্তর্যামী না কামচর? বিনোদ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। অপ্রতিভ হইয়া আত্মসম্বরণ পূর্ব্বক বলিলেন, "বাপু, স্ত্রীপুরুষে কত ঝগড়া হয়, সে কথায় তোমার কি দরকার? তুমি নিজের কাজ বাজিয়ে চলে যাও। স্ত্রীর ধন স্বামীর, এ কথা জান ত?"

সে অন্তর্যামী বা কামচর—যেই হোক্—সে দুঃখিত হইয়া বলিল,—"কি করেছ ঠাকুর? মালক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলে তার সোণা রূপার লোভ সামলাতে পারচ না। কিন্তু তোমার দোষ কি? দিন কাল এম্‌নি পড়েচে! মা-মরা অনাথিনী, তুমি সোয়ামী, তোমার কাছে আশ্রয় নিতে এসেছিল, তাকে তুমি দূর করে দিলে? এই কি ধর্ম্ম ঠাকুর? আর পেটারিটি তার সঙ্গে থাক্‌লে তাকি পার্‌তে তুমি? কিন্তু ঠাকুর, সেই মেয়েটির মন কত দুর্লভ ঐশ্বর্য্যের ঠাঁই, তা একবার দেখলে না। মালক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলেছ!"

বিনোদবিহারীর ভ্রান্তি দূর হইল। কথা বলিতে বলিতে আগন্তুক মাথার পাগড়ী খুলিয়া ফেলিয়াছিল, এবং তাহার দীর্ঘায়ত চক্ষুর জ্যোতি সে অন্ধকারেও ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বিনোদ গলদঘর্ম্ম হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সম্মুখে এ যে ডাকাইত বিশ্বনাথ বাবু!

বিশ্বনাথ বলিল, "ঠাকুর, চিন্‌তে পেরেছ কি? সেদিন জগত্তির ঘাটে ডাকাতের টাকার ওপর তোমার ঘৃণা দেখে তোমার ওপর আমার ভক্তি হয়েছিল। কিন্তু দেখছি তোমাদের ধর্ম্ম কেবল মুখে, কেবল লোক-দেখানো; ছি ঠাকুর, মালক্ষীকে আমার পায়ে ঠেলেছ! আমি তাঁর চরণে এই পেটারি পৌঁছে দেব, যেখানেই থাকুন তিনি! বিশে যাকে মা বলেচে, তার আবার দুঃখু কি ঠাকুর?"

বিশ্বনাথ সেই পেটারি মাথায় লইয়া বেগে নিস্ক্রান্ত হইল। বিনোদ নির্ব্বাক স্তম্ভিত হইয়া সেই গৃহান্ধকারে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভয়ে, বিস্ময়ে তাঁর পা উঠিতেছিল না।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিক্রমসিংহের ছেলেরা সে রাত্রে গৃহে ফিরিল না। অন্য সময়ে ইহাতে একটু চিন্তার কারণ হয় বটে, কিন্তু ডাকাইতির হাঙ্গামায় মীরা ভাবিবার সময় পায় নাই। প্রাতেও তাহাদের কোনও সংবাদ পাওয়া গেল না। সরলা সূর্য্যোদয়ের কিছু পরে বিদায় হইয়া গেল। দু'চারি দিন থাকিতে অনুরুদ্ধ হইলে মীরাকে হাসিয়া বলিল, "দিদি, আমার সত্‌সতীনের ঘর, পথে আর দেরি করা ভাল হয় না। ভাইদের বিয়ের সময় আমায় মনে করো দিদি, তখন অবিশ্যি আস্‌বো; তোমাদের উপকার কখন ভুলব না।" সরলা বিস্তর আপত্তি করিলেও মীরা পথের আহার্য্যাদি দিতে ছাড়িল না।

বেলা প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেলে পরিহার গ্রামে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। সিংহ মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্রটি গত কল্য সন্ধ্যার সময় এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক বিষম আহত হইয়া নিশীথে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। খাটুলিতে শব আসিয়া উপস্থিত। কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্র আসে নাই। ব্যাঘ্র নিহত না হইলে সে গৃহে ফিরিবে না। মীরা শোকে অধীর হইয়া উঠিল, কিন্তু বিক্রমসিং বাহিরে অন্ততঃ অটল রহিলেন। অনুচরদের ডাকিয়া বলিলেন, "মেয়ে ছেলের মত কাঁদিলে কি হবে? হয় যুদ্ধে নয় শীকারে রাজপুতের ছেলে ত মরিবেই! দুষ্‌মন এখনও বনে বেঁচে! তোমরা এখুনি উদ্যোগ করে আমায় নিয়ে চল। আমি সেই পুত্রঘাতীর রক্ত দেখে পুত্রশোকের জ্বালা নিবারণ করব। স্বহস্তে সেই বাঘ না মেরে আমি জলগ্রহণ করব না।"

শুনিয়া মীরা পিতার পদতলে আসিয়া পড়িল। ভাইগুলিকে সে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল, তাহার শোকের অবধি ছিল না। তথাপি

ক্ষণেকের জন্য চিত্ত স্থির করিয়া সে পিতৃচরণে ভিক্ষা করিল, যাহা বিধাতার মনে ছিল, তাহা হইয়াছে। তিনি আর সে বিপদে যেন না যান; কেন না, তার মন বলিতেছে, তিনিও বুঝি নিরাপদে ফিরিতে পারিবেন না। বিক্রম মীরার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, "আমায় স্ত্রীলোকের মত কাঁদাসনে বেটী!" তার পর সদলে শীকারে বাহির হইয়া গেলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

পরিহার হইতে প্রায় চারি ক্রোশ দূরে বিখ্যাত বাগ্‌দেবীর খালের ধারে হোড়ঙ্গের বিস্তৃত বন। বন নাতিবৃহৎ বৃক্ষগুল্মাদিতে আচ্ছন্ন, এবং এরূপ ঘনবিন্যস্ত যে, সূর্য্যরশ্মিও তাহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। ইহার এক প্রান্তে স্বরূপগঞ্জ যাইবার পথে বিশ্বনাথের একটি আড্ডা ছিল, খালের ধার হইতে সুড়ঙ্গপথে তাহার পথ। সে কালে ডাকাইতদলের লোক ছাড়া সাধারণে তাহা জানিত না।

এই জঙ্গলের অন্য প্রান্তে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে বিক্রমসিংহের পুত্রেরা শীকার করিতে আসিয়াছিলেন। যে শাল্মলীতরুমূলে পীতাম্বর বাঘের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আহত হন, সঙ্গীরা সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধকে সে স্থান দেখাইয়া দিল। দিগম্বর সমস্ত রাত্রি সেখানে অপেক্ষা করিয়া প্রভাতে আবার ভ্রাতৃহন্তার অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত—বেলা তখন দুইপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে—তখনও তাহার কোনও সংবাদ নাই। বিক্রমসিংহ চারি দিকে লোক পাঠাইয়া, স্বয়ং স্বরূপগঞ্জের মুখে, মনুষ্যসমাগমচিহ্নমাত্রশূন্য অপথে চলিলেন। লতাগুল্মসমাকীর্ণ কণ্টকাকীর্ণ বনদেশে চিরদিন তিনি সানন্দে বিচরণ করিয়াছেন। আজ জীবনের শেষ বেলায়, পুত্রশোকবিহ্বল, পুত্রশোকপ্রতিবিধিৎসু বৃদ্ধ অবলীলাক্রমে সে সব অতিক্রম করিয়া যাইতেছিলেন। নিতান্ত দুর্গম স্থানে তরবারি ব্যবহারের প্রয়োজন হইতেছিল। এইরূপে প্রায় দুই ক্রোশ পথ মুক্ত করিয়া বিক্রমসিংহ এক সুদীর্ঘ তিন্তিড়ী বৃক্ষের দিকে আকৃষ্ট হইলেন। বৃক্ষশাখা হইতে মনুষ্যের আর্ত্তকণ্ঠস্বর তাঁহার কাছে ব্যাকুলভাবে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে,—"সিংহীমোশাই গো, আমাকে বাঁচাও!"

বিক্রমসিংহ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। প্রথমে মনে হইল,—এ ভ্রম; কিন্তু সেই আর্ত্তকণ্ঠ আবার পূর্ব্ববৎ ধ্বনিত হইল। বিক্রম বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, ঊর্দ্ধে এক প্রকাণ্ড শাখায় একটা মনুষ্য

দেহ কে বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছে। তিনি ব্যথিত হইলেন। কৌতূহলী হইয়া শুধাইলেন, "কে তুমি? কি দোষে, কে তোমার এ দুর্দ্দশা করেছে? যদি ঠিক কথা বল, আমি তোমার বাঁধন খুলে দেব।"

তৃষ্ণার্ত্ত ক্ষীণ কাতরকণ্ঠে জানাইল যে, বেশী কথা সে বলিতে অক্ষম। কাছে গেলে বলিতে পারে।

বিক্রমসিংহ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বৃক্ষারোহণ করিলেন। নিকটে গিয়া দেখিলেন, গত রাত্রের ক্ষুদ্র ডাকাইত দল যাহার নেতৃত্বে পরিচালিত হইয়াছিল, সেই ব্যক্তির এই দুরবস্থা। বৈদ্যনাথের চক্ষু দিয়া অবিরল ধারা পড়িতেছিল। বৃদ্ধকে কাছে দেখিয়া বলিল,—"আমার প্রাণ বাঁচাও। আর কখন আমি টাকার লোভ করব না। গুরুর দিব্বি, আর কখন ডাকাতি করব না। গোয়ালার ছেলে দুধ দই বেচে গুজরাণ করব। দোহাই তোমার সিংহী মশায়! বাঁচাও আমাকে। হাত খোলা নেই যে, তোমার পায়ে ধরব!"

বিক্রম আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তোমার এ দশা করিল? বিশ্বনাথ? তার কি কোনও ভৌতিক বল আছে? এর মধ্যে কেমন করে তোমার দেখা পেলে?"

বৈদ্যনাথ বলিল, "কপাল! নইলে ধর্ম্ম-বাপ হয়ে একটু দয়া করলে না? ভয়ে আমি আস্তানায় লুকিয়ে ছিলাম—ভোরে পালিয়ে যাব। কিন্তু সেই রাত্রেই আমায় ধরবে, কে জানত? তার পর আর বামাল ধরে আমার এ দশা করেছে। সূর্য্যি উঠতে না উঠতে বেঁধে রেখে গেছে, এখনও এলো না। হয় ত এম্‌নি করে খেতে না দিয়ে মেরে ফেল্‌বে! সিংহী মশায়! ছেরোকাল বিনি মাইনেতে তোমার চাকর থাক্‌ব। বাঁচাও আমাকে, শীগ্‌গির আমায় খুলে দাও, নইলে আড্ডা কাছে, আবার এলো বলে। তার যত দয়া, তত রাগ।"

বিক্রমসিংহ বৈদ্যনাথের বন্ধন সকল কাটিয়া দিলেন। বলিলেন, "তুমি অতি গর্হিত কাজ করেছিলে! কখ্‌খন আর এমন করো না। যদি বিশু তোমায় আবার ধরে, আমার নাম করো।"

তখন বৈদ্যনাথ কষ্টে নামিয়া আসিল। কঠোর বন্ধনের দাগে দাগে বেত্রাঘাতবৎ কাটিয়া রক্ত পড়িতেছিল। বিক্রম তাহাকে ধরিয়া জলাশয়ের দিকে চলিলেন। বাগুদেবীর খাল সেখান হইতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ। নিকটে অন্য জল ছিল না।

জলে নামিয়া বৈদ্যনাথ আকণ্ঠ পুরিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিল। স্নান করিয়া

অনেকটা সুস্থ হইল। বিক্রমসিংহ আবার স্বকার্য্যে অগ্রসর হইবেন ভাবিতেছেন, কিন্তু কোন্ দিকে যাইবেন, স্থির করিতে পারিতেছেন না। এমন সময়ে সেই নিস্তব্ধ বনদেশ কম্পিত করিয়া অদূরে উত্যক্ত ব্যাঘ্র গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

বিক্রমসিংহ বিদ্যুৎপৃষ্টবৎ সহসা উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। শব্দানুসরণ করিয়া উন্মুক্ত অসিহস্তে ছুটিয়া চলিয়া গেলেন।

সেই শার্দ্দূলগর্জ্জন খালের অপর তীরে প্রতিধ্বনিত হইতে না হইতে বৈদ্যনাথ ডুব দিয়া তাহা উত্তীর্ণ হইল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বিক্রমসিংহ যে অবস্থায় শিকারের সাক্ষাৎ পাইলেন, তাহা ভয়ানক। খালের ধারে নিবিড় ঝোপের ভিতর প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র,—সম্মুখে সদ্যোহত বিপুল ষণ্ডদেহ পড়িয়া আছে, তাহার মাথার উপর প্রকাণ্ড পাইকড় গাছের উচ্চ শাখার অন্তরাল হইতে কে তাহার প্রতি তীরের উপর তীর সন্ধান করিতেছে। ঝোপ এরূপ ঘনবিন্যস্ত যে, ঠিক সম্মুখে লক্ষ্য স্থির হইতেছে না। পার্শ্বের ছিদ্রপথে শরচালনা করিয়া বাঘটাকে উত্যক্ত করাই শিকারীর প্রথম উদ্দেশ্য। এইরূপে সে বাহিরে আসিলে শর এবং গুলি বর্ষণের সুবিধা হইবে। কিন্তু ব্যাঘ্র স্বস্থান হইতে নড়িতেছিল না। তীর সকল তাহার বাসগৃহের ভিতর পড়িতেছিল বটে, কিন্তু তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাহাতেই তাহার একান্ত শোণিতপানানন্দে বিঘ্ন ঘটিতেছিল। সেই জন্য ব্যাঘ্র রোষভরে গর্জ্জন করিয়া উঠিয়াছিল।

শরসন্ধায়ীকে বিক্রম দেখিতে পাইতেছিলেন না, কিন্তু সে তাঁহাকে চিনিয়া প্রমাদ গণিল। বৃক্ষশাখার সেই অন্তরাল হইতে পীতাম্বর হাঁকিল—"বাবুজি, হুঁসিয়ার, এখন শীকারের সম্মুখে যাবেন না!" কিন্তু বিক্রম ব্যাঘ্রের নিতান্ত নিকটে ও সামনে আসিয়া পড়িয়াছিলেন—কোনরূপ সতর্কতা অবলম্বনের তাঁহার স্পৃহা ছিল না, তখন আর সে উপায়ও ছিল না। ব্যাঘ্র তাঁহাকে সম্মুখীন হইতে দেখিয়া আবার গর্জ্জন করিয়া উঠিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে এক লম্ফে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইল। বিক্রমও চকিতে পিস্তল ছুড়িলেন। লক্ষ্য তেমন স্থির হয় নাই, গুলি বাঘটার কর্ণচ্ছেদ করিয়া বাহির হইয়া গেল। তখন সে ভীষণতর হইয়া বিক্রম সিংহের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

পীতাম্বর পিতার এই সঙ্কটাবস্থায় হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল—বন্দুক উঠা-

ইয়াও গুলি করিতে পারিল না। এ দিকে বৃদ্ধ অসিচালনার অদ্ভুত কৌশলবলে বাঘটার সম্মুখের একটা পা অকর্ম্মণ্য করিয়া দিলেন বটে, কিন্তু জন্তুটার লক্ষ্য সম্পূর্ণ ব্যাহত করিতে পারিলেন না। তাহার ফলে স্বয়ং মস্তকে দারুণ আহত হইলেন। তিনি তাহার কবল হইতে আত্মদেহ মুক্ত করিয়া দ্বিতীয় বার অসি চালনা করিবার পূর্ব্বে পীতাম্বরও ব্যাঘ্রের পৃষ্ঠদেশে গুলিবর্ষণ করিল। তাহাতে তাহার মেরুদণ্ড ভগ্নপ্রায় হইল বটে, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল না। সে বিক্রম সিংহের মস্তকের উপর আপনার ব্যাদিত মুখগহ্বর স্থাপিত করিল। বিক্রমের অসিফলক উদর বিদ্ধ করিলেও সে মুখের গ্রাস ত্যাগ করিল না। বৃদ্ধ দেখিলেন, মুহূর্ত্তে তিনি ব্যাঘ্রমুখে চূর্ণিত হইয়া যাইবেন। পীতাম্বর বৃক্ষ হইতে দ্রুত অবতরণ করিতেছিল বটে, কিন্তু সে নিজেই বুঝিল, তাহার দ্বারা কোনরূপ সহায়তা লাভের পূর্ব্বে পিতা ব্যাঘ্রমুখে প্রাণত্যাগ করিবেন। এমন সময়ে কাহার নিক্ষিপ্ত শরে মস্তিষ্কের ঠিক্ সন্ধিস্থানে বিষম আহত হইয়া অকস্মাৎ ব্যাঘ্র ভূপতিত হইল। তাহার বিপুল দেহভার মস্তকে লইয়া বিক্রম সিংহও পড়িয়া অজ্ঞান হইলেন।

সঙ্গে সঙ্গে পীতাম্বর বৃক্ষশাখা হইতে বেগে লাফাইয়া পড়িল। বিস্মিত হইয়া দেখিল, মৃত ব্যাঘ্রের শিরে যে তীর সংলগ্ন রহিয়াছে, তাহাই তাহার মৃত্যুর একমাত্র কারণ। পীতাম্বর বাঘটার মুখগহ্বর হইতে পিতার মস্তক বিমুক্ত করিল বটে, কিন্তু তাহার বিপুল দেহভার অঙ্গুষ্ঠপরিমিত স্থান চ্যুত করাও তাহার সাধ্যাতীত। তথাপি সে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে ছাড়িল না। এই সময়ে শিকারীর বেশে কেহ ঊর্দ্ধশ্বাসে সেখানে দৌড়িয়া আসিল।

পীতাম্বর তাহাকে চিনিতে পারিল না। কিন্তু সে ব্যক্তি নিতান্ত আত্মীয়ের মত তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া মৃতব্যাঘ্রদেহ স্থানান্তরিত করিতে সহায়তা করিল। তার পর বিক্রমসিংহের শরীর পরীক্ষা করিয়া দেখিতে দেখিতে তাঁহার মৃগয়াবেশ খুলিয়া ফেলিল। পীতাম্বর আগন্তুকের উপদেশে উত্তরীয় ভিজাইয়া আনিয়া পিতার মুখে চোখে জল সিঞ্চিত করিল। বিক্রমসিংহ দারুণ আহত হইয়াছিলেন, মস্তক হইতে অবিশ্রান্ত শোণিতপাত হইতেছিল। সেই অবসরে সে ঔষধসংগ্রহের জন্য ছুটিয়া চলিয়া গেল। পীতাম্বরকে বলিল—"কোন চিন্তা করো না। এম্‌নি করে খুব জল ঢাল। আমার ফিরিতে দেরি হবে না।"

সেই অপরিচিত, তার পর এক দণ্ডের ভিতর খাটুলি ও চারি জন বাহক সঙ্গে করিয়া আনিল। ঔষধ সঙ্গে আনিয়াছিল, স্বহস্তে ক্ষতস্থানসমূহে লেপন

করিয়া দিল। বাহকদের সাহায্যে বিক্রমসিংহের দেহ খাটুলিতে স্থাপিত করিয়া আদেশ করিল, "আড্ডায় নিয়ে যা।"

পীতাম্বর অপরিচিতের এই সৌজন্য এবং আত্মীয়তায় মুগ্ধ হইল। খাটিয়া চলিয়া গেলে সেও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কিন্তু কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাহার কেমন বাধ-বাধ করিতেছিল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পীতাম্বর সেই অপরিচিত গৃহে গৃহস্বামীর আতিথ্যসৎকারের সুব্যবস্থায় মুগ্ধ হইলেন। দেখিতে দেখিতে অনুচরেরা সে গৃহ আহার্য্য সামগ্রীতে পূর্ণ করিল। সেই জনমানবশূন্য বনের মধ্যে তাহারা যেরূপ অনায়াসে এবং সত্বরতার সহিত প্রয়োজনীয় সকল কাজ সম্পন্ন করিতেছিল, যথার্থই তাহা বিস্ময়কর। সে গৃহের গঠনপ্রণালীও বড় বিস্ময়জনক। নিতান্ত নিকটে আসিয়াও পীতাম্বর প্রথমে বুঝিতে পারে নাই যে, সেখানে মনুষ্যের বাসগৃহ থাকিতে পারে। অথচ গৃহ সকল তেমন ক্ষুদ্র বা অপরিস্কৃত নহে। বিস্মিত পীতাম্বর ভাবিতেছিলেন, এটা বুঝি একটা প্রেতপুরী!

গৃহস্বামী সমস্ত দিন বিক্রমসিংহের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল। তাহার নির্দ্দেশ মত পীতাম্বর অজ্ঞান পিতার মুখে ধীরে ধীরে দুগ্ধ ও সরবৎ সিঞ্চিত করিতেছিলেন। একটু অবকাশ পাইলেই গৃহস্বামী অন্তর্হিত হইতেছিল—কিন্তু কোথায় যাইতেছিল, পীতাম্বর তাহা স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। সুড়ঙ্গপথের কোনও সংবাদ তিনি জানিতেন না, এবং জানার সম্ভাবনা ছিল না।

বিক্রমসিংহ যখন চক্ষু মেলিলেন, তখন অপরাহ্ন হইয়া গিয়াছে। পীতাম্বরকে দেখিয়া তিনি সুধাইলেন, "এ আমায় কোথায় এনেছ? বাঘটা আমায় খেয়ে ফেলেছে, স্বপ্নে এই মনে হচ্ছিল। কে আমায় তার মুখ থেকে বাঁচালে?" এমন সময়ে গৃহস্বামী আসিয়া পদতলে দাঁড়াইল। পীতাম্বর সজলনেত্রে তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন—কথা কহিতে পারিলেন না। এবং তাঁহার তখনকার মনের ভাব বাক্যের অতীত! সেই অঙ্গুলিনির্দ্দেশ দেখিয়া গৃহস্বামী মুখ নত করিল। একটু একটু লজ্জিত হইয়া পীতাম্বরকে বলিল, "আপনি আমায় পর মনে করচেন কেন? আপনি যেমন ওঁর ছেলে, আমিও তাই!"

বিক্রমসিংহ নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে স্পষ্ট চিনিতে পারিতেছিলেন না। তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া বলিলেন—"কে বিশ্বনাথ? বদেকে আমি ছেড়ে দিয়েছি।

তাঁকে এবারটা মাপ করো। সে বলে তোমার যত দয়া, তত রাগ! আমাকে কি তোমার আড্ডায় এনেছ? এ যাত্রা আমার রক্ষে নাই। আমায় গঙ্গা-তীরে নিয়ে চল! ঐ দেখ, দিগু আমার জন্যে অপেক্ষা করচে।"

পীতাম্বর বালকের ন্যায় রোদন করিয়া উঠিলেন। বিশ্বনাথ বলিল, "ভয় কি? আঘাত তেমন বেশী নয়। যে ওষুধ দিইচি, তাতেই সেরে উঠবেন। কতবার আমি বাঘের কামড় থেকে এই ওষুধের গুণে বেঁচে উঠেছি!"

বৃদ্ধ মৃদু হাসিলেন। "তোরা বালক, আর আমি বুড়া! তোদের এক ফোটা রক্ত ক্ষয় হয়, দশ ফোটা বাড়ে। আমার কি তাই বিশু! রক্তস্রাবে আমি অবসন্ন হয়ে পড়েচি। ধন্বন্তরিও আমায় বাঁচাতে পারেন না। নিজের শরীর আমি বুজ্‌চি। তোমরা আমায় গঙ্গাতীরে নিয়ে চল। আমার জনম-দুঃখিনী কন্যাকে খবর পাঠাও!"

মীরার কথা মনে করিয়া বিক্রম সিংহ অধীর হইতেছিলেন। পুত্রশোকের মর্ম্মদাহন বিস্মৃত স্বপ্নের মত ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল।

বিক্রমসিংহ ঠিক্ বলিয়াছিলেন। তিলে তিলে তাঁহার জীবনীশক্তি অন্ত-র্হিত হইতেছিল। গঙ্গাতীরে পিতৃগতপ্রাণা চিরদুঃখিনী কন্যার সঙ্গে যখন দেখা হইল, সে দৃশ্য অনুভব করা যায়, কিন্তু বর্ণনা করা যায় না। স্বরূপগঞ্জের সন্নিকটে, বিশ্বনাথের আড্ডার অনতিদূরে, কন্যাপুত্রপরিবৃত হইয়া বিক্রমসিংহ গঙ্গাগর্ভে পরদিন মধ্যাহ্নে দেহত্যাগ করিলেন। বিশ্বনাথ ছেলেদের সঙ্গে ছেলের মত অধীর হইয়া কাঁদিল!

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বদন বাগ্‌দী দিদি ঠাকুরাণীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে শ্বশুরবাড়ী পৌঁছাইতে আসে নাই বটে, কিন্তু একটু দূর হইতে সে তাঁহাদের অনুসরণ করিল। পূর্ব্ব রাত্রে ভগবান মদক বদনকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া সরলার কাছে সব কথা বলিয়া-ছিল। কিছুই তাহার অবিদিত ছিল না। বদন জয়দুর্গা ঠাকুরাণীর কাছে নানারূপে উপকৃত এবং আশ্রিতগণের ভিতর তাঁহার বিশেষ স্নেহপাত্র ছিল। সে জন্য লোকে রহস্য করিয়া তাহাকে বলিত, "ঠাক্‌রুণের পোষ্য পুত্তুর।" পরিহার হইতে যাত্রাকালে সরলা বাগ্‌দী চারি জনকে বিদায় দিতে চাহিলে, বদন মহা আপত্তি করিয়া বসিয়াছিল। আর তিন জন নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিয়া গেল—কিন্তু বদন গেল না।

একটু একটু দিন থাকিতে বদন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীটি দেখিয়া আসিয়াছিল। সরলা নিতান্ত দুঃখিনীর মত পদব্রজে, একমাত্র পরিচারিকা সঙ্গে সবে প্রথম শ্বশুরঘর যাইবে ভাবিতে, মা ঠাকুরাণীকে মনে করিয়া বদন চোকের জল মুছিল, দিদি ঠাকুরাণীর আজ্ঞায় নৌকায় রহিল বটে, কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না। বড় বউ যখন গলা জাহির করিয়া পল্লীগ্রামের শান্ত রাত্রিসমাগম কাঁপাইয়া তুলিতেছিলেন, সে তখন চোরের মত বাড়ীর প্রাচীরগাত্রে অন্ধকারমধ্যে লুকাইয়া ব্যাপারটা কত দূর গড়ায়, তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। এমন সময়ে সহসা দেখিল, অন্ধকারে কে এক জন দীর্ঘ লাঠির মাথায় পেটারির মত কিছু একটা ঝুলাইয়া দ্রুতগতি বহির্বাটীর দিকে গেল। অনেকক্ষণ তাহার কোনও সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। শেষে বদন শুনিল, কে মুখুয্যে মোশাইকে ডাকাডাকি করিতেছে। বদন আর একটু অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইল। কেন না, সেখান হইতে সে আগন্তুকের সঙ্গে বিনোদের কথাবার্ত্তা সকলই শুনিল।

বিশ্বনাথ বাহির হইয়া গেলে বদন তাহার পাছে পাছে চলিল। ক্ষুদ্র গ্রাম, দেখিতে দেখিতে তাহারা শস্যপূর্ণ প্রান্তরে আসিয়া পড়িল। গ্রাম ইহার মধ্যেই প্রায় সুষুপ্ত—কেবল ভরানদীর কুলু কুলু রব স্পষ্টতর হইতেছিল।

বিশ্বনাথ এক স্থানে একটু অপেক্ষা করিয়া আর একখানি লাঠি খুঁজিয়া লইল। বদন বুঝিল, রন্‌পায় উঠিলে কাহার সাধ্য এই দলপতির গতি অনুসরণ করে। সে সাহস সংগ্রহ করিয়া হাঁকিল, "মশাই গো, একটু দাঁড়াও। আমার কিছু কথা আছে।"

বিশ্বনাথ ফিরিয়া দাঁড়াইল। ইহার মধ্যে বেতের ক্ষুদ্র পেটারিটি পৃষ্ঠদেশে দৃঢ় বদ্ধ করিয়া লইয়া সে যাত্রার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াছিল।

বদন সম্মুখে আসিয়া "অবদন হই" বলিয়া করজোড়ে নমস্কার করিল, এবং আত্মপরিচয় দিল। পিছু ডাকায় যাত্রার অশুভ আশঙ্কা করিয়া বিশ্বনাথ একটু রাগিয়া উঠিয়াছিল, পরিচয় পাইয়া আনন্দিত হইল।

বিশ্বনাথ কহিল,—"তোমারই নাম বদন? ভগবানের কাছে সন্ধ্যার একটু আগে তোমার কথা সব শুনেছি। আমি মাঠাকুরাণীকে তাঁর পেটারাটি ফিরে দিতে এসেছিলাম, কিন্তু দেখা পেলাম না। সত্যিই কি বিটুলে বামুন তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েচে? কোথায় তিনি?"

বদন। একবার বুড়ীর কান্না শুনতে পেয়েছিলাম। বোধ করি নৌকায়

ফিরে গিয়েছেন। নিতান্ত অপমান না হলে আর তিনি ফেরেন নি। আমি কেবল মোশাইয়ের সঙ্গে কথা কইবার জন্যে আছি।

বিশ্ব। তা বেশ হয়েচে। তোমার দেখা না পেলে, আমাকে নদীর ধারে ধারে ছুটে বেড়াতে হতো। মা কালী তোমাকে মিলিয়ে দিলেন। তা মা আমার ছেলে মানুষ, প্রথমে শ্বশুরঘর করতে এসে এমন মনকষ্ট পেলেন, আমি আজ আর দেখা করে তাঁর ক্লেশ বাড়াব না বদন। তা ছাড়া লোভিষ্টি বামুন হয় ত এখুনি টাকাগুলোর লোভে ছুটে আস্‌বে। এর মাঝে আমাদের থাকা ভাল নয়। পেটারিটি তোমার হাতে দিয়ে আমি নিশ্চিন্তি হই। পথে আর কোন বিপদ হবে না। বদের আমি নাজেহাল করেচি। শুন্‌চি ব্যাটা কৃষ্টপুরের দিকে পালিয়েচে।

বদন বিশ্বনাথের হাত হইতে পেটারিটি লইল। দেখিল, আগের চেয়ে বেশী ভারী। হাসিয়া বলিল, "বাবু মোশাই, এত ভারী করে দিয়েচো! দিদি ঠাক্‌রুণ আমার বড় ধর্ম্মভীতু, পেটারি ছোঁবে কি না সন্দেহ। তোমার ধন তুমি ফিরে নাও বাবু মোশাই।"

বিশ্বনাথ মনে মনে বদনের প্রশংসা করিল। বলিল, "বদন, মা আমার ধর্ম্মভীতু, তা জেনেও কিছু আমি দিয়েছি। কিন্তু তাঁকে বলো, এ আমার ডাকাতির টাকা নয়। আমি দু'চার বড় লোকের ঘরে কিছু কিছু মাইনেও পাই, এ সেই টাকা। নিতান্ত মা না নেন, টাকাটা তুমি নিও বদন। তোমার মতন ভাল লোক আমি বেশী দেখিনি।"

বদন হাসিল। "অত টাকা আমার হাতে এলে, লোকে বল্‌বে, চোর। তোমার আশীর্ব্বাদে মা ঠাক্‌রুণ আমাকে বেশ গুচিয়ে দিয়ে গেছেন বাবু মোশাই। আর টাকায় আমার কাজ কি? এখন দিদি ঠাক্‌রুণের একটা থিত্‌ ভিত্‌ হলেই আমি নিশ্চিন্ত হতে পারতাম।"

এই সময়ে দূরে দুটি মনুষ্যমূর্ত্তি দেখা গেল। উভয়ে ঠাহর করিয়া দেখিল, স্ত্রীলোক। আয়ি বুড়ি রোদনের স্বরে বলিতেছিল---"এমন হলো কেন গো! নাত জামাই, তুমি এক দিনের ভার নিলে না?" বদন বলিল---"ঐ দিদি ঠাকরুণ। বুড়ী আস্‌চে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে! পথ ভুলে ঘুর্‌চে বুজি!"

বিশ্বনাথ কহিল—"আমি আর দাঁড়াব না বদন! মা যদি শ্বশুরবাড়ী আর না যান, তাঁকে বাড়ী নিয়ে যাও! বাড়ীতে থাক্‌তে না পারেন, নবদ্বীপে গঙ্গার ধারে গিয়ে বাস করুন। আমি তার ব্যবস্থা করে দেব। মার মনের ভাব বুঝে

তুমি ভগবানের সঙ্গে পরামর্শ করে চলো। আমি এখন কাল্‌নার দিকে চল্‌লাম; শেষ রাত্রে ভগবানের সঙ্গে কথা কয়ে যাব! কিছু ভেবো না।"

তখন বিশ্বনাথ ইষ্টদেবীকে স্মরণ করিয়া সহসা অন্তর্হিত হইয়া গেল।

ক্রমশঃ।

সহযোগী সাহিত্য।

ভ্রমণবৃত্তান্ত।

তিব্বতে গুপ্তবিদ্যা।

গুপ্তবিদ্যার অনুশীলনে তিব্বত কিরূপ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, সে বিষয়ে ডাক্তার হেনকোল্ড 'এরিনা' পত্রে প্রবন্ধ লিখিতেছিলেন; উক্ত পত্রের অক্টোবর সংখ্যায় তিব্বতের প্রধান লামার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকারের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। বিবরণটি যৎপরোনাস্তি কৌতুকোদ্দীপক,—অনেকের নিকট হয় ত অবিশ্বাস্য।

তিব্বতের প্রধান লামা বুদ্ধের অবতার। খৃষ্টীয় মিশনারীগণ অপবাদ দিয়া থাকেন যে, প্রধান লামা বালক, তিনি পুরোহিতের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিকা মাত্র; কিন্তু হেনকোল্ড সাহেব লিখিয়াছেন, তিনি লামাকে তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্নভাবে দর্শন করিয়াছেন।—তিনি বালক বটে, কিন্তু দুর্ব্বলমতি শিশু নহেন; তাঁহার বয়স আট বৎসর, নয় বৎসরের নিশ্চয়ই অধিক নহে; নির্ব্বোধের ন্যায় ঔদাস্যপূর্ণ ভাব সে মুখে অঙ্কিত নাই, তাঁহার দৃষ্টি তেজোগর্ব্বময়, সে দিকে চাহিলে সম্মান ও বিস্ময়ে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। মুখমণ্ডল সৌষ্ঠবসম্পন্ন এবং উদার, কিন্তু সে মুখে এমন একটি বিষাদরেখা অঙ্কিত ছিল যে, বালকের মুখে তাহা নিতান্ত বিসদৃশ। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয়ই ডাক্তারকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্মিত করিয়াছিল।

প্রধান লামা।

টালাই লামার দৃষ্টি এমন তীক্ষ্ণ যে, দেখিলেই বোধ হয়, তিনি তাঁহার চক্ষু দ্বারা মনের অন্তর্দ্দেশ পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিতেছেন। তিনি ডাক্তারের সঙ্গে জার্ম্মান ভাষায় কথা কহিতে লাগিলেন। ডাক্তার বহুকাল কাহাকেও এ ভাষায় কথা কহিতে শুনেন নাই। লামা জার্ম্মান ভাষায় কিরূপে সুপণ্ডিত হইলেন, তাহা মনুষ্যের নিকট একটি প্রহেলিকা। ডাক্তার লামার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার সময় সম্পূর্ণ আত্মগোপন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে জার্ম্মান বলিয়া চিনিবার কোনও উপায় ছিল না। দার্জিলিং ত্যাগ করিবার সময় তিনি সর্ব্বশরীর রঞ্জিত করিয়া ও উত্তরভারতের প্রচলিত পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া হিন্দুর বেশ ধারণ করাতে, নিরাপদে লাসায় পৌঁছিয়াছিলেন; এবং তিনি যে ছদ্মবেশী, তাহা কেহই অনুমান করিতে পারে নাই।

জার্ম্মান ভাষায় লামার কথোপকথন।

ডাক্তার হেন্‌কোল্ড বলেন, ভারতে ও তিব্বতে প্রাক্তন সংস্কার প্রণালীতে কোনও বিশেষ জ্ঞান লাভ করার কথা অবিসম্বাদিতরূপে সত্য; পাশ্চাত্য দর্শন কিন্তু এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। হয় ত ইহা (Hypnotism) হিপনোটিজ্‌মের রূপান্তর, এবং এই বিস্ময়কর অভ্যাস মনোভাবনির্ণয়ের নামান্তরমাত্র।

লামা উক্ত ডাক্তারের সমস্ত চিন্তা এবং অভিপ্রায় নির্ণয় করিয়া যে কোনও অধ্যায় তাহা বিবৃত করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু এই অদ্ভুতশক্তিশালী বালক যে শুধু ইহাতেই তাঁহাকে অবাক্ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। ডাক্তার তাঁহার যে জ্ঞানের পরিচয় পাইয়াছিলেন, প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য জগতের মনীষিগণের নিকট তাহা অতি বিরল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে তাঁহার প্রচুর অধিকার, জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁহার এরূপ ব্যুৎপত্তি যে, ডাক্তার তাঁহার ধাতুবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, আণবিকতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে গভীর জ্ঞান দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়াছিলেন। ডাক্তার যে কোনও বিষয়ের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহাতেই লামার অসামান্য পারদর্শিতা লক্ষিত হইয়াছিল। দার্শনিক তত্ত্বেও তাঁহার সুন্দর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার সমস্ত কথাই চিন্তাপূর্ণ, তর্ক করিবার প্রণালী এবং ক্ষমতা অদ্ভুত, কিন্তু তাহা সহজবোধ্য ও সরল। তাঁহার প্রত্যেক বাক্যে একটি প্রভাব আছে, যাহাতে অনুমান হয়, তিনি সর্ব্বদর্শী এবং বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ, কোনও বিষয়ই তাঁহার অজ্ঞাত নহে।

লামার অদ্ভুত ক্ষমতা।

প্রধান লামার সহিত ডাক্তারের কাল সম্বন্ধেও কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। লামা বলেন, পৃথিবীর গতি দ্বারাই সময়ের পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়া থাকে; মেরুপ্রদেশে পৃথিবীর গতি অনুভূত হয় না, সুতরাং সেখানে কালেরও পরিমাণ নাই। তাঁহার মতে গণিতশাস্ত্র ভ্রান্তিসঙ্কুল; কারণ, ইহা বিশ্লেষণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাঁহার মুখমণ্ডলে যে বিষাদচিহ্ন অঙ্কিত ছিল, পৃথিবীর অধিবাসি-বৃন্দের অভাব ও উদ্বেগই তাহার কারণ; এই উদ্বেগ তিনি হৃদয়ের সহিত অনুভব করেন। তিনি ডাক্তারের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মের কোনও কোনও অসার অংশ সম্বন্ধেও কথোপকথন করিয়াছিলেন।

কোন কোন বিষয়ে লামার মত।

সমাজনীতি।

পাপাচরণে পুরুষের অধিকার।

যে নৈতিক পাপাচরণে রমণীর অধিকার নাই, তাহার অনুষ্ঠানে পুরুষ কি পরিমাণে অধিকারী, এ সম্বন্ধে 'হিউম্যানিটেরিয়ান' পত্রিকায় প্রায় আট জন লেখক ও লেখিকা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। শ্রীমতী মার্টিনের প্রশ্ন—"যৌননীতি সম্বন্ধে পুরুষের আদর্শ স্ত্রীলোকের আদর্শের অনুরূপ হইবে কি না?"—পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা লেখক লেখিকাগণের মতামত উদ্ধৃত করিতেছি।

শ্রীমতী বট্লার বলেন, "সত্যের হিসাবে আমাদের এই প্রশ্ন মীমাংসা করা বিধেয়; টাকাকড়ির দেনা পাওনা বিষয়ে কিম্বা কোন বৈষয়িক কার্য্যে সত্যকথা বলা, এবং ঠিক কাজ করা উচিত। কিন্তু যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, 'সত্যকথা বলা এবং সৎব্যবহার করা সম্বন্ধে স্ত্রী ও পুরুষের আদর্শ একরূপ হওয়া উচিত কি না?' তাহা হইলে ভরসা করা যায়, এই প্রশ্ন শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্য বোধ করিবে। আইন এবং সমাজ, এ বিষয়ে পুরুষকে যে পরিমাণ অধিকার দান করিয়াছে, রমণীগণ তাহা অপেক্ষা অধিক অধিকারের দাবি করিলে চতুর্দ্দিক হইতে নিঃসন্দেহই একটা বিপুল কোলাহল উত্থিত হয়।"

শ্রীমতী বট্লারের মত।

চরিত্র সম্বন্ধে এ রকম প্রশ্ন শুনিলে ভবিষ্যৎবংশীয়গণের বোধ করি বিস্ময়ের সীমা থাকিবে না।

ক্লেমেণ্টস্ স্কটের নিকট এ প্রকার প্রশ্ন কিছুমাত্র অসঙ্গত নহে; তাঁহার মতে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের চরিত্রদোষ অধিকপরিমাণে ঘৃণ্য; কারণ, রমণীর নৈতিকবল পুরুষের অপেক্ষা অনেক বেশী। তিনি বলেন,—"তুলনা করিলে দেখা যায়, স্ত্রীলোকের আপত্তি অতি সামান্য; কারণ লজ্জা ও পবিত্রতা রমণীর স্বাভাবিক ভূষণ, এবং হীন ও পাশবিক প্রবৃত্তি হইতে তাহারা স্বভাবতই যথেষ্টপরিমাণে মুক্ত থাকে; কিন্তু বিনয়, পবিত্রতা কিংবা অন্য কোনও স্বাভাবিক সাহায্যে পুরুষ আপনাকে রক্ষা করিবার অবসর পায় না। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা কি, সে সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা করা উচিত। যদি রমণী-শরীরে পুরুষের ন্যায় বল থাকিত, যদি কখনও তাহাদিগকে গর্ভধারণ করিতে ও শরীরকে জীর্ণ ও ভগ্ন করিতে না হইত, যদি সংসার-সংগ্রামের উপযুক্ত প্রবল ক্ষমতা এবং সহিষ্ণুতায় তাহারা অলঙ্কৃত হইত, মোটের উপর দেবী হইয়া না জন্মিয়া যদি তাহারা পুরুষের ন্যায় পশুত্ব লইয়া জন্মগ্রহণ করিত, তাহা হইলে স্বামী স্ত্রী উভয়ের যৌননীতির আদর্শ অভিন্ন হইতে পারিত এবং সেরূপ হওয়াও উচিত ছিল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুস্থদেহ পুরুষ এবং সুস্থদেহা নারী, এ উভয়েই সম্পূর্ণ বিভিন্নপ্রকৃতিসম্পন্ন; প্রকৃতি তাহাদিগকে পৃথক্ এবং বিভিন্নভাবেই গঠন করিয়াছেন।"

ক্লেমেণ্টস্ স্কটের আপত্তি।

ক্লেমেণ্টস্ স্কটের এই যুক্তি দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, দুই ব্যক্তি বিভিন্নপরিমাণ প্রলোভনের সম্মুখীন হইলে, অধিক প্রলোভিত ব্যক্তির নৈতিক আদর্শের সম্মুখীন হইবার পূর্ব্বেই তাহার পৃষ্ঠপ্রদর্শন করাই বিধেয়। ফলে, এরূপ শিক্ষার ফল এই হইবে যে, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রলোভিত ব্যক্তির নীতির আদর্শ অনতিবিলম্বেই খর্ব্ব হইয়া যাইবে; সুতরাং উপযুক্ত কালে প্রতিঘাতের শক্তিও ক্ষীণ হইবে।

উল্লিখিত বিষয় লইয়া ঈশ্বরের আইন সম্বন্ধে কোনও প্রকার সন্দেহ উত্থাপনের প্রশ্ন না তুলিয়াই লেডী বার্টন মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন যে, সমাজের নিয়ম কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র :—"যে নৈতিক নিয়ম পৃথিবী শাসন করিতেছে, তাহাকেই আমরা সমাজ বলি, তাহা ঈশ্বরের সৃষ্ট নহে; মানুষ নিজের সুবিধার জন্য ইহা গঠন করিয়াছে, ইহাতে অন্ততঃ একটি স্ত্রীলোকও তাহার স্বামীর বন্ধনে আবদ্ধ রহিবে, এমন কি, তাহাকে স্বামিটির কিছুমাত্র প্রয়োজন না থাকিলেও সে বন্ধন শিথিল হইবে না, অথচ কর্ত্তা মহাশয় অপ্রতিহত ভাবে রমণীসমাজে গতিবিধি করিতে পারিবেন, যথা ইচ্ছা যাইবেন, এবং এ জন্মে এতখানি ইয়ারকি করিয়া লইবেন—যা এ জন্মে যথারীতি খরচের পর আরও বিশ জন্মের জন্য মজুত থাকে।"

ঈশ্বর এবং সমাজের আইন।

অতএব, অতঃপর হাউইস্ সাহেবের মতটিরও উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহার বক্তব্য মোটামুটি এই;—১। স্বামীস্ত্রীসম্বন্ধীয় সর্ব্ববিধ অবৈধাচার খৃষ্টধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধী। ২। সমগ্র ব্যবস্থাশাস্ত্রের ইহাই উদ্দেশ্য হওয়া চাই যে, দাম্পত্য আইনে স্ত্রীলোকের পুরুষের করতলবর্ত্তী হওয়া নিষিদ্ধ হইবে, কিন্তু রমণীর আদর্শে পুরুষকে তাহার দাম্পত্যনীতির মাত্রা চড়াইতে হইবে।

হাউইস্ সাহেবের মত।

এখন ফ্রাঙ্কফোর্ট সাহেব প্রশ্ন করিতেছেন, আচ্ছা, পুরুষবর্গ যদি রমণীগণের ন্যায় ব্যবহৃত হইত, তাহা হইলে কত দূর পরিবর্ত্তন সাধিত হইত? উত্তরস্বরূপ তিনি স্বয়ং লিখিতেছেন,—প্রথমে, স্ত্রীপুরুষের প্রাত্যহিক কার্য্যানুরূপ আচরণ লক্ষ্য করিয়া তাহাদের উচিত্যানৌচিত্য অবধারণ করা যাউক। যাঁহার অবনতি আরম্ভ হইয়াছে, এরূপ পুরুষ ও রমণীর অদৃষ্ট অভিন্ন হউক, সে সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হউক, সেই যুবকের সম্মুখে তাহার নাম উচ্চারণ করিবার সময় লোকে যেন

ফ্রাঙ্কফোর্ট মূরের প্রশ্ন ও উত্তর।

বিষাদাবনত মস্তকে অস্ফুটস্বরে সে নাম উচ্চারণ করে। অর্থাৎ, একজন পতিতা স্ত্রীর যেরূপ ভাবে ব্যবহৃত হয়, পুরুষের উপরও সেইরূপ ব্যবহার চলুক ; দেখিবে, সমাজসংস্কার আপনিই ছুটিয়া আসিবে। অবশ্য, সে ব্যক্তির যথাসময়ে অনুতাপ করিবার অধিকার থাকিবে, কিন্তু সমাজে সে কাহারও সহিত মিশিতে পারিবে না, বিশেষতঃ স্কুল কলেজ হইতে বাহির হওয়া, সংসার-অনভিজ্ঞ যুবকবর্গের ত্রিসীমানায় আসিবার অধিকার থাকিবে না। আমার বিবেচনায় এবং আমার বিশ্বাসমতে, সে বিবেচনা অসঙ্গত নহে ; পতিত পুরুষদিগের জন্য একটি 'অনুতাপগৃহ' প্রতিষ্ঠিত করা কর্ত্তব্য। যাহারা পতিত হয় নাই, তাহাদের স্বেচ্ছা-প্রবৃত্ত দানের উপর কোনও প্রকারে নির্ভর করিয়া পতিতগণ এই গৃহকোণে পড়িয়া অনুতাপ করিতে পারে, এমন কি কাজ করিবার সময়েও অনুতাপের নির্ব্বাধ খতি হওয়া বিচিত্র নহে।

কুমারী হেলেন মাদার মহাশয়ার মতটি সর্ব্বাপেক্ষা আপত্তিজনক। সর্ব্বদাই দেখা যায়, পশুত্বের সহিত সংগ্রাম করিতেই রমণীর জীবন কাটিয়া যায়, দৃশ্যটিও রমণীয় নহে। নীতি-বিষয়ে তিনি পুরুষকে অবনত দেখিতে প্রস্তুত নহেন, কিন্তু তিনি মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিতেছেন যে, নীতির ধর্ম্মই এই যে, মানুষ দুর্নীতি-পরায়ণ হইবে। ইহার যাথার্থ্য প্রমাণের জন্য নিম্ মাদার লিখিত প্রবন্ধের প্রথমাংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

প্রকৃতির নৈতিক বিধি দ্বারা দুর্নীতির পোষণ।

"Nature is the safest and final guide in all matter, and specially in these affecting been a nature, and by establishing and continuing a considerable ercess of women over men. the seems to say that males are at a snemiem and have special priviliges."

ডাক্তার এফ্, উইলসন, কুমারী মাদারের ন্যায় নৈতিক নিয়মাবলীতে সুপণ্ডিত। তিনি বলিতেছেন :—"অভিজ্ঞতা দ্বারা আমরা জানিতে পারি যে, অধিকাংশ মানবের পক্ষে যাহা হিতকারী, তাহাই নীতিমূলক। বস্তু সকলকে এইরূপ সাধারণভাবে ধরিলে এ কথা বলাই বাহুল্য যে, পুরুষ ও স্ত্রীর, পরস্পরের পবিত্রতা ও বিশ্বস্ততার উপর ন্যায্যরূপে নির্ভর করা, অত্যন্ত বিবেচনাসঙ্গত কার্য্য।

বাস্তব নৈতিক নিয়ম।

ডবলিউ, এইচ্ উইলকিনস্ বলেন, "ইটন্ কালেজের ছাত্রগণ প্রলোভনসমুদ্রে পরিবেষ্টিত থাকে ; সেই প্রলোভন হইতে অব্যাহত থাকা তাহাদিগের ক্ষমতার অতীত। কিন্তু যুবতী-গণের সম্মুখে সেরূপ কোনও প্রলোভন দেখা যায় না, বরং তাহাদিগকে প্রলোভনের অন্তরালেই রাখা হয়। সেই সমস্ত প্রলোভনের দফাওয়ারী তালিকা প্রকাশ করা নিষ্প্রয়োজন। মোটের উপর, প্রলোভন আছে, এবং সেই জন্যই রমণীর ন্যায় নীতির আদর্শ রক্ষা করিয়া চলা পুরুষের পক্ষেও অতি কঠিন। কিন্তু তথাপি আদর্শের উচ্চতা রক্ষা করা বিধিমতে বিধেয়, তবে তদনুসারে চলা যাউক বা না যাউক, সে স্বতন্ত্র কথা।

সাহিত্য।

হোম্‌স্।

কুলিশকঠোরহৃদয় কিরাতের ন্যায় ইংরাজী সারস্বত কুঞ্জে মরণ তাহার অব্যর্থ শরসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়াছে। অল্প দিনের মধ্যে একে একে অনেকগুলি কবির মধুময় কণ্ঠস্বর চিরদিনের জন্য নীরব হইল। যে সকল মনীষী মহাপুরুষ মরণাহত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের শোক-

সম্প্রদায়ের পূর্ব্বেই অলিভার ওয়েন্‌ডেল্‌ হোম্‌স্‌ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। আমরা আমেরিকান্‌ 'রিভিউ অফ্‌ রিভিউস্‌' হইতে তাঁহার সম্বন্ধীয় মোটামুটি কয়টা কথা সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

হোম্‌স্‌ আশৈশব সুখী। পিতামাতার স্নেহ ও পুস্তক পাঠের পূরা সুবিধা ছাড়া তাঁহার হৃদয়ের প্রবল প্রকৃতি-প্রেম পরিতৃপ্তির উপায়ও তাঁহার ছিল। দেশে ডাক্তারির জন্য পাঠ করিয়া তিনি প্যারীসে গমন করেন। এই জন্য তাঁহার সমস্ত জীবন ও রচনার মধ্যে আমেরিকের কার্য্যতৎপরতা ও ফরাসীর হাস্যপ্রফুল্লতা, যুরোপ ও আমেরিকার মিলনের পুণ্য প্রয়াগক্ষেত্রে মিলিত, বোধ হয়। বাস্তবিক যুবকদিগের পক্ষে প্যারীর ন্যায় মহানগরের সংঘর্ষে আসিয় হৃদয় হইতে দেশীয় সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া হৃদয় উদার করিবার মত হিতকর আর কিছুই নাই। সেখানে তিনি শিক্ষকদিগের স্নেহ ও শ্রদ্ধা লাভ করেন। সাহিত্যপ্রেম তখন হইতেই তাঁহার বড় প্রবল। তিনি তখন "কলেজিয়ান" পত্রে কতকগুলি সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন, এবং তাঁহাতে উক্ত পত্রে বিশেষ প্রশংসিত ও লোকের প্রিয় হইয়া উঠেন।

শিক্ষা।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে "নিউ ইংলণ্ড ম্যাগাজিন" পত্রে তিনি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "Autocrat" প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু উক্ত পত্র উঠিয়া গেল, হোম্‌স্‌ তখন ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করিলেন। সেই জন্যই "অটোক্রাট" দ্বয়ের মধ্যে পঁচিশ বৎসরের কঠোর নীরবতা রাজত্ব করিয়াছে। এ দিকে তিনি ব্যবসায়ে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিলেন, এবং বহু দিন পরে লঙ্‌ফেলো, লাওয়েল, প্রেস্‌কট, মট্‌লি প্রভৃতির সহিত "আটলাণ্টিক মন্থলি"র লেখকশ্রেণীভুক্ত হয়েন। সাহিত্য-সিংহাসনে সম্রাটের ন্যায় আবার "অটোক্রাট" আবির্ভূত হইল। সেই সুপণ্ডিত, সুরসিক ও সুলেখকের প্রবন্ধ সাধারণ পাঠকের উপর অল্প দিনেই অসাধারণ প্রভাব সংস্থাপন করিল। এতদিন সাহিত্যামোদিগণ তাঁহার সুললিত কবিতাবলির ঝঙ্কারে মুগ্ধ ছিলেন, কিন্তু কবিতা সকলে বুঝে না। এখন বহুসংখ্যক নরনারী মুগ্ধহৃদয়ে তাঁহাকে গুরুর মত ভক্তি করিয়া তাঁহার উপদেশপালনে প্রবৃত্ত হইলেন।

ব্যবসায় ও সাহিত্য।

হোম্‌সের সাফল্যের প্রধান কারণ তাঁহার বিশ্বাস; তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, জগৎ ক্রমেই অগ্রসর হইতেছে। মানবগণ কালপ্রবাহে উন্নতির দিকেই অগ্রসর হইতেছে। তাঁহার জ্ঞান সুগভীর ছিল। তিনি অভিধানভক্ত ছিলেন ও যাহা পাঠ করিতেন, তাহার সার সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। কিন্তু তাঁহার প্রধান সহায় তাঁহার অসাধারণ স্মরণশক্তি। তিনি জানিতেন যে, তাঁহার স্মৃতি অকৃত্রিম বন্ধুর ন্যায় সময়ে তাঁহার আবশ্যক সকল তথ্য আনিয়া দিবে ও কখনই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে না। হোম্‌সের রচনা কালপ্রবাহে ভাসিয়া যাইবে না, কারণ সাহিত্যচর্চ্চা তিনি পেশাদারী রকমে করেন নাই। পরন্তু স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া প্রিয়কার্য্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই অসাধারণ প্রতিভাবান পুরুষ চিরদিন উৎসাহের সহিত অন্য ব্যবসায় চালাইয়াছেন। তাঁহার সকল রচনাতেই বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, রসিকতা বা রচনাসারল্য সে উদ্দেশ্যকে ঢাকিতে সমর্থ নহে, তাহা তাঁহার সকল রচনাতেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, পাপ পাপীর বাসনা হইতে উৎপন্ন, তাহার হলাহলময় হৃদয়মন্থনের ফল, তাহা কখনই পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বর্ত্তায় না।

সাফল্য।

"ফোরাম" পত্রে হোম্‌সের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক বলেন যে, ব্রায়াণ্ট, এমারসন, লঙ্‌ফেলো, হুইটিয়ার, হোম্‌স্‌ ও লাওয়েল, এই কয় জন সমসামরিক কবি,

একে একে সকলেই গত। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে লিঙ্কন, ডারউইন, টেনিসন, গ্ল্যাডষ্টোন প্রভৃতির জন্ম হয়—হোম্‌স্‌ও সেই বৎসর জন্ম গ্রহণ করেন। অল্প বয়সে তিনি অনেক কবিতা লিখিতেন, কিন্তু ক্রমে তাঁহার কবিতায় অবনতি দৃষ্ট হইতে লাগিল। "আটলাণ্টিক মন্থলি" পত্রেই তাঁহার প্রতিভা পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠে। তবে "অটোক্রাট"ই তাঁহার প্রধান ও চরম কীর্ত্তি।

হোমস্‌ পবিত্র হাস্যের উৎস মুক্ত করিয়া পাঠকদিগকে আনন্দিত করিয়াছেন। মানবকে দুঃখ তাপ ভুলাইয়া আনন্দিত করিতে আমেরিকার আর কোনও লেখকই এত করেন নাই।

রচনা। তাঁহার রচনা সূর্য্যকিরণ-উদ্ভাসিনী কলগীতিময়ী স্রোতস্বতীর মত বহিয়াছে। হুইটিয়ার পিউরিটান ধর্ম্মমতের কঠোরতা দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, হোমস্‌ পিউরিটান চরিত্রকে কোমল করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বিষণ্ণও নহেন, বিরাগীও নহেন; জীবনের উপভোগ্য ও উপভোগযোগ্য দ্রব্যে তিনি বীতরাগ নহেন; আবার সেই সকল প্রাপ্তির জন্য তিনি হৃদয়ের উচ্চতর প্রবৃত্তি সকলের সেবায় বিরত নহেন। তিনি সংসারে সুখের প্রচারক—তাঁহার রচনার লালিত্যও তাহারই ফল। তাঁহার রচনার হাওয়ায় সেই মনোভাব পাঠক অজ্ঞাতভাবে গ্রহণ করেন। তিনি স্বদেশের মধ্যে আনন্দবিস্তারে ও নিরানন্দ ও কঠোরতার দূরীকরণে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি পুরাতন হইতে নূতন কালে গমন কোমল করিয়াছেন। তিনি বুঝাইয়াছেন যে, জীবন উপভোগযোগ্য, আনন্দ অনুভবযোগ্য, ঈশ্বরের মহিমা সর্ব্বত্র প্রকাশিত। তাই তাঁহার মত সম্মান সাধারণ লেখকের ভাগ্যে ঘটে না, এবং তাঁহার মৃত্যুতে যেরূপ শোকের উচ্ছ্বাস উঠিয়াছে, সেরূপও প্রায় দেখিতে পাই না।

বিপুল কীর্ত্তি পশ্চাতে রাখিয়া হোম্‌স্‌ অন্তর্হিত হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে ইংরাজী সাহিত্যে কবিতার এক প্লাবন আসিয়াছে। "আটলাণ্টিক মন্থলি" পত্রে প্রকাশিত একটি কবিতার এক শ্লোকের অনুবাদ দিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব :—

জীবনের সর্ব্বকার্য্য করি সমাপন,
যশোমাল্যে শিরোদেশ করি বিভূষিত;
দেশহিত, নরহিত, করি সম্পাদন,
ধীরে ধীরে ধরা হতে হলে অন্তর্হিত।
তবে কেন ফেলি অশ্রু? তবু অশ্রু ঝরে,
সেই কবি, সেই বন্ধু, সে গুরুর তরে।

ডিকেন্স।

ডিকেন্সের ন্যায় অসাধারণ ক্ষমতাবান পুরুষ সাহিত্যজগতে দুর্লভ। তাঁহার ভাব ও তাঁহার ভাষা, তাঁহার রচনাপ্রণালী ও তাঁহার ভাবপ্রকাশক্ষমতা, তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি। যখন স্কটের মধুর ও ভাবময় উপন্যাসে ইংলণ্ডীয় সাহিত্য পরিপূর্ণ, তখন সহসা একদিন রোমান্সের ঘন কুজ্ঝটিকা অপসারিত হইয়া গেল, সূর্য্যকরোজ্জ্বল হাস্যময় প্রভাতে 'পিকউইক ক্লবের সভ্যগণ' ইংরাজী পাঠকের গৃহদ্বারে আনীত হইলেন। সাহিত্যজগতে কি পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল! সহসা সাহিত্যের স্রোত ফিরিয়া গেল, ইংরাজী সাহিত্য ডিকেন্সের প্রভাবে পূর্ণ হইল।

"[illegible]ম্যান এণ্ড ইয়ং য়োম্যান" পত্রে কোনও লেখক উপন্যাসিকের কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার পিতার বিষয় জানিয়া কতকগুলি নূতন কথা প্রকাশিত করিয়াছেন। আমরা তাহার কয়েকটি পাঠকদিগকে উপহার দিলাম।

ডিকেন্স সাধারণতঃ নির্জ্জনে একাকী রচনাকার্য্যে ব্যাপৃত রহিতেন; কেবল সময় সময় কন্যা প্রভৃতি নিকটে থাকিতেন। একবার কন্যা বহুদিন পীড়িতা ছিলেন, এবং যখন তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া উঠিতেছিলেন, তখন পিতার অনুমতিক্রমে তিনি অনেক সময় পিতার কক্ষে অতিবাহিত করিতেন। পিতার কার্য্যে ব্যাঘাত জন্মাইবার ভীতি সত্ত্বেও তিনি পিতার আজ্ঞায় সেই কক্ষে যাইতেন। একদিন প্রভাতে কন্যা সোফায় অর্দ্ধশয়ানা, পিতা রচনায় ব্যাপৃত—সহসা কন্যা বিস্ময়বিস্ফারিত ব্যাকুল নয়নে দেখিলেন, পিতা ছুটিয়া সম্মুখস্থ দর্পণের সম্মুখে যাইয়া বদনবিকার করিতে লাগিলেন। পিতা কিছুক্ষণ এইরূপ মুখ-খিঁচানির পর আবার আসিয়া দ্রুত লেখনী সঞ্চালনে ব্যাপৃত হইলেন। আবার দর্পণের সম্মুখে ছুটিলেন, এবং দর্পণমধ্যে আবার সেই সকল অদ্ভুত মুখবিকারের প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হইল। তাহার পর কন্যার দিকে ফিরিয়া তাঁহাকে না দেখিয়া পিতা বিড় বিড় করিয়া কি বকিলেন। তাহার পর নিশ্চিন্তভাবে আবার রচনাকার্য্যে ব্যাপৃত রহিলেন। বহুদিন পর্য্যন্ত কন্যা ইহার কারণ বুঝিতে পারেন নাই। রচনার সময় মনোযোগ ও ঔৎসুক্যাধিক্যে ডিকেন্স সকল ভুলিয়া যাইতেন, এবং আপনাকে কল্পিত চরিত্রের স্থানে সংস্থাপন করিয়া দেখিতেন। তিনি একেবারে তন্ময় হইয়া যাইতেন। সেই জন্যই বোধ হয়, তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি এত জীবন্ত ও সুন্দর। সেই মনোরমা সৃষ্টিক্ষমতা রচনার মধ্যে আপনাকে সর্ব্বতোভাবে নিমগ্ন করি[illegible]ত সমর্থ হইত।

বদনবিকার।

এক এক দিন অসমাপ্ত কার্য্য ফেলিয়া তিনি যখন আহারগৃহে প্রবেশ করিতেন, তখন তিনি অত্যন্ত অন্যমনস্ক থাকিতেন। অন্যমনস্কভাবে কলে চালিত পুত্তলিকার মত তিনি আহার শেষ করিয়া আবার ফিরিয়া রচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। আহারের সময় কেহ কথাবার্ত্তা কহিলে তাহা তাঁহার কানেও উঠিত না; তিনি নিজে কোনও কথাই বলিতেন না। সহসা কোনও দ্রব্য পতনাদি জনিত বা অন্য কোনও শব্দ হইলে, তিনি চমকিয়া উঠিতেন, এবং তাঁহার মুখে এক কাতরতাব্যঞ্জক ভাব প্রকাশ পাইত।

তন্ময়তা।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ট্রেনের দুর্ঘটনার পর হইতে ডিকেন্স শকটে আরোহণ করিতে ভীত হইতেন। সেই দুর্ঘটনার স্মৃতি সর্ব্বদাই তাঁহার হৃদয়ে জাগ্রত ছিল। ইহার পর কোনও প্রকার শকটে আরোহণ বা ভ্রমণ তাঁহার পক্ষে কষ্টের কারণ হইত। একবার তিনি লণ্ডন হইতে ট্রেনে আসিতেছিলেন, পথে সহসা তিনি ভীত হইয়া গাড়ীতে বসিবার স্থানের হাতা চাপিয়া ধরিলেন, তাঁহার বদন পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল, এবং সেই বিস্তৃত কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিল। তিনি বহু চেষ্টাসত্ত্বেও ভয় কাটাইতে পারিলেন না, এবং তাঁহাকে বাধ্য হইয়া পরবর্ত্তী ষ্টেশনে ট্রেন পরিত্যাগ করিতে হইল। এই ভীতি তিনি জীবনে কখনই দূর করিতে পারেন নাই, এবং বহু আশা ও উৎসাহসূচক বাক্যেও সে ভীতি দূর হইত না।

শকটে শঙ্কা।

যুগল কবিতা।

লক্ষ্মীপূজা।

ঝি! ঝি! ওই তোর মুড়ো ঝাঁটা দিয়া
অলক্ষ্মী মাগীরে ঝাটু * দেরে তাড়াইয়া।
ও যে অলক্ষ্মী, করি সর্ব্বনাশ,
আজুও কি মিটিল না আশ?
সর্ব্বনাশি, তুহারে সাবাসি!
করে সধবার একাদশী,
তোর পূজা আয়োজনে ঘোর,
কন্যাগণ বধুগণ মোর!
ক্ষণব্যাধি চুম্বিয়া কপোল,
করিয়াছে দেহ মাংস লোল!
আমরি কি কলির মাধুরী!
ঘৃণার গোময়-রস ভরি,
শত হস্তে ধরি পিচ্‌কারি,
মহা হাস্যে দিয়ে টিট্‌কারি,
বিদ্রূপ ঢালিয়া দেয় গায়!
বাকি কি রাখিল বল্ হায়?
দিনান্তে আকাশ পানে চাব,
তারও অবকাশ নাহি পাব!
কোথা মম লাজ ও ভরম!
কোথা মম ধরম করম!
ঝি, ঝি, ভাঙ্গা কুলো বাদ্যি বাজাইয়া,
বিধবা মাগীরে ঝাটু দেরে তাড়াইয়া।

তুমি কিন্তু এসো গো কমলা,
ত্রিভুবন করিয়ে উজলা!
উষাময় বদন মধুর,
সন্ধ্যাময় চাঁচর চিকুর,
পুণ্যপুঞ্জে জনম জনম,
আজি পাদপদ্ম অনুপম
ফুটিল আমার গৃহে আসি—
সৌরভে পুরিয়া দশ দিশি!

* * * *

শীর্ণ দেহ, পাণ্ডুর অধর,
শুষ্ক তালু কুঞ্চিত জঠর,
চারিধারে করি হাহাকার,
চারিধারে বলি মার মার,
দুর্ভিক্ষ চলিয়ে যবে যায়,
অসংখ্য অসংখ্য পঙ্গপাল,
দুর্ভিক্ষের দুরন্ত ছাবাল,
তরু, লতা, ঘাস, পাতা সব মুড়াইয়া,
বসন্ত-লক্ষ্মীর আহা সিন্দূর মুছিয়া,
জনকের পিছু পিছু ধায়!
তার পরে, ভাগ্যবলে, বাসব হইলে কৃপাবান,
ফল, ফুলে হয়ে শোভাবান,
সাহারার মাঝে পুন দেখা দেয় বিচিত্র উদ্যান!
সেহারে কৃষকবালা হরিষ-অন্তর,
গোলাবাড়ি মাঠ আর ঘর
ভরি গেছে ফসলে ফসলে!
কনক-কুণ্ডলগুলি দোলে,
অতি মনোহর!
মনোহর সমীর হিল্লোলে!
সেইরূপ কনককুণ্ডলা,
স্বর্ণকান্তি তেমতি উজলা,
আসিয়াছ মোর গৃহে? এস মা কমলা!
ধান্য-শীষ অলকে দুলিছে,
মাধুরী যে উথলি পড়িছে!
ঝাঁপি কাঁখে, হসিত বয়ানে,
কটাক্ষে ঝরিছ দৃষ্টি নীবারের পানে,
নীবার যে ঝরিয়া পড়িছে!
দেবি, একি, সবি কি স্বপন?
তুমিও কি স্বপনসৃজন?
বার বার অবিশ্বাস
ফেলিয়া দীরঘ শ্বাস,
মর্ম্মমাঝারে আসি লভিছে জনম!
বল দেবি, তুমি কি স্বপন?

* * * *

দূর দেশান্তরে, বধূ আনিবারে,
যায় যবে বর,

* "ঝাটু" অতি পুরাতন বাঙ্গলা শব্দ। ইহার অর্থ—শীঘ্র।

দুই দিন উদাসীন থাকে
স্বজন নিকর ;
দুই দিন ফাক্ ফাক্ লাগে
আঙিনা ও ঘর ;
তার পর, যবে বর
বধূটিরে লয়ে,
ফিরে আসে আপন আলয়ে,
খুলে যায় প্রাণের মোহানা ;
আসে সুখ-বন্যা তোলপাড় করি!
চারি ধারে হয় হুড়াহুড়ি!
চারি দিকে উলু ধ্বনি হয়!
হর্ষ করে গণ্ডগোল,
হয়ে মহা উতরোল,
বেজে উঠে কঙ্কণ বলয়!
লক্ষে ঝক্ষে আইসে সানাই,
মঙ্গলশঙ্খের সঙ্গে করিতে লড়াই,
লক্ষে ঝক্ষে আইসে সানাই!
লইয়ে বরণডালা,
যতেক সধবা বালা,
কোলে করি, বধূরে নামায়!
কৌতুকে ঘোমটা হতে,
মুচকিয়া মৃদু হাসি,
নববধূ চারিধারে চায়!
তেমতি বধূর রূপ ধরি,
আসিয়াছ? এস মা কমলা!
তেমতি গো উৎসবলহরী,
চারি ধারে বরিষণ করি,
আসিয়াছ? এস দেববালা!
শোভার মুরতি অভিনব,
অনুপম রূপরাশি তব!
তেমতি কাশ্মীর চেলী ঝলমলে তব গায়,
তেমতি সিন্দুরবিন্দু ভালে তব শোভা পায়!
ওকি তব চরণে শোভিছে?
ও নয় গো অলক্তের দাগ,—
বৈজয়ন্তী অরুণের রাগ,
পাদপদ্মে ঝরিয়া পড়িছে!
এ আঁধারে জ্যোৎস্না ফুটায়ে,
হাসিরাশি চৌদিকে ছড়ায়ে,
আসিয়াছ? এস মা ইন্দিরা!

আমি অতি ভাগ্যবান,
আমি অতি পুণ্যবান,
তাই তুমি নিজে আসি নিজে দিলে ধরা।
বল দেবি, সবি কি স্বপন?
তুমিও কি স্বপনসৃজন?
বার বার অবিশ্বাস,
ফেলিয়া দীরঘ-শ্বাস,
মর্ম্ম-মাঝারে আসি লভিছে জনম।
বল দেবি, সবি কি স্বপন?

একি! একি! আলো! আলো!
আলোকেতে ভরি গেল,
চারি দিক্, চারি দিক্!
ফিরান যে দায় হ'ল আঁখি অনিমিক্!
অঙ্গারখনির গর্ভে খোদিতে খোদিতে,
অকস্মাৎ মহাজন নেহারে চকিতে,
আলোময়, আলোময়, আলোময় চারি দিক্—
তেমতি হীরার মূর্ত্তি ধরি,
ঢালি ঢালি অবিরল আলোক-গাগরি,
আসিয়াছ? এস সুরেশ্বরি!
নয়নে লাগিল ধাঁধা,
পরাণ পড়িল বাঁধা।
কি বিচিত্র রূপ তব ওগো দেবেশ্বরি!
দেবি, একি সবি কি স্বপন?
তুমিও কি স্বপনসৃজন?"
বার বার অবিশ্বাস,
ফেলিয়া দীরঘ-শ্বাস,
মর্ম্ম-মাঝারে আসি লভিছে জনম।
বল দেবি, নও ত স্বপন?

জল, জল, জল, জল,
বৃষ্টিধারা অবিরল,
লতা পাতা ফুল ফল ভিজিয়া আকুল সব।
বিহগ কুলায়ে ভিজে নীরব যেন রে শব।
পরিয়া মলিন বাস,
বিরহী ফেলিছে শ্বাস ;
প্রাণের কন্দুক-খেলা বন্ধ করি দিনমানে,
ছেলেরা তাকায়ে রয়, অবাক মেঘের পানে।
ঐ ঐ বালক ছুটিল ;